ভারতী

মাসিক পত্রিকা।

BENGAL LIBRARY
4. SEP.
WRITERS. BUILDINGS

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীসরলা দেবী—সম্পাদিত।

182. Qb. 878. 29.

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

১৩০৯

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র।)

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা।
অসির ফসল	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৯০৫
অশ্রু	ঐ ঐ	৯৭৩
অভিষেকের মহোচ্ছব	... ...	৯৮১
অপূর্ব্ব বিচারকৌশল	... ...	১০৪৮
আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন, এম,এ,	১০১৯
আর এক দিল্লিপতি	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১০৭০
ইতালির নবজীবন	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮৮
উদ্বোধন	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০৩
উত্তর ইতালির উদ্ধার	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪৩
ঐন্দ্র মহাভিষেক	শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গুহ	৭৪৫
কলাশিক্ষা	শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় এম,এ,	৬৭৪, ৭৬০
কর্ত্তব্য সাধন কর	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৮১০
কলিযুগের প্রারম্ভনিরূপণ	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব, এম,এ,	১০৩২
খোকার ভাত	... ...	৭২১
গুলিখোরের আবেদন পত্র	... ...	৭১০
জাপানে ভারতীয় ছাত্র	... ...	৮৯৩
ঢাকা ও ঢাকেশ্বরী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায়	৮৭৯
ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়	৯৩৬

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা।
দায়ে পড়ে দারগ্রহ	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬১৪
দেশোদ্ধারের রত্নালঙ্কার	ঐ ঐ	৭১৫
দেশীয় শিল্পচর্চ্চাসম্বন্ধে ভাউ-নগরীয় অভিমত	শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, বি,এ,	৮৮৪
ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল ও বৈচিত্র্য	শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভাদুড়ী	৯২১
পুকুরপাড়ে	শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বার-অ্যাট-ল	৭৩৯
পরব্রহ্ম ও মহেশ্বর	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম,এ,	৭৭১
পুলিশ কমিশন	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মিত্র	১১৩৬
প্রাচীন ভারতের লিচ্ছবিজাতি	পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম,এ,	৯৪৮
বিবাহ—অনুলোম ও প্রতি-লোম	শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ,	৭০৯
বিলাতি বুটের আত্মকাহিনী	শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু	৯৭৫
বন্দনা	শ্রীমতী সরলা দেবী	১০০১
৺বাবু সুচিৎসিং	শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়	১১৮০
মাঘ কবির জীবন বৃত্তান্ত	পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	৬৩২
মানী প্রজা	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	১০৯৭
শক্তি পূজা	শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভাদুড়ী	৬০৪
শক্তিসাধন ও তাহার পরিণাম	ঐ ঐ	১০৯৮
শ্রীনাথদ্বার	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৯৫৮
সুন্দরী	শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ,	৬৪৭, ৭৯৭, ৮৬৬, ৯০৫, ১০০৪, ১১৪৮
সাদাকাজীর বিচার	... ...	৬৬২

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা।
সাহেবজাতির কুটুম্ববাৎসল্য	... ...	৮২১
সৌন্দর্য্যের বাসা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগচী, বি,এ,	১১৩৫
স্কুলের বাবু	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	১১১০
স্বরলিপি	... ...	১০০২
স্বত্বস্বামিত্ববুদ্ধি	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন, বি,এ,	১০২৬
সিমলা পাহাড়ে নেটিভে সাহেবে	... ...	১০৮৫
হিন্দুধর্ম্মের স্বাবলম্বন-নীতি	পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম,এ,	৮৫৭
হীরবিজয় সূরী	শ্রীযুক্ত পূরণ চাঁদ সামসুখা	৯১৫

ভারতী

মাসিক পত্রিকা।

BENGAL LIBRARY
4. SEP.
WRITERS. BUILDINGS

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীসরলা দেবী—সম্পাদিত।

182. Qb. 878.29.

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

১৩০৯

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র।)

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা।
অসির ফসল	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৯০৫
অশ্রু	ঐ ঐ	৯৭৩
অভিষেকের মহোচ্ছব	... ...	৯৮১
অপূর্ব্ব বিচারকৌশল	... ...	১০৪৮
আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন, এম,এ,	১০১৯
আর এক দিল্লিপতি	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১০৭০
ইতালির নবজীবন	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮৮
উদ্বোধন	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০৩
উত্তর ইতালির উদ্ধার	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪৩
ঐন্দ্র মহাভিষেক	শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গুহ	৭৪৫
কলাশিক্ষা	শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় এম,এ,	৬৭৪, ৭৬০
কর্ত্তব্য সাধন কর	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৮১০
কলিযুগের প্রারম্ভনিরূপণ	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব, এম,এ,	১০৩২
খোকার ভাত	... ...	৭২১
গুলিখোরের আবেদন পত্র	... ...	৭১০
জাপানে ভারতীয় ছাত্র	... ...	৮৯৩
ঢাকা ও ঢাকেশ্বরী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায়	৮৭৯
ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়	৯৩৬

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা।
দায়ে পড়ে দারগ্রহ	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬১৪
দেশোদ্ধারের রত্নালঙ্কার	ঐ ঐ	৭১৫
দেশীয় শিল্পচর্চ্চাসম্বন্ধে ভাউ-নগরীয় অভিমত	শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, বি,এ,	৮৮৪
ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল ও বৈচিত্র্য	শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভাদুড়ী	৯২১
পুকুরপাড়ে	শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বার-অ্যাট-ল	৭৩৯
পরব্রহ্ম ও মহেশ্বর	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম,এ,	৭৭১
পুলিশ কমিশন	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মিত্র	১১৩৬
প্রাচীন ভারতের লিচ্ছবিজাতি	পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম,এ,	৯৪৮
বিবাহ—অনুলোম ও প্রতিলোম	শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ,	৭০৯
বিলাতি বুটের আত্মকাহিনী	শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু	৯৭৫
বন্দনা	শ্রীমতী সরলা দেবী	১০০১
৺বাবু সুচিৎসিং	শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়	১১৮০
মাঘ কবির জীবন বৃত্তান্ত	পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	৬৩২
মানী প্রজা	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	১০৯৭
শক্তি পূজা	শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভাদুড়ী	৬০৪
শক্তিসাধন ও তাহার পরিণাম	ঐ ঐ	১০৯৮
শ্রীনাথদ্বার	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৯৫৮
সুন্দরী	শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ,	৬৪৭, ৭৯৭, ৮৬৬, ৯০৫, ১০০৪, ১১৪৮
সাদাকাজীর বিচার	... ...	৬৬২

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা।
সাহেবজাতির কুটুম্ববাৎসল্য	... ...	৮২১
সৌন্দর্য্যের বাসা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগচী, বি,এ,	১১৩৫
স্কুলের বাবু	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	১১১০
স্বরলিপি	... ...	১০০২
স্বত্বস্বামিত্ববুদ্ধি	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন, বি,এ,	১০২৬
সিমলা পাহাড়ে নেটিভে সাহেবে	... ...	১০৮৫
হিন্দুধর্ম্মের স্বাবলম্বন-নীতি	পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম,এ,	৮৫৭
হীরবিজয় স্থরী	শ্রীযুক্ত পূরণ চাঁদ সামসুখা	৯১৫

$\frac{03}{5}$ 1707 BL 488 49 1902

উদ্বোধন।

বিঘ্নভয়ে অধমের কার্য্যারম্ভে না হয় প্রবৃত্তি ;
আরম্ভ করিয়া কার্য্য বিঘ্ন পেঁয়ে তাহাতে নিবৃত্তি,
মধ্যমের রীতি এই ; বিঘ্ন পরে বিঘ্ন যত বাড়ে,
যে কাজ লয়েছে হাতে উত্তমেরা কভু নাহি ছাড়ে ॥*

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আস্থন বা ছাড়ুন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক কিম্বা হোক যুগান্তরে,
ন্যায় পথ হতে ধীর এক পা না সরে ॥†

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ
বিঘ্নৈঃ পুণঃপুণরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি ॥

† নিন্দন্ত নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্ত
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি ন ধীরাঃ ॥

শক্তিপূজা।

২০১১ ৫০১
৪৮৮।১

বঙ্গদেশ শাক্তপ্রধান দেশ। এই বঙ্গদেশ হইতে শাক্ত গুরুগণ নেপাল ও ভুটানে শাক্ত ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু শাক্ত বলিলেই সাধারণ লোকের মনশ্চক্ষু সমক্ষে এক অপূর্ব্বমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। সিন্দুরশোভিত কপাল, কারণসেবায় আরক্তলোচন, রুদ্রাক্ষশোভিতকণ্ঠ মহা উগ্রস্বভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। শাক্তেরা সমাজবিগর্হিত, সাধুজননিন্দিত মদ্য মাংস সেবাদি কত কুৎসিৎ কর্ম্ম করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। বলিদানে রত বলিয়া অহিংসারত বৈষ্ণবের সহিত শাক্তের চিরকাল বিবাদ। শাক্ত উগ্র, বৈষ্ণব নিরীহ, তাই বৈষ্ণব শাক্তকে দূর হইতে পরিহার করেন। কথিত আছে শ্রীভগবান গৌরাঙ্গের ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম বঙ্গদেশে শাক্তগণের বীভৎস ব্যাপারের স্রোত রোধ করিয়াছিল।

এখন দেখা যাউক এই শক্তি উপাসনা কি? যিনিই শক্তির উপাসনা করেন, তিনিই শাক্ত। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই শাক্ত সম্প্রদায়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব সকলেই শাক্ত। মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি কাহার উপাসনা করেন। তাঁহার আল্লা কে? তাঁহার স্বরূপ কি? খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহারা কাহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাস্য দেবতার স্বরূপ কি? মুসলমান আল্লার, য়িহুদী জিহোভার, খ্রীষ্টান গড্, খ্রীষ্ট ও মেরীর উপাসনা করেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টানের উপাস্য দেবতার নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ বর্ণনকালে, রূপ বর্ণনের প্রয়োজন হইয়াছে। ইঁহাদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যায় আপনারা কি পূজা করেন? তাঁহারা কি উত্তর দিবেন?

তাঁহাদের বলিতে হইবে যে অনুগ্রহ, নিগ্রহ, ক্ষমা, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়করণে সক্ষমা কোন মহাশক্তির উপাসনা করেন। তাঁহাদের উপাস্য হইতে যদি পূর্ব্বোক্ত শক্তি অন্তর্হিত করা যায়, তাহা হইলে কিছু অবশিষ্ট থাকে কি ? তাহা হইলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা কি উপাস্য দেবতার স্থান অধিকার করিবার যোগ্য হয় ? কখনই নয়। বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করুন তাঁহার উপাস্য কে ? শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তিনি কি সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম মদনমোহন মূর্ত্তির মাত্র পূজা করেন ও সেবা করেন ও উপাসনা করেন ? না তাঁহার অনুগ্রহ নিগ্রহকরণ শক্তি, তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়করণ শক্তি, তাঁহার ভক্ত হৃদয়ে আনন্দদান শক্তি ইত্যাদির উপাসনা করেন ? যদি সেই নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, মদনমোহন মূর্ত্তি হইতে পূর্ব্বোক্ত শক্তির অভাব করা যায়, তখন আর অবশিষ্ট কি থাকে ? তখন এমন কিছু অবশিষ্ট থাকে কি, যাহা উপাসনার যোগ্য ? তখন যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা চিত্রে লিখিত বা প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি হইতে কোন ক্রমেই ভিন্ন নহে। তবে যদি বৈষ্ণব বলেন যে তিনি সেই চিত্রাঙ্কিত বা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিমাত্র পূজা করেন, সে ভিন্ন কথা। এইরূপ বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকই শক্তির উপাসনা করেন। মনুষ্যজাতির জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির অনুভূতির আরম্ভ হয়। জীব-মাত্রেই শক্তির অস্তিত্ব অনুভবে সক্ষম। এই শক্তির অনুভবই ভয় ও মৈত্রীর উৎপাদন করে। এবং জগতের সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় এই ভয় বা মৈত্রী বা উভয়ের মিলনের উপর স্থাপিত। ধর্ম্মের প্রথম উন্মেষে যে শক্তিপূজার প্রাদুর্ভাব হয় তাহা ভয়ের উপর স্থাপিত, তাহা উপাস্য দেবতার অনুগ্রহ-নিগ্রহকরণ শক্তির উপাসনা। প্রথমে কেবল নিগ্রহ এড়াইবার জন্য উপাসনার আরম্ভ হয়। অসভ্য পার্ব্বতীয়

প্রভৃতিদিগের ব্যাপার দেখিলেই ইহা প্রতীয়মান হয়। ক্রমে নিগ্রহ এড়াইয়া অনুগ্রহ পাইবার যত্ন হয়। তখন মনে হয় যাঁহার নিগ্রহকরণে ক্ষমতা আছে তাঁহার অনুগ্রহকরণেও ক্ষমতা আছে। তখন ভয় ও মৈত্রীর মিশ্রণ আরম্ভ হয়। ক্রমে ভয় দূরে পড়িয়া থাকে এবং মৈত্রী প্রাধান্য লাভ করে এবং প্রেম ভক্তির স্রোত বহিতে থাকে।

সর্ব্বত্র যে শক্তির উপাসনা দেখা যায়, সেই শক্তি কি? এই শক্তিই আদিকারণ, আদ্যাশক্তি, বৈদান্তিকের ব্রহ্ম, মুসলমানের আল্লা, য়িহুদির জিহোভা, খ্রীষ্টানের গড্, বৌদ্ধের বুদ্ধ, জৈনের জিন। সেই শক্তি এক। তাঁহার দ্বিতীয়া নাই। ইনিই অনাদি অনন্ত। এক হইয়াও এই শক্তি বিবিধরূপে প্রতিপন্ন, ইহাই বুঝাইবার জন্য দেবী-মাহাত্ম্যে ভগবতী বলিতেছেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কাপরা" জগতে আমি একই, আমাছাড়া দ্বিতীয় কে? জগতে যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আদ্যাশক্তির বিভূতিমাত্র। দেবীমাহাত্ম্যে ভগবতী বলিতেছেন—"পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিসন্তো মদ্বিভূতয়ঃ।" এই দেখ আমার বিভূতিরা ঐন্দ্রী প্রভৃতি শক্তিরা আমাতেই প্রবিষ্ট হইতেছে। ইহাই বুঝাইবার জন্য দেবীমাহাত্ম্যে দেবগণ দেবী ভগবতীকে "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা" ইত্যাদি স্তব করিয়াছেন। এই এক শক্তিই প্রথমতঃ ত্রিবিধরূপে প্রকাশিতা। দেবীমাহাত্ম্যে ব্রহ্মা বলিতেছেন— "বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে। তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।" এই এক শক্তিই সৃষ্টিরূপা, স্থিতিরূপা ও সংহৃতিরূপা। কোথাও এই সৃষ্টিরূপা, কোথাও বা স্থিতিরূপা কোথাও বা সংহৃতিরূপা শক্তির উপাসনা হইতেছে। কোথাও সাধক এই শক্তিকে পুরুষরূপে, কোথাও স্ত্রীরূপে, কোথাও বা অমূর্ত্তরূপে উপাসনা করিতেছেন। কোথাও এই শক্তি বিষ্ণুরূপে অসুর সংহার করিতেছেন,

কোথাও বা পালন করিতেছেন, কোথাও বা শিবরূপে সংহার করিতেছেন। কোথাও বা ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিতেছেন, কোথাও বা ভৈরবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুর সংহার করিতেছেন, কোথাও মাতৃরূপে, লক্ষ্মীরূপে, সরস্বতীরূপে সাধকের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শ্রী ও ঐশ্বর্য্য সম্পাদন করিতেছেন। খ্রীষ্টান এই শক্তিকে গড্ সাজাইয়াছেন, তাঁহার মাথায় মুকুট দিয়া, হস্তে রাজদণ্ড দিয়া স্বর্গের সিংহাসনে বসাইয়াছেন। দক্ষিণে খ্রীষ্টরূপী পুত্র বিভূতি, বামে হোলিগোষ্ট্ নামে অপর বিভূতি বসাইয়া শক্তির সৃষ্টিস্থিতি সংহার রূপের সমাবেশ করিয়াছেন। মুসলমানও তাহাই করিয়াছেন। এই খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা এই শক্তিকে দূরে রাখিয়া আপনারা অন্তরে থাকিয়া, মধ্যে যেন একটী পর্দ্দা দিয়া উপাসনা করেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায় অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে এই শক্তির উপাসনার মানসে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন, দর্শন, স্পর্শন ও সেবা-সুখ অনুভব করেন।

ভারতে এই শক্তিপূজার পূর্ণ বিকাশ। ব্রহ্মজ্ঞান ইহার চরম সীমা। অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রথার প্রচার হইয়াছে। শিশুকে যেমন ভয় না দেখাইলে শাসনে রাখা যায় না, তাহাকে কখন ভূতের ভয় দেখাইতে হয়, কখন শাস্তির ভয় দেখাইতে হয়, তবে সে শাসনে থাকে। তেমনি ভারতবাসীর মধ্যে যাহারা শিশু অবস্থায় আছে, তাহাদের জন্য ভয়ের প্রথায় শক্তি উপাসনার প্রচলন হইয়াছে। যাহাদের বুদ্ধি কতক মার্জ্জিত হইয়াছে অর্থাৎ জনসাধারণের ও গৃহস্থ সংসারীর জন্য ভয় ও মৈত্রীমিশ্রিত শক্তিপূজা প্রথার প্রচলন হইয়াছে। ইহারা শক্তিকে পিতৃরূপে, মাতৃরূপে, সখারূপে দেখিবে, তাঁহাকে মনের বেদনা জানাইবে, তাঁহার দর্শন স্পর্শন ও সেবাসুখ অনুভব করিবে, দুঃখময় সংসারে তাঁহাকেই শান্তির নিকেতন মনে করিবে। শাস্তির ভয়ে অন্যায় করিবে না, অনুগ্রহের লোভে সদাচার তৎপর হইবে।

এ অবস্থায় শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের তত বিরোধ লক্ষিত হয় না। তবে যে কোন কোন বৈষ্ণব কালীকে আঁধারে ঠাকুর বলেন, দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন না, বিল্বপত্রকে তেফড়কার পাতা বা মলসরার পাতা বলেন, তাহা অনেক সময় গোঁড়ামী দেখাইবার জন্যও বটে, আবার অনেক অনেক সময় এরূপ করা বিশেষ প্রয়োজনও বটে। অজ্ঞ জড়মতি লোকের কোন বিষয়ে আস্থা জন্মাইতে হইলে তদ্বিষয়ে গোঁড়ামির বিশেষ প্রয়োজন। নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে অশিক্ষিত দুর্ব্বলচিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, কোন একটী বিষয়ে আস্থাবান্ হইতে পারেনা। এভাবে দেখিলে গোঁড়ামী নিন্দনীয় না হইয়া বরং প্রশংসনীয় হয়। এক আশ্চর্য্যের বিষয় শাক্তেরা বৈষ্ণবের দ্বেষ করেন না তবে তাঁহাদের গোঁড়ামী দেখিয়া অজ্ঞবোধে পরিহাস করেন। কিন্তু কোন জ্ঞানবান লোকে এরূপ বিদ্বেষ বা পরিহাস করেন না ইহা নিশ্চিত। যাঁহাদের বুদ্ধি বিশেষ মার্জ্জিত, জ্ঞানালোকে আলোকিত তাঁহাদের জন্য মৈত্রী প্রথায় শক্তিপূজার প্রয়োজন। এখানে ভয় নাই, কেবল মৈত্রী। সাধক উপাস্য দেবতা লইয়া মত্ত। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন নাচে, কখন গায়। তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেনা। এরূপ করিতে করিতে পার্থক্য কাটিয়া যায়, ব্যবধানের লেশমাত্র থাকে না। দুই মিশিয়া এক হইয়া যায়। সাধক অবশ হইয়া সোঽহম্ সোঽহম্ ধ্বনি করিতে থাকেন। ক্রমে এ সোঽহম্ও ও থাকেনা; উহা ওম্-এ পরিণত হয়। ক্রমে ইহাও মিটিয়া যায় এবং পূর্ণব্রহ্ম সমাধি উপস্থিত হয়।

সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক ঠাকুরই পূজা করে, কেবল মন্দির লইয়াই বিবাদ। কাহারও মন্দির কাল, কাহারও সাদা, কাহারও নীল। পরমহংস দেব বলিতেন, এক লণ্ঠনে পাঁচরঙ্গের পরকলা, তাহার ভিতর

তাহার কাছে আলো সেই রঙ্গের দেখাইতেছে। আলো কিন্তু এক। সাম্প্রদায়িক বিবাদও ঠিক এইরূপ।

আমাদের দেশে শাক্ত বলিলেই যাঁহারা তন্ত্রমতে শ্রীআদ্যাশক্তির উপাসনা করেন তাঁহাদেরই বুঝায়। বাস্তবিকই, শক্তিপূজার মূলসূত্র তন্ত্রেই আছে। সদ্গুরুর নিকট যাঁহাদের তন্ত্রমতে যথার্থ যথাবিধি উপদেশ হইয়াছে, তাঁহারা বুঝিয়াছেন ব্যাপার কি। এরূপ সাধক কখন দ্বেষ বা বিদ্রূপ করিতে পারেন না, আপনাকে অপর সাধক হইতে পৃথক মতাবলম্বী মনে করিতে পারেন না। এখানে সব একাকার। যিনি তন্ত্রের রহস্য বুঝিয়াছেন, যিনি মন্ত্রের রহস্য বুঝিয়াছেন, যিনি আবরণপূজা বুঝিয়াছেন, যিনি ন্যাস ধ্যান বুঝিয়াছেন, যিনি ক্রিয়াযোগ শিখিয়াছেন, তিনি কি ভাগ্যবান্! তাঁহার নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সব একাকার। কিন্তু ইহা অতিশয় কঠিন বিষয়। সেইজন্যই ইহা গোপনে রাখার এত ব্যবস্থা। কেবল পুস্তকে পড়িয়া জ্ঞান হয় না। বরং বিপরীত ফল হয়। কারণ পুস্তকে এরূপ ভাষার ব্যবহার করা আছে যাহা অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হয়, কোথাও বা বীভৎস বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এ পন্থা অতি দুরূহ। সাধারণের জন্য নহে; জ্ঞানীর জন্য, পণ্ডিতের জন্য, বুদ্ধিমান বিচারশীলের জন্য। সদ্গুরু ও অধিকারীর অভাবে আমাদের দেশে তন্ত্রে এত অধোগতি হইয়াছে। দুশ্ছেদ্য আবরণে আবরিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ইহা আরও অবনত হইয়া পড়িতেছে। এই তন্ত্রে দুইটী মার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। দক্ষিণ ও বাম। দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষির প্রচলিত মার্গকে দক্ষিণামার্গ ও বামদেব ঋষির প্রবর্ত্তিত মার্গকে বামমার্গ বলে। এক্ষণে এই দক্ষিণ ও বাম মার্গের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

দক্ষিণামার্গী তান্ত্রিকগণ শান্ত, ধীর ও অহিংসারত, তাঁহাদের আহার ও পানীয় সাত্ত্বিক, তাঁহারা মদ্য মাংস মৎস্য স্পর্শ করেন না, অতিশয়

শুদ্ধাচারে থাকেন। ইহাঁরা সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের দিকে তত লক্ষ্য করেন না। আর বামমার্গীদের মধ্যে বীরাচারী ও পশ্বাচারী আছেন। যাঁহারা বহির্শত্রুও অন্তর্শত্রু জয়ে ধৃতশস্ত্র তাঁহাদিগকে বীরাচারী বলে। বাস্তবিক পূর্ব্বে বীরগণের জন্যই এই মার্গ প্রবর্ত্তিত হয়। রণে উন্মত্ত হইয়া মনুষ্য মনুষ্যকে হত্যা করিবে, একি ব্যাপার? অথচ ইহা প্রয়োজন। **দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। আর্ত্তের রক্ষণ বীরধর্ম্ম।**

ইহা বীরাচারের বহিরঙ্গ। অন্তর্শত্রুজয় ইহার উচ্চ অন্তরঙ্গ। কামক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুর জয় করিয়া মায়ার দুর্গ ভেদ করিয়া পূর্ণ-ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা এই উচ্চ অঙ্গের লক্ষ্য। যে স্ত্রীলোক হৃদয়ে কামের উদ্দীপন করে সেই স্ত্রী ভগবতীরূপে প্রতিভাতা হইবে। প্রবৃত্তির উদ্দীপক বস্তুজাত প্রবৃত্তির উদ্দীপনা করিবে না। যাহা মহাতপস্বীগণের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা বীরসাধকের নিকট ব্যাহত হইবে। আর বহিরঙ্গরত বীরসাধক দেবীর প্রেরিত বীর হইয়া দেবীর সংহারকার্য্য সাধন করিতেছেন এই ভাবিয়া রণে প্রবৃত্ত হইবেন। দেবীর কার্য্যসাধন করিতেছেন এই জ্ঞান তাঁহাদের চিত্তকে পাপস্পর্শ শূন্য করিয়া রাখিবে। দেবী পশ্চাতে আছেন এই জ্ঞান তাঁহাকে শতগুণে বলীয়ান করিবে। এইরূপ সাধকবীর একপ্রকার অজেয়। ক্রমে এ বীরসাধনের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। বামমার্গে যেরূপ সাধনের ব্যবস্থা আছে, অপরিমিত সাহস-সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় দৃঢ়প্রাণ মহাপরাক্রান্ত বীর ভিন্ন কেহই তাহার সাধন করিতে সক্ষম হন না। অপরে তাহা সাধন করিতে গেলেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, শ্রীভ্রষ্ট হয়, রোগগ্রস্ত হয় এবং অনেক সময়ে পাগল হয়। সংসারীর এ মার্গ নহে। ইহা জিতেন্দ্রিয়, পরার্থে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীর সন্ন্যাসীর মার্গ। গুরু অভাবে, অধিকারীর অভাবে

আমাদের স্মরণ আছে, একসময় কোন মহাপুরুষের নিকট কোন লোক বামমার্গের উপাসনা করিবার উপদেশ চাহেন। তিনি তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিলেন, বলিলেন "এ মার্গ অতি কঠিন, পারিবি না।" তথাপি লোকটী এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন তাহার বড় ইচ্ছা সে বামমার্গের সাধন করে। তখন মহাপুরুষ বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন "যা, তোর যা ইচ্ছা ক'র্‌গেযা, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মদ খাবি ও বেশ্যাবাজি কর্‌বি এই মৎলব বই ত নয়। যা, খুব ক'সে অম্বল খেগে যা, যখন অম্বলশূল হবে, আমার কাছে এসে ওষুধ জিজ্ঞাসা করিস্।"

বামমার্গীদের মধ্যে কয়জন বীরসাধক আছেন জানি না। যদি একজনও বীরাচারী বীরসন্ন্যাসী, মায়ের পুত্র থাকিতেন তাহা হইলে এত দিন যুগান্তর উপস্থিত হইত। বামমার্গী সাধকেরা আসল ছাড়িয়া অনুকল্পের আশ্রয় লইয়াছেন। রণে শত্রুবিনাশের—অন্তর্শত্রু বিনাশের পরিবর্ত্তে নরবলি, তদভাবে পশুবলি অবলম্বন করিয়াছেন। রণভূমে দুষ্ট অরাতির রক্তে মহাকালীর তৃপ্তিসাধনের পরিবর্ত্তে মেষ মহিষাদির রক্তের অনুকল্প অবলম্বন করিয়াছেন। বীরাচারের একটী বলিমাত্র এই—"শত্রু পক্ষস্য রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে, ভক্ষয়স্বগণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয় সমন্বিতঃ॥ "হে ভৈরব, কুকুর সমন্বিত হইয়া স্বগণের সহিত প্রতিদিন শত্রুসৈন্যের রুধির ও মাংস ভক্ষণ কর।" সংহাররূপা আদ্যাশক্তির উপাসনায় অনুকল্পে সবই রাখিয়াছেন। তাই ফলেরও অনুকল্প হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মার্গের তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও প্রকাশকেরা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য তাহাদের অবিকল বঙ্গানুবাদ দিয়া সাধারণের এক মহা অভাব দূর করিয়াছেন। তাহার ফল এই হইয়াছে যে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাহা

পাঠ করিতেছেন আর বুঝিতেছেন যে, যে মদ্যপান পাপ বলিয়া পরিগণিত, তাহা বাস্তবিক তাহা নহে, ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান উপায়, সুতরাং শাস্ত্রসম্মত। এই মদ্যপানের নিন্দা করিলে পাপ হয়। যে পরস্ত্রীগমন মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত তাহা শাস্ত্রসম্মত, ধর্ম্মসাধনের প্রধান উপায়। ইহা ভিন্ন এমন কত বীভৎস ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছে যাহা স্বামী স্ত্রীর সমক্ষে বসিয়া পাঠ করিতে লজ্জিত হয়। বামমার্গের এই অধোগতি হইবে জানিয়াই ভগবান ব্যাস দেবীভাগবতে বামমার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া উত্তর দেওয়াইয়াছেন যে কশ্যপ কর্তৃক অভিশপ্ত পতিত ব্রাহ্মণগণের বংশধরদিগের জন্য ও পাষণ্ডগণের জন্য এই মার্গ প্রবর্ত্তিত হইল। এরূপ অনিষ্টকর তন্ত্রগ্রন্থ যত প্রকাশিত না হয় ততই ভাল। ধর্ম্মের দোহাই না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহার প্রচার বন্ধ হইত। এই সকল সানুবাদ তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফল এই হইতেছে যে, শাস্ত্র মিথ্যা ও দেবতা মিথ্যা ইহাই ক্রমে সাধারণের বিশ্বাস হইতেছে। প্রকাশকেরা যে কিরূপ পণ্ডিত তাহা তাঁহাদের অনুবাদেই প্রকাশ।

প্রতি মন্ত্রের পঞ্চদশ অর্থ হয়। অধিকারী ভেদে সদ্গুরু উপযোগী অর্থের প্রকাশ করিয়া দেন। সেই পঞ্চদশ অর্থ এই ঃ—(১) প্রতি পদার্থ, (২) আদিম ভাবার্থ, (৩) সম্প্রদায়ার্থ, (৪) নিগর্ভার্থ, (৫) তুরীয়সার্থ, (৬) কৌলিকার্থ, (৭) রহস্যার্থ, (৮) মহাতত্ত্বার্থ, (৯) বামার্থ, (১০) শব্দরূপার্থ, (১১) নামৈকদেশার্থ, (১২) শাক্তার্থ, (১৩) সামলস্যার্থ, (১৪) সমস্ত সদ্গুণার্থ, (১৫) মহাবাক্যার্থ। অনুবাদে কোন্ অর্থ প্রকাশিত হয় অনুবাদকই জানেনা। ইহারা স্বয়ং অন্ধ হইয়া অন্ধকে পথ দেখাইতে চাহে। তন্ত্র গোপ্য কেন ইহারা তাহা বুঝে না। ইহাদের দ্বারা যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে, দেশের যা সর্ব্বনাশ হইবার তাহা হইয়াছে। অল্পে অল্পে

হইতে দিবেন না। যাহা সদ্গুরু বক্ত্রগম্য, সাধক ভিন্ন যাহার রহস্য ভেদ করিতে পারে না, অনুস্বার বিসর্গ উঠাইয়া তাহার অনুবাদ প্রকাশ করায় যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যে বীরাচার একদিন গুহের হস্তে খড়্গ দিয়া রাজপুত জাতিকে বীরমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে তুলিয়াছিল, সদ্গুরুর অভাবে সেই বীরাচারের ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতের পতন হইল। বীরাচারী শিবাজীর পন্থা অনুসরণে সক্ষম ও উপযুক্ত বীর ছিল না তাই মহারাষ্ট্রীয়েরা মাথা তুলিয়াই পড়িয়া গেল। প্রেমভক্তিপ্রধান শিখধর্ম্মে গুরুগোবিন্দ বীরাচারের প্রবেশ করাইয়া শিখের কীর্ত্তি-নিশান উড্ডীন করাইয়াছিলেন। সদ্গুরু অভাবে সে শিখজাতিরও পতন হইয়াছে। আছে সব, নাই কেবল সদ্গুরু ও অধিকারী শিষ্য। বীরাচার—প্রকৃত শুদ্ধসদ্গুরু উপদিষ্ট বীরাচার ভিন্ন দেশের উন্নতি হয় না। বীরাচারে যে সকল সাধনের ব্যবস্থা আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে ব্যাপার কি গুরুতর,—তাহা অসম্ভবকে সম্ভব করা। বীরাচারী কেবল বীর নহেন, সাহসী নহেন; বীরাচারীর জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্বার্থ, জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব্বজীবহিতে রত হওয়া চাই। দেশের উন্নতি সাধনের জন্যও এইরূপ বীরের প্রয়োজন। তিনিই প্রকৃত বীরাচারী যিনি আপনাকে মায়ের পুত্র বলিয়া বুঝিয়া অনন্যদৃষ্টি হইয়া মায়ের কার্য্য সাধনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হইতে পারেন;—স্বার্থের কণামাত্র থাকিলে হইবে না।

মা আনন্দময়ি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক মা! তুমি ইচ্ছা করিয়া নিঃসন্তান হইয়া থাকিবে তাহার আর উপায় কি? তোমার যাহারা সন্তান তাহারা সন্তান-পদ-বাচ্যই নহে, তোমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহে। মা এ সব দেখিয়া শুনিয়া কি করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ! একবার জাগাও মা! জাগ মা!

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

দায়ে পড়ে দার-গ্রহ।

প্রহসন।

(মোলিয়েরের-কৃত "মারিয়াজ ফোর্সে" অবলম্বনে লিখিত)

দৃশ্য।—জগমোহনের বাটী।

জগমোহন। (বাড়ির লোকদিগের প্রতি) আমি এখন বাইরে যাচ্চি, এখনি ফিরে আস্‌ব। দেখ, তোমরা বাড়ীর উপর নজর রেখো—যেখানকার যা' সব যেন ঠিক্-ঠাক্ থাকে। যদি কেউ আমার এখানে টাকা দিতে আসে, সতীশ বাবুর কাছে যেন শীঘ্র লোক পাঠান হয়—আমি সেই খানেই থাক্‌ব; আর যদি কেউ টাকা নিতে আসে, তাকে যেন বলা হয়, আমি বাইরে গেছি, আজ আর ফিরব না।

(সতীশ বাবুর প্রবেশ)

সতীশ। (জগমোহনের শেষ কথা শুনিতে পাইয়া) বাঃ! চাকরদের তো বেশ হুকুম দেওয়া হল!

জগ। সতীশ, তুমি ঠিক্ সময়ে এসেছ ভাই; আমি এই মাত্র তোমার বাড়ি যাচ্ছিলেম।

সতীশ। কি জন্য বল দিকি?

জগ। একটা কথা তোমাকে বল্‌বার জন্য; একটা কোন বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ করতে হবে।

সতীশ। তা বেশ তো, তোমার সঙ্গে দেখা হল ভালই হল—তা, এই খানেই সেই সব কথা হোক্ না।

জগ। তুমি তবে বোসো। একটা গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে, সে বিষয়ে তোমার মতামত কি, আমি জান্‌তে চাই। কেননা, আমি বন্ধুদের না জিজ্ঞাসা করে' কোন কাজ করি নে।

সতীশ। তুমি আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করচ, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য! আচ্ছা, কথাটা কি বল দিকি, সে বিষয়ে আমার যা মতামত, এখনি আমি বলচি।

জগ। আগু থাক্‌তেই তোমাকে কিন্তু একটা কথা বলে' রাখি—দেখ, আমার মন যুগিয়ে কোন কথা বোল না—তোমার যা মত তা পষ্টাপষ্টি আমাকে বল্‌বে।

সতীশ। তা অবিশ্যি বল্‌ব।

জগ। বন্ধু হয়ে মন খুলে কথা না বলাটা বড়ই দোষের বিষয়।

সতীশ। তার সন্দেহ কি।

জগ। কিন্তু এই কলি-যুগে সে রকম বন্ধু মেলাও ভার।

সতীশ। সে কথাও ঠিক্।

জগ। আচ্ছা সতীশ, তুমি তবে মন খুলে আমার কাছে তোমার মতামত বল্‌বে?

সতীশ। হাঁ, নিশ্চয়ই বল্‌ব।

জগ। আমার মাথার দিব্যি যদি না বল।

সতীশ। দিব্যি আবার কি?—আমি বলচি, মন খুলে বল্‌ব। এখন ব্যাপারটা কি, বল দিকি।

জগ। আমি তোমার পরামর্শ জান্‌তে চাই, আমার পক্ষে বিবাহ করাটা ভাল কি না।

সতীশ। কি?—তুমি?—তুমি বিবাহ করবে?

জগ। হাঁ গো, আমিই বিবাহ করব। এই বিষয়ে তোমার মতটা কি বল দিকি?

সতীশ। কিন্তু আগেই একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

জগ। কি কথা?

সতীশ। তোমার এখন বয়স কত হবে?

জগ। আমার?

সতীশ। তোমার না তো আবার কার?

জগ। তা তো ভাই আমি জানিনে—তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, আমার শরীর এখনও দিব্যি আছে।

সতীশ। কি?—তোমার বয়স কত হল তা তুমি জান না?

জগ। না দাদা, আমি তা জানিনে; তুমিও যেমন, বয়সের কথা কে ভাবে?

সতীশ। আচ্ছা একটু মনে করে' বল দিকি, কত দিন হল তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়?

জগ। আরে তখন তো আমার বয়স ২০ বৎসর।

সতীশ। কাশীতে আমরা কত দিন ছিলেম ?

জগ। ৮ বৎসর।

সতীশ। কতদিন লাহোরে বাস করেছিলেম বল দিকি।

জগ। ৭ বৎসর।

সতীশ। তার পর ফরাসডাঙ্গায় ?—যখন তুমি সেখানে পালিয়ে গিয়ে ছিলে ?

জগ। পাঁচ বৎসর।

সতীশ। আর, কত দিন কালাপানি-পারে ?

জগ। আরে, সে তো ১৪ বৎসর বৈতো নয়।

সতীশ। আচ্ছা সে যাক, কতদিন হল তুমি এখানে ফিরে এসেছ বল দিকি ?

জগ। আমি ফিরে এসেছি বাহান্ন সালে।

সতীশ। বাহান্ন সাল—আর এটা হল ৬৪ সাল—এই তো হচ্চে ১২ বৎসর। চন্দন নগরে ৫ বৎসর—এই হল ১৭ ; লাহোরে ৭ বৎসর—এই হল ২৪ ; ৮ বৎসর আমাদের কাশিতে বাস—এই হল ৩২ ; আর আমার সঙ্গে প্রথমে যখন তোমার আলাপ পরিচয় হয়, তখন তোমার বয়স ছিল ২০ বৎসর—এইতো সব শুদ্ধ ৫০ বৎসর হচ্চে! আর কালাপানির কথা ধরলে তো আরও ১৪ বৎসর হয়—এই তো হ'ল ৬৪। তবে জগমোহন দাদা তোমার কথাতেই তো দেখা যাচ্চে, তোমার বয়স প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর হয়েছে।

জগ। কি!—৬০.৬৫ বৎসর আমার বয়স ?—তা হতেই পারে না—অসম্ভব।

সতীশ। আমার হিসাবটা কিন্তু ঠিক্—তাতে এক কড়াও ভুল নেই। এখন, এ বিষয়ে আমার যা মত তা তোমাকে তবে পষ্টাপষ্টি বলি ; আর তুমিও তো আমাকে মন খুলে বল্‌তে অনুরোধ করেছ। এখন তবে প্রকৃত বন্ধুর মতই তোমাকে পরামর্শটা দিতে হচ্চে। দেখ, বিবাহ করাটা এ বয়সে কিছুতেই তোমার উচিত নয়। আর, বিবাহটাও তো বড় সোজা জিনিষ নয় ; বিবাহ করবার পূর্ব্বে যুবাদেরও যখন সাত-পাঁচ ভাবতে হয়, তখন তোমার মত' বয়সের লোকের তো কথাই নেই। দেখ, ওকথা তোমার একেবারে মনে আনাই উচিত নয়। একে তো লোকে বলে, বিবাহ করাটাই একটা মস্ত পাগলামি ; তারপর, যে বয়সে আমাদের একটু বিজ্ঞ হবার কথা, সেই বয়সে যদি আবার বিবাহ করা যায়, তার চেয়ে পাগ্‌লামি আর কি হ'তে পারে ? এই তো আমার মতামত তোমার কাছে পষ্টাপষ্টি বল্লেম। দেখ দাদা, বিবাহের কথা

এখন মনেও এনো না। এখন বিবাহ করলে লোকে কেবল হাস্‌বে। এতদিন তো বেশ এক-রকম খোলসা ভাবে কাটীয়ে এসেছ—এতদিনের পর, এই বয়সে বিবাহের বেড়ি পায়ে পরতে তোমার এত সাধ কেন বল দিকি ?

জগ। ভায়া, তোমার ও-সব উপদেশ এখন রেখে দেও ; আমি তোমাকে বল্‌চি, আমি বিবাহ করবই। যাকে আমার প্রাণ চাচ্চে তাকে বিবাহ করলে যদি লোকে হাসে—হাসুক। আমি সে জন্যে পিছপাও হতে পারিনে।

সতীশ। আরে সে আলাদা কথা—এ কথা তুমি আগে আমাকে বলনি কেন ? ভাল, একটু কথা জিজ্ঞাসা করি,—এত দিন কেন বিবাহ করনি দাদা ?

জগ। আরে তুমি তো ভারি বোকা দেখচি হে। আমি কখন্ বিবাহ করি বল দিকি ?—আমার সময় কৈ ?—সময় কৈ ? আমি তো জন্মাবধি তীর্থে তীর্থেই ঘুরে বেড়াচ্চি—কাশী থেকে আণ্ডাম্যান পর্য্যন্ত কোন্ তীর্থ টা আমার বাকি আছে বলদিকি ?

সতীশ। হাঃ হাঃ হাঃ ! সে কথা সত্যি, তা ধরতে গেলে তোমার মত সাধু পুরুষ আর ভূ-ভারতে নেই !

জগ। দেখ ভাই, এত দিনের পর আমি একটু গাঝাড়া দিয়ে, গুছিয়ে বসেচি। এইবার মনে করচি, বিয়েথাওয়া করে' একটু আয়েস কর্‌ব। তাই একজন ঘটক লাগিয়েছিলেম্ ; ঘটকও একটী মেয়ের সন্ধান দিয়েচে—তার ফোটোও আমি দেখেচি, মেয়েটী দিব্যি।

সতীশ। পছন্দ হয়েছে ?

জগ। খুব পছন্দ হয়েচে, আর তার বাপের সঙ্গেও কথাবার্ত্রা সব ঠিক্ হয়ে গেছে।

সতীশ। তার বাপের সঙ্গেও কথা ঠিক্ হ'য়ে গেছে ?

জগ। আর, বিবাহটাও আজ রাত্রে হবে, আমি তাদের কথা দিয়েছি।

সতীশ। তবে আর এ বিষয়ে মতামতই বা কি ? পরামর্শই বা কি ?

জগ। তা বটে, এখন অমত করলেই বা কি হবে ? ভদ্রলোককে কথা দিয়ে কি এখন আর পিছতে পারি ? আর দেখ, কত বয়স হল তা দেখবার দরকার কি ? চারিদিককার অবস্থাটা একবার বিবেচনা করে' দেখ না। একজন ৩০ বৎসর বয়সের লোককে দেখ, আর আমাকে দেখ, কে দেখতে বেশী মজবুৎ বল দিকি ? রাস্তায় চলবার সময় আমাকে কি কেউ কখন গাড়ি পাল্‌কিতে চড়তে দেখেছে ? আমার দাঁতগুল দেখ দিকি, এখনো আমি লোহার কড়াই চিবিয়ে খেতে পারি ; শুধু খাওয়া

নয়, খেয়ে হজম করতে পারি, তা তুমি জান? (কাশিতে কাশিতে খক্ খক্ খক্) এখন এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি শুনি।

সতীশ। তোমার কথাই ঠিক—আমারই বোঝবার ভুল হয়েছিল, তোমার পক্ষে বিবাহ করাটাই উচিত।

জগ। দেখ, পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার কোন ঝোঁক ছিল না—কিন্তু এখন কতকগুলি কারণ ঘটেচে যাতে আমার পক্ষে এখন বিবাহ করাটাই উচিত বলে' মনে হচ্চে। তা ছাড়া বিবেচনা করে' দেখ, একটি ভাল স্ত্রীকে বিবাহ করায় কত সুখ! সে আমাকে কত আদর করবে, যত্ন করবে, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে। এই সুখের কথা ছাড়া, আরো একটা কারণ আছে। আমি যদি এখন অবিবাহিত থাকি, তা হলে আমার যে এমন উচ্চ বংশ তা একেবারেই লোপ পেয়ে যাবে। দেখ, বিবাহ করে সন্তান হলে আমারই যেন আবার পুনর্জ্জন্ম হবে; আমা হতে কতকগুলি জীবের উৎপত্তি হয়েচে দেখে আমার কত আনন্দ হবে! তারা ঘরের মধ্যে ছুটোছুটী করে' খেলিয়ে বেড়াবে; আমি যখন বাড়ি আসব, বাবা বাবা বলে' আমার কাছে দৌড়ে আস্‌বে; আর আধ-আধ কণ্ঠে কত কথাই বলবে;—এর চেয়ে আর সুখ কি আছে বল দিকি? দেখ ভায়া, আমার মনে হচ্চে, এখনি যেন আমি ছেলের বাপ হয়ে' পড়েচি, আর যেন কতকগুল বাচ্চা-কাচ্চা আমায় চারদিকে ঘুরেঘুরে বেড়াচ্চে!

সতীশ। হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক্ বলেছ দাদা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে? আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্চি তুমি শীঘ্র বিবাহ কর।

জগ। এ বেশ কথা,—তবে তোমারও এতে মত আছে?

সতীশ। এতে আমার খুবই মত আছে।

জগ। দেখ, তোমার কথা শুনে ভাই আমি ভারি খুসি হলেম—তুমিই আমাকে প্রকৃত বন্ধুর মত পরামর্শ দিয়েছ।

সতীশ। আচ্ছা সে মেয়েটি কে বল দিকি?

জগ। তার নাম কমলমণি।

সতীশ। সেই ও পাড়ার কমলমণি?

জগ। হাঁ, সেই।

সতীশ। রামকান্ত বাবুর মেয়ে কমলমণি?

সতীশ। তুল্‌সিদাসের বোন্ কমলমণি ?—যে তুল্‌সিদাসের সার্কাসের দল আছে ?

জগ। সার্কাসের দল ?—তা হতে পারে, আশ্চর্য্য কি ?

সতীশ। যে তুল্‌সিদাস ঘোড়া ব্রেক্ করে ?

জগ। ঘোড়া ব্রেক করে ?—তা হোক্, তারা মস্ত কুলীন !

সতীশ। ও ! তবে বুঝেছি, বুঝেছি, বেশ, বেশ, তোফা !

জগ। রোসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই (ফোটো আনিয়া প্রদর্শন) পাত্রীটি কেমন মনে হয় ?—আমার কেমন পছন্দ বল দিকি ?

সতীশ। (স্বগত) দশ বছরের মেয়েকে এই ফোটোতে দেখাচ্চে যেন ত্রিশ বছরের মাগী! (প্রকাশ্যে) বাঃ ! পাত্রীটি দিব্যি ! আর কথা নেই, পত্রপাঠ বিয়ে করে' ফ্যালো দাদা।

জগ। আমার পছন্দটা কি ভাল হয় নি ?

সতীশ। খুব ভাল হয়েচে—তা আর বল্‌তে। আর দেরি না—শুভস্য শীঘ্রং বুঝলে কি না—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)। (স্বগত) বিয়ে তো করবেই, আমি ফাঁক্‌তালে এই সময় দাদার মাথায় কিঞ্চিৎ হাত বুলিয়ে নিইনে কেন। (প্রকাশ্যে) দেখ দাদা, এইবার কিছু গহনা-পত্র গড়াতে দেও, কাপড়-চোপড় তৈরি করাও ! বয়সটা কত হয়েচে এখন তো জান্‌তে পেরেছ—এখন সেই বুঝে কাজ কর ; বুঝ্‌লে দাদা ? হাঃ হাঃ হাঃ ! আবার আজকাল কত রকম নূতন ফ্যাশান উঠেচে—"আমায় ভুলোনা" বোরোচ্—ডানা-তোলা-জ্যাকেট্—আরও কত কি। মন যোগাতে হলে এ সব দেওয়া চাই—বুঝ্‌লে দাদা ? হাঃ হাঃ হাঃ !

জগ। তা কি আর বুঝিনে—বুঝেচি বৈকি। তা ওতে কত পড়বে বল দিকি ?—আমি তো ভাই, আজ কালের ফ্যাশান-ট্যাশান বুঝিনে—দেখ ভায়া, তোমার উপরেই সমস্ত ভার, যা লাগে তুমিই সব খরিদ পত্র করে দিও। তুমি যে এই কথা বল্লে, তাতে আমি যে কত খুসি হলেম তা বল্‌তে পারি নে।—ভায়া, আজ রাত্রে বিবাহে উপস্থিত থেকো—দেখো ভুল না।

সতীশ। হাঁ আমি নিশ্চয়ই আস্‌ব।—তোমার বিবাহে আমি আস্‌ব না ?—বল কি ? (স্বগত) রামকান্ত বাবুর কন্যা—যার বয়স ১০ বৎসর বই নয়—সেই কমলমণির সঙ্গে ৬৫ বৎসর বয়স্ক জগমোহনের বিবাহ ? বাঃ ! চমৎকার বিবাহ, বলিহারি যাই ! (প্রকাশ্যে) জগমোহন দাদা, আমি তবে এখন আসি।

জগ। দেখো ভায়া, ভুলো না। বিবাহের সময় আস্‌তেই চাও।

সতীশ। (হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! এ বিবাহে আমি আবার আস্‌ব না?—বল কি। ভাল কথা, গহনা কাপড় খরিদের টাকাটা কি এখন দেবে।

জগ। কত চাই?

সতীশ। এই এখন হাজার খানেক দিলেই হবে।

জগ। হাজার টাকা?—এই নেও (নোট বাহির করিয়া প্রদান) টাকা নিয়ে তো আর স্বর্গে যাব না।

সতীশ। না দাদা, সে দিকে যাবার বড় একটা সম্ভাবনাও নেই। আমাদের ঠিক্ তার উল্টো দিকেই বোধ হচ্চে যেতে হবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

(সতীশ বাবুর প্রস্থান)

জগ। এই বিবাহে নিশ্চয়ই আমি সুখী হব—যে শুনচে তারই যেন আনন্দ আর ধরচে না, একটু নঃ হেসে আর থাক্‌তে পারচে না। আহা! সেই কমলমণি আমার হবে—একমাত্র আমারি হবে। তার সেই জ্বল-জ্বলে পিট্‌পিটে চোখ দুটি আমার হবে, তার সেই থ্যাবড়া-থোবড়া নাকটি আমার হবে, তার সেই ফুলো-ফুলো ঠোঁট দুটি আমার হবে, তার সেই জিলিপি-পাকানো কান দুটি আমার হবে! আমি তাকে আদর করতে পাব, যে রকম ইচ্ছে গালাগালি দিতে পারব; আমি তাকে হৃদয়রত্ন বল্‌তে পারব, প্রাণেশ্বরী বল্‌তে পারব; তাকে আমি প্যাঁচামুখী বল্‌তে পারব, বাঁদরমুখী বল্‌তে পারব; আর তাতে আমাকে কেউ নিন্দেও করতে পারবে না—এইবার আমার চুড়োন্তো সুখের সময় উপস্থিত! আরও তার কি কি গুণ আছে, লোকের কাছে একটু সন্ধান নিইগে যাই। (যাইতে যাইতে গান)

সোহিনী—দাদ্‌রা।

একা একা এতদিন কেটে গেল,
এখন দুখের নিশা প্রভাত হল!
আর না জ্বালা স'ব, দুজনে এক হব,
সোহাগে সদা রব ঢল ঢল।
তাহারি মুখ চেয়ে, যামিনী যাবে বয়ে,
নিবাব তারি প্রেমে হৃদি-অনল॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—জগমোহনের গৃহ।

জগ। একটা কথা শুনে বড় যে খট্‌কা লাগ্‌ল!—সে তার ভায়ের সার্কাসে নাকি ঘোড়ার উপর ডিগ্‌বাজী খ্যালে! এ রকম ঘোড়ায়-চড়া মেয়ের সঙ্গে কি বিয়ে করে' সুখ হবে?—শেষে সে আমার মাথায় চড়বে না তো?

(সতীশ বাবুর প্রবেশ)

জগ। এই যে ভায়া, তুমি ঠিক্ সময়েই এসেছ। টাকাটাতো খরচ হয়ে যাইনি?

সতীশ। কেন বল দিকি? আমি সমস্তই খরিদপত্র করেছি—সে হাজার টাকাটা তো গেছেই, আরো নিজের গাঁট থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে তবে বাকী জিনিসগুল খরিদ করেচি।

জগ। এর মধ্যেই সমস্ত খরিদ করে ফেলেছ?—কি বিপদ! এত তাড়াতাড়ি করবার আবশ্যক ছিল কি?

সতীশ। আবশ্যক নেই? আজ রাত্রে তোমার বিবাহ—বল কি?—আবশ্যক নেই? দাদা, তুমি এখন এই কথা বলচ?—এই কিছু আগে এত অনুরাগ এত উৎসাহ দেখ্‌লেম—সে সব কোথায় গেল?

জগ। দেখ, একটা সময় থেকে, এই বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে ভারি একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়েছে। আর বেশী দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই এই বিষয়টা আর একটু ভাল করে তলিয়ে দেখতে হবে। তা ছাড়া, দুপুর বেলা ঘুমতে ঘুমতে একটা স্বপ্ন দেখলেম—সে স্বপ্নটারও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। তুমি তো ভাই জান, শাস্ত্রে বলে, স্বপ্ন এক রকম আর্শি-বিশেষ; পরে যা ঘটে, স্বপ্নে তার ছায়া আগু থাকতেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখ, আমি স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন একটা ঘোড়া-ব্রেক্ করবার গাড়িতে আমাকে যুড়ে দিয়েছে—আর একটা মেয়ে মানুষ চাবুক হাতে করে—

সতীশ। দাদা, আমার এখন একটু কাজ আছে, তোমার স্বপ্নের কথাটা আমি এখন শুন্‌তে পারচিনে; তা ছাড়া, স্বপ্নের ফলাফলের বিষয় আমি কিছু বুঝিনে; তোমার প্রতিবাসী যে দুইজন দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁরাই সে বিষয়ে বেশ ব্যবস্থা

দিতে পারবেন। তাঁরা দুই ভিন্ন টোলের পণ্ডিত; তাঁদের উভয়েরি মতামত তুমি অনায়াসেই জান্‌তে পারবে। আমার যা মত তা তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলেচি। এখন তবে আমি আসি।

(প্রস্থান)

জগ। (স্বগত) সতীশ বেশ কথা বলেছে। এই ঘটকা সম্বন্ধে ঐ দুই পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে' দেখা যাক্।

(প্রস্থান)

দৃশ্য।—ন্যায়রত্নের টোল।

ন্যায়রত্ন ও জগমোহন।

ন্যায়। (কোন এক ব্যক্তির উদ্দেশে) তুমি অতি অশিষ্ট! তোমাকে পণ্ডিত-মণ্ডলী থেকে বহিস্কৃত করা উচিত।

জগ। এই যে! ঠিক্ সময়ে আপনাকে পাওয়া গেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণাম।

ন্যায়। (জগমোহনকে না দেখিয়া) আমি বিবিধ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করে' দিতে পারি—ন্যায়শাস্ত্র থেকে সিদ্ধ করতে পারি যে, তুই অতি মূর্খ—মূর্খতর—মূর্খতম—মূর্খাৎ মূর্খ—মূর্খেষুমূর্খ—যত প্রকার কারক ও বিভক্তি আছে সকলগুলিই তোতে প্রয়োগ হতে পারে!

জগ। (স্বগত) কারও উপরে পণ্ডিতটা ভয়ানক চটেচে দেখ্‌চি (প্রকাশ্যে) ও! ন্যায়রত্ন মহাশয়!

ন্যায়। (এখনও জগমোহনকে না দেখিয়া) তুই আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিস্, অথচ তর্কশাস্ত্রের ক খ তুই জানিস্ নে।

জগ। (স্বগত) রাগের মাথায় আমাকে এখনও দেখ্‌তে পাচ্চে না। (প্রকাশ্যে) ও ন্যায়রত্ন মহাশয়!

ন্যায়। (এখনও দেখিতে না পাইয়া) তর্কশাস্ত্রের সকল নিয়মানুসারেই এই যুক্তি নিন্দনীয়।

জগ। পণ্ডিতটাকে কে না জানি ভয়ানক রাগিয়ে দিয়েছে।

ন্যায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে "প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তা-বয়ব তর্কনির্ণয়"।

জগ। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণাম!

স্থায়। জয়ন্ত!

জগ। আচ্ছা মশায়—

স্থায়। (যে দিক্ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল পুনর্ব্বার সেই দিক্‌পানে গিয়া) তুই কি করিচিস্ তা কি তুই জানিস্ মূর্খ?—তোর যুক্তিতে "বাধিত হেত্বাভাস" দোষ ঘটেচে তা তুই জানিস্?

জগ। আমি আপনাকে একটা কথা—

স্থায়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন, নিগমন এই পঞ্চাবয়বের কোন অবয়বই তোর কথার সঙ্গে মেলে না।

জগ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—

স্থায়। তোর কথা আমি মান্‌ব?—আমি শেষ পর্য্যন্ত আমার মত বজায় রাখ্‌ব।

জগ। এইবার তবে শুনুন—

স্থায়। প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি শব্দ প্রভৃতি সকল প্রমাণের দ্বারাই আমার এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করতে পারি তা তুই জানিস্?

জগ। ও স্থায়রত্ন মহাশয়! এত রুষ্ট হয়েছেন কেন?

স্থায়। রুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

জগ। তবু, ব্যাপারটা কি বলুন দিকি।

স্থায়। একজন মূর্খ লোক আমাকে দিয়ে একটা কথা স্বীকার করিয়ে নিতে চায়—যা অতি ভয়ানক, অতি ভীষণ, অতি জঘন্য!

জগ। আচ্ছা, সে কথাটা কি বলুন দিকি?

ন্যায়। আরে বাপু—গেল গেল—সব রসাতলে গেল!—এই কলিকালে আর কিছুই থাকে না। পৃথিবীটা পাপে একেবারে ডুবে যাচ্চে—চারিদিকে ভয়ানক যথেচ্ছাচার—যে যা খুসি তাই বল্‌চে। দেখুন, রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই রাজার সৃষ্টি। রাজপুরুষদের লজ্জায় মরে' যাওয়া উচিত যে তাঁরা এরূপ গর্হিৎ কার্য্যের প্রশ্রয় দেন—কিছুমাত্র শাসন করেন না।

জগ। মহাশয়! বিষয়টা কি?

ন্যায়। আরে মহাশয়, সে দিন প্রকাশ্য সভায় একটা মূর্খ বল্‌চে কি না, "এই বঙ্গদেশে খুবই বক্তৃতার ধূম—কিন্তু ভিতরে বহ্নি নাই!" ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই —এর চেয়ে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত কি আর কিছু হতে পারে?

জগ। সে কি রকম ?

ন্যায়। ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় থাক্‌লেও ব্যাপ্যের আরোপ করে' ব্যাপকের অভাব প্রসঞ্জিত করাকেই তর্ক বলে; তার প্রয়োগ এইরূপ যথাঃ—"বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকিত না, কারণ বহ্নি মাত্রেই ধূম-ব্যাপ্ত।" এমন সহজ কথা যা তুমি পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারচ ; তা কিনা সে মূর্খটা বুঝ্‌তে পারে না ? (যে দিক্‌ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, আবার সেই দিকে গিয়া) আরে মূর্খ তুই বলিস্‌ কি না—যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি নাই ?—ভগবান গৌতমের তর্কপরিচ্ছেদটা আর একবার উল্টে দেখ্‌গে যা।—মূর্খ কোথাকারে !

জগ। আমি মনে করেছিলেম, এইবার বুঝি রাগটা পড়ে গেছে। (ন্যায়রত্নের প্রতি) পণ্ডিত মশায় ! অত ক্রুদ্ধ হবেন না।

ন্যায়। আমি ক্রুদ্ধ ?—হাঁ আমার ক্রোধের উৎপত্তি একটু হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আর তা আমি অনুভব কর্‌চিনে !

জগ। ধূম বহ্নির কথা এখন রেখে দিন—আপনাকে একটা কথা আমার বল্‌বার আছে—আমি বল্‌ছিলেম কি—

ন্যায়। পাজি লক্ষ্মীছাড়া !

জগ। অনুগ্রহ করে' আমার কথাটা একবার শুনুন—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। একে বলে মূর্খতার পরাকাষ্ঠা !

জগ। ভাল বিপদ !—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। এই প্রকার কথা কেউ কখন বলে ?

জগ। তার ভুল হয়েছিল সন্দেহ নেই—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। এইরূপ প্রতিজ্ঞা মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রে দূষিত বলে আখ্যাত হয়েচে।

জগ। সে কথা সত্য—এখন আমি কি বল্‌চি শুনুন !

ন্যায়। কেন ?—এ বিষয় তিনি স্পষ্টাক্ষরেই তো বলে গেছেন—

জগ। হাঁ হাঁ, আপনার কথাই ঠিক্‌। (যে দিক্‌ দিয়া ন্যায়রত্ন প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই দিকপানে গমন করিয়া) ওগো ! তুমি অতি মূর্খ।—অতি নির্লজ্জ !—এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সঙ্গে তুমি কি না তর্ক করতে এসো। (ফিরিয়া ন্যায়রত্নের

আমার কথাটা শুনুন দিকি। আমার এক বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে, তাই আপনার কাছে ব্যবস্থা নিতে এসেছি। দেখুন আমি এখন বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়েছি। পাত্রীটি দেখ্‌তে সুশ্রী, গড়নও বেশ পরিপাটি, তার বাপেরও মত হয়েছে। তবে কিনা, বিবাহ করাটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত এখনো আমি ঠিক্ করতে পারচিনে। একটা স্বপ্ন দেখে আমার মনটা বড়ই বিচলিত হয়েচে। আপনি একজন মস্ত পণ্ডিত—তাই সেই স্বপ্নটার ফলাফল জান্‌তে আপনার নিকট এসেছি।

ন্যায়। ধূমের সদ্ভাব সত্বেও তুই যদি বল্‌তে পারিস্ বহ্নি নাই, তা হলে তুই বল্ না কেন, আমার বিদ্যা থাকা সত্বেও আমি একটা আস্ত গর্দ্দভ!

জগ। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? সে যাক্, আমার কথাটা অনুগ্রহ করে' একবার শ্রবণ করুন—এক ঘণ্টা ধরে' আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করচি—আর আপনি তার একটা উত্তর দিলেন না?

ন্যায়। আমাকে মার্জ্জনা করবে। কোন উচিত কারণে, আমার মন ক্রোধের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল।

জগ। ও সব কথা এখন রেখে দিন—আমার কথাটা এইবার শুনুন।

ন্যায়। ভাল, তোমার এখানে আসবার প্রয়োজনটা কি শুনি।

জগ। কোন একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করতে চাই।

ন্যায়। কোন্ ভাষায়?

জগ। কোন্ ভাষায়?

ন্যায়। হাঁ।

জগ। বাঙ্গালীর ছেলে আবার কোন্ ভাষায় বলে?

ন্যায়। বলি, সংস্কৃত ভাষায় আমার সঙ্গে কথা কইতে চাও কি?

জগ। না।

ন্যায়। প্রাকৃত?

জগ। না।

ন্যায়। মাগধী?

জগ। না।

ন্যায়। মহারাষ্ট্রীয়?

জগ। না!

স্থায়। গৌড়ীয়?

জগ। না—না—খাঁটি বাঙ্গলা—বাঙ্গলা—বাঙ্গলা।

স্থায়। তবেই হল—তাকেই বলে গৌড়ীয়—আচ্ছা বেশ, বাঙ্গলা ভাষাতেই হোক।

জগ। বেশ।

স্থায়। আচ্ছা, তবে এই পাশে এসো। কেন না, সংস্কৃত ভাষায় যারা বাক্যালাপ করে, তাদের জন্য আমার এই কাণ্‌টা নির্দ্দিষ্ট—আর যারা ইতর ভাষায়—মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করে, তাদের জন্য আমার এই কাণ্‌টা নির্দ্দিষ্ট।

জগ। (স্বগতঃ) ভাল বিপদ। এই সব ম্যাচাংদের সামান্য একটা কথা বলাও দেখ্‌চি বৃষ-উচ্ছুগ্‌গের ব্যাপার!

স্থায়। এখন তোমার জিজ্ঞাস্যটা কি, বল দিকি?

জগ। একটা ছোট-খাট বিষয়ে আমার একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়েচে—

স্থায়। তা, বেশ—বেশ! ন্যায়শাস্ত্রে সংশয় তো উপস্থিত হতেই পারে—বল, আমি এখনি তার ভঞ্জন কর্‌চি।

জগ। মাপ কর্‌বেন—তা নয়—আমি বল্‌ছিলেম কি—

স্থায়। তুমি হয়তো জান্‌তে চাও, বহ্নিমান পর্ব্বত হতে ধূমের অনুমান, ও ধূমমান পর্ব্বত হতে বহ্নির অনুমান—এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা প্রমাণসিদ্ধ—এই না?

জগ। ও সব কিছুই নয়।

স্থায়। অথবা হয়তো জান্‌তে চাও, ন্যায়শাস্ত্রে নিগ্রহস্থান কোনগুলি—এই না?

জগ। না না—তা নয়।

স্থায়। তবে বুঝি, কত প্রকার তর্ক আছে তাই জান্‌তে চাও?

জগ। না না সে সব কিছুই নয়—আমি বল্‌ছিলেম কি—

স্থায়। পদার্থ কয় প্রকার—তাই?

জগ। না—না আমি বল্‌ছিলেম—

স্থায়। ন্যায়ের কতগুলি অবয়ব—তাই বুঝি?

জগ। না মশায়, তা নয়—আমি—

স্থায়। হেত্বাভাস কয় প্রকার—তাই?

ন্যায়। তবে কি?—আমি তো কিছুই অনুমান করে' উঠ্‌তে পার্‌চি নে।

জগ। সেই কথাই তো আপনাকে আমি বল্‌তে যাচ্চি—আমার কথাটা না শুন্‌লে আপনি অনুমান কর্‌বেন কি করে'? ব্যাপারটা হচ্ছে এই—আমি একটি সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছুক হয়েচি। এবং আমি তার বাপকেও এ বিষয় জানিয়েছি—তবে কি না আমার একটা খট্‌কা হয়েচে—

ন্যায়। (জগমোহনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) মনের চিন্তা প্রকাশ কর্‌বার জন্যই বাক্যের সৃষ্টি। যেমন আমাদের চিন্তাগুলি বাহ্য বস্তুর চিত্র, সেইরূপ আমাদের বাক্যও চিন্তার একরূপ চিত্র বল্লেও হয়। (জগমোহন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, মাঝে মাঝে হাত দিয়া ন্যায়রত্নের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কথা বন্ধ করিতেছে এবং যেই হাত সরাইয়া লইতেছে, অমনি আবার ন্যায়রত্নের বকুনি আরম্ভ হইতেছে) কিন্তু অন্য চিত্রের সহিত এর প্রভেদ এই;—মূল বস্তু হতে অন্য চিত্রগুলির পার্থক্য সর্ব্বত্রই জান্‌তে পারা যায়, কিন্তু বাক্যের মধ্যেই বদ্ধ থাকে; কেন না, বাক্য তো আর কিছুই নয়—বাহ্য চিহ্নের দ্বারা চিন্তাকে প্রকাশ করার নামই বাক্য। এ থেকে প্রতিপন্ন হচ্চে, যারা উত্তমরূপে চিন্তা কর্‌তে পারে, তারাই উত্তম বাক্যও প্রয়োগ কর্‌তে পারে। অতএব এখন তুমি বাক্যের দ্বারা তোমার চিন্তা আমার নিকট প্রকটিত কর; অন্যান্য সকল চিহ্ন অপেক্ষা বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা বোধগম্য তার সন্দেহ নাই।

জগ। (স্বগতঃ) পণ্ডিতটা জ্বালালে! কি বল্‌চে, আমি তো কিছুই বুঝতে পার্‌চি নে।

ন্যায়। হাঁ, "চিত্তস্য দর্পণো বাক্যং"। এই বাক্যরূপ দর্পণে, প্রত্যেকের অন্তরের নিগূঢ় কথা প্রতিবিম্বিত হয়। চিন্তা করা এবং বাক্য প্রয়োগ করা—এই উভয় প্রকার ক্ষমতাই যখন তোমার আছে, তখন তোমার চিন্তা আমার নিকট প্রকাশ করবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করায় তোমার আপত্তি কি বাপু?

জগ। তাই তো আমি কর্‌তে যাচ্চি—কিন্তু আপনি যে আমার কথায় কর্ণপাত কর্‌চেন না।

ন্যায়। আমি শুন্‌চি—বল।

জগ। ভট্টাচার্য্যি মহাশয়! আমি এই কথা বল্‌চি যে—

ন্যায়। সংক্ষেপে বল, সংক্ষেপে বল।

ন্যায়। দেখো বাবু, পৌনরুক্তি দোষ ও অনর্থক বহুভাষণ যেন না হয়।

জগ। মশায় আমি—

ন্যায়। সংক্ষেপে—সংক্ষেপে—

জগ। আমি আপনাকে—

ন্যায়। গৌর চন্দ্রিমা ও বাক্যাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই—

জগ। (টিকি ধরিয়া কিল মারিতে উদ্যত।)

ন্যায়। আরে বাপু কর কি—কর কি—তুমি তো দেখ্‌চি ভারি কোপন-স্বভাব! কোথায় তুমি বাক্যের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করবে—না তুমি কি না ক্রোধে একেবারে উন্মত্ত! সে দিন যে গণ্ডমূর্খটা বলেছিল, "ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই"—তার চেয়েও তুমি যে দেখ্‌চি আরও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য—আর, আমি এখনি প্রমাণ করে' দেব—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শব্দ প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণ করে' দেব যে—তুমি অতি অর্ব্বাচীন, অতি মূর্খ, অতি পাষণ্ড! আমার পরামর্শ প্রার্থনা করতে এসে কিনা আমাকে অপমান?—আমি কত বড় পণ্ডিত তা তুমি জানো?—আমাকে অপমান?

জগ। (স্বগতঃ) আঃ! পণ্ডিতটা বক্‌-বক্‌ ক'রে এতও বক্‌তে পারে!

ন্যায়। সাহিত্য বল—দর্শন বল—কোন্‌ বিষয়ে আমার পাণ্ডিত্য নেই বল দিকি?

জগ। (স্বগতঃ) এখনও ঐ কথা?—জ্বালালে দেখ্‌চি।

ন্যায়। বেদ—বেদাঙ্গ—জ্যোতিষ—ব্যাকরণ—কাব্য, সাহিত্য—অলঙ্কার—শ্রুতি-স্মৃতি—দর্শন—ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, বেদান্ত—মীমাংসা—কোন্‌টায় আমি কম বল তো বাপু? না, তোমার মত মূর্খের সঙ্গে আমি বাক্যালাপও করি নে।

(প্রস্থান।)

জগ। আঃ এই ভট্‌চার্য্যি ম্যাচাংদের সঙ্গে পারা ভার! অন্যের কথা আদবে শুনবে না—আপনার কথাই সাত কাহন। সতীশ আর একজন পণ্ডিতের কথা বলেছিল—দেখি সে যদি এই স্বপ্নটার ব্যাখ্যা করে' দিতে পারে। (প্রস্থান।)

দৃশ্য—বেদান্তবাগীশের টোল।

(জগমোহনের প্রবেশ।)

জগ। বেদান্তবাগীশ মশায়! কোন একটা ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য আপনার কাছে আমি ব্যবস্থা নিতে এসেছি। (স্বগতঃ) যা হোক্‌, এ লোকটা তবু তো লোকের

বেদান্ত। দেখ বাবু! ও রকম ধরণের কথা বলাটা তুমি ত্যাগ কর। আমাদের দর্শন শাস্ত্রে বলে, জগতের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই; যা দেখি কিছুই সত্য নয়—সকলই মায়া—সে শুধু সত্যের অবভাস মাত্র—অতএব নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যুক্তি-সঙ্গত নয়। এই জন্য তোমার বলা উচিত হয় নি, "আমি এসেচি"—তোমার বলা উচিত ছিল "বোধ হয় আমি এসেছি;" কেন না, আমরা আত্মাতে আমিত্বের অধ্যারোপ করি বৈ তো নয়।

জগ। বোধ হয় আমি এসেছি?

বেদা। হাঁ।

জগ। যখন ঘটনাটা ঠিক্, তখন বোধ না হয়ে আর কি হতে পারে?

বেদা। দেখ, ওটা ঘটনারূপ কারণের কার্য্য নয়। সত্য না হলেও তোমার নিকট সত্য বলে' প্রতীয়মান হচ্চে মাত্র।

জগ। সে কি রকম? আমি এসেছি এই কথাটা তবে সত্য নয়?

বেদা। সত্য বলে' তোমার নিকট প্রতীয়মান হচ্চে মাত্র—এই জন্য কিছুই নিশ্চিত ভাবে বলা উচিত নয়—সকল বিষয়েই সন্দেহ করা কর্ত্তব্য; দেখ, অন্ধকারে রজ্জু দেখ্‌লে কার না সর্প বলে' ভ্রম হয়?

জগ। কি! আমি এখানে নেই?—আর আপনি আমার সঙ্গে যে কথা কচ্চেন সেটাও সত্যি না?

বেদা। তুমি যে ওখানে আছ, আর তোমার সঙ্গে আমি যে কথা কচ্চি, সেটা আমার নিকট প্রতীয়মান হচ্চে মাত্র। আর, তত্বতঃ আমিই বা কে?—তুমিই বা কে?

জগ। কি বিপদ! আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করচেন না কি? এই যে আমি এইখানে আছি—আর আপনি ঐখানে আছেন—এতে তো কোন "বোধ হয়" থাক্‌তে পারে না। দেখুন মশায়, ও সব সূক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্রের কথা এখন রেখে দিন—এখন আমার কথাটা শুনুন; আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়েছি এই কথাটা আপনাকে জানাতে এসেছিলেম।

বেদা। আমাকে জানাতে এসেছিলে?—আমি কে?

জগ। শুনুন, আমি এখন আপনাকে জানাচ্চি।

বেদা। তা হতে পারে।

জগ। দেখুন, পাত্রীটী বেশ রূপবতী।

বেদা। অসম্ভব নয়—ওরূপ তো প্রতীয়মান হয়েই থাকে!

জগ। বিবাহ করাটা আমার পক্ষে উচিত না অনুচিত?

বেদা। উচিতও হতে পারে, অনুচিতও হতে পারে।

জগ। (স্বগত) এ ম্যাচাংটা দেখ্‌চি আবার আর এক সুর ধরেচে! (প্রকাশ্যে) যে পাত্রীটীর কথা আপনাকে বল্লেম, তাকে বিবাহ করাটা আমার পক্ষে ভাল কি?—এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করচি।

বেদা। তা, যে রকমের পাত্রী তার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে।

জগ। বিবাহ করাটা আমার পক্ষে কি ভাল নয়?

বেদা। হতেও পারে।

জগ। আপনাকে আমি অনুনয় করচি, উত্তরটা একটু সিধে ভাবে দিবেন।

বেদা। আমারও অভিপ্রায় তাই।

জগ। কিন্তু আমি একটা কুস্বপ্ন দেখেচি—

বেদা। তা হতে পারে।

জগ। আমাকে যেন ঘোড়ার মত করে' গাড়িতে যুতেচে, আর একজন স্ত্রীলোক চাবুক হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছে।

বেদা। আশ্চর্য্য কি!

জগ। এ স্বপ্নটা কি ফল্‌বে?—এ বিষয়ে আপনার মত কি?

বেদা। কিছুই অসম্ভব নয়।

জগ। আপনি যদি আমার জায়গায় হতেন, তা হলে এ স্থলে কি করতেন?

বেদা। জানি না।

জগ। আমাকে এখন কি পরামর্শ দেন?

বেদা। তোমার যা অভিরুচি।

জগ। আমাকে আপনি দেখ্‌চি ক্ষেপিয়ে তুল্‌বেন।

বেদা। দেখ বাপু, আমি এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারব না!

জগ। আ মোলো যা!

বেদা। দেখ বাপু, "আমি"-পদার্থটা কি—প্রথমে জানো, তার পরে অন্য কথা।

জগ। আ গ্যাল যা! রোসো, এইবার আমি তোমার সুর বদ্‌লাচ্চি। (টিকি

বেদা। আরে রাম—আরে রাম—আরে—

জগ। এইবার "আমি"-পদার্থটা কি, বুঝ্‌তে পেরেচেন তো ?

বেদা। এত বড় স্পর্দ্ধা? আমাকে প্রহার?—আমার মত দার্শনিক পণ্ডিতকে অপমান?

জগ। ও রকম ধরণের কথাটা বলা আপনার মত পণ্ডিতের উচিত হয় না। আমিই বা কে?—আপনিই বা কে?—কে কাকে প্রহার করে? আপনার বলা উচিত—"বোধ হচ্চে যেন তুমি আমাকে প্রহার করচ।"

বেদা। আমি এখনি পুলিসে নালীশ করতে চল্লেম—আমাকে অপমান?

জগ। আমি কে?—আপনিই বা কে?

বেদা। আমার গায়ে প্রহারের দাগ আছে, আমি এখনি দেখিয়ে দেব।

জগ। হতে পারে!

বেদা। আমি নালীশ কর্‌ব—তুমি আমাকে প্রহার করেছ।

জগ। প্রহার আবার কি?—প্রহার বলে প্রতীয়মান হচ্চে মাত্র।

বেদা। তুমি আদালতে নিশ্চয়ই দণ্ডিত হবে।

জগ। আমি?—আমি আবার কে?

বেদা। আচ্ছা কেমন দণ্ডিত না হও আমি দেখ্‌চি। আমাকে প্রহার?—আমাকে অপমান?—আমি পুলিসে চল্লেম। (প্রস্থান)

জগ। পণ্ডিত দুটোর কাছ থেকে যদি একটা পষ্ট কথা বের করতে পারলেম!—এখন কি করা যায়? আমার বিয়ে করতে তো এখন আদপে ইচ্ছে নেই। কোন রকম করে' এখন কথাটা কাটিয়ে দিতে পার্‌লে বাঁচি। তবে, এরি মধ্যে কিছু টাকা খরচ হয়ে গেছে। তা হোক্‌, কিন্তু এর চেয়ে আরো কিছু খারাপ নাহলে এখন বাঁচি। এখন এই হাঙ্গামটা থেকে কি করে' উদ্ধার হই? যাই, কনের বাপের সঙ্গে একবার দেখা করিগে, দেখি যদি বিয়েটা কোন রকম করে' ভাঙিয়ে দিতে পারি। বাড়ীর নম্বরটা বুঝি ১০৫।* (প্রস্থান)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* স্থানাভাববশতঃ বাকী দৃশ্যগুলি প্রকাশিত হইল না। কার্ত্তিক মাসের ভারতী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নাটিকাখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া যাইবে।

মাঘ কবির জীবনবৃত্তান্ত।*

মাঘ অতি শ্রেষ্ঠ কবি। যে সকল কবি সংস্কৃত-ভাষায় কাব্য লিখিয়া জগতে অক্ষয় যশ ও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদেরই সম আসনে আসীন। মাঘের কবিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। একজন প্রাচীন রসজ্ঞ লিখিয়াছেন ;—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ" !

উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠে জানা যায়, প্রাচীনেরা মাঘকে কালিদাস, ভারবি অপেক্ষাও উচ্চস্থানীয় মনে করিতেন। প্রকৃত পক্ষে এই কবি কালিদাস, ভবভূতি ও ভারবি অপেক্ষা উচ্চস্থানীয় কি না ? সে বিষয়ের বিচার করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে তাঁহার শিশুপালবধ কাব্য যে বাগ্দেবীর অনন্যসাধারণ প্রসাদের ফল তাহার আর সন্দেহ নাই। এই কবির বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল এবং মধুর। ইনি রৈবতক পর্ব্বত ও সমুদ্রের বর্ণনায় বিলক্ষণ শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। কবি রাজনীতি-শাস্ত্রেও অতিশয় দক্ষ ছিলেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি রাজ্য-রক্ষার উপায়গুলি কোথায় কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি শিশুপালবধ কাব্যের ১ম সর্গে ও ১৩শ সর্গে সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষ-বাদ বিবৃত করিয়াছেন। ষড়্দর্শন ব্যতীত বৌদ্ধদর্শনেও তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল।

* এই প্রবন্ধটি বিগত ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

তিনি উপমাচ্ছলে বৌদ্ধদর্শনের মূলতত্ত্ব পঞ্চস্কন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কবির আর একটি ক্ষমতা প্রকটিত হইয়াছে, অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্যে; কি শব্দালঙ্কার কি অর্থালঙ্কার উভয়ের প্রয়োগেই কবি বিলক্ষণ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত চিত্রকাব্যের নির্ম্মাণেও তাঁহার অল্প নৈপুণ্য ছিলনা, মুরজবন্ধ, সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া তিনি বিলক্ষণ চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল কারণে মাঘের শিশুপালবধ সংস্কৃত বিদ্যার্থি-বৃন্দের একখানি অতি প্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের টীকা অনেক। ভারত-বর্ষের প্রত্যেক দেশেই প্রায় শিশুপালবধের কোন না কোন টীকাকারের নাম শ্রুত হওয়া যায়। এই সকল টীকার মধ্যে মল্লিনাথের সর্ব্বঙ্কষানাম্নী টীকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মল্লিনাথ শিশুপালবধের ন্যায়-পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ গ্রন্থ পাইয়া তাঁহার নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার অবসর পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শিশুপালবধের টীকায়ই মল্লিনাথের যথার্থ শক্তি প্রকটিত হইয়াছে।

শিশুপালবধ ব্যতীত মাঘের লেখনী হইতে আর কিছু নির্গত হইয়াছিল কিনা উহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে বল্লভদেব ও ক্ষেমেন্দ্র কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা মাঘের কবিতার অনুরূপ কিন্তু শিশুপালবধে দৃষ্ট হয় না, ইহাদ্বারা পণ্ডিতগণ অনুমান করেন মাঘকর্ত্তৃক আরও কিছু বিরচিত হইয়াছিল কিন্তু এখন উহা কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

ভারতীয় কবিগণের এক প্রকার চিরাভ্যস্ত প্রকৃতি এই যে তাঁহারা প্রায় আত্মপরিচয় প্রদান করেন না। কিন্তু মাঘ ঐ শ্রেণীর লোক নহেন, তিনি জানিতেন তাঁহার পরলোকগমনের কিছুকাল পরে আর কেহ তাঁহার পরিচয় অবগত হইতে পারিবে না, তজ্জন্য তিনি অতিসংক্ষেপে নিজের বংশপরিচয় প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা প্রথমে এই কবির আবির্ভাবকাল যথাসাধ্য নির্ণয় করিয়া পরে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে উহার আলোচনা করিতেছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য কবিগণের ন্যায় মাঘের আবির্ভাবকালও অত্যন্ত বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। অধ্যাপক জ্যাকোবি বলেন ;—মাঘ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। আবার ডাক্তার জন্‌ক্ল্যাট্ মাঘের জন্মকাল খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্দ্দেশ করেন। মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই ; মহাশয় তাঁহার "ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন মাঘ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার প্রকাশিত "শিশুপালবধ" কাব্যের একটি সংস্করণে লিখিয়াছেন "মাঘ কথনই খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর গ্রন্থকার নহেন, কারণ আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার গ্রন্থে মাঘের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই আনন্দবর্দ্ধন খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন।" বম্বের মিঃ কে, বি, পাঠক মহাশয়, মাঘের প্রাচীনতা বিষয়ে আরও প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ১১০২ শকাব্দের একখানি কানাড়ী শিলালিপিতে তিনি মাঘের নাম উল্লিখিত দেখিয়াছেন। আর ভোজরাজ-সঙ্কলিত 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ" নামক অলঙ্কারগ্রন্থে শিশুপালবধের ৯ম সর্গের ৬ষ্ঠ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সোমদেবের "যশস্তিলক" নামক গ্রন্থেও মাঘের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ৮৮১ শকাব্দে এই যশস্তিলক গ্রন্থের রচনা পরিসমাপ্ত হয়। এই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণরাজ রাজা ছিলেন। মাঘসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও কৌতুকাবহ উল্লেখ নৃপতুঙ্গের "কবিরাজ-মার্গে" দৃষ্ট হয়। নৃপতুঙ্গ তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই এই পুস্তক রচনা করেন। তিনি ৮১৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে

শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নৃপতুঙ্গের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কবির স্বরচিত কাব্য হইতেও যে তাঁহার জন্মসময়ের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কিছু না জানা যায় এমন নহে। কবি শিশুপালবধের ২য় সর্গের ১১২ শ্লোকে দুইখানি বৈয়াকরণ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। একখানি "কাশিকাবৃত্তি" ও অপরখানি উহার টীকা "ন্যাস"। এই উভয় গ্রন্থই বিদ্বান্ বৌদ্ধলেখকগণের লেখনী-সম্ভূত। কাশিকাবৃত্তি বামন ও জয়াদিত্য এই উভয়ের প্রণীত। চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ঈশীং বলেন ;—কাশিকাবৃত্তির লেখক জয়াদিত্য একজন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং ৬৬১—৬৬২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। ন্যাস এই কাশিকাবৃত্তির ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ইহা জিনেন্দ্রবুদ্ধি নামক একজন বৌদ্ধপণ্ডিতের বিরচিত। এই উভয় গ্রন্থই বৌদ্ধপাণ্ডিত্যের স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ। চীনভ্রমণকারী ঈশীং কাশিকা-বৃত্তির লেখক জয়াদিত্যের কথা লিখিয়াছেন কিন্তু ন্যাসকার জিনেন্দ্র-বুদ্ধির বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই, ইহাদ্বারা অনেকে অনুমান করেন চীনপরিব্রাজকের ভারতভ্রমণকালে ন্যাসকার জন্মগ্রহণ করেন নাই। কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের উপর যে সকল গ্রন্থকারের প্রতিভার আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তির ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সাহিত্যসংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ করাই চীনপরিব্রাজকগণের ভারত-ভ্রমণের উদ্দেশ্য, অতএব যদি ন্যাসকার তখন আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলে ঈশীং কখনই তাঁহার কথা উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না। এই সকল কারণে ন্যাসের রচনাকাল খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মাঘ তাহার পর আবির্ভূত হন, কারণ তিনি ন্যাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন এই কবি ১০ম বা ১২শ শতাব্দীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন না তিনি যে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে

বিদ্যমান ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব এই সকল প্রমাণ প্রয়োগ দৃষ্টে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে মহাকবি মাঘ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষাংশে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ১১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া শিশুপালবধ নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে মাঘ কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেন? আমরা ভোজ-প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা অবগত হইতে পারিয়াছি, তিনি দক্ষিণাপথের গুর্জ্জর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই দক্ষিণাপথের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দৃশ্যগুলি তাঁহার লেখনীতে উত্তমরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার দ্বারকানগরী ও তৎসন্নিহিত সমুদ্রের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়. এ সমুদয় তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন। মাঘ একজন গুণগ্রাহী রাজার মন্ত্রীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ কবি এই রাজাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিজের বংশের পরিচয় প্রদানকালে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী লিপিকরগণের অনবধানতা প্রযুক্ত তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, এই রাজা অমরত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। কবি শিশুপালবধ কাব্যের সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন ;—

সর্ব্বাধিকারী সুকৃতাধিকারঃ
শ্রীধর্ম্মনাভস্য বভূব রাজ্ঞঃ।
আসক্তদৃষ্টি র্বিরজাঃ সদৈব
দেবোঽপরঃ সুপ্রভদেবনামা॥

কালে মিতং বাক্যমুদর্কপথ্যং
তথাগতস্যেব জনঃ সুচেতাঃ।
বিনানুরোধাৎ স্বহিতেচ্ছয়ৈব
মহীপতির্যস্য বচশ্চকার॥

তস্যাভবদ্দত্তক ইত্যুদাত্তঃ
ক্ষমী মৃদু ধর্ম্মপরস্তনূজঃ।
যং বীক্ষ্য বৈয়াসমজাতশত্রো
র্বচো গুণগ্রাহি জনৈঃপ্রতীয়ে॥

সর্ব্বেণ সর্ব্বাশ্রয় ইত্যনন্দ
মানন্দভাজা জনিতং জনেন।
যশ্চদ্বিতীয়ং স্বয় মদ্বিতীয়ো
মুখ্যঃ সতাং গৌণমবাপ নাম॥

শ্রীশব্দরম্যকৃতসর্গ সমাপ্তি লক্ষ্ম
লক্ষ্মীপতেশ্চরিতকীর্ত্তনচারু মাঘঃ।
তস্যাত্মজঃ সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্॥

মাঘের পিতামহের নাম সুপ্রভদেব। তিনি নিষ্পাপ দেহ এবং দেবচরিত্র সম্পন্ন ছিলেন। এই সুপ্রভদেব শ্রীধর্ম্মনাভ নামক একজন রাজার সর্ব্বাধিকারী অথবা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কুসংস্কারবর্জ্জিত লোকে যে প্রকার বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করে, এই রাজা সময়োচিত অথচ পরিণামহিতকর এই মন্ত্রীর পরামর্শগুলি সেইরূপ গ্রহণ করিতেন। রাজাকে কোনরূপ অনুরোধ করিতে হইতনা, তিনি আপন ইচ্ছায় নিজের হিতাকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রীর বাক্য অনুসারে কার্য্য করিতেন। সেই সুপ্রভদেবের দত্তক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্ষমাশীল মৃদু এবং ধর্ম্মপরায়ণ। গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা তাঁহার বাক্যে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। লোকে সর্ব্বদা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় হইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দ্বিতীয় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই দত্তকের পুত্র মাঘ কবিকীর্ত্তির দুরাশাগ্রস্ত হইয়া শ্রীশব্দের দ্বারা রমণীয়, লক্ষ্মীপতির চরিত্র বর্ণনায় মনোহর এই শিশুপালবধ নামক কাব্য রচনা করিলেন।

অব্যবহিত পূর্ব্বে যে রাজার বিষয় উল্লিখিত হইল তাঁহার রাজধানী গুর্জ্জর প্রদেশের কোন্ নগরীতে ছিল, উহা জানা যায়না এবং তাঁহার

প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা অবগত হওয়াও দুর্ঘট। কারণ শিশুপাল-বধের ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। কোন হস্তলিপিতে "ধর্ম্মনাভ", কোন খানিতে "ধর্ম্মদেব," কোনখানিতে আবার "বর্ম্মদেব" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি পাঠ্যাবস্থায় যে পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছিলাম উহাতে "ধর্ম্মনাভ" এই পাঠ ছিল, সুতরাং অবিকল উহাই উদ্ধৃত করিলাম। কথিত আছে এই রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং মাঘের লেখা হইতেও উহার বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর মাঘের ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ যে অতিশয় শিক্ষিত এবং উদারচরিত ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐরূপ সদ্গুণ-সম্পন্ন না হইলে একজন বৌদ্ধনরপতির বিশ্বাসভাজন হইতে পারিতেন না। আর শিশুপালবধ পাঠ করিয়া মনে হয়, মাঘের জীবৎকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না, অধিকন্তু বিদ্বদ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না তাঁহারাও বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিতেন এবং বৌদ্ধনীতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধনীতি যে তদানীন্তন শিক্ষিতগণের জীবনের গতিকে উন্নত করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধরাজার মন্ত্রীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের উল্লিখ্যমান কবিও অনেকটা বৌদ্ধনীতির আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মানবচরিত্রের বর্ণন প্রসঙ্গে উহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও ঐ সকল নীতিকথা স্মৃতি পুরাণ ও প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে ও দৃষ্ট হয়, তথাপি উহা তদানীন্তন উন্নত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে সবিশেষ অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া কবির হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, এবং তিনি উহা কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে পরনিন্দা, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, ক্রোধ, খলতা প্রভৃতি অকুশল

সুকুমার মহো লঘীয়সাং
হৃদয়ং তদ্গতমপ্রিয়ং যতঃ।
সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্যমী
ক্ষপয়ন্ত্যেব হি তন্মনীষিণঃ॥

ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিদের হৃদয় কি কোমল, তাহাদের হৃদয়গত অপ্রিয় সহসা বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু মনীষীরা সাবধানে উহা গোপন করিয়া থাকেন।

উপকারপরঃ স্বভাবতঃ
সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো
গুরু-হৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ॥

সজ্জন ব্যক্তিরা স্বভাবতই সকলের উপকারপরায়ণ। হায় কি আশ্চর্য্য! তথাপি অসাধু ব্যক্তিরা তাঁহাদের উন্নতিতে সর্ব্বদা সন্তাপ অনুভব করে।

পরিতপ্যত এব নোত্তমঃ
পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতিঃ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃ
স্ফুটনির্ভিন্নদুরাশয়োঽধমঃ॥

উত্তম ব্যক্তিরা পরের উন্নতিতে কিছুমাত্র সন্তাপ অনুভব করেন না, মধ্যম ব্যক্তিরা সন্তপ্ত হইলেও মুখে উহা ব্যক্ত করেন না, কিন্তু অধম ব্যক্তিরা অন্যের উন্নতিতে অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং তাহাদের দুরভিপ্রায় তাহারা প্রকাশ করিয়া ফেলে।

জিতরোষরয়া মহাধিয়ঃ
সপদি ক্রোধজিতো লঘুর্জনঃ।
বিজিতেন জিতস্য দুর্ম্মতেঃ
মতিমদ্ভিঃ সহ কা বিরোধিতা॥

সুধী ব্যক্তিরা ক্রোধকে পরাজিত করিয়াছেন, আর লঘুচিত্ত ব্যক্তিরা ক্রোধ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে। অতএব ক্রোধ-জেতা সুধী ব্যক্তিদের সহিত আবার ক্রোধজিত লঘুব্যক্তিদের স্পর্দ্ধা কি?

বচনৈরসতাং মহীয়সো
ন খলু ব্যেতি গুরুত্বমুদ্ধতৈঃ।
কিমপৈতি রজোভিরৌর্ব্বরৈ
রবকীর্ণস্য মণে র্মহার্ঘতা॥

অসাধু ব্যক্তিদের উদ্ধত বাক্যেও মহৎ ব্যক্তিদের গৌরবের হ্রাস হয় না, ধূলিদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে কি মণির মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে?

পরিতোষয়িতা ন কশ্চন
স্বগতো যস্য গুণোঽস্তি দেহিনঃ।
পরদোষকথাভিরল্পকঃ
স্বজনং তোষয়িতুং কিলেচ্ছতি॥

যে ব্যক্তির অন্যের সন্তোষজনক কোন গুণ নাই সেই ব্যক্তিই কেবল অন্যের দোষ কীর্ত্তন দ্বারা বন্ধুজনের সন্তোষ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া থাকে।

এইরূপ অনেকগুলি নীতিপূর্ণ কবিতা শিশুপালবধের ষোড়শসর্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা অনুমান করা যায় কবি কিরূপ নীতিপরায়ণ ও বিমলচিত্ত ছিলেন। কবি যে বৌদ্ধশাস্ত্র উত্তমরূপ পাঠ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা "ললিতবিস্তর" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন মারসৈন্যগণ ভগবান্ বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। কবি সেই বিষয় স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন;—

ইতিতত্তদা বিকৃতরূপমভজস্তদভিন্নচেতসম্।
মারবলমিব ভয়ঙ্করতাং হরিবোধিসত্ত্বমভিরাজমণ্ডলম্॥

মার সৈন্যগণ যে প্রকার অবিকৃতচিত্ত বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেইরূপ এই রাজন্যবর্গও অবিকৃতচিত্ত হরিরূপ বোধিসত্ত্বকে

এখানে কবি হরিতে বুদ্ধত্বের আরোপ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। মাঘের ব্যবহারও সম্পূর্ণ দার্শনিক পণ্ডিতের ন্যায় ছিল। পূর্ব্বকাল হইতে একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে সেই গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য অভীষ্ট-দেবতার নমস্কাররূপ একটা মঙ্গলাচরণ করা হইয়া থাকে। তজ্জন্য কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ এই রীতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রন্থের আরম্ভে অভীষ্টদেবতার নমস্কার করিয়া পরে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূত্রপাত করিয়াছেন। কিন্তু মাঘ উক্ত রীতির অনুবর্ত্তন করেন নাই, তিনি জানিতেন প্রাক্তন কর্ম্ম-অনুসারে ফললাভ হইবে, অতএব দেবতার নমস্কার করিব কি জন্য? তাঁহার এই ব্যবহার পণ্ডিতসমাজের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ টীকার প্রারম্ভে ঐ কথাটি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীরা প্রথম এই বিতর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে, কেন মঙ্গলাচরণ করিব? ইহার উত্তরে টীকাকার লিখিয়াছেন "মঙ্গলাচরণদ্বারা বিঘ্নধ্বংস হয়, বিঘ্নের ধ্বংস হইলে, ঝটিতি অভীপ্সিত বিষয়ের পরিসমাপ্তি হয়।" পুনরায় বিরুদ্ধবাদীদের কথা উল্লেখ করিয়া টীকাকার বলিয়াছেন কেন "বাণভট্টাদে মঙ্গলে সত্যপি গ্রন্থসমাপ্ত্যভাবাৎ মাঘাদৌ মঙ্গলাভাবেঽপি সমাপ্তি দর্শনাৎ," অর্থাৎ বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরীর প্রারম্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হয় নাই, তিনি তাঁহার গ্রন্থকে অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়াই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু মাঘ কবি মঙ্গলাচরণ করেন নাই তথাপি তাঁহার গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই সকল কথা পাঠ করিয়া মনে হয় মাঘের মার্জ্জিতসংস্কারের বিষয় লইয়া পূর্ব্বেও বিলক্ষণ আলোচনা হইত।

এই কবির প্রথম জীবনের ঘটনা কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি শিশুপালবধ কাব্য রচনা করিবার পরও যে বহুকাল জীবিত ছিলেন উহা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে কিম্বদন্তী ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নাই। আর মধ্যভারতবর্ষে ও দক্ষিণাপথে আর একটি অতি শোকাবহ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। উক্ত জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় মহাকবি মাঘ অর্থাভাবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। গুর্জ্জরদেশীয় একজন পণ্ডিত বলেন মাঘ যে গ্রামে অবস্থান করিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামের অপর একটি নাম ছিল। এই ঘটনার পর এক রাজা সেই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "ভীলগ্রাম" এই অভিনব নামকরণ করেন। সেই রাজা বলিয়াছিলেন বহুসংখ্য সম্পন্ন লোক থাকিতেও যখন এই মহাকবির উপবাসে মৃত্যু হইল অতএব ইহাকে আর সভ্য লোকের গ্রাম বলা যায় না, ইহা অসভ্যভীলের গ্রাম। সেই অবধি নাকি ঐ গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "ভীলগ্রাম" এই নূতন আখ্যা হয়। কিন্তু এই সকল কথা কেবল লোকমুখে প্রচলিত মাত্র, কোন গ্রন্থাদি হইতে এই সকল কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বল্লাল-কবিরচিত "ভোজপ্রবন্ধে" মাঘকবির শেষজীবনের একটি দুঃখাবহ-কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘটনাটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে মাঘকে ১২শ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিতে হয়, কারণ ভোজ-প্রবন্ধের নায়ক ধারানগরীর অধীশ্বর ভোজরাজ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তজ্জন্য পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ প্রভৃতি শিশুপালবধ কাব্যের প্রকাশকগণ উক্ত আখ্যায়িকার প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নাই। কিন্তু দক্ষিণাপথের কোন কোন পণ্ডিত মাঘকে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষাংশের গ্রন্থকার বলেন, অথচ ঐ আখ্যায়িকায় বিশ্বাস

ভোজপ্রবন্ধে বর্ণিত ঘটনাগুলির কালের সামঞ্জস্য নাই ; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে ঐ গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে সংস্কৃত কবিগণের বিষয়ে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং লোকমুখে প্রচলিত ছিল, উহা একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

মধ্যভারতবর্ষে ধারানাম্নী একটি অতি প্রাচীন নগরী আছে। উহা বর্ত্তমান ধাররাজ্যের রাজধানী। ইহা নর্ম্মদানদীর অনতিদূরবর্ত্তিনী। ঐতিহাসিকগণ বলেন "খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বেও এই রাজ্য বিদ্যমান ছিল।" কেহ কেহ বলেন "মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয়গণই ধাররাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।" কেহ কেহ বলেন "বিক্রমাদিত্যের ভাগিনেয় হইতে বর্ত্তমান ধারেশ্বরগণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।" এই বংশে প্রসিদ্ধ ভোজরাজ জন্মগ্রহণ করেন। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কারগ্রন্থ, ভোজপ্রবন্ধ ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থ এই ভোজরাজের সময় সঙ্কলিত হয়। ধারেশ্বরগণের বংশে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর ভোজ ব্যতীত বোধ হয় পূর্ব্বে অন্য কোন ভোজরাজ বিদ্যমান ছিলেন। আমাদের বর্ণ্যমান কবি জীবনাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজপ্রবন্ধকার বল্লালকবি লিখিয়াছেন ;—

একদিন ধারানগরীর অধীশ্বর ভোজ সভায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময় দ্বারপাল আসিয়া সংবাদ দিল মহারাজ গুর্জ্জর দেশ হইতে মাঘনামা কবি আসিয়া নগরের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পত্নী আপনার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য দ্বারে উপস্থিত। রাজা বলিলেন শীঘ্র তাঁহাকে প্রবেশ করাও। তাহার পর মাঘপত্নী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া মাঘের প্রেরিত একখানি পত্র দিলেন। রাজা সাদরে পত্রখানি পাঠ করিলেন। উক্ত পত্রে এই কবিতাটি লিখিত ছিল।

কুমুদবনমপশ্রি শ্রীমদম্ভোজষণ্ডং ত্যজতি মুদমুলূকঃ প্রীতিমাংশ্চক্রবাকঃ।
উদয়মহিমরশ্মির্যাতি হিমাংশুরস্তং হতবিধিনিহতানাং হা বিচিত্রো বিপাকঃ।

এখন কুমুদবনের শোভা ম্লান, পদ্মসমূহ বিকসিত এবং দীপ্তিযুক্ত, পেচকের আমোদ বিদূরিত হইয়াছে, চক্রবাক আহ্লাদিত। দিবাকর উদয়াচলে আরোহণ করিতেছেন, হিমাংশু অস্তাচলগামী। হায় হতবিধাতা কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিদের কি আশ্চর্য্য দশা-বিপর্য্যয়।

রাজা এই প্রভাত বর্ণন শ্রবণ করিয়া মাঘপত্নীকে প্রভূত সুবর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "মাতঃ আপাততঃ ভোজনের নিমিত্ত এই সুবর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হইল, আগামী প্রত্যূষে আমি মাঘপণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণমনোরথ করিব। মাঘপত্নী সেই সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখন যাচকেরা তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক মাঘপণ্ডিতের সেই শারদীয়—জ্যোৎস্নাধবল গুণাবলীর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। তিনি স্বীয়স্বামীর কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করিয়া অতীবপরিতুষ্ট হইলেন এবং রাজদত্ত সমুদয় ধন সেই যাচকমণ্ডলীকে প্রদান করিয়া রিক্তহস্তে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভর্ত্তার সমীপে সমুদয় নিবেদন করিলেন। মাঘ পত্নীর বদান্যতায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "প্রিয়ে! তুমি যথার্থই পতির ছন্দানুবর্ত্তিনী ও পতিগতপ্রাণা। অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। কিন্তু এই যে যাচকগণ দলে দলে আমার নিকট আগমন করিতেছে, ইহাদিগকে কি প্রদান করিব?" মাঘ এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় একজন প্রার্থী মাঘকে রিক্তহস্ত দেখিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করিলেন। যথাঃ—

আশ্বাস্য পর্ব্বতকুলং তপনোপতপ্ত
মুদ্দামদাববিধুরাণি চ কাননানি।
নানানদীনদশতানিচ পূরয়িত্বা

হে মেঘ! তুমি সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত পর্ব্বতকুল ও উদ্দাম বনাগ্নিদগ্ধ কাননকে সুশীতল এবং নানা নদনদীকে পরিপূরিত করিয়া যে রিক্ত হইয়াছ উহাই তোমার অপূর্ব্বশোভা। যাচকের, ঐরূপ উক্তি শুনিয়া মাঘ আবার নিজ ভার্য্যাকে বলিলেন ;—

অর্থা ন সন্তি নচ মুঞ্চতি মাং দুরাশা,
ত্যাগে রতিং বহতি দুর্ললিতং মনো মে।
যাচ্ঞা চ লাঘবকরী স্ববধে চ পাপং,
প্রাণাঃ স্বয়ং ব্রজত কিং পরিদেবনেন॥

আমার অর্থ নাই কিন্তু দুরাশা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, আমার অবাধ্য অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দানের নিমিত্ত সমুৎসুক, যাচ্ঞা নিতান্ত হীনকার্য্য, আত্ম-হত্যায় মহাপাপ, অতএব প্রাণসকল তোমরা স্বয়ংই প্রস্থান কর, আর রোদন করিয়া কি হইবে?

দারিদ্র্যানলসন্তাপঃ শান্তঃ সন্তোষবারিণা।
যাচকাশাবিঘাতান্তর্দাহঃ কেনোপশাম্যতি॥

আমি সন্তোষরূপ জলের দ্বারা দারিদ্র্যরূপ অগ্নিকে উপশমিত করিয়াছি কিন্তু যাচকের আশাভঙ্গ জন্য যে অন্তর্দাহ উপস্থিত হইতেছে, ইহার উপশম কিসে হইবে?

মাঘের ঐরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া যাচকেরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। এ দিকে মাঘ ও কিছুক্ষণ পরে পরলোক গমন করিলেন। স্বামীর মরণে মাঘপত্নী ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ;—

সেবন্তেস্ম গৃহং যস্য দাসবদ্ভূভুজঃ সদা।
স স্বভার্য্যাসহায়োঽয়ং ম্রিয়তে মাঘপণ্ডিতঃ॥

যাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া নরপতিগণ সেবকের ন্যায় সর্ব্বদা যাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেন। আজ পত্নীমাত্র-সহায় সেই মাঘপণ্ডিত কালগ্রাসে পতিত

এদিকে ধারানগরীর অধীশ্বরের নিকট সংবাদ গেল—কবি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার পর তিনি একশত ব্রাহ্মণের সহিত মৌনভাবে সেখানে আগমন করিলেন। কবির পত্নী কবির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা নর্ম্মদাতীরে কবিকে লইয়া গিয়া যথাবিধি তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। কবিপত্নী চিতাবহ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া পতির সহগামিনী হইলেন।

এই সকল লেখা ও মধ্যভারতবর্ষের কিম্বদন্তীসমূহের আলোচনা করিলে মনে হয়, মাঘ কবির শেষজীবনে অর্থকৃচ্ছ্রতা ও তজ্জন্য অনাহারে মৃত্যু প্রভৃতি সত্য। তিনি একজন বড় রাজার মন্ত্রীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বোধ হয় পৌতৃক সম্পদ্ যথেষ্ট ছিল, অপরিমিত ব্যয়ে সে সমুদয় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। শেষজীবনে বার্দ্ধক্যে ও অর্থাভাবে নিতান্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া ধারেশ্বরের নিকট সমাগত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধারেশ্বরের সাহায্যগ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়া যায়।

সময়াভাবে মাঘের কাব্য সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না, প্রবন্ধান্তরে উহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

সুন্দরী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত বৈঠকখানা গৃহে কান্তিচন্দ্র বসিয়া আছেন। প্রভাতকাল। জয়মঙ্গলগ্রামের প্রজারা বিদ্রোহ করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছে, তাহারই সম্পর্কীয় কাগজপত্র লইয়া সদরনায়েব দণ্ডায়মান, ইতিমধ্যে ডাকওয়ালা আসিয়া কয়েকখানি পত্র দিয়া গেল। নায়েবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"কাছারিতে গিয়ে দেখব।"—"যে আজ্ঞা হুজুর" বলিয়া নায়েব চলিয়া গেল।

কান্তিচন্দ্র পত্রগুলি খুলিয়া একে একে পাঠ করিলেন। সবগুলি শেষ হইলে একখানি লইয়া পুনর্ব্বার মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। সেখানি এইরূপঃ—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

সূর্য্যপুর।

(তারিখ)

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ—

অদ্য মধ্যাহ্নকালে শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি কহিলেন যৌতুকস্বরূপ যদি আমি সুন্দরবনে আমার জমিদারীর সমস্ত অংশ জামাতাকে দান করি, তাহা হইলেই আপনি পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত, অন্যথা নহে। এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমি সীতনাথের দ্বারায় বলিয়া পাঠাইয়াছি, এ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বে সে সমস্ত আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। এ পত্রে সংক্ষেপে তাহা পুনর্ব্বার আবৃত্তি করি।

আপনি জানেন আমি অপুত্রক, আমার ঐ একমাত্র কন্যা। পুত্র-লাভেরও কোনও সম্ভাবনা নাই। আমার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, আমার অবর্ত্তমানে তাহার অধিকাংশই আমার কন্যা-জামাতার প্রাপ্য। সমস্ত না কহিয়া অধিকাংশ কহিলাম এই কারণে যে আমি আমার বিষয়ের কিয়দংশ কোনও দেশ-হিতকর কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিতে চাহি।—এ ক্ষেত্রে আমার সুন্দরবনের বিষয় এখনি জামাতাকে দান করিবার অপর কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না, শুধু এই প্রতিবন্ধক। আপনি স্বয়ং সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অংশের ভূম্যধিকারী, আপনি অবগত আছেন সুন্দরবনের অনেক স্থান কিরূপ উর্ব্বর; জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া ক্রমে প্রজা বসাইতে পারিলে সুন্দরবনের সম্পত্তি ক্রমে বিশেষ লাভের আকর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আমি এই উদ্দেশ্যে অনেক টাকা ফেলিয়াছি, অনেক স্থলে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, এখন যদি এ বিষয় হস্তান্তরিত করি তাহা হইলে আমার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে না, ইহাই আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক।

আমার এই প্রতিবন্ধকের কথা শুনিয়া আপনার তরফ হইতে সীতানাথ শেষ জবাব আমাকে দিয়া গিয়াছেন। আপনার সহিত কুটুম্বিতা আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল, তাহার সম্ভাবনা তিরো-হিত হওয়াতে আমি দুঃখিত। এ সম্বন্ধে আমার আর কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহারই জন্য এ পত্র আপনাকে লিখিতেছি। আমার প্রস্তাব এই—সুন্দরবনের জমিদারীর দানসত্ব আমি জামাতাকে লেখাপড়া করিয়া দিব, কিন্তু আমি স্বয়ং যাবজ্জীবন উক্ত বিষয়ের ট্রাষ্টী থাকিব। লভ্যাংশ হইতে আমার ইচ্ছামত উহার উন্নতিকল্পে যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা আমিই করিব। বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ আমার হস্তে রহিবে। আমার মৃত্যুর পর জামাতা উহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার লাভ করিবেন। ইহাতে যদি আপনার মত হয়, তবে আমি কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত

আছি। বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ইহাতে আপনার অলাভের কোনও কারণ নাই। বরং এখন আপনার পুত্রকে ঐ বিষয় দান করিলে উহার যাহা মূল্য হইত, আমার সংকল্পিত উন্নতিসাধনের পর তাহার মূল্য অন্ততঃ চতুর্গুণ হইবে। কেবল উপস্থিত লভ্যাংশ হইতে আপনি বঞ্চিত থাকিবেন। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, উপস্থিত লভ্যাংশ বড় বেশী নহে।

আপনি যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে পত্রদ্বারা আমায় জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ঈশ্বরকৃপায় এ বাটীর সমস্ত মঙ্গল। আপনার পারিবারিক কুশল প্রার্থনা করি। ইতি,

ভবদীয়

শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়।”

পত্রপাঠ শেষ করিয়া কান্তিচন্দ্র ডাকিলেন—“দরোয়ান।”

“হুজুর”—বলিয়া দ্বারবান্ নতমস্তকে দাঁড়াইল।

“দেখ ত, রায়জি সূর্য্যপুর থেকে ফিরে এসেছেন কিনা।”

“যো হুকুম হুজুর।” বলিয়া দ্বারবান্ চলিয়া গেল।

কান্তিচন্দ্র উঠিয়া কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন—সুন্দরবনের সম্পত্তির প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখনি পাইবার জন্য তাড়াতাড়ির কারণ আর কিছুই নহে,—পাছে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ পত্নীর অপর সন্তানাদি হয়। সুন্দরবনের সম্পত্তির বর্ত্তমান লভ্যাংশ যে বড় বেশী নয় তাহা কান্তিচন্দ্র স্বয়ং অবগত ছিলেন। নিজের জমিদারীতে তিনিও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া প্রজা বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন,—হরিহরের জমিদারী হস্তগত হইলে, তাহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে তিনি [illegible] হইবেন। কিন্তু যে যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন সে

সেই কার্য্য স্বয়ং শেষ করিতে চাহে,—কাহাকেও তাহার বিশ্বাস হয় না। উত্তম কথা। হরিহর চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তাহা শেষ করুন। কান্তিচন্দ্রের অনেক ঝঞ্ঝট বাঁচিয়া যাইবে। অনেক টাকাও বাঁচিয়া যাইবে।

এই সব চিন্তা করিয়া কান্তিচন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল, রায়জি এখনও সূর্য্যপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কান্তিচন্দ্র তখন কাছারি বাড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এই দিন অপরাহ্নসময়ে সীতানাথের পালকী গ্রামে প্রবেশ করিল। রায়গৃহিণী দূর হইতে বাহকগণের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিলেন, ত্বরিতপদে হরিনামের মালা হাতে করিয়া সদরদরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সীতানাথ পালকী হইতে অবতরণ করিয়া সহাস্য-বদনে জননীকে প্রণাম করিলেন। অন্যের অগোচরে জননী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"কার্য্য সিদ্ধি ?" সীতানাথ বলিলেন—"তোমার আশীর্ব্বাদে।"

সীতানাথ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য পরিজনগণ সমবেত হইল, সীতানাথ মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন। কাহার সাধ্য অনুমান করে, কয়েকপল পূর্ব্বে এই মুখে চক্ষে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছে।

রায়গৃহিণী মাথ্‌নাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তাহাকে বলিলেন—"মাথ্‌না, যা দিকিন ঝক্ করে হরে ময়রার দোকান থেকে পাঁচ সিকের ভাল রসগোল্লা কিনে আন দিকিন। বেশ ভাল দেখে

হরিন্নুট দিতে হবে। আর হরে ময়রাকে বলিস্, দেবতার সামিগ্রী, ওজনে যেন একটু বেশী করে দেয়।"

মাথ্না হরিন্নুট কিনিতে গেল। সীতারায় হস্তপদাদি ধৌত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, পথে বেশী কষ্ট হয়নিত ?"

"না, বেশী নয়।"

"সেখান থেকে কখন বেরিয়েছ ?"

"বেরিয়েছিলাম কাল বেলা আন্দাজ এগারোটার সময়।"

রায়গৃহিণী বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"কাল বেলা এগারোটার সময়! তবে এত দেরী হল কেন ? পৌঁছলে কখন ?"

"পৌঁছলাম পরশু সন্ধ্যাবেলায়। তারপর, সকল কথাবার্ত্তা কয়ে, খেয়ে টেয়ে বেরুলাম। পরশুদিন সারাদিনের পথশ্রমে শরীর এত অবসন্ন হয়ে ছিল—বিশ্রামও যথেষ্ট হয়নি। মণিরামপুরে পৌঁছে দেখলাম শরীর ভারি বেদনা। তাই সেইখানেই রাত্রিটা বিশ্রাম করবার কল্পনা করলাম। আজ আবার খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছি।"

অতঃপর মাতাপুত্রে চুপি চুপি অনেক কথা হইল। উভয়েরই মুখ আনন্দে উল্লাসিত।

মা বলিলেন—"আজ সকালে লোক দিয়ে কান্তি জানতে পাঠিয়েছিল তুমি বাড়ী এসেছ কিনা।"

সীতানাথ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভায়ার দেখি ভারি তাগাদা! এই একটু পরে গিয়ে আশাবায়ু নিবৃত্তি করে আসছি।" রায়গৃহিণী মুচ্‌কিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মাখন হরিন্নুট লইয়া ফিরিয়া আসিল। গৃহিণী বলিলেন—"ঐ তুলসীতলায় পিতলের সরা চাপা দিয়ে রেখে দে।"

হরিন্নুট রাখিয়া দিল। রায়গৃহিণী বলিলেন—"সীতু, তুমি কাপড় ছেড়ে হরিন্নুটটা দাও।"

সীতানাথ বলিলেন—"তুমিই দাওনা মা। আমি আর পারিনে। সারাদিনের পর আর"—বলিয়া সীতানাথ ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন।

দেবতার প্রতি এই অবহেলায় রায়গৃহিণী কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। তথাপি তিনি পুত্রের ক্লান্তি দর্শনে নিজেই হরিন্নুট দিতে অগ্রসর হইলেন।

হরিন্নুট যখন দেওয়া হইতেছে, তখন আবার জমিদারের দ্বারবান রায়জির সন্ধান লইতে আসিল। সীতানাথ বলিয়া পাঠাইলেন তিনি আন্দাজ অর্দ্ধ ঘণ্টায় উপস্থিত হইবেন।

বাটীর পরিজনবর্গ জানিল, হরিন্নুট দেওয়া হইতেছে, সীতানাথ নিরাপদে গৃহে ফিরিয়াছেন বলিয়া। হরিন্নুটের প্রকৃত কারণ দাত্রী, তাঁহার পুত্রবর এবং হরি ভিন্ন অপর কেহ জানিল না।

হরিন্নুট দেওয়া শেষ হইলে রায়গৃহিণী গলায় বস্ত্র দিয়া হরিকে প্রণাম করিতে করিতে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—"একটা মনস্কামনা পূর্ণ করলে বাবা—আর একটা মনস্কামনা পূর্ণ কর—একশো—উঁহু—পঞ্চাশ টাকা খরচ করে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব বাবা।" গৃহিণী প্রথমে একশো টাকা বলিতে যাইতেছিলেন,—তাহা সংশোধন করিয়া পঞ্চাশ টাকা বলিলেন। একশো টাকার কথাটা ভাল করিয়া চাপা দিবার জন্য বারম্বার বলিলেন—"পঞ্চাশ টাকা খরচ করে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব বাবা—পঞ্চাশ টাকা খরচ করে সিন্নি দেব। হে বাবা, দোহাই বাবা—আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

তাহার পর উঠিয়া বাটীর সকলকে—বউঝিকে, ছেলেপিলেকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। সীতানাথের অংশেই প্রসাদের সংখ্যাটা

ধূমপান করিতে বসিলেন। সন্তোষপূর্ব্বক ধূমপান করিয়া, জমিদারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কান্তিচন্দ্র তম্বখানায় উপবেশন করিয়া আরামের সহিত আলবোলা টানিতেছিলেন। সীতানাথকে দেখিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। সীতানাথের মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ। কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন এলে হে ?"

"এই ঘণ্টা দুই হবে পৌঁছেছি।"

"কখন বেরিয়েছিলে ?"

"কাল সেখানে আহারাদি করে মধ্যাহ্ন সময় বেরিয়েছিলাম।"

"এত বিলম্ব ?"

বিলম্বের কারণ সীতানাথ খুলিয়া বলিলেন। তখন কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর—ওদিকের সংবাদ কি ?"

সীতানাথ মুখ কাচুমচু করিয়া বলিলেন—"সে সুবিধে নয়।" বলিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

"কেন ? বলে কি ?"

সীতানাথ মুখের ভাব অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণ করিয়া, হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আরে, সে মহা কৃপণ লোক। কিছুতেই রাজি হল না। সে বলে সুন্দরবনের ও জমিদারী আমি উন্নতি করছি—এ করছি—তা করছি—ঢের টাকা ফেলেছি—সে দিতে টিতে পারব না। কত করে ভজাবার চেষ্টা করলাম,—বল্লাম উন্নতি করছ বেশ ত—আমরাই কি উন্নতি না করব, আমরাই কি ফেলে রেখে দেব ? আমরাও বংশাবলীক্রমে সুন্দরবনে জমিদারী করে আসছি, আমরা আর জানিনে ? কতকরে ভজাবার চেষ্টা করলাম কিছুতেই বর্গ মানলে না। 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'।"

সীতানাথ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"সে বলে একটা কোনও তালুক টালুক চাও ত দিতে পারি। সুন্দরবনের ও জমিদারী হাতছাড়া কর‍্‌ছিনে। আমি বল্লাম থাক তালুকে আমাদের প্রয়োজন নেই। ঐ পণে ভিন্ন আমরা পেরে উঠব না। একবারে শেষ কথা বলে এসেছি।"

কান্তিচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"কি রকম তালুক দিতে চেয়েছিল ?"

সীতানাথ মনে একটু শঙ্কিত হইলেন। হরিহর চট্টোপাধ্যায় যে কয়েকটা তালুকের নাম করিয়াছিলেন—তাহার প্রত্যেকটাই উৎকৃষ্ট তালুক। সুতরাং চালাকি করিয়া বলিলেন—"কটা তালুকের নাম করলে—নাম মনে হচ্চে না—কোন কাযেরই তালুক নয়। বল্লে এই গুলোর মধ্যে যেটা চাও দিতে পারি। আমি চটে মটে বল্লাম থাক্ তাতে আমাদের আবশ্যক নেই। আমাদের ছেলের বিয়ে হচ্চেনা এমন ত নয়।"

কান্তিবাবু পকেটে প্রভাতের চিঠি খানি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন —"পোষ্যপুত্র টুত্র নেবার কোন রকম মৎলব দেখলে ?"

সীতারায় বলিলেন—"সে খবর ভাল করেই জেনে এসেছি। পোষ্য-পুত্র নেবে না বটে, কিন্তু যদি বিয়েই হয়—আমাদেরও কোন আশা নেই। সে বলে আমার যা কিছু বিষয় আছে, তা থেকে আমার মেয়ে জামাইকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে বাকী সব সৎকার্য্যে দান করে যাব। বল্লে ছেলে মেয়েকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করে যাওয়া মহা গর্হিত কার্য্য; কত বক্তৃতাই করলে। বল্লে বিলেতে কারনলি বলে কে নাকি এক কবি আছে সে তার ছেলে মেয়েকে বঞ্চিৎ করে নিজের তামাম বিষয় খয়রাৎ করে যাচ্চে। সে নাকি বলেছে প্রভুত্বের উপর

কান্তিচন্দ্র উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভুত্বের উপর পরিশ্রম কি আবার ?"

সীতানাথ তীব্রস্বরে হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আরে কে জানে মশায় ! ভাল বুঝতেই পারলাম না। অত ইংরিজি ফিংরিজি বুঝিনে আমরা সাদাসিধে মানুষ। সে মহা সায়েব লোক। চা খায়। দেবতা ব্রাহ্মণকে ডোণ্টো কেয়ার করে। সেখানে কুটুম্বিতে করে সুখ হবে না," বলিয়া সীতানাথ জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

কান্তিচন্দ্র পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া আর একবার পাঠ করিলেন। পাঠান্তে সীতানাথের হস্তে তাহা প্রদান করিলেন। বলিলেন—"দেখ, আজ সকালে এই চিঠি খানা পেলাম। তুমি সেখান থেকে চলে আসবার পর বোধ হয় ভেবে চিন্তে দেখেছে—দেখে এই চিঠি লিখেছে।" বলিয়া কান্তিচন্দ্র ল্যাম্পটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন।

চিঠি পড়িতে পড়িতে সীতানাথের বুক হিম হইয়া গেল,—কিন্তু মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পাঠ শেষ করিয়া বলিলেন—"যাক্। এত যে বক্তৃতা তার কাছে করে এসেছি—সেটা একেবারে নিষ্ফল হয়নি দেখছি। তবে কিনা ফলটা সদ্য সদ্য হলেই আমারও অনেকটা মনোকষ্টের লাঘব হত।—কি স্থির করছ তা হলে ?"

কান্তিচন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"তুমি বল্লে বিষয়ের অধিকাংশ খয়রাৎ করে যাবে, যৎকিঞ্চিৎ জামাই মেয়েকে দিয়ে যাবে,—চিঠিতে ত ঠিক তার উল্টো লিখেছে।"

সীতানাথের মুখ মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিপন্নের মত দেখাইল। পরক্ষণেই সে ভাব তিরোহিত হইল। বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—তাইত বলছি কিনা,—ওষুধ ধরেছে,—কিন্তু বিলম্বে। এত বক্তৃতা যে করেছি, তা বৃথা হয়নি। আমি বল্লাম কিনা বুঝিয়ে—তোমার ও কার্ণলি ফার্ণলি রেখে দাও। সাহেবেরা যা করবে, আমাদেরও কি তাই করতে

হবে নাকি? এই রকম করে করেই ত দেশটা উচ্ছন্ন গেল। চিরকাল বাপপিতামহের আমল থেকে যা হয়ে আসছে, তাই কর। সৎকার্য্যে দান করে যেতে ইচ্ছে হয়ে থাকে, বেশ ত সে উত্তম কথা,—তাই বলে, কি ছেলে মেয়েকে এ রকম বঞ্চিত করে যেতে আছে? তোমার ষোল আনা থেকে দু আনা যদি তুমি সৎকার্য্যে দান করে যাও তা হলেই লোকে তোমায় ধন্য ধন্য করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওষুধ ধরেছে দেখছি। বেশ বেশ। এখন তোমার মত কি বল।”

কান্তিচন্দ্র চিঠিখানি মুড়িয়া পকেটে উঠাইয়া রাখিয়া বলিলেন—“আমার মত বিবাহ দেওয়া।”

অন্তরে বিষম নিরুৎসাহ,—মুখে প্রফুল্লতার ভান করা, গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রমের ব্যাপার। সীতানাথের কণ্ঠে ক্রমাগত শ্লেষ্মা আসিয়া জমিতে লাগিল। বারম্বার গলা ঝাড়িয়া তিনি বলিলেন—“যাক্—এতটা মেহনৎ যে হল,—সার্থক হয়েছে।”

কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—“মেয়েটিকে তুমি দেখে আসনি ত?”

“না। তখন যে রকম সুর ধরেছিল হরিহর চাটুর্য্যে, মেয়ে দেখার আর কোনও আবশ্যক বোধ করিনি। বল ত গিয়ে দেখে আসি।”

কান্তিবাবু বলিলেন—“তোমায় আর বার বার কষ্ট দেব না। আমি নিজেই মেয়েটি দেখতে যাব মনে করেছি।”

শুনিয়া সীতারায়ের মুখখানি ছোট হইয়া গেল। সেখানে কথা-বার্ত্তায় যদি তাঁহার জুয়াচুরি প্রকাশ হইয়া যায়! বলিলেন—“বেশ বেশ—তা হলে ত ভালই হয়। আজ তা হলে উঠি আঃ—গা হাত টাটিয়ে রয়েছে। একটু বিশ্রাম না করলে আর প্রাণটা বাঁচছে না।” বলিয়া সীতানাথ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাটী আসিয়া জননীকে সকল কথা বলিলেন। সেদিন রাত্রে রায়-

অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইতে সমর্থ হইল মাত্র।

সীতানাথ শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"মা যখন হরির্লুট দিতে ডেকেছিলেন—তখন আলস্য করে দেবতার উপেক্ষা করাটা ভাল হয়নি।"

কক্ষান্তরে বিনিদ্র শয্যায় রায়গৃহিণী ভাবিতে লাগিলেন—"কি কুবুদ্ধি হল—মতিচ্ছন্ন ধরল,—একশো টাকাই মানলাম না কেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দুইদিন পরে নবগোপালের পানসী আসিয়া মহেশপুরের ঘাটে লাগিল। তখনও মধ্যাহ্নকাল আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। নবগোপাল পানসী হইতে অবতরণ করিয়া তীরবর্ত্তী একটা বৃক্ষের নিম্নে কম্বল পাতিয়া উপবেশন করিল। এক-জন দাঁড়িকে আদেশ করিল নৌকায় যে দুইটা বন্দুকের বাক্স আছে তাহা আনিয়া দাও। বাক্স দুইটা আসিলে তাহা খুলিয়া নবগোপাল দুইটি বন্দুক বাহির করিল।—একটি বন্দুক বড়, একটি ছোট। ছোট বন্দুকটি হাতে লইয়া নবগোপাল উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর বড় বন্দুকের বাক্স হইতে একটি থলি লইয়া তাহার মধ্য হইতে বন্দুক পরিষ্কার করিবার মশলা সরঞ্জাম বাহির করিল। ছোট বন্দুকটির নলে স্থানে স্থানে মরিচা পড়িয়া গিয়াছিল, নব-গোপাল তাহা সযত্নে পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য এটি সে রমার ব্যবহারের জন্য আনিয়াছে। এটি তাহার বাল্যকালের বন্দুক। প্রথম শিক্ষার বন্দুক—এটি তাহার অত্যন্ত আদরের জিনিষ। নিজে যখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, বড় বন্দুক ব্যবহার করিতে সক্ষম হইল, তখন কতলোক নবগোপালের নিকট এ বন্দুকটি চাহিয়াছিল,

কিন্তু সে কাহাকেও এটি দেয় নাই। রমার জন্য ইহা আনার কল্পনা অদ্য প্রভাতে মাত্র তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে, নতুবা সে বাড়ী হইতেই ইহা পরিষ্কার করিয়া আনিত। নবগোপালের হস্তদ্বয় বন্দুকের প্রতি নিযুক্ত রহিল, কিন্তু তাহার চক্ষুর্দ্বয় বারম্বার গ্রামপথের পানে আকৃষ্ট হইতেছে।

সূর্য্য আকাশের মধ্যভাগে আরোহণ করিল, তখনও রমার দেখা নাই। বন্দুক পরিষ্কার হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল! আকাশে এক একবার মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে নিবাইয়া দেয়, আবার রৌদ্র উঠে। এই দুইদিনে রমার সম্বন্ধে নবগোপালের মনে অনেক কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে। উহার পিতা কে—কোন জাতি, এখনও রমার বিবাহ হয় নাই কেন—ইত্যাদি। ভাবিয়া রাখিয়াছে আজ রমাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। রমা যাহারই কন্যা হউক, নিতান্ত বালিকা নহে—তাহাকে লইয়া বনে শিকার করিতে যাওয়া কি উচিত?—এ প্রশ্ন নবগোপালের মনে বারম্বার উদিত হইয়াছিল। কিন্তু রমার মুখে চক্ষে সে এমন একটা বালকসুলভ নিঃসঙ্কোচ নির্ভীকতা দেখিয়া গিয়াছিল যে তাহাকে বঙ্গগৃহের একটি তরুণী বলিয়া কিছুতেই সে মনে করিতে পারিতেছিল না। নবগোপাল তথাপি বারম্বার ভাবিয়াছিল, থাক, গিয়া কাজ নাই। কিন্তু এই আশ্চর্য্য বালিকার পুনঃসঙ্গলাভের জন্য তাহার মন অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। সুতরাং সে আসিয়াছে। বিংশতি বৎসর বয়সে আমরা সব সময় ততটা হিসাব করিয়া কাজ করি না।

এখনও রমা আসে না। নবগোপাল তখন স্থির করিল, গ্রামপথে একটু অগ্রসর হইয়া রমা আসিতেছে কিনা দেখিবে। বন্দুক সেখানে রাখিয়া, উঠিয়া, নবগোপাল গ্রামপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল। কোথাও

কোমল হইয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই বনলক্ষ্মীর দর্শন পাইল। দেখিবামাত্র তাহার অন্তরাত্মা পুলকিত হইয়া উঠিল।

নিকটে অগ্রসর হইয়া নবগোপাল বলিল—"রমা এসেছ!"

রমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—"তোমার বন্দুক কৈ?"

"বন্দুক ঘাটের কাছে রেখে এসেছি। তোমার দেরী দেখে ভাবছিলাম তুমি বুঝি আর এলে না।"

রমা মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

নবগোপাল বলিল—"আমার সঙ্গে সত্যি শিকার করতে যাবে?"

রমা বলিল—"যাব বৈকি।"

"তোমার বাড়ীর লোকে কিছু বলবে না ত?"

রমা খুব নিশ্চিতভাবে বলিল—"কিচ্ছু না। আমি পিসিমাকে বলে এসেছি। পিসিমা বল্লে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। পিসিমা শুনতেও পায় না কিছুই না।"

"তোমাদের বাড়ী আর কে কে আছেন?"

"আমার বাবা আছেন, রাজলক্ষ্মী বলে আমার ছোট বোন্ আছে, আর লছমি আছে।"

"লছমি কে?"

"লছমি আমার দাই। আমারত মা নেই কিনা, সেই আমায় মানুষ করেছে।"

"লছমি তোমায় বক্‌বে না?"

রমা অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে বলিল—"না। লছমি বক্‌বে কেন? সে নিজেই আমাকে শিকার কর্‌তে শিখিয়েছিল। আমায় তীর-ধনুক তৈরি করে দিয়েছিল।"

হইল। বৃক্ষতলে কম্বলের উপর রমা দেখিল দুইটা বন্দুক পড়িয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় বন্দুকটি দেখাইয়া রমা জিজ্ঞাসা করিল "এটা কোথায় পেলে?"

নবগোপাল বলিল—"ও আমার ছেলেবেলাকার বন্দুক।"

রমা সেটি হস্তে উঠাইয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এতে সব জানোয়ার মারা যায়?"

শুধু ছোট ছোট জানোয়ার মারা যায়। বাঘ টাঘ মারা যায় না! এটি কিজন্যে এনেছি জান রমা?"

রমা বলিল—"না।"

"এটি তোমার জন্যে এনেছি।"

"আমার জন্যে এনেছ?" বলিয়া রমা বন্দুকটি আবার উঠাইয়া লইল। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উত্তেজনাবশতঃ পুনর্ব্বার বলিল —"আমার জন্যে এনেছ সত্যি?"

নবগোপাল বলিল—"তোমারি জন্যে এনেছি।" বন্দুক পাইয়া রমার আনন্দ দেখে কে! বলিল—"চল তবে শিকার করতে যাই।"

নবগোপাল বলিল—"তোমার জন্যে আর একটা জিনিষ এনেছি।"

"কি?"

নবগোপাল তাহার দুইটি পকেট হইতে দুইটি সুন্দর পাদুকা বাহির করিল। বলিল—"বনে বনে বেড়াও, যদি তোমার পায়ে কাঁটা ফুটে যায়, তাই এ দুটি এনেছি। পর দিকিন।"

রমা পরিতে পরিতে বলিল—"এ কি রকম জুতো! লছমি আমার জন্যে বিকানীর থেকে যে জুতো আনিয়ে দিত সেত এরকম নয়। তাতে জরি দেওয়া দেওয়া।"

নবগোপাল বলিল—"তোমার জুতো পরা অভ্যেস আছে? আজ

রমা বলিল—"এখন আর পারিনে।"

"কেন ?"

"এখন বড় হয়েছি কিনা।" বলিয়া রমা মুখখানি বিজ্ঞের মত করিয়া রহিল।

দুইজনে প্রস্তুত হইল। রমা নিজের বন্দুক নিজে লইতে চাহিল। নবগোপাল বলিল—"না তোমার কষ্ট হবে। এখন আমি বয়ে নিয়ে যাই। তুমি যখন চাইবে তখন দেব।" রমা দুঃখিত স্বরে বলিল—"আমি তবে কিছু নেব না ?" নবগোপাল বলিল—"আরও দুটো জিনিষ আছে, টোটার বাক্স আর খাবারের থলি। এর একটা নাও।" রমা টোটার বাক্সটা হাতে ঝুলাইয়া লইল। এই বেশে এই দুইটি নবীন ব্যাধ বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সাদা কাজীর বিচার।

যাঁহারা মনে করেন সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আইনের কড়াক্কড়িতে এ দেশ হইতে কাজীর বিচার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত। বঙ্কিম বাবুর 'সীতারামে'র উপাখ্যানারম্ভে এক কাজীর বিচারের উল্লেখ আছে, মুসলমান ফকিরকে উল্লঙ্ঘন করা অপরাধে গঙ্গারামের উপর কাজিসাহেবের হুকুম হইয়াছিল তাহাকে সশরীরে মাটিতে পুঁতিতে হইবে। ফৌজদারী আইনের বিশেষ সতর্কতা-সত্ত্বেও এই শ্রেণীর কাজীর বিচার এদেশের ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ দ্বারা অহরহ হইয়া থাকে। যাঁহারা নিয়মিতরূপে সংবাদ পত্র পাঠ করেন, তাঁহারা জানেন, এই প্রকার কাজীর বিচারসংখ্যা দিন দিন কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে। একদিকে হাইকোর্টের উদারতা, অন্যদিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অঞ্চলচ্ছায়া, সুতরাং অনেক ম্যাজিষ্ট্রেটই মনের আনন্দে কসাইয়ের ছুরিকায় প্রাণপণে শান দিতেছেন। সংবাদ পত্র হইতে তীব্র আর্ত্তনাদ উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে।

সুবিচার করিতে গিয়া, হতভাগ্য নিরপরাধীকে অত্যাচারীর কবল হইতে রক্ষণ করিতে গিয়া, সারণ ও নোয়াখালীর ভূতপূর্ব্ব স্মরণীয় জজ মিঃ পেনেল কিরূপে পদচ্যুত হইলেন তাহা পাঠকগণের স্মরণ আছে। আমাদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়াই মিঃ পেনেলের বিপদ ঘটিয়াছিল, বুদ্ধিমান আমরাই পেনেলকে পাগল বলিয়া উপহাস করি! পেনেলের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া কোন্ জজ আর ন্যায়বিচারের জন্য প্রাণপণ করিবেন? তাঁহারা এদেশে চাকুরী করিতে আসিয়াছেন; ন্যায় যেখানে কুটুম্বগণের, ভাই বেরাদরগণের স্বার্থের বিরোধী হয়, সেখানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হ-জ-

উপায়, তাহাতে দুই পাঁচটা নেটিভের মান, সম্ভ্রম, অর্থ, গৌরব, সর্ব্বস্ব নষ্ট হউক বিচারপতিগণের তাহা দেখিবার অবসর কোথায়? দেশের শাসনকর্ত্তাগণের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া বেসরকারী ইংরাজ-সমাজও ক্রমে সুর উচ্চ করিতেছে। কুলি ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে যদি কোন ইংরাজের জেল হয়, তাহাহইলে এখন ক্ষমতাপন্ন এংলোইণ্ডিয়ান ডিফেন্স সভা হইতে চুনাগলির জয়ঢাক-বাহী ডিক্রুজ সাহেব পর্য্যন্ত একেবারে সেই বিচারের উপর খড়্গাহস্ত! অধিকদূর যাইবার আবশ্যক নাই, আসামের চাকর এলেন সাহেবের প্রতি বিনাপরিশ্রমে একমাস কারাদণ্ডের আদেশে ভারতের ফিরিঙ্গী মধুকরগণ লোষ্ট্রাহত মধুকরের ন্যায় কিরূপ সুতীব্র হুল বাহির করিয়া আসামের উপত্যকা হইতে কলিকাতার বড়লাট সাহেবের দরজা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এখনও সকলের মনে আছে। আসামের ভাগ্যবিধাতা মহামতি কটন তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ অপক্ষপাত শাসনের প্রয়াসী ছিলেন, এজন্য তাঁহার শাসনকালের শেষ কয়বৎসর ফিরিঙ্গী সমাজের অভিমানে, অনুযোগে, ক্রোধে, তাঁহাকে কিরূপ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায় তাঁহার ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে এমন ধীরভাবে সুবিচারের পোষকতা করিতে পারিত না। এমন কি, তিনি তাঁহার সেই এক-নিষ্ঠ সুবিচার-প্রীতি ও অপক্ষপাত নীতির জন্য ভারতের উচ্চতর শাসন-কর্ত্তাগণের পোষকতা ও সহানুভূতিও লাভ করিতে পারেন নাই! এই সকল কারণে এদেশের ইংরাজসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট সম্প্রদায় মনে করে যদি দৈবাৎ তাহাদের লাথিতে কোন নেটিভের ক্ষণভঙ্গুর প্লীহা বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিম্বা মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা-

করিলেই ঠিক সুবিচার হয়। দেশীয়গণের প্রতি অত্যাচার করিয়া ইংরাজ অপরাধীগণ যদি সর্ব্বত্র যোগ্যদণ্ড প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে উদ্ধত ইংরাজ বা ফিরিঙ্গীর দল যখন তখন নেটিভের কৃষ্ণচর্ম্মের ঘাত-সহত্ব পরীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইত না। এ দুর্ভাগ্য দেশে দুর্বৃত্ত গোরাকে তাহার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শিক্ষাদানের কোন পথই বর্ত্তমান নাই,—এই একমাত্র ছাড়া যে আমরা তাহাদের লাথি খাইয়া তাহাদের নাসিকাবিলোপের জন্য ঘুসি তুলিব। কারণ আদালতে তাহাদের উপযুক্ত শাসন হয় না, এবং ধর্ম্মোপদেশ তাহারা ভণ্ডের কৌশলমাত্র মনে করে।

কিন্তু এইরূপ অবিচারের শেষফল কিরূপ বিষময় হয়, তাহা অতীত শতাব্দীর নীলবিদ্রোহের ইতিহাস হইতেই বুঝিতে পারা যায়; সে দাবানল সহজে নির্ব্বাপিত হয় নাই। সুবিচারের ব্যভিচার, তা যেখানেই হউক, ভগবান দীর্ঘকাল সহ্য করেন না। কত পরিবারে দেখিয়াছি কর্ত্তৃপক্ষের সুবিচারের প্রতি ওদাসীন্যে সুখের পরিবার ছারখার হইয়া গিয়াছে।

ফৌজদারী কলহে একদিকে নেটিভ ও অন্যদিকে সাহেব থাকিলে নেটিভ কিরূপ বিচার লাভ করে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত অনেকবার দেখিয়াছি। আসামী যদি সাহেব হয় তাহা হইলে তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইলেও সে কিরূপ বিচার লাভ করে, তাহার দৃষ্টান্ত বহুবার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। আসামী দেশীয় লোক, ও ফরিয়াদী সাহেব হইলে আসামীর ভাগ্যে কিরূপ বিচার লাভ হয়, সংপ্রতি এলাহাবাদে তাহার একটি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—পরীক্ষাফল যৎপরোনাস্তি সন্তোষপ্রদ!

লালা সোমেশ্বর প্রসাদ এলাহাবাদের একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, তাঁহার সম্ভ্রমের এইমাত্র পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি

পরিচয় এই যে, এলাহাবাদের বহুসংখ্যক অট্টালিকা তাঁহার নিজস্ব, তাহাদের ভাড়া হইতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয়।

ডিলাফস্ নামক এক সাহেব—খাঁটি কি ট্যাঁস্ আমরা সংবাদ রাখি না,—সোমেশ্বরের একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিত। সাহেব বাড়ীতে কতকগুলা ফুলের গাছ রোপন করিয়াছিল। সে সকল গাছ টবে ছিল না, মাটিতে প্রোথিত ছিল, এবং শাখাপত্র বিস্তার পূর্ব্বক তাহারা একটি কুঞ্জবনের মত শোভা ধারণ করিয়াছিল। ডিলাফস্ কেন জানিনা, লালা সোমেশ্বরের বাড়ী ছাড়িয়া দিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এক অদ্ভুতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, সে সেই কুসুমকুঞ্জ নির্ম্মূল করিয়া গাছগুলি স্থানান্তরিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল! সোমেশ্বর মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, সাংসারিক লোক, তিনি নিজের স্বার্থ রক্ষার অভিপ্রায়ে সাহেবকে বাধাদান করিলেন। গাছগুলি তিনি আটকাইলেন, সাহেবকে পথ হইতে গাছ ছাড়িয়া আদালতের আশ্রয় লইতে হইল। উন্নত পিনালকোডের কাণ্ডদেশে সাহেব তাহার নৌকা বাঁধিল।

সোমেশ্বর, সাহেবকে স্থাবর গাছগুলি লইয়া যাইতে দেন নাই, তাহা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা প্রকৃতঘটনা, কেহ তাহা অস্বীকার করে নাই; ধরিতে গেলে লালা সোমেশ্বরের উপরই ডিলাফস্ অন্যায়াচরণ করিয়াছিল, তিনি দেওয়ানি করিয়া তাহার নিকট হইতে খেসারত আদায় করিতে পারিতেন। কিন্তু ফৌজদারীর বিচার অন্যরূপ হইল; সাক্ষীর অভাব হইল না, দেশীয় ও ইংরাজ অনেকেই সাক্ষী দিলেন। 'অপার ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের' ইংরাজ এজেণ্ট বলিলেন, ভাড়াটিয়া বাড়ীর গাছে গৃহের অধিকারীর সত্ব। হুইলার কোম্পানীর একজন ইংরাজ অংশীদার বলিলেন, ভাড়াটে

গৃহস্বামীর সম্পত্তি, সাহেব নিজে বাড়ী ভাড়ার ব্যবসায় করেন, এ সকল তত্ত্ব তাঁহার জানা আছে।

কিন্তু 'ধর্ম্মস্যতত্ত্ব নিহিত গুহায়াং, মহাজনো যেন গতসংপন্থা' —এ সকল তত্ত্ব গুহার মধ্যে নিহিত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মহাজনের পন্থা অনুসরণ পূর্ব্বক মকদ্দমার রায় দিলেন;—আসামী সোমেশ্বরদাস গাছ আদায় উপলক্ষে দাঙ্গাহাঙ্গাম করিয়াছে—অতএব তাহার তিন মাসের জেল!—নিজের জিনিস চুরী হয় না, সুতরাং সোমেশ্বর-দাস গাছগুলি চুরী করিয়াছেন, এ কথা বলা চলে না। যে পন্থা মুক্ত ছিল ম্যাজিষ্ট্রেট সেই পন্থাতে তাঁহার সংকল্প তরণী চালাইলেন। এরূপ কাজীর বিচার এদেশেও সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় না। সেই গঙ্গারামী বিচারের বহুদিন পূর্ব্বে গল্পলেখক ঈসপের আমোলে একবারমাত্র ঘটিয়াছিল, গিরি নির্ঝরণীতে জলপানরত ছাগশিশুকে এইরূপ বিচারেই ব্যাঘ্র তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কেবল তরুণ-বয়স্ক ম্যাজিষ্ট্রেটকেই এজন্য অপরাধী করা যায় না। প্রবীন সেসন জজও আপীলে স্থির করিলেন, সোমেশ্বরের অপরাধ গুরুতর, তবে তিনি বিজ্ঞ, অধিক বিবেচক, তাই দয়াপরবশ হইয়া দণ্ড কিঞ্চিৎ লঘু অর্থাৎ একমাস করিয়া দিলেন। সোমেশ্বর হাইকোর্টের নিকট এখন বিচার প্রার্থনীয়।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে লালা সোমেশ্বরের আপীলের হুকুম হইল, শান্তি রক্ষার জন্য তাঁহাকে দুই বৎসরের মুচলেকা দিতে হইবে, স্বয়ং তিনি পাঁচ হাজার টাকার এক মুচলেকা দিবেন, আর আড়াই হাজার টাকা হিসাবে পাঁচ হাজার টাকার দুই জামিন দিবেন। ইহাতে অপারগ হইলে তাঁহাকে এক বৎসর শ্রম রহিত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। নিম্ন আদালত তাঁহার যে পাঁচশত টাকা জরিমানা করিয়া-

জজের বিচারে লালার একমাস কারাদণ্ডেরই আদেশ ছিল, কিন্তু হাইকোর্ট তাহা খণ্ডন করিয়া দশ হাজার টাকা জামিনের আদেশ প্রদান করিলেন, না দিতে পারিলে এক বৎসর কারাদণ্ড! সুতরাং জজের আদেশ অপেক্ষা দণ্ড বৃদ্ধি হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এদেশের চোর, বদমাস, দস্যুগণ যে দণ্ডভোগ করে, লালা সোমেশ্বর নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য একজন সাহেবের সহিত সামান্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সেই দণ্ডলাভ করিলেন, ভারতের একটি শ্রেষ্ঠতম আদালত হইতে আপীলের ফলস্বরূপ এই দণ্ড প্রদত্ত হইল! কি লঘু অপরাধে কি গুরুদণ্ড, ভাবিলে লজ্জায়, ঘৃণায়, বিস্ময়ে, স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু পিনালকোডের এইরূপ ভাষ্য আজকাল বহুস্থানেই দেখা যাইতেছে, কে বলিবে সেকালের কাজীর বিচার একালের কাজীর বিচার অপেক্ষা অদ্ভুত ছিল?

যদি সোমেশ্বর দাস আসামী ও সেই সাহেবটা ফরিয়াদী না হইত, তাহা হইলে এ মামলার বিচার কিরূপ হইত তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

কিন্তু এদেশের ইংরাজ বিচারকগণের অনেকেই ন্যায় বিচারে অনভ্যস্ত। যেখানে ইংরাজ ও দেশীয়ের সহিত সংঘর্ষণ নাই সেখানেও তাঁহারা বিচারপথচ্যুত হইয়া পড়েন, যে ন্যায়বিচারে তাঁহাদের প্রকৃত মহিমা প্রকাশ পাইতে পারে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যায় বিচারে স্ব স্ব মহিমা প্রতিপাদনে অগ্রসর হন। ইহাতে দেশের লোক তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাবতার না ভাবিয়া এক একটা জহ্লাদমাত্র মনে করে; এদেশে যাঁহারা সিভিলিয়ান হইয়া আসেন তাঁহারা লেখাপড়া না শেখেন এমন নহে, ইংরাজ সিভিলিয়ানেরা যে বংশসম্ভূতই হোন, তাঁহারা যে বিলাতে নিতান্ত চোয়াড়ের সংসর্গে বাস করেন এরূপও

নাই; কিন্তু এদেশে আসিয়া তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও জয়েণ্টপদ লাভ করিয়া একটা মহকুমার রাজত্ব করিতে দেখিলে অনেক সময় জনপদবাসীগণ অদূরে যমের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে তাঁহারা এমন পৈশাচিকতার পরিচয় প্রদান করেন যে সে জন্য সুশিক্ষিত ভদ্র ইংরাজ সম্প্রদায়ের লজ্জা রাখিবার পথ থাকে না, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না।

এইরূপ পৈশাচিকতা-পরায়ণ একটি ইংরাজ সিভিলিয়ান্ সে দিন যে জহ্লাদসুলভ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সিভিলিয়ানটি মুঙ্গেরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, নাম মিঃ টমাস। মিঃ টমাস সে দিন একটি মুসলমান কনষ্টেবলের অপরাধের বিচার করিয়াছেন; কনষ্টেবলটির নাম সাদেক। সে প্লেগের সময়ে নির্ম্মিত হাসপাতাল নামধেয় একটা জীর্ণ কুটীর হইতে দুই চারিখানি বাঁশ কাঠ টানিয়া লইয়া গিয়া তাহা জ্বালানী কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। সাদেক চুরি অপরাধে অভিযুক্ত হইল। বিচারক স্বয়ং মিঃ টমাস্, বিংশ শতাব্দীর দানিয়াল। দানিয়াল মহাশয় চুরী অপরাধে সাদেকের প্রতি বিশঘা বেত্রের ব্যবস্থা করিলেন।

সাদেক নিরুপায় হইয়া মিঃ টামাসের এই আপীলহীন আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করিবার জন্য জজ সাহেবের কৃপা প্রার্থী হইল। মোসন হাইকোর্টে পাঠাইবার মালিক সেসন্সজজ। জজ আবার মুঙ্গেরে থাকেন না। সদরে জজ সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া উত্তরটা আসা পর্য্যন্ত আসামী জয়েণ্টম্যাজিষ্টেট মিঃ টমাসকে ধৈর্য্যধারণ করিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিল। কিন্তু মিঃ টমাস তখন শোণিতলোলুপ হাউণ্ডের মত্ততা হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন, সাদেকের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না।

কাছে এক এফিডেভিট করিল, বেচারা বৃথা আশার প্রলোভনে বিতংসে কেশরীকে বাঁধিবার চেষ্টা করিল! সবজজ বাবু জয়েণ্ট হাকিম মিঃ টমাসকে অনুরোধ করিয়া লিখিলেন, অন্ততঃ জজের নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসা পর্য্যন্ত যেন তিনি বেত্রদণ্ড স্থগিত রাখেন। সাদেক একে মিঃ টমাসের আদেশে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক জজের কাছে মোসনের প্রার্থনায় টেলিগ্রাম করিয়াছে, তাহার উপর সব জজের কাছে—একটি মুন্সেফের রাজসংস্করণ, কৃষ্ণবর্ণ, নির্ব্বোধ দেওয়ানী হাকিমের নিকট এফিডেভিট করিয়াছে—সুতরাং তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি তখনই বেত্রদণ্ড পরিচালনার আদেশ প্রদান করিলেন। এই শ্রেণীর বিচারকগণ ন্যায়বিচারের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন কিম্বা কর্ত্তব্যজ্ঞানের কিরূপ সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, তাহা এই ঘটনা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নহে; অবশেষে মিঃ টমাস্ যাহা করিলেন তাহা কেবল কাপুরুষতা নহে, নীচতাপূর্ণ; এদেশের কোন ভদ্রলোক সেরূপ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হইতেন; কিন্তু টমাসের মত সিভিলিয়ানের নৃশংসাচারে কুণ্ঠা নাই। চাপরাসীর উপর বেত্রাঘাতের আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার সুবিচারের প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইল না, তিনি স্বয়ং বেত্রদণ্ড পরিচালন পরীক্ষা করিবার জন্য বিচারালয় পরিত্যাগ করিলেন, স্বয়ং তিনি চাপরাসীকে তাহার প্রাণপণ শক্তিতে বেত্রাঘাতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, এবং পাছে চাপরাসী অধিক বেত্রচালনায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও সেজন্য বেত্রের আঘাত কিছু মৃদু হয়, এই ভয়ে তিনি চাপরাসীকে মধ্যে মধ্যে কিছুকালের জন্য প্রহার স্থগিত রাখিতে আদেশ করিলেন। এই ভাবে বিশঘা বেত্রাঘাতের

বেত্রাঘাত দেখিয়া পৈশাচিক আনন্দে এই প্রেত-প্রকৃতি ম্যাজিষ্ট্রেটের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, কিন্তু অবশেষে তিনি দুঃখিত হই হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা গিয়াছে।

দুঃখিত কিজন্য হইলেন, তাহা লিখিতেও লজ্জা বোধ হয়। মনে হয় বিচার বিতরণের জন্য সিভিলসার্ভিস্ পাস এই সকল মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত, মূঢ়তা দ্বারা আপাদমস্তকমণ্ডিত, দর্পান্ধ যুবকগণকে কেন লক্ষ লক্ষ লোকের কর্ত্তৃত্বে স্থাপন করা হয়? যাহাদের সংযম নাই, ধৈর্য্য নাই, ন্যায়ান্যায় বিবেচনা নাই, তাহাদিগকে বিচারালয়ে বিচারের পদে স্থাপন করা অপেক্ষা একটা ভল্লুক বা ব্যাঘ্রকে আনিয়া তাহার হস্তে সেই দায়িত্ব প্রদান করিলে এই প্রকার বিচার কার্য্যের কি অধিক অঙ্গহানি হয়? লিখিতে সত্যই লজ্জা হয়, মিঃ টমাস্ চাপরাসীর বেত্রপরিচালনা শক্তি দেখিয়া খুসী হইতে পারিলেন না, বোধ হয় বেত্রের প্রত্যেক আঘাতে হতভাগ্য সাদেকের অঙ্গ হইতে দুই দুই আঙ্গুল পুরু চামরা উঠিয়া গেলে, ও বিশ ঘা বেত খাওয়ার পর বেচারীর মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ না হইলে, মিঃ টমাস্ চাপরাসীর বেত্রচালন নৈপুণ্য প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিতে পারিতেন। কিন্তু সাদকে যে অবস্থায় বেত্র পরিপাক করিল তাহাতে তিনি চাপরাসীকে ঘোর অনুপযুক্ত জ্ঞান করিলেন, তাঁহার বিচারে চাপরাসীর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইল!—এই পাঁচ টাকা অর্থদণ্ডের অর্থ চাপরাসী সপরিবারে একমাস যাহা খাইত, তাহাই বন্ধ করিয়া দেওয়া। কোন দেশের বিচারনীতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা, নীচতা ও পাশবিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি এই সকল সদ্যোজাত সিবিলিয়ানগুলিকে শাসন করিবার লোক থাকিত, উৎপীড়িতের ক্রন্দন শুনিবার কেহ থাকিত, তাহা হইলে মিঃ টমাসের মত বিচারকের সংখ্যা

কেহ কাহারও দরজার ছায়া মাড়াইলে অপরাধী হয়, কিন্তু আইন সঙ্গত উপায়ে যদি বিচারক কাহারও লঘু পাপে তাহার প্রাণনাশেরও আয়োজন করিলেন, তবে তিনি ক্ষমার্হ, অনেকস্থলে উৎকৃষ্টতর জেলায় এরূপ বিচারকের, পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাঁহাদের কুকীর্ত্তির উপর যবনিকা নিক্ষেপ করা হয়। তাহার ফল এই হয় যে, প্রজামণ্ডলীর যে বেদনা এক স্থানে সঞ্চিত ছিল, এই উপায়ে তাহা দেশ দেশান্তরে সঞ্চালিত হইয়া উৎপীড়িতের অশ্রুভার ও মর্ম্মজ্বালা বৃদ্ধি পায় মাত্র। এই রূপ দণ্ডে কোন উপকারেরই আশা করা যায় না। সিভিলিয়ানগণ পদ-স্খলিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে শাসন করিতে এত গররাজী কেন আমরা তাহা বুঝি না। গবর্ণমেণ্ট সিভিলিয়ানের সমষ্টি বলিয়াই কি এরূপ হয়? কিন্তু এ ভাবে কত দিন গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান থাকিবে? সিভিলিয়ান আইনে প্রজার মুখ বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের বেদনা ও অসন্তোষের উৎস কখন উৎপাটিত হইবার আশা নাই।

একালের অনেক সিভিলিয়ন এমন স্পর্দ্ধিত যে তাঁহারা সম্প্রদায়-বিশেষের মনোভাবকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। নিজের পদ-মর্য্যাদায় দেশের মহাসম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকেও অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় দেখিয়া থাকেন। ভারতের চতুর্দ্দিকেই তাহার দৃষ্টান্ত। পুরীর রাজা, হিন্দুরা যাঁহাকে 'চলান্তী বিষ্ণু' দেহধারী বিষ্ণু মনে করেন, সেই পুরীরাজের কি দুর্দ্দশা পুরীর অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট গ্যারেটের হস্তে ঘটিয়াছে, তাহা বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার বিদিত আছে। এমন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অন্তঃপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুচর দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিল, কিন্তু সে কি অপরাধে? তিনি যাহা হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যাহা হিন্দুর নিকট সর্ব্ববাদীসম্মত সেই কার্য্য সম্পাদনে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বাধা পাইয়া গবর্ণমেণ্টের

রাধের অভিযোগ, এবং তাহার কি কঠিন দণ্ড! পুরীর রাজগৌরব, দেবগৌরব আজ এক বালক সিভিলিয়নের সবুট পদাঘাতে পুরীর সমুদ্র সৈকতে প্রোথিত হইয়াছে। সমগ্র হিন্দু সমাজ দুঃখে, লজ্জায়, ক্রোধে এবং ক্ষোভে নির্ব্বাক। গবর্ণমেণ্ট একটা সুবিচার করিবেন আশা ছিল, অন্ততঃ ছোট লাট পুরীতে পদার্পন করায় অনেকের আশা হইয়াছিল তিনি রাজা ও প্রজা সর্ব্বসাধারণের অভিযোগে কর্ণপাত করিবেন। কর্ণপাত করিয়াছেন কি না জানিনা, কিন্তু এখন দেখিতেছি মিঃ গ্যারেট অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থানে বিহার প্রদেশের মজঃফরপুর জেলায় বদলী হইলেন। যাঁহারা আশা করিতেছিলেন, এই ঘটনার পর পুরীর মত হিন্দুর তীর্থস্থানে একজন অতি সুযোগ্য বহুদর্শী হিন্দু ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন; দেশে সেরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের যে একান্ত অভাব ছিল তাহাও নহে। কিন্তু দেখিলাম, মিঃ গ্যারেটের স্থানে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেলভিনি নিযুক্ত হইলেন! অল্পদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এই মহামহিম ম্যাজিষ্ট্রেটের যেরূপ স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পুরীবাসীগণের আশঙ্কা দূর হইবার বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা নাই। শুনা গিয়াছিল, এই মহাত্মার বিচারে অনুরাগ নাই, পুনর্ব্বিচার, অর্থাৎ আপীলেই তাঁহার অনুরাগ, কিন্তু আপীল শুনিবারও তাঁহার অবসর অল্প, উকীলগণকে তাঁহার কুঠিতে গিয়া দরবার করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিশেষতঃ প্রকাশ্য আদালতের বারান্দায় কেহ যাতায়াত করিলে ইনি পিনালকোড অশুদ্ধ হইল মনে করেন, চাপরাসী রাখিয়া অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়, অপদস্থ করিতেও ত্রুটী হয় না। যে দেশের রাজ-রাজেশ্বরগণের রাজসভা সর্ব্বসাধারণের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত, যে দেশের বিচারকগণ প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ মনে করিতেন, ন্যায়বিচার বিতরণ

পদবাচ্য ছিলেন, সেই দেশে টমাস্, গ্যারেট, ডেলভিনি প্রভৃতি শাসনকর্ত্তা ও বিচারকগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে! এবং ইঁহাদের দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে!

অবশ্য এজন্য আমাদের দেশের অপদার্থ, কাপুরুষ, অন্নলোলুপ গোলামের দলও কিয়দংশে দায়ী। যখন ইংলণ্ডে থাকে, যখন সিভিল সার্ব্বিস পাশ না করে, তখন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তা ও বিচারকগণ মনুষ্যের নানা সদ্গুণে ভূষিত থাকে। কিন্তু এ দেশে আসিয়া যে সকল কারণে ইহারা নষ্ট হয় তাহার প্রধান কারণ অধীনস্থ আমলা ও অন্যান্য অনুগ্রহাকাঙ্খী মনুষ্যপুঞ্জের তোষামোদ! সে প্রকার হীন তোষামোদে বিশেষ সংযতচেতা, কর্ত্তব্যপর, উদারহৃদয় মনুষ্যই অবিচলিত থাকিতে পারেন। বর্ত্তমান লেখক নিজের অভিজ্ঞতা হইতে অবগত আছেন, কোন একজন ইংরাজ হাকিমের হেড্ কেরাণী তাঁহার সাহেবের সঙ্গে কুঠিতে দেখা করিতে যাইবার সময় কুঠির বারান্দার নীচে জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতেন, এই অত্যধিক সম্মান প্রদর্শনের ফলেই যশোবন্ত গোপালদের পৃষ্ঠদেশে বেলীর মত সাহেবের জুতা স্থাপিত হয়। সেরেস্তাদার সেলামদানে সাহেবের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য দশটার সময় সাহেবের গাড়ী বারান্দায় আসিয়া তীর্থের কাকের মত ধরণা দিতেন। দেখাদেখি আফিসের সকলেই দশটায় আসিয়া গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াইতে লাগিল। সেলাম না দিলে সাহেব যদি চটেন! সাহেব দেখিলেন, এ মন্দ সম্মান নহে, একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অমুক আমলা সেলাম দিতে আসে নাই কেন? সাহেব কিন্তু পূর্ব্বে কখন একথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতী সম্পাদিকাকে সত্যকথাই লিখিয়াছিলেন, “শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম (ইউরোপে)

আমাদের চারিদিক হইতে শুনাইবার চেষ্টা হইতেছে "Pat তোর আর কোন আশা নাই, তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম"—কাজেই আমাদের আটশত টাকার ডেপুটি, দুই শত টাকার সেরেস্তদার ও সাত টাকার পেয়াদা সব সমান।

এই দুর্দ্দিনে কোন্ মহাপুরুষের, কোন্ পরিত্রাতার আবির্ভাব হইবে? কোন্ গুরু আমাদের কাণে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিবেন—"ভারতবাসি তুই গোলাম নস্, তুই জন্মাস্‌নি গোলাম, তুই থা ক্‌বিনা গোলাম।"

কলাশিক্ষা।

এ দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে কে না আনন্দিত হইবেন? বিদ্যায়াশ্চ ফলং জ্ঞানং। জ্ঞানের বলেই ত জর্ম্মানি জর্ম্মানি, আমেরিকা আমেরিকা, ইংলণ্ড ইংলণ্ড; এমন কি জাপান জাপান হইয়াছে। তবে ভারত জড়ভরত হইয়া রহিয়াছে কেন?

রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রবিৎ মনীষিগণ এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর দিয়াছেন। সে সকল উত্তর বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। প্রশ্নটির আর একটা দিক্ আছে, যাহাতে উহার উত্তর সহজ বোধ হয়। এই উত্তর সহজ, কাজেই সকলের মনেই উদিত হইয়াছে। সেই পুরাতন কথারই প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

ইহা সহজ কথা যে, মানুষ সমাজ মানুষের মত। মানুষের যেমন মস্তক হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সমাজরূপ মানুষেরও মস্তক

বুঝা যায়, ক্রিয়া দ্বারাও বুঝা যায়। সংস্থানের বিকার বা রূপান্তরে ক্রিয়াই আশ্রয়। এইরূপ কেহ বা সমাজের মস্তক, কেহ বা উদর, কেহ বা হস্ত, কেহ বা পদ, ইত্যাদি সমস্ত বর্ত্তমান। অর্থাৎ প্রাচীনদিগের মত বলিতে গেলে সমাজে কেহ বা ব্রাহ্মণ, কেহ বা ক্ষত্রিয়, কেহ বা বৈশ্য, কেহ বা শূদ্র।

উন্নত সমাজ যে এই প্রকারে নির্ম্মিত, সে বিষয়ে বিসম্বাদ নাই। কুলগত জাতি সমাজের হিতকর, কি অহিতকর, সে তর্কে এখন প্রয়োজন নাই। উহার ফল যাহাই হউক, এটুকু সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সমাজ-কলেবর বৃহৎ বা উন্নত হইলে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে, এবং গুণকর্ম্ম-বিভাগে ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ণের উৎপত্তিও হয়। তাই শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাকলাশ্রয়েনৈব তন্নাম্না জাতিরুচ্যতে।" বিভিন্ন বিদ্যা ও কলার আশ্রয়হেতু তাহাদের নামে জাতির নাম হইয়া থাকে।

আরও একটী সর্ব্ববিদিত সত্য এই যে, শিক্ষাদ্বারা মানুষকে উত্তম বা অধম করিতে পারা যায়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানবের তারতম্য চারুপাঠাধ্যায়ী বালকেরাও বুঝে। এমন কি, শিক্ষিত অশিক্ষিত; হস্তী, অশ্ব, কক্কুর, প্রভৃতি ইতর প্রাণীর প্রভেদ সকলেই প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অতএব এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। এ কথা বলাও বাহুল্য যে,

জীবামি শতবর্ষন্ত নন্দামি চ ধনেন বৈ।
ইতি বুদ্ধ্যা চিন্তয়েদ্ বৈ ধনং বিদ্যাদিকং সদা॥

সকলেই ইচ্ছা করেন, শতবর্ষ জীবিত থাকিব, এবং যাবজ্জীবন আনন্দে থাকিব। এবং সকলেই জানেন যে, এ নিমিত্ত সর্ব্বদা ধন ও বিদ্যাদির চিন্তা আবশ্যকে। ইহার সহিত আর একটু যোগ করিলে বক্তব্য সুগম হইবে। শতবর্ষ জীবনধারণ করে প্রাক্ষ

অন্নবিনা একদিন জীবনধারণ অসম্ভব। আর জীবনধারণই যদি অসম্ভব, তবে আনন্দলাভের আশা কোথায়?

তবে বুঝা গেল, দেশে এমন শিক্ষা চাই, যাহাদ্বারা প্রথমে জীবনধারণ সম্ভাব্য হয়; এবং জীবনধারণের চিন্তাদূর হইলে এমন শিক্ষা চাই যদ্বারা জীবনধারণ সুখময় হইতে পারে।

ইহা প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, প্রত্যেক সমাজসম্বন্ধেও তেমনই প্রয়োজ্য ব্যক্তিগত জীবন লইয়া সমাজের জীবন, এবং ব্যক্তিগত আনন্দ সমাজের আনন্দ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবিত থাকিলেই জীব জীবিত থাকে, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাস্থ্যে থাকিলেই জীব সুস্থ থাকে।

এ পর্য্যন্ত তিনটি সহজ কথার উল্লেখ করা গিয়াছে। (১) উন্নত সমাজ মাত্রেই জাতিবিভাগ আছে; (২) সমাজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ধন ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে; (৩) শিক্ষাদ্বারা ধন ও জ্ঞান অর্জ্জন করা যাইতে পারে।

লোকে বলে, এ দেশ দরিদ্র। কিন্তু দেশটা দরিদ্র বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দেশটা সাহারা মরুভূমি নহে, কিংবা তুষারাচ্ছন্ন সাইবিরিয়া নহে। দেশটা লবণসমুদ্রের তলেও নহে, কিংবা হিমালয়ের উচ্চশিখরেও স্থাপিত নহে। দেশে মানুষের অভাবও নাই, বরং অনেকে বলেন, সদ্ভাবই অধিক। দেশে শিক্ষাও ত দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইতেছে। তথাপি দেশের দারিদ্র্যদোষের মোচন হয় না কেন?

দেশের লোকেরা যদি দরিদ্র, তবে দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা করি না কেন? দারিদ্র্য অর্থে আয় অপেক্ষা ব্যয়াধিক্য। তবে দারিদ্র্যমোচনের দুইটি উপায় আছে। (১) আয়বৃদ্ধি, (২) ব্যয় হ্রাস। মনে করা গেল যেন, কোন ব্যক্তির ব্যয়হ্রাসের উপায় নাই। তখন তাহাকে আয় নিশ্চিত বাড়াইতে হইবে।

বহুমূল্যে বিক্রয় করা, (২) যাহাতে আয় হইতেছিল না, তাহাকে আয়ের পথে আনা। আয়ের পথে আনিবার অর্থ কি? উৎপাদন। উৎপাদন করিবার উপায় কি? সেই বিষয়ে শিক্ষা। বলা বাহুল্য, এরূপ শিক্ষা আছে। না থাকিলে বিলাতে কোন দ্রব্যই বৃথা নষ্ট হইতেছে না কেন? সে দেশে যদি আয় বাড়াইবার কৌশল থাকে, এ দেশেও সে কৌশল শিক্ষা করা যাইতে পারে।

তবে আর একটা কথা স্থির হইল। এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এমন শিক্ষা আবশ্যক হইয়াছে, যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে পারে। দেশে কোনও শিক্ষা নাই, বলিবার যো নাই। শিক্ষা বিলক্ষণ আছে; এত আছে যে, বর্ষে বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহুশিক্ষিত ব্যক্তি সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, এবং সম্মুখে একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে সংসারকে বিভীষিকাময় দেখিতেছেন। শুক্রাচার্য্যের মতানুসারে বলিতে গেলে, বাস্তবিক বিদ্বৎস্বপি চ দারিদ্র্যং ভাবনার ও দুঃখের কারণ বটে।

এ রকম অবস্থা কেন ঘটিয়াছে? একটা ভ্রমবশতঃ। সে ভ্রমটা এই যে, দেশের সকল ব্যক্তিকেই সমাজরূপ দেহের মস্তক মনে করা, কিংবা সমাজের সকলকেই ব্রাহ্মণ হইতে বলা। ফলে শিক্ষাগুণে দাঁড়াইয়াছে, দেশটা পণ্ডিতমূর্খানাং।

উপায় কি? শুক্রাচার্য্য বলেন,

> বিদ্যা কলানাং বৃদ্ধিঃস্যাৎ তথা কুর্য্যান্নৃপঃ সদা।
> সর্ব্ববিদ্যা কলাভ্যাসে শিক্ষয়েদ্ ভৃতিপোষিতাম্ ॥

যাহাতে বিদ্যা ও কলার বৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ভৃত্যদিগকে সকল বিদ্যা ও কলা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিদ্যাই বা কি, কলাই বা কি?

> যদ্‌যৎস্যাদ্ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকং।
> শক্তো মূকোঽপি যৎকর্ত্তুং কলাসংজ্ঞং তু তৎ

যে যে কর্ম্ম বাক্যের বিষয়, তাহাদের নাম বিদ্যা ; এবং যে যে কর্ম্ম মূক ব্যক্তিও করিতে পারে, তাহাদের নাম কলা।

বিদ্যা ও কলার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ পাওয়া গেল।* এখন বুঝা যাইবে, আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি, বা করিতেছি, তাহা বাচিক মাত্র। পূর্ব্বকালে এদেশের নীতিকারগণ বাচিক ও কায়িক, উভয়বিধ শিক্ষার প্রয়োজন প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অষ্টাদশ বিদ্যার প্রশংসা করিতেন বটে, কিন্তু চতুঃষষ্টি কলাভ্যাসের আবশ্যকতা ভুলিয়া যান নাই। আমরা কিন্তু একালে কেবল বিদ্যাভ্যাসই করিতেছি, এবং বিদ্যাভ্যাসের সাধনরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছি। ফলে দেশটা ব্রাহ্মণের দেশ হইতে চলিয়াছে। সমাজরূপ দেহের একাঙ্গের স্থূলতা হইতেছে, হস্তপদাদি অন্যান্য অঙ্গ অলস ও নির্জীব থাকিতেছে। কেবল ব্রাহ্মণে কোন সমাজ ঠিক চলে না।

বস্তুতঃ বিদ্যাভ্যাস করা তাঁহাদের উচিত, যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে চান, যাঁহারা মনে করিতে পারেন,

বিদ্যাধনং শ্রেষ্ঠতরং।

দানেন বর্দ্ধতে নিত্যং ন ভারায় ন নীয়তে।

কিন্তু এরূপ লোক কয়জন আছেন ? অধিকাংশই মনে করেন,

অস্তি যাবত্তু সধন স্তাবৎ সর্বৈস্তু সেব্যতে।

ফলতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষেও,

সংস্থতৌ ব্যবহারায় সারভূতং ধনংস্মৃতং।

---

* কলা অর্থে বাঙ্গলায় শিল্প শব্দের প্রায়ই প্রয়োগ দেখিতে পাই। শিল্প-প্রদর্শনী, শিল্পবিদ্যা, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি স্থলে শিল্পের পরিবর্ত্তে কলা শব্দ ব্যবহার করা শাস্ত্র-সঙ্গত। শুক্রনীতিতে শিল্পের এই লক্ষণ আছে,

প্রাসাদ প্রতিমারাম গৃহ বাপ্যাদি সৎকৃতিঃ।

কথিতা যত্র তচ্ছিল্প শাস্ত্র মুক্তং মহর্ষিভিঃ॥

সংসারে থাকিতে গেলে ধনকে সার জ্ঞান করা উচিত।

যখন তখন যেখানে সেখানে শুনিতে পাই, আমরা লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরি খুঁজিতে ব্যস্ত হই। কিন্তু বুঝিতে পারি না, বিদ্বানের পক্ষে ধনাগমের আর কি পথ আছে। বুঝিতে পারি না, কেমন করিয়া বিদ্বান্ কলাবান্ হইতে পারে। কলাবানের বিদ্বান্ হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু বিদ্বানের কলাবান্ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ কোন্ ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে চায়? কিন্তু কোন্ শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে না চায়?

কেন চায়? পরাণ সেকরা স্বর্ণকার, কলায় নিপুণ। ইহাতে তাহার বেশ উপার্জন আছে, কিছু বিষয় সম্পত্তিও হইয়াছে। তথাপি সে সেকরা! আমার বাড়ীতে আসিলে বসিবার যায়গা পায় না। কিন্তু তাহার পুত্র হুকলম ইংরাজি শিখিয়া কেরাণিগিরি করে। ফলে কিন্তু বৃদ্ধ পিতাকেই পুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে হয়। অথচ সেই পুত্র আসিলে বসিতে জায়গা পায়, পিতাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এরূপ স্থলে কোন্ পরাণ নিজের ছেলেকে ব্রাহ্মণত্বপদে উন্নীত হইতে দেখিতে না চাহিবে?

এইরূপ কারণে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে সকলেই "ভদ্রলোক" হয়, এবং যে "ভদ্রলোক" হয়, সে বরং ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া, লোকের দ্বারস্থ হয়, তথাপি অভদ্রলোকের কাজ করিয়া স্বাধীন হইতে চায় না। বাস্তবিক, দেশের দুর্গতি এই খানে। অল্প একটু ইংরাজী পড়িলেই ভদ্রলোক হইতে পারা যায়, নর্মালস্কুলে যথোচিত পাঠ পড়িলেও পণ্ডিতমাত্র, এবং কোন স্কুলে পাঠ না পড়িয়া কলা আশ্রয় করিলে ব্যবসাদার বা দোকানদারমাত্র।

এই জন্যই বিদ্বান্ অনেক, কলাবান্ অল্প লোক হইতে চায়। অথচ কলিকাতায় বি,এ বিদ্বান ২৫ টাকা বেতনে তৃপ্ত, কিন্তু যে সে কলাবান্

যাঁহারা মনে করেন, ইংরাজি স্কুল করিয়া দেশের দুর্গতি দূর করিবেন, তাঁহাদিগকে দুইটি বিষয় ভাবিতে বলি।—(১) ইংরাজি শিখাইয়া "ভদ্রলোকের" সংখ্যা আরও বাড়াইয়া ফল কি? (২) কেবল বিদ্বানে কোন সমাজ চলে কি?

কোন কোন পাঠক শুনিয়া হয়ত চমকিয়া উঠিবেন নূতন স্কুল স্থাপনের পরিবর্ত্তে, দেশের দুই পাঁচ শত ইংরাজি স্কুল উঠাইয়া দিলে দেশের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যদি সামর্থ্য ও উদ্যোগ থাকে, ইংরাজি ইস্কুলের পরিবর্ত্তে কলাভবন করুন, কলাভবন করিতে না পারেন, কারুকর্ম্মালয় করুন, তাহাও না পারেন, বাঙ্গালা বিদ্যালয় করুন। মনে রাখিবেন, দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় চিন্তা করা যাইতেছে। আপনি, আমি দশজন চাকরি করিলে, মোক্তারি বা ওকালতি করিলে, দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না, আপনার আমার হইতে পারে।

কেহ মনে করিবেন না, আমি প্রবুদ্ধ মনের সম্মান করি না, যথেষ্ট করি। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি না যে, ইংরাজি স্কুলে পড়িলেই মন প্রবুদ্ধ হইতে পারে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে, কি কারুকর্ম্মালয়ে, কি কলাভবনে তাহা হইতে পারে না। আমরা যখন বিদ্বানের সম্মান করি, তখন তাঁহার প্রবুদ্ধমনের, তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের সম্মান করি। কলাবানের বা কারুকের পক্ষে ব্রাহ্মণত্বলাভের পথে কোন বিঘ্ন দেখিতে পাই না।

তবে, যে দিকেই দেখি, সেই দিক দিয়াই দেখিতেছি, কলা আশ্রয় ব্যতীত গতি নাই। সমাজে কলাবান্ না থাকিলে, অন্য সমাজের কলাজাত দ্রব্যের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। কলাভ্যাস ব্যতীত ধনাগমের উপায় নাই। ধনাগম চিন্তা সকল চিন্তার প্রথমে।

এই সকল কথার একটিও নূতন নহে। সকলেই জানেন, সকলেই বলেন। ইহাও নূতন নহে যে, দেশের লোকে যাঁহারা এই বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, উত্তমরূপ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তাফল কার্য্যে পরিণত করিতে বিমুখ। তবে এইটুকু নূতন বা বিচিত্র বটে যে, তাঁহারাই কারুকর্ম্মাভ্যাসের নাম শুনিলে চারিদিকে বিভীষিকা দেখেন। এতদ্ বিষয়ে পরে বলা যাইতেছে।

আর একটু বিচিত্র এই যে, অনেকেই টেক্‌নিকাল স্কুল স্থাপনের কথা বলেন, কিন্তু সে স্কুলে কি শিখাইতে চান, তাহা বলিতে পারেন না। অন্ধকারে ভূতের ভয়ে রামনাম উচ্চারণে ভূতের ভয় যাইতে পারে, কিন্তু টেক্‌নিকাল নাম উচ্চারণের ফল অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। যিনি টেক্‌নিকাল স্কুলের কথা তুলিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে স্কুলে কি বিষয় কি ভাবে শিখাইতে চান? দেখিবেন, দশজনের মধ্যে একজন কদাচিৎ সদুত্তর দিতে পারেন। তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার কি চিন্তাশীলতার দোষ দিতেছি না। উপজীব্য বিনা চিন্তার নাম আকাশ-কুসুম কল্পনা; অর্থশাস্ত্রের সহিত তাহার আকাশ পাতাল প্রভেদ। যে নিজে মিস্ত্রী নয়, সে অপরকে মিস্ত্রীগিরি কি শিখাইবে? বাস্তবিক প্রশ্নটি আদৌ সহজ নহে। তাই, আমরা জানি না, ঠিক কি রকম স্কুল হইলে আমাদের অভাব দূর হইতে পারে। কার্য্যতঃ দেখিতেছি, প্রশ্নটির দ্বিবিধ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। (১) Industrial school, (২) Surveying or Engineering school। কোন কোন জেলার প্রধান নগরে প্রথমোক্ত স্কুল খোলা হইয়াছে। কোন স্কুলে ছুতারের কাজ, কোথাও বা কামারের কাজ শিখান হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন ছুতার ও কামারের অভাবে দেশ উদ্ধার হইতে পারে নাই, যেন

উদ্দেশ্য সাধিত হয়! যাহা হউক, কাগজপত্রে দেখিতে পাই, কোন Industial স্কুলে ছাত্রসংখ্যা অধিক নহে।

কেনই বা অধিক হইবে, তাহা বুঝা যায় না। যে ছেলে স্কুলে যাইতে পারে তাহার জন্য ইংরাজী স্কুল আছে। তেমন 'ভদ্রলোকের' স্কুল থাকিতে সে কেন Industrial স্কুলে যাইবে? যে ছেলে স্কুলে যাইতে পারে না, সে ছেলে তাহার ঘরের স্কুলেই পাঠ শেষ করে। ছুতারের ঘরই যে স্কুল! কামারের ছেলে কিছু না শিখিলেও কামার।

বস্তুতঃ এইরূপ Industrial স্কুল প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক গ্রামেই রহিয়াছে। এবং আছে বলিয়াই দেশে ছুতার কামারের অভাব হয় নাই। সরকারি বিবরণীতে উহাদের নাম উঠে না, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড উহাদের তত্ত্ব রাখেন না। ইহা একরকম শুভ লক্ষণ বটে। নচেৎ হয়ত উহারা 'ভদ্রলোকের' স্কুলে পরিণত হইত। সে যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত কোন মিউনিসিপালিটি কিংবা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কলাজীবীকে উৎসাহ দান বা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কেহ কেহ প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, কিন্তু কেহ বলিতে পারেন, প্রদর্শণী ঘুরিয়া কোন কারু নূতন কিছু শিক্ষা করিয়াছে?

এই সে দিন কলিকাতার পত্রিকা সম্পাদকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, কলের তাঁত (fly-shuttle loom) দ্বারা তাঁতির অনেক উপকার হইতে পারে। অনেকেই ভাবিয়াছেন, কলের তাঁত যেন একটা নূতন উদ্ভাবনা। দেশের তাঁতিরা জানিত না, কখনও দেখে নাই। অনেক স্থানের তাঁতিরা দেখে নাই, কারণ কেহ দেখায় নাই। নতুবা জিনিসটা এ দেশের পক্ষে নূতন নহে; অন্ততঃ হুগলি জেলায় নূতন নহে। যে তাঁতি টাকা পনের খরচ করিতে পারে, সে পুরাতন তাঁত ছাড়িয়া কলের তাঁত করে। কিন্তু কেহ বলিতে পারেন, হুগলি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড

অথচ সেই তাঁতে বুনিবার কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে একটা স্কুল হইয়াছে। অবশ্য কিছুই না করা অপেক্ষা স্কুল করা ভাল।

দেশের অবস্থা কি, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তথাপি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। আমাদের কি প্রকার শিক্ষা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। বিশ্ববিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার কথা নহে, বরং তাহা প্রসারিত হউক। আমার বক্তব্য, দেশের সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য নয়; অবস্থাবৈগুণ্যে সকলে প্রবেশ করিতে পারে না; পারিলেও সমাজের পক্ষে তাহা হিতকর নহে। বিশ্ববিদ্যালয় ত আছেই; তাহার সহিত বিশ্বকলালয় থাকা আবশ্যক।

বিশ্বকলালয় নাই বটে, কিন্তু দুই চারিটি কলা শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয় লইয়াছেন। যথা, ইঞ্জিনিয়ারিং বা শিল্প এবং তদন্তর্গত কয়েকটি কলা। কিন্তু এই খানেই কলাশিক্ষার আরম্ভ এবং কলাশিক্ষার শেষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্বরূপ বহু ইংরাজী স্কুল আছে, কিন্তু শিল্প শিক্ষার শাখা স্বরূপ কি আছে? সার্ভে স্কুল, আর্ট স্কুল।

এইরূপ স্কুল আছে বটে, কিন্তু তৎসমুদয় দুই একটি কলা লইয়া প্রতিষ্ঠিত। অসংখ্য কলাশিক্ষার সাধন নহে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবিষ্ট ছাত্রের বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞান হয়, এবং ছাত্র ইচ্ছা করিলে সেই জ্ঞান প্রসারিত করিতে পারে; তেমনই বিশ্বকলালয় চাই, যাহাতে ছাত্র প্রবিষ্ট হইলে কলা বিষয়ে তাহার জ্ঞান হইবে, এবং ইচ্ছা করিলে সেই জ্ঞান কার্য্যে প্রকাশ করিতে পারিবে। কোন কোন পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন, কিন্তু ইহা সত্য যে, উদ্ভাবনা শক্তি বিকাশের নিমিত্ত স্কুল হইতে পারে, এবং সে প্রকার স্কুল নাই বলিয়াই এদেশে উদ্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। জর্মানি যে এত ভূরি ভূরি তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, তাহার কারণ অপর কিছুই নহে; এক কারণ, সেখানে তত্ত্ব আবিষ্কারের পথ খোলা হইয়াছে। আমেরিকা

যে এত ভূরি ভূরি কল ও বিলাস-সাধন উদ্ভাবন করিতেছে, তাহার কারণ সেখানে উদ্ভাবন করিবার পথ খোলা হইয়াছে। মৌলিকতা পদার্থটা দুর্লভ বটে, কিন্তু যে সব ব্যাপারে আমরা মৌলিকতা দেখিয়া বিস্মিত হই, তাহার নিরেনব্বইটা শিক্ষার ফল। নিউটন বা দারবিন কদাচিৎ জন্মে, কিন্তু এ দেশ চেষ্টা করিলে এডিসন বা রণ্টেন্ জন্মাইতে না পারে, এমন নয়। বিদেশীয় লোকে আমাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলে যে, অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইলেও ফলে কিছুই হয় নাই, কিন্তু ভাবিয়া দেখেনা যে শিক্ষা দ্বারা কি ফল হইতে পারে। যদি বিদেশীদের সহিত আমাদের শরীরগত, মস্তিষ্কগত, কোন প্রভেদ দেখা যাইত, তাহা হইলে বলিতাম বিধাতা আমাদিগকে নিগ্রো করিয়াছেন, উপায় নাই। এই উত্তরে হয়ত প্রাচীন নীতিকার কামন্দকও সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি বলিয়াছেন,

ন কিঞ্চিৎ ক্বচিদস্তীহ বস্তুসাধ্যং বিপশ্চিতাম্।
অয়োঽভেদ্যমুপায়েন দ্রবতামুপনীয়তে॥

এই লোকে কোন দেশে বা কোন কালে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা পণ্ডিতগণের অসাধ্য। লৌহাদি ধাতু অভেদ্য হইলেও উপায় দ্বারা দ্রবীভূত হয়।

দেশে কলাশিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে, তাহা দেখা আবশ্যক। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে কারুকর্ম্মালয় আছে। ইহাদেরই প্রসাদে এখনও বহু কলাজাত সামগ্রীর অভাব হয় নাই। ইহাদের প্রত্যেকটাকেই টেক্‌নিকাল স্কুল বলা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় স্কুল নাম না থাকাতে তৎসমুদয়ের কোন উল্লেখ নাই ; এই সকল স্কুলের উন্নতি করিতে পারিলে দেশের অনেক অভাব দূর হইতে পারে। এতদ্‌বিষয়ে সংক্ষেপে বলা চলিবে না, কাজেই সম্প্রতি ক্ষান্ত হওয়া গেল।

কিন্তু যে কোন কলাশিক্ষা করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন আছে। বুদ্ধি মার্জ্জিত না করিলে, অন্ততঃ লিখিতে পড়িতে না জানিলে কলাশিক্ষার সুবিধা হয় না, এবং কিছু শিখিলেও সেটুকুতে উন্নতি করিতে পারা যায় না। অন্যের লব্ধ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে গেলেই কিছু না কিছু লেখাপড়া আবশ্যক। এই হিসাবে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি কলাশিক্ষারও সাধন বটে। এই প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিয়াছি, দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আমার কোন বন্ধু এই উক্তিতে ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, সরকারি রিপোর্টেই প্রকাশ যে, দিন দিন বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইতেছে। রিপোর্ট অনুসারে সম্প্রতি দুই এক বৎসরের মধ্যে হ্রাস হওয়ার কথাটা সত্য। কিন্তু মোটের উপর বৃদ্ধি বলা অসঙ্গত নহে। সুখের বিষয়, এদিকে কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, এবং কালক্রমে এমন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে যাহাতে বিদ্যালয়ের বা ছাত্রের সংখ্যাগণনায় কল্পনা মিশিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে যে প্রণালীতে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত, নূতন প্রণালীতে তাহার আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে। প্রথম পরিবর্ত্তনের সময় দুই চারি বৎসর তেমন ফল না হইতেও পারে। কিন্তু পদ্ধতিটি যে সুবিবেচিত ও সময়োপযোগী হইয়াছে, চিন্তা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, ঐ পদ্ধতির অন্তর্গত manual training বা কর-শিক্ষার বিরুদ্ধে দেশময় ঘোর আর্ত্তনাদ শুনা গিয়াছিল। ফলে দাঁড়াইয়াছে, উহা এক্ষণে ছাত্রের ইচ্ছাধীন হইয়াছে। অর্থাৎ কোন ছাত্রই শিখিবে না। ভাবিয়া দেখুন, আমরা যাহা আকাঙ্খা করিতেছিলাম, তাহার সূত্রপাত হইবা মাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কেমন নিশ্চিন্ত হইয়াছি!

বলিতে কি, এই প্রকার কর-শিক্ষার প্রচলনের নিমিত্ত সকলের

আসিলাম, তাহার শেষই এই খানে। টেক্‌নিকাল স্কুলের আদি সূত্র *ম্যানুয়েল ট্রেনিং*। রেখা বা চিত্রাঙ্কন উহার প্রধান অঙ্গ, যে অঙ্গের প্রয়োজন বঙ্গবিদ্যালয় ত দূরের কথা, ইংরাজি স্কুলের শিক্ষকেরাও কদাচিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে দুইই আছে; তদ্ব্যতীত টেক্‌নিকাল স্কুলের অপরাপর অঙ্গ, যাবতীয় বিজ্ঞানশাখার যাহা মূল, তাহাও আছে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, পদ্ধতিটি সময়োপযোগী হইয়াছে। যেহেতু এতদ্দ্বারা এ দেশের শিক্ষার বাচিক অংশের পরিবর্ত্তে কায়িক অংশের প্রাধান্য ঘটিতে পারিবে। বিদ্যার সহিত কলার যোগ,—ইহাই ত আবশ্যক।*

বোধ করি, টেক্‌নিকাল স্কুলের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কলাভবন। উহাতে শিক্ষার বিষয়, অর্থশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি ম্যানুয়েল ট্রেনিং বা কর শিক্ষা। ছুতার কামার ডোম প্রভৃতির যাবতীয় বার্ত্তার মূল অভ্যাস করানই কারুকর্ম্ম শিক্ষালয়ের এক উদ্দেশ্য। উহাতে ছুতার কামার তৈয়ারি হয় না, কিন্তু ছুতার, কামার গড়িবার ভিত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ যাবতীয় অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরে ছাত্রগণ স্ব স্ব ইচ্ছা, সামর্থ্য, সুযোগ অনুসারে যে কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে। এদেশে যদি কোন এক প্রকার স্কুল স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সম্প্রতি ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুল। ইহার পর বিশেষ বিশেষ বার্ত্তা শিখাইবার নিমিত্ত কলাভবন স্থাপিত হইতে পারে। ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুলে বালকের 'ভদ্রলোক' হইবার রোগ জন্মিতে পারে না। এদেশের পক্ষে উহা পরমলাভ বলিতে হইবে।

---

* উপরে ইংরাজি ও বাঙ্গালা স্কুলের প্রভেদ করা হয় নাই। কারণ নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে উভয়বিধ স্কুলের প্রথম শিক্ষক একই। ইহা ঠিকই হইয়াছে। মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষায় শিশুদিগকে কোন্ বিষয় শিখান যাইতে পারে? বিদেশীয় ভাষায় কোন বিষয় যুবা ও বয়স্কেরা শিখিতে পারে, কিন্তু শিশুদিগের নিকট

প্রচলিত যে সকল Industrial school আছে, তাহাতে কলাজীবীর পুত্রেরা কদাচিৎ শিক্ষা পাইতে যায়; অন্য জাতির পুত্রেরা শিখিতে যায় বটে, কিন্তু শেষে সে শিক্ষার ফল কিছুই দেখায় না—Industrial স্কুলের এই সকল দোষ ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুলে নিবারিত হইতে পারে।*

দেশে কি প্রকার শিক্ষা আবশ্যক হইয়াছে, এবং সে শিক্ষা কোথায় আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহা বলা গেল। দেখা গেল, যে ভাবে যে সদিচ্ছায় গভর্ম্মেণ্ট নূতন শিক্ষাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, দেশের লোকে শিক্ষক, গ্রন্থকার, পরিচালক, সমালোচক—সেই ভাবে সেই ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করিলে সুফলের আশা করা যাইতে পারে। উহা কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুশিক্ষা মাত্র। উক্ত প্রাথমিক শিক্ষার পর, কিংবা শেষ পরীক্ষার পূর্ব্বেই যাহাতে ছাত্র ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত বড় বড় নগরে ঐরূপ স্কুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষার ভার, ডিষ্ট্রিক্‌ট বোর্ডের হাতে। ম্যানুয়েল ট্রেনিং দিবার ভারও তাঁহাদের গ্রহণ করা উচিত। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ যে ডিষ্ট্রিক্‌ট বোর্ড পারেন তাঁহারা কোন না কোন রূপে ঐ প্রকার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইতেছেন। তবে, দেশকালপাত্র সবিশেষ বিচার করিয়া, শিক্ষা-বিজ্ঞান অভ্যাস করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিয়া ঐরূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে সুফলের আশা দুরাশা হইবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

---

* যাঁহারা Manual Training জিনিসটা কি, জানিতে চান, তাঁহাদিগকে Manual Tarining in Education, (Contemporary Science Series)

ইতালীর নবজীবন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের এই বিপ্লব বৃথা যায় নাই। ইতালীবাসিরা ইহাকে প্রশংসা করিয়া সগর্ব্বে বলিত—"জুলাইয়ের মহা-যশস্কর সময়।" ইহার ফল ম্যাটজিনির জন্মভূমিতে ফলিয়াছিল। কার্বোনারী সম্প্রদায়ের উত্তেজনায় মোডিনা, বলোনা, ও পোপের রাজ্যে ক্রমাগত যুগপৎ রাজ্যোপপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। নূতন পোপ ষোড়শ গ্রীগরী রাজ্যোপপ্লবের ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যেই পোপ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এবং যখন বিদ্রোহীদল তাঁহাকে তাঁহার দেবত্র, সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার ভয় দেখাইল তখন তিনি অষ্ট্রীয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মেটারনীচ ত ইহাই চান্, তিনি তৎক্ষণাৎ ইতালীতে একদল অষ্ট্রীয়বাহিনী প্রেরণ করিলেন। পোপ নিরাপদ হইলেন। দেবত্র সম্পত্তি তাঁহার পুনরধিকৃত হইল এবং তিনি শৃঙ্খলার সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয়ার মধ্যস্থতায় ফরাশী গবর্ণমেণ্ট ঈর্ষা-পরবশ হইয়া একদল ফরাশী সেনা ইতালীতে পাঠাইলেন এবং আলকোনা অধিকার করিলেন। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল কয়েক বৎসর ধরিয়া ইতালীতে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলে নাই। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই চার্লস এলবার্ট সার্দ্দিনীয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি যৌবনে কার্বোনারী দলের সঙ্গে কিছুদিন মিশিয়া ছিলেন। তখন ম্যাটসিনি, নির্ব্বাসিত হইয়া ফ্রান্সের মার্সেল্স নগরে বাস করিতে ছিলেন। তিনি যেমন শুনিলেন যে চার্লস এলবার্ট রাজা হইয়াছেন, অমনি তাঁহাকে একখানি পত্র পাঠাইলেন। সেই প্রসিদ্ধ পত্রে তিনি এই

না। তাহারা এখন মানবসমাজের ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব ও অধিকার চায়। এই সকলে বহুকাল হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল। তাহারা চায় ব্যবস্থা ও স্বাধীনতা, তাহারা চায় একতা ও স্বাতন্ত্র্য। তাহারা এবং তাহাদের রাজ্য খণ্ডকৃত, বিশ্লিষ্ট ও অত্যাচারিত; তাহাদের দেশ নাই, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহাদিগকে বিদেশীরা *Helot nation* (দাসজাতি) বলিয়া ঘৃণা করে ও কলঙ্ক আরোপ করে। স্বাধীন দেশের লোকে, স্বাধীনচেতা দর্শকবৃন্দ এদেশে আসিয়া এদেশকে বিচেতন, গতপ্রাণ জাতির দেশ বলিয়া আখ্যা প্রদান করে। তাহারা দাসত্বপরিপূর্ণ পেয়ালা নিশেঃষে সীটে শুদ্ধ পান করিয়াছে, কিন্তু তাহারা "আর সে পেয়ালা ভরিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা ও শপথ করিয়াছে। হে রাজন্; তুমি কেবল পীডমণ্টের জন্য ভাবিও না সমস্ত ইতালীর জন্য ভাবিও। সমস্ত ইতালী উৎসুকচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। হে রাজন্, কেবল একটী বার বল "ইতালী আমার।" এই বাক্য দান কর। সমস্ত ইতালীজাতির হইয়া তাহাদের নায়ক ও চালক হও এবং তোমার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া তাহাতে লেখ, "একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য"। স্বাধীন-চিন্তার পক্ষপাতী হইয়া তাহা রাজ্যময় ঘোষণা কর। তুমি তোমার প্রজার লৌকিক স্বত্ব-রক্ষক ও প্রকাশক এবং সমস্ত ইতালীর পুনর্জন্মকর্ত্তা বলিয়া নিজেকে ঘোষণা কর। অসভ্য বর্বর জাতির হাত হইতে তাহাকে মুক্ত কর। ভবিষ্যৎ গঠন কর এবং নূতন শতাব্দীর প্রবর্ত্তক হও। তোমার দিন হইতে তুমি শক প্রচলিত কর। জাতীয় ইচ্ছা ও রুচির সহিত তোমার রুচি ও ইচ্ছা একত্র কর এবং অপরিবর্ত্তিতভাবে তাহা রক্ষণে যত্নশীল হও। উদ্দেশ্য দৃঢ় করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিলেই তোমাকে বিজয়লক্ষ্মী আশ্রয়

হইব। আমরা আমাদের জীবন তোমাকে প্রদান করিলাম এবং আমরা ইতালীর অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকলকে তোমার বৈজয়ন্তীর তলগত করিয়া দিব। আমরা আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দসমক্ষে একতার হিতকারী শুভফল বর্ণনা করিব, বুঝাইয়া দিব। দেশ হিতৈষণার জন্য আমরা লোকদিগকে উত্তেজিত ও প্রোৎসাহিত করিব। আমরা নিজের দুঃখ প্রচার করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিব। হে মহারাজ আমাদিগকে কেবল একটী বার একত্র কর, দেখিবে আমরা জয়ী হইয়াছি।"

এরূপ অনুরাগপূর্ণ তেজস্বীপত্রেও রাজা কর্ণপাত করিলেন না। তিনি করিলেন কি? তিনি এক হুকুম প্রচার করিলেন যে, যদি ম্যাটজিনি সীমান্ত অতিক্রমকালে ইতালীতে পদার্পণ করেন তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ধৃত ও বন্দী হইবেন। রাজা ম্যাটসিনির কথা শুনিলেন না বটে, কিন্তু প্রজারা শুনিল, এবং দলে দলে, ম্যাটজিনির নব-প্রতিষ্ঠিত দলে মিশিতে লাগিল। এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভার নাম "নব্য ইতালী"। সাভোনা-দুর্গে বন্দী হইবার পর হইতেই ম্যাটজিনি ভাবিতে ছিলেন তিনি কোন্ উপায়ে একটী গুপ্ত-সভা প্রতিষ্ঠা করিবেন যাহা কার্বোনারী সম্প্রদায়ের স্থান অধিকার করিতে পারে। তিনি কার্বোনারীদিগের কার্য্যের পদ্ধতি পছন্দ করিতেন না এবং তাহাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তাহাদের ধর্ম্ম একেবারে নাস্তিগর্ভ। তাহারা ইতালীর বর্ত্তমান রাজ্য-শাসন প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ও দৃঢ়সংকল্পিত শত্রু, সেই শাসনপ্রণালী উৎসন্ন ও বিধ্বস্ত করিতে তাহারা কৃতসংকল্প, কিন্তু তাহার পর আর কি করিবে তাহা তাহারা জানিত না। এক কথায় তাহাদের কোন সংস্থাপিকা বুদ্ধি ছিল না। এই সকল অভাব দূর করিবার মানসে ম্যাটজিনি "নব্যইতালী" দল সৃষ্টি করেন। কার্বোনারী সম্প্রদায়ের অবশ্যম্ভাবী পতন হইল। ম্যাটজিনির

বিদ্বান ও ক্ষমতাশালী লোকদিগকে দলভুক্ত করিত। তিনি বলিতেন "রাজ্যবিপ্লব কেবলমাত্র সাধারণ প্রজাদিগের দ্বারা উত্থাপিত হইবে এবং কেবল তাহারাই ইহা সমর্থন করিবে। এই এক কথায় আমাদের সমস্ত মত ও তত্ত্ব প্রকাশ। ইহাই আমাদের বিজ্ঞান, ধর্ম্ম এবং আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণের অনুরাগ। কার্ব্বোনারী সম্প্রদায় কেবল মাত্র অভিজাত ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ না, তাহারা একযোগে এবং যুগপৎ রাজ্যবিপ্লব ঘটাইতে পারিত না। একযোগ ও যৌগপত্য এই দুইটীতে সিদ্ধকামতাই রাজ্যবিপ্লবের মূলমন্ত্র।" তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল না। কার্য্যের পারিপাট্য ছিলনা, দৃঢ়তা ছিল না এবং কোন উচ্চ আদর্শ ছিল না। সেইজন্য ম্যাটজিনির নূতন দলের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছিল স্বার্থ-প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং ইতালীয়গণের প্রতীতি জন্মান যে "বিজয় লাভ করিতে হইলে একমাত্র স্বার্থত্যাগই তাহার উপায়—নিরন্তর ও অবিরাম স্বার্থত্যাগ।" "সাধারণ লোক শিক্ষিত হইলে স্বার্থত্যাগ আরম্ভ করিবে। স্বার্থত্যাগ প্রথমে শিক্ষায় আরম্ভ হয়। ইতালী ফ্রান্সের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছিল, ইতালী উচ্চ তত্ত্ব গ্রহণে উদাসীন। তাহাদিগের তাৎকালিক আসন্ন ক্লেশে ব্যাকুলিত হইয়া তাহারা যে কোন রকম সাহায্য, যে কোন রকম রাজা বা যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের আশুক্লেশ নিবারণ করিবে তাহাকে গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছে; কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সময়ের মহা সমস্যা ধর্ম্মাত্মক।" এইগুলি ম্যাট্‌জিনির উক্তি। উপরোক্ত কথাগুলি হইতে ম্যাটজিনির দোষগুণ অতি স্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রচণ্ড ঔৎসুক্য, ব্যগ্রতা, তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস, তাঁহার উচ্চ আদর্শ এই কথাগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অন্য উপায়ে আদর্শ প্রাপ্ত হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ সেই উপায় সকলের বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইতেন। তিনি নিম্নলিখিত প্রকারে "নব্য ইতালীর" নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন,—

"নব্যইতালী" সমাজ।

যাহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং যে সকল ইতালীয়গণের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ইতালীর ভবিতব্যে এক-জাতীয়তা আছে এই নব্য-ইতালী সমাজ উক্ত প্রকারের ইতালীয়-গণের একটী সমাজ। যে সমস্ত ইতালীয়গণ ইহাতে যোগ দেয় তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে তাহারা তাহাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তাহাদের জীবন, ধন, চিন্তা এবং কর্ম্ম, সমস্তই উৎসর্গ করিবে। ইতালীর মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করা এবং ইতালীকে স্বাধীনতা ও সাম্যের আবাসস্থল করা তাহাদের মহৎ উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় শিক্ষা ও রাজ্যোপপ্লবের যুগপৎ সংঘটন। ঘৃণ্য অষ্ট্রীয়ান্‌দিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করা এইটীই সর্ব্ব প্রথম আবশ্যক। এবং যখন নিষ্ঠুর ও মারাত্মক যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন রূপে এটী সম্ভব নয় তখন যত শীঘ্র যুদ্ধ বাধে ততই শ্রেয়ঃ। এইরূপ যুদ্ধ ইতালীয়গণ তাহাদের মাতৃভূমির জন্য আরম্ভ করিবে ও চালাইবে। বিদেশীয় রাজন্যবর্গের বা কূটসামনীতির উভর নির্ভর করিলে চলিবে না। জাতীয় একতা ব্যতীত স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা বা ভ্রাতৃভাব দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভ্রাতৃভাব ও সৌহার্দ্দ্য ইতালীকে পৃথিবীতে ইটালীর ধর্ম্মোদ্দেশ্য প্রচারে নিযুক্ত করিবে।"

"নব্য ইতালী" সুতরাং অদ্বৈতবাদী। ম্যাটজিনি সদাই তাঁহার অনুচরবর্গকে বলিতেন "ইতালী,—সমস্ত ইতালীর নাম বিনা উচ্চারণে কখন সমুত্থান করিও না।" ম্যাটজিনি নিজে প্রজাতন্ত্রে দারুণ বিশ্বাসী

প্রজাতন্ত্রপ্রণালী শিক্ষা কিম্বা সেই মতাবলম্বী করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ম্যাটজিনির প্রজাতন্ত্রপন্থা বাস্তবিক অতি উদার রকমের ছিল। তাঁহার কৃত নিয়মাবলীতে তাঁহার মত দেখা যায়। তিনি বলিতেন সার্ব্ব-লৌকিক অনুমোদনে যে রাজ্য শাসন প্রথা অনুষ্ঠিত হইবে তাহার কাছে আমরা মস্তক অবনত করিব, কারণ জাতীয় ঐক্যমতের কাছে ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এইখানে কেবল সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, যদি কেহ বিশদরূপে জানিতে চান তবে তাঁহারা নব্য-ইতালী সমাজের নিয়মাবলীর পুস্তক পড়িতে পারেন।

তাঁহার এই শিক্ষা-প্রসারের ফল অবিলম্বে প্রচুররূপে ফলিয়াছিল। অনুদাহরণীয় বেগে ভ্রাতৃভাব ছাত্র হইতে ছাত্রান্তরে, যুবক হইতে যুবকান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। যে সমস্ত লোক ইতালীর মধ্যে থাকিয়া নব্য-ইতালী দলের কাগজ গুলি চালান করিত, তাহারাই শেষে এত নাম পাঠাইতে ও এত লোকের আসক্তির পরিচয় দিতে লাগিল যে ম্যাটজিনির সহিত যে ক্ষুদ্র দলটী নির্ব্বাসিত ভাবে তাঁহার পরিশ্রমের ও সংকটের ভাগ লইয়াছিল, তাঁহারা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই নূতন নব্যইতালী সমাজ অতি শীঘ্র ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাতিশয় প্রবল বলিয়া পরিগণিত হইল। ম্যাটজিনি বলিতেন, "ইহা ধর্ম্মের জয়; একদল মুষ্টিমেয় অজ্ঞাতনামা, অজ্ঞাতকুলশীল ও দরিদ্র যুবক এত অল্প সময়ের মধ্যে সাতটী রাজ্যের ত্রাসজনক বাধা বিপত্তি পীড়ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়ছে। সভার শীর্ষদেশে তাহারা যে ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছে তাহা সত্যের বৈজয়ন্তী।" "ত্রাস" ও "বাধা" কথাটী নিরর্থক ব্যবহার হয় নাই, কারণ ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ অগষ্ট

কিন্তু তিনি সম্বৎসরকাল ফরাসী পুলিসের চক্ষে ধূলি প্রদান পূর্ব্বক মার্সেলসেই বসিয়া আপন কার্য্য অব্যাহত ভাবে চালাইতে লাগিলেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অঃ তিনি সুইজারলণ্ডে গিয়াছিলেন। সুইজারলণ্ড হইতে তিনি কুক্ষণে সাভয়ের নিষ্ফল অভিযানে যোগ দেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ অঃ সুইস গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে আরো বেশী দিন রাজ্যে রাখিতে অস্বীকার করিলে, তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ তিনি ইংলণ্ডে বাস করেন। তিনি নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন যে "ইংলণ্ড আমার কাছে আমার প্রায় স্বদেশপ্রতিম হইয়াছে এবং এখানে আমি আমার দুর্ভাগ্য ও দুঃখময় ক্লিষ্ট নির্ধন জীবনে নিত্য সান্ত্বনা, স্নেহ ও সহানুভূতি পাই।" ইংলণ্ড হইতে তিনি দারুণ ঘনীভূত দৈন্যের দশায়ও সমান তেজে অপ্রতিহত প্রভাবে নিজ প্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্য্যাবলী পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদিও নির্ব্বাসিত হইয়াও তাঁহারপ্রভাব প্রবল ছিল, তথাপি তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহার মত একচিত্তে গ্রহণ করে নাই।

ম্যাটজিনির সম্প্রদায় ব্যতীত ইতালীতে আর দুইটী প্রবল দল ছিল। তাহাদের মধ্যে একদল ম্যাটজিনির ন্যায় ইতালীর জাতীয় একতা সাধনে লালায়িত, কিন্তু অন্য উপায়ে, ম্যাট্জিনির প্রদর্শিত পথে নয়। ইহাদের বিষয় পরে সবিস্তারে আলোচিত হইবে। এই দলের লোকেরাই পীডমণ্টের উপর ইতালীর স্বাধীনতার সমস্ত আশা ও নির্ভর রাখিয়াছিল এবং পীডমণ্টকে ইতালীর দৈবনির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতাকারক রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিল। আর এক প্রবল দলের নাম নিয়ো-গুয়েলফ্‌স্‌। এই দলের লোকেরা পোপকে জাতীয় রাজ্যবিপ্লবের নেতা করিয়া ইতালীকে স্বাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই সময় ইহাদের দলপতি জিওবার্টী। সেই সময়ের অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছিল যে জিওবার্টীর দল মনে করিল বুঝি

ষোড়শ গ্রীগরী স্বর্গে যান, পাওনিয়ো তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি প্রজাবর্গের সহিত পূর্ব্ব বিবাদের রফা করিয়া কতকগুলি সংস্কার প্রচালন করিলেন, আপনার ধর্ম্মাধ্যক্ষতার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। নীয়ো-গুয়েলফ্‌স্‌—জীওবার্টীর দল একেবারে আনন্দে লাফাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, এবং মনে করিল বুঝি সহস্র বৎসরের অন্ধকার অপসারিত হইল, তাহাদের সুখসূর্য্য উদয় হইল, এবং নবনিযুক্ত ক্ষোরা পোপকে তাহারা ইতালীর স্বাধীনতাপ্রদ মোক্ষতোদ ও রক্ষক বলিয়া তাঁহার জয়গান ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। এই সময়কার ঘটনা সকল বর্ণনা করিয়া একজন সমালোচক বলিয়াছেন, এরূপ কৃত্রিম অবস্থা ও দুস্তর সংকটের এরূপ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সংমিশ্রন ইতিহাসে কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ম্যাটজিনির পক্ষে সব সমান, যেমন রাজা তেমনি পোপ। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই। যেমন শুনিলেন যে নূতন পোপ হইয়াছেন, অমনি অনতিবিলম্বে তাঁহাকে ঐ পবিত্র সুমহান্ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া এক পত্র লিখিলেন। নূতন পোপ অষ্ট্রীয়ার ফেরেরা দখলের বিরুদ্ধে অসম্মতিবাদ প্রকাশ করিয়া প্রজাগণের ক্ষণিক অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীন সংস্কারের উৎসাহ তাঁহার শীঘ্রই অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছিল।

পীডমণ্টে ও টস্কানীতে রাজারা কতকগুলি শাসননীতির সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রজাবর্গের বড়ই আনন্দলাভ হইয়াছিল, কিন্তু তেমনি মেটারনীচ মহোদয়ের মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইয়াছিল। কেবল সেই রাজকুলকলঙ্ক পাপিষ্ঠ অধার্ম্মিক ফার্দ্দিনান্দ প্রজাবর্গকে কখন কোন উদার ব্যবস্থার অঙ্গীকার করে নাই।

প্রত্যেক দিন ইতালীতে জাতীয় একতা বিশেষতঃ জাতীয় স্বাধীনতার বিষয় উত্তরোত্তর আন্দোলন হইতে লাগিল। সকল শ্রেণীর লোক

প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। সাধারণ লোকের মানসিক ভাব শতমুখী হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। জেনোয়ার বিজ্ঞানসমিতি, ক্যাসেলের কৃষিবিষয়ক সমিতি এ সকলই রাজনৈতিক সমিতির বেশান্তর মাত্র। তৎকালে পীডমণ্টের রাজা চার্লস্ অ্যালবার্ট Count of Costegretoকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা সেই কংগ্রেসে উপস্থিত সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। সেই পত্রের মর্ম্ম এই—"অষ্ট্রীয়া সকল শক্তিনিচয়ের নিকটে জ্ঞাপন ও প্রচার পত্র পাঠাইয়াছে যে সে ফেরেরা অধিকার করিয়া দখল ও ভোগ করিবে, যেন ফেরেরা দখলে অষ্ট্রীয়ার পৈতৃক স্বত্ব আছে। যদি ঈশ্বর কখন মুখ তুলিয়া চান ও ইতালীর স্বাধীনতার জন্য কখন যুদ্ধ ঘোষণা হয় তাহা হইলে আমি আমার প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত অশ্বে আরোহন পূর্ব্বক আমার বাহিণীর সেনাপত্য গ্রহণ করিব। অহো! কি সুখের ও গৌরবের দিন যে দিন ইতালীর স্বাধীনতার জন্য আমরা রণমদে মত্ত হইয়া রণনিনাদে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিব। অহো সে দিন কি সুখের ও কি গৌরবের হইবে।" এই পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে সকলেই অমানুষিক উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উন্মাদবৎ হইয়া গিয়াছিল, এবং কংগ্রেসের সমবেত ব্যক্তিমণ্ডলী রাজাকে তৎক্ষণাৎ ইতালীর ব্যাপারের পরিচালক হইয়া ইতালীর স্বাধীনতার জন্য অসি নিষ্কাশন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

রাজ্যবিপ্লবের পূর্ব্ববৎসর ইতালীতে এইসব ব্যাপার ঘটিয়াছিল। যখন ব্যবস্থাবলীর সংস্কার ও সংশোধনের আন্দোলন সার্ব্বজনীন ভাবে চলিতেছিল তখন প্রকৃতিপুঞ্জ ঐ খবর পায়, সুতরাং তাহারা মনে করিল শুধু ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন না করিয়া ইতালী রাজ্যে অবস্থিত অত্যাচারী রাক্ষসসম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে বিনাশ

করিতে সাহস পাইতেছিল, এবং যে শক্তি ইহাদিগের রাজ্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার মহাসুযোগ আসিয়াছে।

১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটে। অরলিয়ন্স রাজবংশ বিতাড়িত হয়েন এবং দ্বিতীয়বার ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র রাজ্য ঘোষিত হয়। মার্চ মাসে ঐ রাষ্ট্র-বিপ্লব সংক্রামক হইয়া ইউরোপে যথেচ্ছাচারী সকলের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে পৌঁছিল। ভীষণ কম্পনে ভিয়েনা নড়িয়া উঠিল এবং মহাশক্তিশালী মেটারনীচকেও স্থানচ্যুত করিয়া তৎকৃত দুই সহস্র হতভাগ্য নির্ব্বাসিত দলের সঙ্গে মিশাইয়া দিল।

বস্তুতই বোধ হইয়াছিল যেন ইতালীর উদ্ধারের সময় আসিয়াছে। পূর্ব্বেই সিসিলী দ্বীপে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই ফার্দ্দিনন্দও কতকগুলি সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একমাস পরে টাস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউক ঐরূপ করিয়াছিলেন, এবং মার্চ মাসে প্রতিনিধি-বর্গের সভার নিয়মানুযায়ী কতকগুলি ব্যবস্থা পীডমণ্ট ও রোমে বিঘোষিত হইয়াছিল। ভিয়েনার সম্বাদ সকলকে জাগরিত করিয়াছিল। যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সে সব সম্বাদ গৃহীত হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়; ক্ষণকালের নিমিত্ত যেন সব বিদ্যুৎময় হইয়াছিল।

মার্চ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়ানেরা মিলান খালি করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ভিনিস বিদেশীয় রাজপুরুষদিগকে নিজ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, এবং ডানীয়েলমানীনির কর্ত্তৃত্বে পুনর্ব্বার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। মেটারনীচের ক্রীড়াপুত্তলী মোডেনার ও পারমার রাজারা পলায়ন করিল এবং পীডমণ্টাধিপতি চার্লস এলবার্ট জাতীয় ব্যাপারে নায়ক ও পরিচালক হইয়া অষ্ট্রীয়ার শক্তিকে অবজ্ঞা দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। টসকানীও পশ্চাৎপদ ছিল না।

নিজে অন্যান্য ইতালীয়দিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য কতিপয় সৈন্যদল পাঠাইলেন এবং তাহাদের মধ্যে একটী উদ্দীপক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—"সৈন্যগণ, ইতালীর স্বাধীনতার জন্য পবিত্র ও ধর্ম্ম যুদ্ধের ফলাফল লোম্বার্ডীর রণক্ষেত্রে মীমাংসিত হইবে। পূর্ব্বে মিলানের নগরবাসীরা তাহাদের রক্তপাত করিয়া, অসাধারণ শৌর্য্যে ও বীরত্বে পৃথিবীকে চমকিত করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সার্দ্দিনিয়ার সৈন্যগণ তাহাদের মহানুভব রাজা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। ইতালীর সন্তানগণ, পূর্ব্বতন টস্ক্যান-জাতির গৌরবের উত্তরাধিকারীগণ, এরূপ পবিত্র মুহূর্ত্ত উপেক্ষা করিয়া লজ্জাকর আমোদে রত থাকিতে পারে না। সত্বর চল, যে সকল শূর ও সাহসী ভ্রাতৃগণ এক বৈজয়ন্তীতলে একত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে যুক্তহস্ত আমাদের লম্বার্ড ভ্রাতৃগণের সহায়তায় অগ্রসর হও।

সেই রাজকুলকলঙ্ক বম্বা (ফার্দ্দিনান্দ) মুহূর্ত্তের জন্য যেন সার্ব্বজনীন উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে অষ্ট্রীয়ার বন্ধন দূরে নিক্ষিপ্ত হইল,সেই মুহূর্ত্তেই, বম্বা, পিয়াসেজ্জা, সাভোনা, লোম্বার্ডী এবং ভিনিস রাজ্যের প্রজারা সকলে একমত হইয়া সার্দ্দীনীয় রাজের সঙ্গে যোগদান করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন বোধ হইল উত্তর ইতালী সার্দ্দীনীয়ার কর্ত্তৃত্বে একত্রিত হইল, বিদেশীয়েরা দেশ হইতে নিষ্কাশিত হইল, ইতালির স্বাধীনতার সূত্রপাত হইল, এমন কি বোধ হইয়াছিল যে ইতালীর জাতীয় একতা সংস্থাপিত হইল।

কিন্তু অষ্ট্রীয়ার শক্তি তখনও অতি প্রবল। গ্যারিবল্ডীর প্রচণ্ড বিক্রম, ম্যাটসিনির অতুল উৎসাহ ও প্রাচীন যোদ্ধা র‍্যাডেটাকীর রণ-কৌশলের সম্মুখে ভাসিয়া গেল। চার্লস আলবার্ট পুনর্ব্বার বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক নতজানু হইতে বাধ্য হইলেন; উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত

করিলন। ১৮৪৯ খ্রীঃ বসন্তকালে চার্লস অ্যালবার্ট পুনরায় লড়াই বাধাইলেন কিন্তু এবারেও সেই সমরনিপুণ প্রবীণ যোদ্ধা র‍্যাডেটাকী কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইলেন। এই যুদ্ধ ১৮৪৯ খ্রীঃ মার্চ মাসের ২৩ তারিখে নোভারা নামক স্থানে ঘটিয়াছিল। সেই শোচনীয় দিনের সন্ধ্যাকালে তিনি আপন রাজদণ্ড নিজপুত্র যুবরাজ ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে প্রদান করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর হইলেন। এই ভিক্টর ইম্যানুয়েলই উত্তরকালে ইতালী জাতির একতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জগতে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে রোম নগরে ব্যাপার সকল গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিদ্রোহের সময় উপস্থিত হইবার পর পোপ অনেক বাগবিতণ্ডার পর প্রকাশ করিলেন যে ইতালী জাতীয় বিদ্রোহ ব্যাপারে অষ্ট্রীয়ার মহাশক্তির বিরুদ্ধে তিনি যোগদান করিতে রাজী নহেন; এবং সেই সময়ে তিনি কাউণ্টরোজি নামক একজন ভদ্রলোককে রোম নগরের যাবতীয় কার্য্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। নভেম্বর মাসে রোজি বেচারার লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তিনি বিদ্রোহ ও রাজ্যোপপ্লবের সময় দুরাকাঙ্খার বশবর্ত্তী হইয়া সমতা রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। পোপ রোজীর হত্যাকাণ্ডে নিরতিশয় ভীত ও ত্রস্ত হইয়া গেটা নামক স্থানে পলায়ন করিয়া নেপল্‌সের দুরাচার রাজা ফার্দ্দিনাণ্ডের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে রোমনগরে শাসনকর্ত্তা বা কোনরূপ শাসন প্রণালী না থাকায় কিছু কালের জন্য ঘোর অরাজকতা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৪৯ খ্রীঃ অঃ ৯ ফেব্রুয়ারী প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইয়া প্রজাতন্ত্র প্রথা ঘোষিত হইল। ম্যাটজিনি ঐ রোমের প্রতিনিধি সভার একজন সভ্য নিযুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি

ভাব ও গতি কিরূপ হইয়াছিল, কিরূপ স্বর্গীয় উৎসাহ ও আহ্লাদে তিনি উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হইয়া ছিলেন, তাঁহার নিজের ভাষায় তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "বাল্যকালাবধি রোম আমি স্বপ্নে দেখিতাম, রোম আমার মানসিক কল্পনার জন্মস্থান ও আধারভূমি, রোম আজ মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি সকলের কেন্দ্রস্থল, রোম আমার আত্মার আরাধ্য দেবতা। পরম পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া অতি প্রশান্ত ও গম্ভীর হৃদয়ে আমি রোমে প্রবেশ করিলাম। আমি যখন রোম নগরের সর্ব্বপ্রধান নগরদ্বার মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন আমার মনোমধ্যে যেন বৈদ্যুতিক তেজ প্রবেশ করিল, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। যেন নূতন প্রাণের এক উৎস বহিয়া গেল। আমি আর কখন রোম দেখিবনা, কিন্তু তাহার স্মৃতি আমার মরণকালে পরমেশ্বরের চিন্তা ও আমার প্রিয়তম চিন্তা সকলের সঙ্গে অভিন্নরূপে জড়িত থাকিবে, এবং যেদিন ইতালীর জাতীর একতা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া প্রজাতন্ত্রের বিজয়পতাকা পোপ প্রাসাদের ও জুপীটার মন্দিরের উপরে শোভিত হইবে, আমি যেখানে সমাধিস্থ হইনা কেন আমার বিশ্বাস সেদিনও আমার গতপ্রাণ অস্থি পঞ্জরের ভিতর দিয়া ঐ বৈদ্যুতকী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইবে।" সিদ্ধপুরুষের আশা সফল হইয়াছিল কিন্তু আংশিক, সম্পূর্ণ নহে। রোমনগরে ইতালীর জাতীয় নিশান পৎপৎ শব্দে উড়িতেছে বটে কিন্তু ম্যাটসিনির কল্পিত প্রজাতন্ত্রের ধ্বজা নয়। ইহা সুব্যবস্থিত, উদার রাজতন্ত্রের বৈজয়ন্তী।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাতন্ত্র ক্ষণিকের হইলেও অগৌরবের নহে। যে তিন জন প্রজাতন্ত্রে শাসন কর্ত্তা বলিয়া বরিত হইয়াছিলেন তাঁহারা অসাধারণ সাম্যদৃষ্টিতে সকল শ্রেণীকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রোমকে রক্ষা করিবার জন্য প্রবল পরিশ্রম সহকারে উপায় উদ্ভাবন ও

এদিকে পোপ মহোদয় নিজ রাজ্য পুনগ্র্হণের জন্য বিদেশী শক্তি পুঞ্জের সহিত অনবরত ষড়যন্ত্র করণে মনঃসংযোগ করিলেন। ঘটনাক্রমে ফ্রান্স সাহায্য করিতে রাজী হইল। নবপ্রতিষ্ঠিত ফরাশী প্রজাতন্ত্রের অধিনায়ক লুই নেপোলিয়ন এই সুযোগে সৈন্যদিগের ও ফরাশী পুরোহিত বর্গের অনুরাগভাজন হইবার সংকল্প করিলেন। এক ঘায়ে দুই পাখী মারার লোভ তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। দেয়ার্স সাহেব বলেন "ক্যাথলিক ধর্ম্মে অনুরাগ বশতঃ বা রোমবাসীদের প্রীতি ও উপকারের নিমিত্ত নেপোলীয়ন রোমে পদার্পন করেন নাই, তিনি ফরাশীর উপকারের জন্য গিয়াছিলেন।"

এরূপ মহা সংকটেও রোম প্রজাতন্ত্রে বিচলিত না হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে বিপদের সম্মুখীন হইল। নেপোলিয়নের সৈন্যাধ্যক্ষ একবার হটিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু রোমবাসীরা ৩৫০০০ হাজার সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া বেশী দিন লড়াই চালাইতে সক্ষম হইল না। কাজেই ১৮৪৯ খ্রীঃ অঃ ৩রা জুলাই রোমে প্রজাতন্ত্রের পতন ও ধ্বংস হইল এবং ফরাশীর সাহায্যে পোপ তাঁহার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভিনিস তখনও দানিয়েল মানিনের বশে পরিচালিত হইয়া বীরবিক্রমে মস্তক উত্তোলন করিয়া অষ্ট্রীয়াকে সগর্ব্ব দৃষ্টিতে দেখিতেছিল, অগাষ্ট মাসে ভিনিসের পতন হইল, এবং অষ্ট্রীয়ার যথেচ্ছাচারী রাজশক্তি বিজয় লাভে মহা উল্লাসিত হইল।

অষ্ট্রীয়ার যথেচ্ছাচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল বটে কিন্তু বাস্তবিক অকস্মাৎ মহা বিপদে ইহা হৃদয়ে যে আঘাত পাইল তাহা হইতে আর নিরাময় হইতে পারিল না।

ইতালী জাতির একতা ও জাতীয় স্বাধীনতা নাটকের ঘটনাবলী ক্রমেই উত্তোরোত্তর ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈব-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কে রোধ করিতে পারে ?

ইতালী হইতে বিতাড়িত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সুনিশ্চিতরূপে ম্যাটজিনির প্রজাতন্ত্র প্রণালীকে কালের করাল গ্রাসে তুলিয়া দিল।

ম্যাটসিনির জীবনে উত্তর কালে কি ঘটিয়াছিল তাহা আমার দেখান উদ্দেশ্য নয়। পরমেশ্বর তাঁহাকে যে জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন তাহা সাধিত হইল। যে গুরুতর বিষয়ের আবশ্যক তিনি প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিঃশেষে নিষ্পন্ন করিবার জন্য অধিক আর কিছুই করিতে পারিলেন না। অন্য লোকের হাতে তাহা ন্যস্ত হইল। রাজনীতিবিশারদের ব্যবহারোচিত চাতুর্য্য, কর্ম্মক্ষমতা, সিদ্ধপুরুষের সুমহৎ উচ্চ জ্ঞান ও নীতির স্থান লইয়াছিল। ম্যাটসিনি ইতালীর জাতীয় একতা দৃঢ়ীকৃত হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাটসিনি যে সকল লোককে যে উপায়গুলিকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন সেই সকল লোক ও সেই সকল উপায় দ্বারা বহুকালের আশার ধন ইতালীর জাতীয় একতা ও স্বাধীনতা লব্ধ হওয়াতে প্রজাতন্ত্রোন্মত্ত ম্যাটসিনির মনদুঃখ ও পীড়ার সীমা ছিল না। বাস্তবিক রাজনৈতিক কর্ম্মকৌশলাপেক্ষা তাঁহাতে জ্ঞানের ভাগ বেশী ছিল। কর্ম্মকুশলব্যক্তিদিগকে কর্ম্ম করিতে উত্তেজিত করা, তাহাদিগের মনে নিজের প্রচণ্ড ও স্থায়ীভাব সকল জন্মাইয়া দেওয়া, নিজের স্বর্গীয় উদার এবং কঠোর উৎসাহের ভাবে তাহাদিগকে মাতাইয়া অনুপ্রাণিত করা এই সকল ম্যাটজিনির কাজ। এবং যদিও কার্য্য সকলের ঔচিত্যানৌচিত্য বোধ করিবার শক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ পরিমাণে ছিল, কিন্তু মহৎ ও স্থায়ী রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসকলের ব্যবহার জ্ঞান ছিল না। তাঁহার মাথা ছিল হাত ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহৎ শিক্ষাদাতারূপে ম্যাটজিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি যতই ভ্রমজনক হোক, তাঁহার আশানুযায়ী ফল তিনি পান নাই বটে;

সর্ব্ব সময়ের সর্ব্বদেশের রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রণাকুশল রাজপুরুষদের আদর্শস্বরূপ।

ম্যাটসিনি প্রজাতন্ত্রে সাতিশয় অনুরক্ত থাকিলেও প্রজাতন্ত্র তাঁহার মতে উদ্দামবৃত্তি প্রজাবর্গের শাসন নয়। পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র প্রথার যতরকম সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাটী মাটসিনির। তিনি বলিতেন—"দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাহাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় তাহাকেই প্রজাতন্ত্র প্রথা বলে।" তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে নিষ্ঠাসহকারে আপন কর্ত্তব্য করিবে সেই ধার্ম্মিক। নিষ্ঠাসহকারে কর্ত্তব্যপালন সকল ধর্ম্মের জন্মভূমি। "মানবের কর্ত্তব্য'' নামক পুস্তকের অনুক্রমণিকায় ম্যাটসিনি বলিয়াছেন যে "যদি তোমরা যথেচ্ছাচারী অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসন হইতে মুক্ত হইতে চাও তবে প্রথমতঃ ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্য করিবে। সংসারের বিস্তৃত মহারণক্ষেত্রে ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের যুদ্ধে তুমি সর্ব্বসমক্ষে আপন নাম ধর্ম্মের বৈজয়ন্তীতলে স্থাপন পূর্ব্বক অবিরাম গতিতে অধর্ম্মের সহ যুঝিবে। দুর্নীতি ও স্বার্থপরতা এই দুইটী অলীক-ভাব মনুষ্যদিগের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া কেমন করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া মোহজালে আচ্ছন্ন করে তাহা একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত সম্যক বোধগম্য হইবার উপায় নাই; আমি তাহা দেখিয়াছি এবং ঐ পুস্তকের দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে মানস করিয়াছি। তোমাদের অভিলাষানুযায়ী মত সমর্থন করিয়া ও তোমাদের বাসনানুরূপ পরামর্শ দিয়া অন্যান্য লোকে তোমাদের অনুরাগ ভাজন হইতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমি তোমাদিগকে এত ভালবাসি যে আমি তাহা পারি না। আমার কথা তোমাদের কর্ণে এখন অত্যন্ত কর্কশ বলিয়া বোধ হইতে পারে; আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা

দুর্নীতি দ্বারা অকলঙ্কিত থাকিয়া ও ধন দ্বারা উৎসন্ন না গিয়া অগোণে জানিবে যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সকল ধর্ম্মের আকর।”

চাটুকার উচ্চাভিলাষী পদপ্রার্থী ব্যক্তি নিশ্চয়ই কখন এরূপ চিন্তা ও বাক্য প্রচার করিতে পারে না। যিনি পবিত্রচেতা, ঈশ্বরপ্রেরিত সিদ্ধ-পুরুষ, যিনি তাঁহার জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন, স্বজাতিগণকে বিদেশীয় অত্যাচার ও দাসত্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে এবং স্বার্থপরতা ও ঘৃণাজনক প্রবৃত্তি হইতে যিনি পৃথিবীর মনুষ্যবর্গকে রক্ষা করিতে যত্নশীল এই সেই মহাত্মা ম্যাটসিনির উক্তি।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবাহ—অনুলোম ও প্রতিলোম।

একই দেশ বিভিন্ন শোনিতাত্মক জাতিসমূহের বাসভূমি হইলে তথায় বর্ণসঙ্করোৎপত্তি অনিবার্য্য হয়। কিন্তু তথাপি কোন দেশেই সঙ্কীর্ণজাতির প্রতি জনসাধারণের তত অনুকূলভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বর্ণসঙ্করোৎপত্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইদানীন্তন ইয়ুরোপীয়েরাও সঙ্কীর্ণজাতির প্রতি বিরূপ। তিন চারি বৎসর গত হইল কোন সুপরিচিত বাঙ্গালীর নিকট এক ইংরেজ তাঁহার এক আত্মীয়ের সহিত কোনও হিন্দুরমণীর পরিণয় প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে এদেশীয় ভদ্রঘরে বিবাহ করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা ফিরিঙ্গীদিগকে অবজ্ঞা করেন। ফলতঃ খাঁটি ইংরেজের চক্ষে ইম্পিরিয়াল আংলো-

বর্ণসঙ্করের দুইটী প্রধান প্রকার ভেদ। ইংরেজরমণীর গর্ব্ভে নিগ্রোপুরুষের .এবং নিগ্রোরমণীর গর্ব্ভে ইংরেজপুরুষের সন্তান, উভয়েই সঙ্কীর্ণ। কিন্তু উভয়ের প্রতি সমাজের ব্যবহার সাম্য নাই। হিন্দু-ব্যবস্থাশাস্ত্রে প্রথমোক্ত প্রকার বিবাহ প্রতিলোম এবং শেষোক্ত প্রকার অনুলোম নামে আখ্যাত। দেখা যায় অনুলোম অপেক্ষা প্রতি-লোমবিবাহ সর্ব্বত্রই অধিকতর নিন্দিত।

হিন্দু-ব্যবস্থাপকদিগের মধ্যে মনু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজ্যতম, তিনি অসবর্ণ-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয় না। অনুলোমবিবাহ তাঁহার মতে অপ্রশস্ত। তিনি কামপরবশদিগের জন্যই তাদৃশ বিবাহের বিধি দিয়াছেন। কিন্তু প্রতিলোমক্রমে বিবাহকারীদিগের. প্রতি তিনি ঘোর পাষণ্ডত্ব আরোপ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন পতি অপেক্ষা পত্নী যত উচ্চ জাতি হইতে আগত, তাঁহাদের সন্তানকে তত অধিক নিগৃহীত, এবং কাজেই সেই বিবাহকে তত অধিক নিন্দিত করাই সংহিতাকারের অভিপ্রায়। মনুর ব্যবস্থায় শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ব্ভজাত সন্তান 'নরের অধম চণ্ডাল।' মোট কথা, দাসকল্প, কৃষ্ণত্বক্ শূদ্রের পক্ষে আর্য্যকন্যার পতিত্ব বা আধিপত্যলাভ তাৎকালিক ভূদেব শ্বেতকায় ব্রাহ্মণের নিতান্তই অসহ্য ছিল।

আধুনিক শ্বেতকায় ভূদেব দিগের হৃদয়ের গতিও তদ্বৎ। ইংরেজেরা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাংশ হইতে স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও নেটিবের কোর্টশিপ চলিলে স্থানীয় ইংরেজ মহলে হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

যাঁহাকে পত্নীস্বরূপে স্বগৃহে আনয়ন করি, তিনি নীচজাতীয়া হইলেও তাহাতে আমার আপনার জন পর হয় না; যাহাদের সহিত জন্মাবধি খেলাধূলা করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি, তাহাদের সংসর্গ হইতে

আঘাত দিতে পারে না। কিন্তু উচ্চজাতীয়া পাত্রী নীচজাতীয় পাত্রে সম্প্রদত্তা হইলে কন্যার পিতৃকুলের বিলক্ষণ ক্ষোভের কারণ জন্মে। তাঁহার পিতামাতা আর তাঁহাকে আপন বা আপনাদের সমকক্ষ ভাবিতে পারেন না। সামাজিক উৎসবাদিতে তাঁহার সহিত যোগ দেওয়া অসম্ভব হয়; গৃহাভ্যন্তরেও তাঁহার সহিত মুক্ত ব্যবহার চলে না। ফলতঃ সে কন্যা পিতৃকুলের পক্ষে মৃত। স্নেহের প্রতিমা ভগিনী, দুহিতা প্রভৃতিকে এই ভাবে চিরবিসর্জ্জন দিতে সহজেই অপ্রবৃত্তি জন্মে। তাই উচ্চজাতীয়েরা অনুলোম অপেক্ষা প্রতিলোম বিবাহের অধিকতর বিরোধী।

এ বিষয়ে আর একটী কথা আছে। মুখে স্বীকার করি বা না করি, এবং আইনে যাহাই থাকুক, সমাজের উপরকার দুই চারিটী জ্ঞানী লোক বাদ দিলে অবশিষ্ট প্রায় সকলেরই মনে পত্নীত্বের সহিত দাসীত্বের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের একটী চিত্র অত্যুজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত আছে। তাই প্রতিলোমবিবাহ উচ্চজাতির অপ্রিয়। যাহাকে ইতর সংজ্ঞা দেই, সে যে আমার কন্যাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া পতিত্ব খাটাইবে, ইহা কি কখনও আমার পক্ষে রুচিকর হইতে পারে? অধিকন্তু যে সমাজে বিবাহচ্ছেদের রীতি নাই, তথাচ পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু বিবাহচ্ছেদের রীতি সত্ত্বেও স্ত্রীর পক্ষে পতিত্যাগ অতি কঠিন, প্রায় অসম্ভব। তাই নীচজাতিতে সম্প্রদান করিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ অসুখসম্ভাবনাশঙ্কারূপ দায়িত্বগ্রহণে অপ্রবৃত্তিও অতি স্বাভাবিক। এইরূপ নানা কারণে বিবাহে প্রতিলোম ক্রম সমধিক নিন্দিত।

কিন্তু এ বিষয়ে বিজ্ঞানের মত বিচার করা কর্ত্তব্য। বোধ হয় অনু-লোম অপেক্ষা প্রতিলোম বিবাহই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। সুসভ্য

সেই সভ্যজাতির কোনও ক্ষতি নাই ; পরন্তু, হয়ত স্বজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে উক্ত পুরুষের যে সন্তান জন্মিত, সুসভ্যা স্ত্রী তাহাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সন্তান প্রদান করিবেন। যাহাতে কন্যাদাতার কোনও ক্ষতি নাই, অথচ পরিণেতার লাভ সম্ভাবনা, তাহা প্রকৃষ্ট রীতি সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে অনুলোমবিবাহ উচ্চজাতীয় পুরুষের সন্তানে নীচজাতীয়া মাতার শোণিত প্রবেশ করাইয়া তাহার হীনত্ব সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে উক্ত নীচজাতির কোনও লাভ নাই। অর্থাৎ অনুলোমবিবাহে কন্যাদাতার বংশের লাভ নাই ; কিন্তু পরিণেতার বংশধরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কোন ইংরেজপরিবারের কোন কন্যা কোন নিগ্রোপরিবারে বিবাহিতা হইলে উক্ত ইংরেজপরিবারের শোণিতের অবনতি ঘটে না ; অথচ নিগ্রোবংশে উৎকৃষ্টতর শোণিতের প্রবেশবশতঃ তাহার উন্নতি হইতে পারে। যদি উক্ত নিগ্রোপরিবারের কন্যা ইংরেজপরিবারে সম্প্রদত্তা হয়, তাহাতে নিগ্রোবংশের উন্নতি হয় না ; কিন্তু ইংরেজবংশে অপকৃষ্ট শোণিতের মিশ্রণে তাহাদের অবনতি ঘটিতে পারে।

এই হিসাবে অনুলোম অপেক্ষা প্রতিলোমবিবাহই শ্রেয়স্কর বোধ হয়। কিন্তু কোন কোন কারণে প্রতিলোমবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক পরিমাণে লঘুকৃত হইতে পারে।

মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ, জন্ম ও শিক্ষা এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে। উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক লইয়া না জন্মিলে কোন শিক্ষাতেই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মিতে পারে না। বন্য সাঁওতালের বংশে নিউটনের প্রাদুর্ভাব সম্পূর্ণ অসম্ভব। কুপ্রবৃত্তি পৈত্রিক হইলে সচ্চরিত্রতা লাভ অতি কঠিন, প্রায় অসম্ভব। পক্ষান্তরে সুশিক্ষার

কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলে ন্যূনাধিক ব্যাঘ্র-স্বভাবাপন্ন হয়। তাই একই শিশু ইংরেজ, হিন্দু, বা নিগ্রোসমাজে প্রতিপালিত হইলে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। কারণ শিক্ষা সামাজিক অবস্থা সাপেক্ষ।

এই কথাগুলি মনে রাখিয়া অনুলোম ও প্রতিলোমবিবাহের আপেক্ষিক ফলাফল বিচার করিতে হইবে। সন্তান পিতার সমাজেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয় এবং সেই সমাজেরই সংখ্যাবৃদ্ধি করে। নীচজাতীয়া কন্যা উচ্চজাতিতে পরিণীতা হইলে সেই সমাজে থাকিয়া সুশিক্ষা বলে কথঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিবেই। অধিকন্তু তাহার সন্তানগণ সমুন্নত পিতৃসমাজের অঙ্গীভূত হওয়াতে মাতৃদত্ত আংশিক হীনতার কুফল হইতে অনেক পরিমাণে মুক্তি পাইবে। কিন্তু উচ্চজাতীয়া কন্যা হীনজাতীয় পতির সমাজে বাসনিবন্ধন তাহার পুর্ব্বশিক্ষাজনিত সভ্যতা হইতে বঞ্চিতা হয়। তাহার সন্তানগণও অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য পিতৃ-সমাজের শিক্ষাগুণে মাতৃশোণিতাগত শ্রেষ্ঠত্বের ফলভোগে সমর্থ হয় না। তাই যদি কোন সমাজে দুই চারিটী মাত্র অসবর্ণ বিবাহ ঘটে, তবে মোটের উপর অনুলোমবিবাহ অপেক্ষা প্রতিলোমবিবাহ অধিকতর শুভকর বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু অসবর্ণবিবাহ অহরহ ঘটিলে অন্যরূপ ফল দাঁড়াইবে। উচ্চ-জাতীয়া বহুকন্যা নীচজাতিতে সম্প্রদত্তা হইলে তাহাদের প্রভাবেই অতি অল্পকালে উক্ত নীচজাতির সভ্যতাস্রোত পরিবর্ত্তিত ও সমুন্নত হয়; কাজেই তাহাদের সন্তানগণও তত হীন হইতে পারে না। অতএব তাদৃশ অবস্থায় প্রতিলোমবিবাহ সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, নিম্নজাতিগুলির উন্নতির সোপানমাত্র। পক্ষান্তরে উচ্চজাতীয় পুরুষেরা সদাসর্ব্বদা নীচজাতীয়া পত্নী গ্রহণ করিলে বহু সংখ্যক নীচজাতীয়া বধূর সমষ্টীকৃত হীনতা প্রবল হইয়া পতির সমুন্নত সমাজ ম্লান করিয়া ফেলিবে।

অতএব যদি কোন দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় অত্যুন্নত হইতে অতি বর্ব্বর পর্য্যন্ত নানাজাতি বাস করে, তবে প্রচলিত প্রথার ব্যভিচার স্বরূপ দুই চারিটী মাত্র অসবর্ণ বিবাহ ঘটিলে প্রতিলোমবিবাহদ্বারা উচ্চশ্রেণীসমুহের মনোদুঃখ ভোগ অনাবশ্যক ; দুই একটী অনুলোম-বিবাহেও তাঁহাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত রীতি হইলে প্রতিলোমবিবাহের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল কারণ তাহাতে ক্রমে ক্রমে নিম্নশ্রেণীসমূহ উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষ হইয়া উঠে ; এবং তাহাই শোণিতভেদরূপ অনৈক্যের বীজ উৎপাটন করিবার একমাত্র পন্থা। কিন্তু অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর সাবধানতা আবশ্যক ; কারণ তাহার আধিক্যে উচ্চশ্রেণীর অধঃপাতের আশঙ্কা আছে ; এবং উচ্চশ্রেণীর অধঃপাতই সমাজের মৃত্যু।

এ স্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনুলোমবিবাহ অপেক্ষা প্রতিলোমবিবাহ অত্যধিক হইলে, উচ্চশ্রেণীতে নিরন্তর আবশ্যক সংখ্যক বিবাহযোগ্যা যুবতী কোথা হইতে আসিবে? উত্তরে এই বলা যায় যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে কখনও পাত্রীর অভাব ঘটিবে না। প্রতিলোমবিবাহের প্রাবল্যে নিম্নজাতীয়া অনেক রমণী অবিবাহিতা থাকিতে পারে। কিন্তু সকল দেশেই বহুসংখ্যক গর্ভধারণক্ষমা রমণী পতি সহবাস হইতে বঞ্চিতা। তার কারণ অনূঢ়ত্বই হউক, কিম্বা বৈধব্যই হউক, ফল সমান। যদি তাহাই হয়, তবে অযোগ্যতমদিগকে সন্তান প্রসব হইতে বিরত রাখাই শ্রেয়স্কর ; তাহাতে দেশের মঙ্গল এবং সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল। অর্থাৎ যদি অনেক যুবতীর পতিসহবাস বিরতি অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে প্রতিলোমবিবাহের বহুপ্রচলনদ্বারা উচ্চজাতীয়া রমণীদিগের পতিসমাগমপন্থা প্রশস্ত করিয়া হীনতরা নীচজাতীয়া রমণীদিগকে কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বিনী করাই যুক্তি সঙ্গত।

গুলিখোরের আবেদন পত্র।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বড়লাট মহোদয় প্রবলপ্রতাপেষু—

দিল্লীতে অপূর্ব্ব রাজ-দরবার অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে এই সংবাদে আপনার যাবতীয় প্রজাবর্গের মধ্যে এ অধীনরা যতদূর আনন্দ অনুভব করিয়াছে, সেরূপ আনন্দ অনুভব করা এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের ত্রিশ কোটী অধিবাসীদিগের মধ্যে অপর কোন শ্রেণীর লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ ভারতবাসী মাত্রেই স্বভাবতঃ কুনো, ঘরাও, কেবলমাত্র আমরা দরবারী। আমাদের জীবন এক কথায় Club life। মদ্যপান একা ঘরে বসিয়া করা যায়, কাঁচা আফিংও একা চলে, কিন্তু সহপায়ী ব্যতীত গুলি খাওয়া চলে না। কাযেই মহামান্য গুলিখোর সম্প্রদায়ের মেম্বর আমরা সকলেই মিশুক লোক; এবং আনন্দ অনুভব করা সম্বন্ধেও আমাদের সমকক্ষ আর কেহই নাই, কারণ উহাই আমাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য। স্বরিতানন্দের ভক্তেরা যে আনন্দ অনুভব করেন তাহা আশু ও তীব্র হইলেও ক্ষণস্থায়ী, অপর পক্ষে আমাদের আনন্দ মৃদু হইলেও চিরস্থায়ী। আমাদের চিদাকাশে বাঁধা রোশনাই। আমরাই শুধু মশগুল হইতে জানি।

কিন্তু এই মহা আনন্দের মধ্যে আমাদের একটি আক্ষেপের কারণ ঘটিয়াছে। আপনি এই দরবারে রাজা, মহারাজা, জমিদার, দোকানদার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার এমন কি সংবাদ পত্রের সম্পাদককে পর্য্যন্ত সবান্ধবে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত শুভকার্য্যে যোগদান করিবার জন্য সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন। যদিও ইঁহারা কেহই সমজদার নহেন। কেবলমাত্র এই হতভাগ্যেরা ফাঁক পড়িয়াছে। ইহাই আমাদের হরিষে বিষাদ হইবার কারণ। আমাদের আপাততঃ এই বিনীত প্রার্থনা যে আমরাও উক্ত দরবারে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা যেন পাই। তাঁহাতে আমাদেরও মনের দুঃখ দূর হইবে, দরবারও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা যে নিতান্ত অযথা ও অসঙ্গত নহে তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই আবেদন পত্র হুজুরের হস্তে অর্পণ করিতে আমরা সাহসী হইতেছি।

গুলিখোর বলে। অহিফেন সেবন এ দেশের একটি সনাতন প্রথা। উক্ত প্রথা অতি প্রাচীন কালেও যে প্রচলিত ছিল হিন্দু-দর্শনই তাহার প্রধান প্রমাণ। এই অহিফেনের গুণেই পৃথিবীর সম্মুখে হিন্দু জাতির মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। এই অহিফেনের প্রসাদেই চীনজাতি আমাদের কাছে চিরঋণী। ভারতবর্ষ পুরাকালে বৌদ্ধ-দর্শন নামক মানসিক অহিফেন দান করিয়া চীন দেশকে সভ্য করিতে আরম্ভ করে, তাহা সত্ত্বেও পূর্ণ সভ্যতার পক্ষে তাহাদের যেটুকু বাকী ছিল একালে আসল অহিফেন দিয়া তাহা পূর্ণ করিতেছে। আমাদের আসল বক্তব্য এই যে জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে হিন্দু-মুসলমান সকলেই বহুকাল হইতে অহিফেন সেবন করিয়া আসিতেছে। গুলির আড্ডায় বর্ণভেদ নাই, ধর্ম্মভেদ নাই—সেখানে আমরা অহিফেনের যোগসূত্রে সকলে সমান আবদ্ধ। সে বন্ধন ছিন্ন করে এমন সামর্থ্য কাহারও নাই। ভারতবাসীদের একতার কেন্দ্রস্থল গুলির আড্ডা, এবং কালে গুলির প্রচার যত বৃদ্ধিলাভ করিবে আমাদের জাতীয় একতাও ততই ঘনীভূত হইয়া আসিবে। আমাদের দ্বারা এই যে মহৎ কার্য্যের সাহায্য হইতেছে সেইজন্য আমরা হিন্দুস্থানবাসী মাত্রেরই—বিশেষতঃ ভারত-গভর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিতে পাই যে এই দরবারের অন্যতম উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে একতা স্থাপন করা। যেহেতু আমরা উক্ত একতা সাধন ব্রতে চিরদিন ব্রতী আছি—সেইজন্য এই অনুষ্ঠানে বিশেষরূপ যোগ দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে।

২য়তঃ। আপনার সকল প্রজার ভিতর আমরা সর্ব্বাপেক্ষা রাজভক্ত। সর্ব্বসাধারণের ভিতর যেরূপ ও যে পরিমাণ রাজভক্তি বিদ্যমান তাহাত আমাদের আছেই, উপরন্তু ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ, কারণ যাহা আমাদের প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় ও মূল্যবান—অর্থাৎ অহিফেন, তাহা আমরা উক্ত গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে লাভ করিয়া থাকি। আমাদের উপকারার্থে সরকার বাহাদুর অহিফেনের চাষ করেন, এবং যাহাতে আমরা খাঁটি মাল পাই সেইজন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা অহিফেন প্রস্তুত করাইয়া উক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের উপরেই তাহার প্রচলনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যখন Sir Joseph Pease প্রমুখ ইংলণ্ডের জনকতক অরসিক ব্যক্তি আমাদিগকে অহিফেন হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন সরকার বাহাদুর "কমিসন" (আহা ইচ্ছা করে কমিসনের বালাই নিয়ে মরি) বাহির করিয়া সেই আসন্ন ঘোর বিপদ হইতে

বদ্ধ আছে তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। যাহার ছিল, De Quincy, তিনি বহুদিন হইল অহিফেন লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

৩য়তঃ। আপনার প্রজাদিগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুশীল ও সচ্চরিত্র। অহিফেনের প্রসাদে আমরা একরূপ জীবন্মুক্ত। শরীরের ভাগ এতই কম যে দূর হইতে আমাদিগকে লোকের ছায়া বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার উপর আমরা এতদূর মৃদু স্বভাব যে ঘোড়া দেখিলে ১০০ হাত দূরে থাকি, হাতী দেখিলে ১০০০ হাত, এবং মাতাল দেখিলে উর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিই। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক ভীরুতা এই দুইয়ের সংমিশ্রনে আমাদিগকে এত সুশীল ও নিরীহ করিয়াছে। খুন, জখম, দাঙ্গা, হাঙ্গাম প্রভৃতি কোনরূপ দুঃসাহসের কার্য্যের ভিতর আমরা থাকি না। সুতরাং আমাদের নিকট হইতে সমাজের কিংবা শাসনকর্ত্তাদের কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। সেই কারণে, সমাজ আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারে কিন্তু ভয় করে না। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইবার আমরা সম্পূর্ণ আশা রাখি।

৪র্থতঃ। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলিও আমাদের নিমন্ত্রণ করিবার পক্ষে আপনার মতে যদি যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে নিম্নকথিত কারণকে আপনি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আপনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে দিল্লীর দরবারে ভারতবাসী সকল একত্রিত হইয়া পরস্পরের সহিত ideaর বিনিময় করিবে। ইহাই যদি দরবারের প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আমাদিগকে বাদ দিয়া দরবার ঠিক Hamletকে বাদ দিয়া "Hamlet"এর অভিনয়ের মত। কারণ ইহা জগৎ বিখ্যাত যে ভারতবর্ষের যত orignal idea সব গুলির আড্ডাতে জন্মলাভ করে। আমাদের wit এবং wisdom হিন্দুস্থানের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত, তাহা ভারতের চির আনন্দের সামগ্রী। আমাদের আড্ডা ideaর রাজ্য। আমাদের মন খেচর, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন লুক্কায়িত স্থান নাই যেখানে সে মনের গতিবিধি নাই। এ বিশ্বের ধূম্রে উৎপত্তি ও ধূম্রে বিলয়। তাই আমরা ধূম্রসেবী বলিয়া বিশ্বের সকল তত্ত্ব অবগত আছি। উক্ত কারণে এই দিল্লীর দরবারে, এই ideaর বাজারে আমাদের সর্ব্বপ্রধান স্থান লাভ করা উচিত।

পূর্ব্বে দরবারে যোগদান করিবার পক্ষে কি কি উপযোগিতা আছে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। পরে, আমাদের কোনরূপে যে অনুপযোগিতা নাই তাহাই জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

আমরা প্রথমতঃ অসন্তুষ্ট নহি। কারণ, শিক্ষার ধার আমরা ধারি না। বিশ্ব লইয়া যাহাদের কারবার, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ। সরকারের চাকরীরও আমরা প্রত্যাশা রাখিনা। ছিঁচ্কে চুরিতেই আমাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়।

দ্বিতীয়তঃ। আমরা Congress ওয়ালা নহি, কারণ গুলির আড্ডায় আমরা পৃথিবীর যত "রাজা উজীর" মারি। বাহিরের রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি না, আমরা বক্তা নই; আমরা শুধু সার কথা বলি, সুতরাং স্বল্পভাষী। সংবাদপত্রের সহিতও আমাদের কোন সংশ্রব নাই; কারণ, গুলির আড্ডাই সকল সংবাদের জন্মভূমি; আমরা প্রতিজনে একাধারে Reuter এবং Times.

জনরব যে দরবার Economic linesএ চালান হইবে। সে হিসাবেও আমাদের কোন অনুপযোগিতা নাই। পূর্ব্বে আমাদের স্বভাবের যে পরিচয় দিয়াছি তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারিবেন যে হাতিঘোড়ায় আমাদের দরকার নাই। আমরা সকলেই মিতাহারী—আমাদের ঝোঁক শুদ্ধ দুধের দিকে। যখন এই দরবারে এত গরুর যোগাড় করা হইয়াছে তখন আমাদের খোরাকের জন্য কোন ভাবনা নাই। দিল্লীতে শুনিতে পাই জলকষ্ট হইয়াছে। আমরা যেহেতু জল দেখিলে ডরাই, সেইজন্য জলের অনাটন আমাদিগকে নিমন্ত্রন করিবার পক্ষে বাধা হইতে পারে না। মেরু-বায়ু আমরা নিজে যোগাড় করিয়া লইব। আর ছিটে সে ত সরকার বাহাদুরের নিজ গুদাম হইতে সরবরাহ হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে অন্ততঃ আপনার অনুষ্ঠিত Art Exhibitionএর জন্যও আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কেননা আমরা হিন্দুস্থানের একটা বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য পদার্থ। শেষ কথা এই যে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ না করিলেও আমরা দরবারে উপস্থিত থাকিব; কারণ, আমরা রবাহুতের দল। তবে বিনা নিমন্ত্রণে আমরা প্রকাশ্য ভাবে যাইতে পারি না, ভদ্রলোকের বেশধারণ করিয়া যাইব—এই যা তফাৎ। ইতি—

সাং বাগবাজার
কলিকাতা।

সেবক—
শ্রীমহামান্য গুলিখোর সম্প্রদায়
The Honourable Society of
Opium Smokers.

C 1902

63/5 1708 BL 489 4972902

দেশোদ্ধারের রত্নালঙ্কার।*

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

দৃশ্য—একটি সুসজ্জিত প্রসাধন-কক্ষ—দীপালোকে উদ্ভাসিত। একজন রমণী নাচের পোষাক পরিয়া, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, আয়নার সম্মুখে আসীনা—তাহার সন্নিকটে অলঙ্কারের শূন্য পেটিকা খোলা রহিয়াছে।

নাচের মজ্‌লিস্! আহা! নাচের মজ্‌লিসে পুন
যাইতেছি কত দিন পরে!
থাকিতে না পারে কভু যুদ্ধ বিগ্রহ ঘোর
দেশ-মাঝে চিরকাল তরে।
কে সহিবে চিরকাল দুরভিক্ষ? কে ছুঁড়িবে
চিরকাল কামান-বন্দুক?
কিন্তু এই কথা, মোর বলা কি উচিত? না, না,
আমি নহি কর্ত্তব্য-বিমুখ।
শত্রু-আক্রমণ-কালে করেছি কর্ত্তব্য মোর
স্বদেশের সুদুহিতা-সম,
আহতের সেবা-তরে সৈন্য-চিকিৎসক-সাথে
গেছি পরি' বর্ম্ম-আবরণ।
এই ক্ষীণ হস্ত, যাহা বীণাবাদ্যে ছিল পটু
বাঁধিয়াছে আহতের পটি,
শীত-কষ্ট কার' তুচ্ছ গেছি ঘোর রণ-মাঝে
যোদ্ধা-সম বাঁধি' ক্ষীণ কটি।
তার পর, এতদিনে হইতেছে কোন গৃহে
ছোটো-খাটো নৃত্য-আয়োজন;

* গত ফরাসী-জর্ম্মান-যুদ্ধে জর্ম্মান-সৈন্য যখন ফরাসী দেশ অধিকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিল, সেই সময়ের বর্ণনা।

ৰ্ক'দোষ যাইতে সেথা ?— ইথে কি হইবে
—সুপবিত্র শোকের নিয়ম ?
কেন এ ভাবনা বৃথা ? আর যা হোক্ না কেন,
মাতৃভূমি তিনিও রমণী;
তাঁহার উচিত ভাবা কেমনে কাটাবে লোকে
চির-শোকে জীবন এমনি ?
এ দুই বরষ ধরি' বসন ভূষণে আমি
কিছুমাত্র করিনি যতন;
হাসিটি ছিল না মুখে, ছিনু অলঙ্কার-হীনা
খেল্‌না-হারা শিশুর মতন।
আহা কি সুন্দর এই মুক্তামালা, কর্ণফুল,
কি প্রভা করিছে বিকীরণ!
এই হীরকের হার জ্বলে যেন বিস্ফুলিঙ্গ;
অঙ্গুরীটি সুন্দর কেমন!
শুভ্র এ বাহুতে মোর,— সমুন্নত কণ্ঠোপরে
পরিনু এ অলঙ্কার সব;
ন'টা বাজিয়াছে এবে, এখনি প্রস্তুত আমি,
আজি রাতে ভুঞ্জিব উৎসব!

(কিছুকাল নীরব থাকিয়া)

গত বর্ষ শীতকাল— কিন্তু কেন বৃথা আমি
জাগাই সে অমঙ্গল স্মৃতি ?
ঠিক্ এই সময়েতে, ঠিক্ এ মুহূর্ত্ত-মাঝে,
করিয়াছিলাম অবস্থিতি,
সমস্ত রজনী আমি কোন এক হতভাগ্য
রণাহত সৈনিকের সাথে;
মূর্ত্তিমান ধৈর্য্য সেগো, ছাড়ি দেছে যেন হাল
—অকাতরে অদৃষ্টের হাতে।
সহসা বৈদ্যের মুখ হ'ল যবে অন্ধকার
মুমূর্ষু বুঝিল, শীঘ্র হবে তার শেষ।

আরো কিছুকাল পরে   পুরোহিত এল যবে
জীবনের আশা আর না রহিল লেশ।
পুরোহিতে দেখিয়া সে   করিল অভিবাদন
যথারীতি সৈনিক-ধরণে ;
রাখিল ধর্ম্মের মান   সরল সৈনিক সেই
ধর্ম্মকথা শুনিয়া শ্রবণে।
সেই রাত্রি, আহা তার   জীবনের শেষ রাত্রি ;
ছিল মোর জাগিবার পালা ;
বলিল আমায় কষ্টে—   যে কথা স্মরিয়া তার
উঠেছিল জ্বলি' মনো-জ্বালা ;
"নির্ব্বাচিত হয়ে যবে   সৈন্য-দলভুক্ত হয়ে
এনু এই ভীষণ সংগ্রামে,
পিতা মাতা উভয়েরে   ছাড়িয়া আসিয়াছিনু
শত্রু-সাথে মোদের সে গ্রামে।
শত্রু-সৈন্য সে সময়   ছিল বসি' পূর্ব্ব হ'তে
সে গ্রামটী করি' অধিকার ;
না জানি গো কত দিনে   যাইবে সে গ্রাম ছাড়ি,'
সেই সব দস্যু দুরাচার !"
এখনো দেখিছি যেন—   মুমূর্ষু সৈনিক সেই
করিতে করিতে বরণনা,
অধর দংশন করে,   ক্ষীণ হস্তে মুঠা ধরে
চোখে ছোটে যেন অগ্নি-কণা !
বলিতে লাগিল সে গো   আকুল নিশ্বাস ফেলি'
—বরষিয়া অশ্রুবারি-ধার :—
"গ্রামটি ছাইয়া গেছে   শকট, বাহন, যানে,
স্থানে স্থানে অস্ত্র স্তূপাকার।
সমস্ত করিছে ধ্বংস,   সন্ধি হইয়াছে, তবু
শত্রুসম করে ব্যবহার।

কষ্টের নাহিক সীমা, আরো বাড়ে, যত দিন যায়।
ঘোড়-সোয়ারের দল পথে পথে ছুটিয়া বেড়ায়।
শত্রু-সেনা করে বাস গৃহস্থের প্রতি ঘরে ঘরে ;
কেহ আসে ঘুমাইতে, কেহ আসে পানাহার-তরে।
কেহ বা আইসে সেথা ঘোড়ায় করিতে ডলামলা ;
কেহ আসে আক্রমিতে রূপবতী কোন কুলবালা।
কেহ করে ধূমপান শোকাকুলা গৃহকর্ত্রী
মাতাদের চোখের সম্মুখে ;

গৃহের দুয়ারে কেহ মাজে ঘসে তলোয়ার
জয়-গান গাহি' মন-সুখে !"
সৈনিক বেচারা আহা বলিতে লাগিল তোড়ে
বাগমীর মত যেন জ্বরের খেয়ালে ;
দেখে কলপনা-চোখে :— "টাঙানো রয়েছে গৃহে
স্বদেশের বীর-চিত্র ঘরের দেয়ালে।
চিত্রের সম্মুখে আসি' শত্রুদল হয়ে জড়
লঘু চিত্তে করিছে বিদ্রূপ হাসাহাসি ;
পলিত ধবল-কেশ বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর
কেমনে সহিবে এই অপমান-রাশি ?"
সেই সে অপরিচিত মৃত সৈনিকের কথা
কি জানি সহসা কেন আইল স্মরণে ;
আকুল করিল হৃদি, স্তম্ভিত হইল চিত,
মগন হইনু যেন গভীর স্বপনে !
বলিয়াছে ঠিক্ কথা, স্বদেশের ধনরত্ন
যত দিন না হবে নিঃশেষ,
ঘৃণিত দেশের শত্রু ততদিন রবে বসি,'
কিছুতেই না ছাড়িবে দেশ।
ধনরত্ন ?—সত্য বটে বিজয়ী বিদেশী দস্যু

বিপুল সে অর্থরাশি!　　কেমনে জুটিবে ইহা?

(আয়নায় মুখ দেখিয়া)

আহা! কিন্তু আমা-সম　　কে আছে রূপসী!
সাজিয়াছি কি সুন্দর!　　ভুলিয়া গিয়াছি, ওহো!
যেতে হবে নাচের উৎসবে;
নাচের উৎসবে যাব?　　আমিতো গো করিতেছি
—বেশভূষা অতুল বিভবে;
রত্ন-অলঙ্কার পরি'　　গর্ব্বিত উন্নত শিরে
যাব বসি সউশীন যানে
বসনের সউরভে　　আমোদিত করি দিক্,
দীপোজ্জ্বল উৎসবের স্থানে।
ওদিকে দেখগো চাহি'　　কাঁপিছে সমস্ত দেশ
সুভীষণ দাসত্ব-আঁধারে;
অরাতির রক্ষিদল　　রাজপথে সগরবে
—পাহারা দিতেছে চারিধারে।
নিয়ম হয়েছে জারি,　　নিশীথ-সময়ে দীপ,
নিভাইবে গ্রামবাসী-জন।
দেশের সৈনিক কোন　　হয়তো চলিছে পথে,
হৃদে রোষ করিয়া পোষণ;
বিদেশী দেখিলে কিন্তু　　সেলাম করিতে বাধ্য,
এমনি গো কঠিন শাসন!
যাবনা উৎসবে তবে;　　এই কি যথেষ্ট হবে?
আরো কি কর্ত্তব্য মোর নাহিক বিশেষ?
মুমূর্ষু সৈনিক সেই　　জানিতে উৎসুক ছিল
বিদেশীরা কতদিনে ছাড়ি যাবে দেশ।
দেশের দুহিতা কোন　　নাচের উৎসবে যায়,
তবে কি জনমভূমি হয়েছে উদ্ধার?
সৈনিকের প্রেত-আত্মা　　জিজ্ঞাসিলে এই কথা
কি উত্তর দিব আমি তার?
বুঝেছি কর্ত্তব্য এবে,　　নাহি আর চিত্তমাঝে

(তাড়াতাড়ি রত্নালঙ্কারগুলি আবার পেটিকায় পূরিয়া)

সাধের ভূষণ তোরা ! পুন এই কারাগারে
কর্‌রে প্রবেশ !
এবে শুধু অলঙ্কারে রূপ ভারাক্রান্ত হবে,
আর এতে কি কাজ বলনা ?
ওরে রে মুকুতারাজি ? তোদের ভগিনী অশ্রু
—কর্‌ এবে তাদের সান্ত্বনা।
যারে মরকত মনি ! নীলকান্ত, পদ্মরাগ !
যারে তোরা সব যারে !
যারে তুই সাধের হীরক !
তুয়া বিনিময়ে যদি একটি চাষারো গৃহে
স্বাধীন প্রদীপ জ্বলে
তবে মোর জীবন সার্থক !
এখন যাইব আমি ; হাঁ আমি যাইব সেই
নাচের উৎসবে।
শোক-বলে হয়ে বলী সাজিয়া গো সুপবিত্র
শোকের বিভবে॥
জননি জনমভূমি ! অতুল রূপসী তুই—
ছিলি আগে রাজরাণী
এবেরে পথের কাঙালিণী !
তোরি মত দীন বেশে যাব আমি সে উৎসবে ;
বিস্ময়ে সুধাবে সবে
—"এই বেশে কেন হেথা ইনি"?
আমি শুধু বলিব, সে সুবিস্মিত সভাজনে :—
দেশ চেয়েছিল অর্থ
—অর্থ আমি দিয়াছি তাহারে ;
মণি-মুক্তা অলঙ্কার কিবা তাহে প্রয়োজন ?
মাতৃভূমি থাকে যদি
দাসী হয়ে দাসত্ব আঁধারে !

খোকার ভাত।

ভৈরব নদের তীরে ক্ষুদ্র বসন্তপুর গ্রাম। ভৈরব এক কালে নামের মহিমা ঘোষণা করিত, এখন আর সেকাল নাই, অনেক বনিয়াদী জমীদারের ন্যায় ভৈরব এখন নাম সম্বল। তাহার বক্ষে ক্ষীণ নীর ধারা, তাহাও শৈবালাচ্ছন্ন, বদ্ধজলে স্রোতের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। তীরে গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী শ্মশান, চষা মাঠ, হরিদ্বর্ণ পুষ্প ভূষিত 'গাঁদলের' কণ্টকক্ষেত্র, তৃণপূর্ণ প্রশস্ত প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র বাবলাগাছ—পিতৃমাতৃহীন নিতান্ত অসহায় বালকের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। দূরে কোথাও আম কাঁঠালের বাগান, অশ্বত্থবৃক্ষ, বাঁশের বন।

গ্রামে বাজার নাই, শনি ও মঙ্গলবারে হাট হয়, মঙ্গলবারের হাটেই অধিক সমারোহ। হাটের নিকট কয়েকখানি দোকান, দুই একখানি স্থায়ী, অধিকাংশই অস্থায়ী, হাটের দিন সেখানে দোকানীর সমাগম হয়, অন্য সময় শীতকালের সিমলা শৈলের ন্যায় নির্জ্জনতা বক্ষে লইয়া নির্ব্বাসিত ভাবে পড়িয়া থাকে। এই সকল দোকান ভিন্ন, হাটের মধ্যে একটা হোটেল, একটা মদের দোকান, ও একটা ডাকঘর আছে—মদের দোকানেই পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর বৈঠকখানা, আর একটু দূরে পথের ধারে কয়েকটি পল্লীবিলাসিনীর বিলাস-গৃহ। পথের উপর গ্রাম্য বিলাসী-গণ কম্বলে বসিয়া একটা প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার আলোকে দশ পঁচিশ খেলা করে, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে কখন বা মদ্যপান করে, ডুগি তবলা লইয়া ভাবে বিভোর হইয়া গান করে, বিদ্যাসুন্দরের মালিনীমাসী হইতে সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত কেহই অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। হোটেলের পাশেই একটা বড় অশ্বত্থগাছ, ছায়ায় গাড়ী

'তিউড়ি' খুঁড়িয়া 'খানা পাকায়', তাহাদের হোটেল নাই। পঞ্চদশ ক্রোশ-ব্যাপী দীর্ঘ পথে গরুর গাড়ীর এই একটি বড় আড্ডা।

গ্রামের মধ্যে কলাবাগান, পাটের ক্ষেত, বাস্তুভিটার নিদর্শনস্বরূপ উচ্চ মাটির ঢিপি। গ্রামের সীমান্তস্থিত আম্র-কাননের পারে গোচারণের মাঠ, তাহার পাশেই মুসলমানদিগের সমাধিক্ষেত্র—বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্নছে।

এই মাঠের এক পাশে কুঠিয়াল ল্যাং সাহেবের নীলের কুঠি ও সাহেব এই কুঠীর বাহিরে নীলের ও কুঠীর ভিতরে নবাবীর আড়ম্বর করিয়া থাকেন। রেভারেণ্ড এণ্ডারসন সাহেবের সঙ্গে তিনি রবিবারে যথানিয়মে গীর্জ্জায় প্রার্থনা করিতে যান, কি প্রার্থনা করেন তা তাঁহার যিশুখ্রীষ্টই বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি কুঠীতে ফিরিয়া যে দেওয়ান রাধামাধব বিশ্বাসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নির্দ্দোষ প্রজাগণকে শ্যামচাঁদের প্রহার সুখ প্রদান করেন, তাহা ভুক্তভোগীগণের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তাহারা জীবন্ত সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে না বলিয়া মামলা জিতিতে পারে না, উপরন্তু দণ্ডবিধি আইনের করুণায় মিথ্যা মকর্দ্দমা সৃষ্টিজনিত অপরাধে অপরাধী পরিগণিত হইয়া ধন্য হয়। তাই একদিন মিয়াজান মিঞা তাহার চাচা আমেদ সেখকে বলিতেছিল, "আংরেজের আইন ভাল, সব্বুদ্ধি হাকিমটেই নটো (দুষ্ট)।"—আমেদ সেখ অনেকদিন ফৌজদারী আদালতের পেয়াদা ছিল, সে বলিল, "বাবজান্ ওকথায় চুপ দে, শেষে আবার ডিফার্ম্মেসনে পড়বি! নীল মামদো যে ক বেটা এ তল্লাটে আছে—আমাদের এই হাকিমডা তাদের সব্বারই বোনাই হয়।"

কিন্তু পাদরী আণ্ডারসন সাহেবের সম্মুখে ল্যাং সাহেব মূর্ত্তিমান স্বর্গভ্রষ্ট বড় 'পায়স ক্রিস্তিয়ান।' রতনেই রতন চেনে, দেওয়ান রাধামাধব বিশ্বাসটিও "পায়স হিন্দু",—ফোঁটা, তিলক, গলদেশে তিন

গণ কলঙ্ক রটাইত দেওয়ানজি ঘুঁসের আধিক্যে ঝোলাটিকে বড় করিয়াছিলেন, এই ঝোলায় সমস্ত উৎকোচ সঞ্চিত হইত; তিনি যখন নায়েব ছিলেন, তখন ঝোলা ছোট ছিল।) মস্তকে টিকির স্থূল গোচ্ছা পদ্ধতি কোন প্রকার অনুষ্ঠানের ত্রুটী ছিলনা। গৌরাঙ্গের কৃপায় ন যে কত প্রজার ভিটায় নীল বপন করিয়া কার্য্যদক্ষতার পরিচয় াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার প্রভুর লীলার অনুরোধে তিনি 5 শত ব্রজগোপী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন তাহা তিনি ও তাঁহার ভু ভিন্ন আর একজন বলিতে পারে, এ লোকটি তাঁহার মুহুরী াণিক বিশ্বাস। মুহরীগিরিতে প্রশংসালাভ করিবার জন্য অনেক প্রকার কার্য্যে অভিজ্ঞ হওয়ার আবশ্যক ছিল।

গ্রামের প্রধান লোকের কথা বলিলাম, এখন সাধারণের কথা বলি। কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী নগরে জমীদারের বাস—সেখানেই মহকুমা। এই জমীদার-বাড়ীতে গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোক চাকরী করেন। কাহারও কাহারও বা পেশা পৌরোহিত্য ও গুরুগিরি, কিন্তু গুরুগিরিতে আর প্রাণধারণের সুবিধা নাই দেখিয়া অনেকেই কৃষি-কর্ম্মানুরক্ত; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "আমরা প্রচীনকালের আর্য্যবংশধর, আর্য্যগণ চাস করিতেন, আমরাও সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি।" গ্রামে দুই একখানি টোল আছে, তাহাতে কেহ কেহ অধ্যাপনা করেন, ছাত্রগণকে অধিকাংশ সময়ই গৃহ হইতে চাল ডাল বহন করিয়া আনিতে হয়, জমাদার-বাড়ীতেও সেজন্য কিঞ্চিৎ বৃত্তি লাভ হয়; বঙ্কিমের আসল কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মত ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণরূপ পেশাবলম্বী ব্রাহ্মণ নন্দনও দুই চারি-জনের অসদ্ভাব নাই, অবসর কাল তাঁহারা নায়েব গোমস্তার চাটুবাদে ক্ষেপণ করেন। গ্রামের চাকরীর মধ্যে বড় চাকরী রাধামাধব বিশ্বাস ও 'ছিষ্টিধর' ঘোষের। সৃষ্টিধর গ্রাম্য মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত

পাঠ করিয়া সরস্বতীর শ্রীচরণে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মীর পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন সে ঢাকা জেলার একটা রেলের ষ্টেসনে 'মালবাবু' (Goods clerk), মাসিক বেতন পঞ্চদশ, উপরি প্রাপ্তি দুই শত মুদ্রা, 'পাটের সিজনে' তাঁহার মাসিক আয়—আড়াইটি মুন্সেফের সমান, তাই গ্রামে একটি দ্বিতল অট্টালিকার বনিয়াদ পত্তন হইতে গ্রামের লোক বলে, 'ছিষ্টিধর বাহাদুর ছেলে, আর দিন কত পরে সরকারের কাছে রায় বাহাদুর খেতাব পাবে।' দেওয়ান রাধামাধবে পরিবারে ও সৃষ্টিধরের পরিবারে আনুগত্য সর্ব্বজনবিদিত, রাধামাধবে স্ত্রী সৃষ্টিধরের পত্নী মাতঙ্গিনীর ধর্ম্মমাতা।

সৃষ্টিধরের প্রতিবেশীর নাম রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজেন্দ্রবাবু সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র, কিন্তু এখন অবস্থা মন্দ, তিনি বি, এ, পাশ করিয়া গ্রাম্য মাইনরস্কুলের হেড-মাষ্টারী লইয়াছেন; বেতনের ত্রিশ টাকা ও পৈত্রিক যাহা কিছু আছে তাহাতে কোন প্রকারে সংসার চলে, কিন্তু অলঙ্কার হয় না, সুতরাং তাঁহার পত্নী কাদম্বিনী নিরাভরণা। সেই নিরাভরণাকে দেখিয়া 'ছিষ্টিধরের' সাভরণা পত্নী মাতঙ্গিণী গর্ব্বভরে ওষ্ঠ বক্র ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া একদিন স্নানের ঘাটে তাহার 'বেগুণফুল'কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, "রেলের মাষ্টার আর ইস্কুলের মাষ্টার—যেন হাতিতে আর ব্যাংয়ে। মাষ্টার হলেই হল!" বেগুণফুল লাল বর্ণের গামছাখানিতে যৌবন-শ্রীদুষ্ট মুখখানি মার্জ্জনা পূর্ব্বক মৃদু হাস্যে দন্ত খর্সান চূর্ণানুলিপ্ত বিবর্ণ ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া বলিলেন, "যেমন রাজরাণী আর চাকরাণী—রাণী দুইই।" সৃষ্টিধরের পত্নীর কাদম্বিনীর প্রতি বিদ্বেষের কারণ ছিল, দরিদ্রের পত্নী হইয়াও কাদম্বিনী সুন্দরী, রূপ দেবকন্যার মত, হৃদয়খানিও তদনুরূপ। কুৎসিতা মাতঙ্গিনীর তাহা সহ্য হইত না। এইজন্য 'ছিষ্টিধর'কে বাধ্য হইয়া স্ত্রীর জন্য কয়েক সাঠ গহনা গড়াইতে হইয়াছিল।

এই রাজেন্দ্র মাষ্টারের শিশু পুত্রের অন্নপ্রাশন। পুত্রটি এখনও সর্ব্বসাধারণ কর্তৃক খোকা নামে অভিহিত। খোকার কি নাম হইবে এই কথা লইয়া আজ পনের দিন ধরিয়া দত্ত পরিবারে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। শিশুর ঠাকুরমা বলেন, "উহার নাম রাখিব হরিপদ, মরিবার সময় নামটি মনে করিলেও যমদূতের হাত এড়াইতে পারিব।" কাদম্বিনী বলেন, "খোকার নাম নীলমণি থাক মা, যে ভুতো ছেলে!" খোকার সাত বৎসরের দিদি সরোজিনী বলিল, "না মা, ওর নাম হবে হাব্‌লা, মুখ দিয়ে যে লাল পড়ে, বাবা!"—সে মহা আগ্রহে মাতৃ-ক্রোড়শায়ী হাবলার মুখ চুম্বন করিল, হাবলা ছোট ঠোঁট দুখানি মেলিয়া লাল মাড়ি বাহির করিয়া একবার হাসিল। শেষে কিছুই স্থির হয় না দেখিয়া সরোজিনী তাহার বিদ্যালয় প্রত্যাগত পিতার মস্তকে পাকা চুলের সন্ধান করিতে করিতে বলিল, "বাবা, খোকার নাম থাক্‌বে কি?"—বাবা খবরের কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "শ্রীযুক্ত বাবু রমেন্দ্র নাথ দত্ত।"—এমন অদ্ভুত নাম শুনিয়া সরোজিনীর হাত দুখানি তাহার পিতার মস্তকে অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, সে গম্ভীরভাবে বলিল, "ও নাম ভাল নয়, ও আমার মুখে আসবে না।"—পিতা বলিলেন, "তবে তুই হাবলাই বলিস্‌, তুই পরে ওর হাতে কিল খাবি।"

সকালে ছক্কানন্দ ঠাকুর রাজেন্দ্র নাথের গ্রামস্থ কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, ছক্কানন্দ কেবল নিমন্ত্রণে নারদ নহে, পরের সহিত বিবাদ বাধাইতেও উক্ত ঋষিটির ন্যায় তাহার পারদর্শিতা ছিল। কুটুম্বিনীগণের নিমন্ত্রণ ভার গৃহকর্ত্রীর মহাপ্রসাদের উপর পতিত হইল। মহাপ্রসাদ মালীর মেয়ে, রাজেন্দ্রের জননী একবার পুরুষোত্তম-ধামে উপস্থিত হইয়া এই বর্ষীয়সী, পবিত্র চরিত্রা স্ত্রীলোকটির সহিত মহা-

পূর্ব্ব রাত্রেই নানা স্থান হইতে তরকারী আসিয়া জুটিয়াছে, অপক্ক কদলী হইতে সুপক্ক কুষ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকল তরকারীই স্তূপাকারে রক্ষিত। রাধামাধবের পুত্র স্কুলের ছাত্র, রাধামাধব রাজেন্দ্রকে সুপণ্ডিত বলিয়া মান্য করিতেন, তিনি স্বয়ং সাহেবদের চিঠিপত্র লইয়া রাজেন্দ্রের নিকট পত্রাদির অর্থাবধারণ করিতেও আসিতেন, তিনিই এ অন্নপ্রাশনে কলাপাতা, তরকারী ও মৎস্যের ভার লইয়াছিলেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দুই জোড়া বঁটিতে তরকারী কুটা হইল। রাজেন্দ্রের মাতা বৈষ্ণব-কুল-দুহিতা সেই জন্য তিনি তরকারী 'কুটা' না বলিয়া 'বানানো' বলেন, তিনি এক একবার তরকারি 'বানানো' দেখিতে আসিতেছেন, আবার ভাঁড়ার ঘরের দিকে যাইতেছেন, হরিনামের ঝোলা আজ শিকায় উঠিয়াছে। ওপাড়ার শ্যামা ঠাকুরঝি বলিলেন,—"বৌ, রাত্রি অনেক হ'ল মালাগাছটা নাও।" গৃহিণী বলিলেন,—"আর মালা! কাল শ্রীমধুসূদন লজ্জা না দেন ত মালা নেব, কালকের কুটুম্বিতে কি রকম করে শেষ হবে সেই চিন্তাই আমার জপমালা হয়েছে!" তেল কতটুকু আসিয়াছে, আর ঘি লাগিবে কি না, যে পরিমাণ লবণ গুঁড়া আছে তাহাতে কাজ চলিবে কি আরও গুঁড়াইতে হইবে, সকল কুটুম্বিনীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে কি না এই সকল বিষয়ের আলোচনা লইয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। কাল ছেলে ভাত খাইবে, খোকার মার আজ বড় আনন্দ, তিনি আজ উল্লাসভরে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। শাশুড়ী বলিতেছেন, "যাও বাছা, আজ সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছ, একটু শোও গে! আবার তোমার অসুখ কল্লে খোকারও শরীর খারাপ হবে, যে পচা ছেলে!" বধূ বলিলেন,—"সে কি মা! তুমি খাটবে, আর আমি গিয়ে শোবো!" "না শোবে ত খালি ঘুরে বেড়াও, তোমাকে আর বাছা পারিনে! ব্যাটার বৌ এসে

খোকার মা আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, বুঝিলেন শাশুড়ীর নিকট দুর্ব্বাক্য শ্রবণের পথ তিনি মুক্ত করিয়াছেন।

ছোট বৌ ও কাদম্বিনীর দেখনহাসি একটি ঘরের কোণে মৃৎ-প্রদীপের মৃদু আলোকে বসিয়া ভিজা সুপারী কাটিতেছিলেন। আর মিত্রদের সুলোচনা খোকার বসিবার পিঁড়িতে আলিপনা দিতেছিলেন। কাদম্বিনী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটু মনোযোগের সহিত আলিপনার শুভ্র কারুকার্য্য দেখিয়া বলিলেন, "কিলো সুলি, আমার ছেলের ভাত না হয়ে গেলে আর তোর বিদ্যে প্রকাশ শেষ হবে না।"

অন্নপ্রাশনের দিন প্রভাতে একদল রসুনচৌকী দত্তবাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপের বারান্দায় চাটাইয়ের উপর বসিয়া মধুর সুরে গান করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বেঞ্চির উপর বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে রসুনচৌকী শুনিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতর রমণী সমাজ মহাব্যস্ত। দেওয়ানজীর আদেশে জেলেরা সমস্ত রাত্রি তাঁহার কালাচাঁদপুরের পুকুরে মাছ ধরিয়া বেলা আটটার সময় তিনটি প্রকাণ্ড রোহিৎ মৎস্য দত্তবাড়ীর রান্নাঘরের সম্মুখে আনিয়া ফেলিল। মাছ দেখিয়া খোকার পিসি কামিনী বলিলেন, "খোকার পয় ভাল, খাসা মাছ পাওয়া গিয়েছে।" তারাচাঁদ জেলে দত্তদের রায়ৎ, বড় বাধ্য, তারাচাঁদের মা, স্ত্রী ও ভগিনী তিনজনে মাছ কুটিতে বসিল।

বধূগণ সকালেই স্নান করিয়া আসিলেন, দত্তগিন্নি বলিলেন, "বৌমা, ওদের একটু জলখাবারের আয়োজন করে দাও, কত বেলায় ভোজ হবে, পুরুষেরা না খেলে ত মেয়েদের বসাতে পারবো না; অনেকেরই কোলে কাঁচাছেলে, সকালে কিছু দুটো মুখে না দিলে পিত্তি পড়বে।" কাদম্বিনী এক একবাটী চালভাজায় সর্ষপ তৈল মাখাইয়া তাহাতে মুড়কী ও সন্দেশ দিয়া নিমন্ত্রিতা বধূগণকে জল খাইতে দিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সিক্ত এলোচুলে গ্রন্থিদিয়া প্রসারিতপদে ক্রোড়দেশে রাখি

লইয়া পরম পরিতৃপ্ত অন্তরে চাল ভাজা চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন, কাহারও কাহারও দুই একটি কাঁচালঙ্কার ফরমাস হইল। তাঁহাদের ছেলে মেয়েরা সমস্ত ঘরে দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ ও জটলা করিতে লাগিল। তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ পাড়িতেছে, কেহ কাহারও পিটে গুড়ুম করিয়া একটা কিল মারিয়া মায়ের কাছে পলাইয়া যাইতেছে,—চারিদিকে গণ্ডগোল।

বিধবাগণও সকালে স্নান শেষ করিয়া হেঁসেলে প্রবেশ করিয়াছেন, কুটুম্ব-ভোজন না হইলে তাঁহারা জলস্পর্শ করিবেন না। একাগ্রমনে, পরম যত্নে তাঁহারা 'যজ্ঞি' রাঁধিতেছেন, মনে মনে বলিতেছেন 'হে নারায়ণ, যেন লজ্জায় পড়তে না হয়!" রান্নাঘরে যেখানে ভাত হইতেছে সেখানে কয়েকখানি কলাপাতার উপর একখানা সুপরিস্কৃত কাপড় বিছানো, তাহার উপর হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত ঢালা হইতেছে। উনানে তিল পিঠুলি, বেগুণভাজা, বড়া, ডাল, সুক্তুনি চড়িয়াছে, বিভিন্ন উনান হইতে কলকল, ছ্যাঁক ছুঁক, সাঁ সাঁ শব্দ উঠিতেছে। খোকার মামীমা মৎস্য রন্ধনে সুনিপুণা, তিনি আঁষ হেঁসেলে স্তূপীকৃত মৎস্য লইয়া ভাজিতে বসিয়া গিয়াছেন। গিন্নি কেবল ভাঁড়ার হইতে আবশ্যকীয় সামগ্রী জোগাইতেছেন, পাছে রাঁধুনীগণের কোন অসুবিধা হয়।

নাপিত আসিয়া খোকার নখ খুঁটিয়া দিয়া গেল। খোকার মাসী খোকাকে তেল হলুদে অভিষিক্ত করিয়া কাঠের পিঁড়ির উপর বসাইয়া শীতলজলে স্নান করাইয়া দিলেন; স্নানে খোকার বড় আনন্দ, মাথা বহিয়া চোখে মুখে জল পড়ে আর সে চোখ বুঁজিয়া খিল খিল করিয়া হাসে। খোকার স্নান শেষ হইলে মাসী তাহাকে মায়ের কোলে দিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন; মা ছেলেকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে স্নেহোচ্ছ্বসিত নতদৃষ্টিতে পুত্রের মস্তকে চিরুণী সঞ্চালন করিতেছেন

রাজেন্দ্রনাথ পত্নীকে বলিলেন, "নবদ্বীপ (স্বর্ণকার) বালা আর মল এনেছে, নিমফল খানিক পরে দেবে বলেছে। দেখ দেখি বালা জোড়াটা গড়েছে কেমন?" কাদম্বিনী আগ্রহভরে বালা দুগাছি লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহা পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর বলিলেন "বেশ গড়ন হয়েছে, নবদ্বীপ ঢাকার কারিগর গড়ে ভাল। ছেলেহার? হারের কথা বলেছিলাম যে!" রাজেন্দ্র কিছু বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "হার আর এখন হয়ে উঠ্‌লো না। খোকাকে দিতে কি আর আমার অসাধ? তা টাকাতে কুলিয়ে উঠ্‌লো না যে; কুটুম্ব দশ-জনকে আবার একটু ভাল করে খাওয়াতে হবে, এই প্রথম কাজ কচ্চি! উমেশবাবুর কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ করবার চেষ্টায় গিয়ে-ছিলাম, তা আজ কাল কি আর কেউ শুধু হাতে টাকা ধার দেয়? তিনি বল্লেন, হাতে এখন টাকা নেই।" কাদম্বিনী ছলছল নেত্রে বলিলেন, "আমার বালা দুগাছি নিয়ে গেলেই পারতে, শুধু হাতে লোকের কাছে টাকা ধার চাইবারই বা কি দরকার ছিল?" রাজেন্দ্র বলিলেন, "কাদাম্বনী, তোমার আর কিছু ত নেই, থাকবার মধ্যে কেবল ঐ দুগাছি বালা, তোমাকে দুভরি সোণা কখন দিতে পাল্লাম না, এমনই অক্ষম আমি, তোমার বাবা যে দুগাছি বালা দিয়েছিলেন, তাও ঘুচোবো?" কাদম্বিনী আর্দ্রস্বরে বলিলেন, "তা হোক, দুগাছি কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে থাকলেও আমার অসুখ নেই। গহনা পরাতেই কি এত সুখ?"—রাজেন্দ্র নাথ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া পত্নীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহার মুখের উপর মুখখানি নত করিয়াছেন এমন সময় কাদম্বিনী মুখ সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি যেন কি! এখনই কে এসে পড়বে আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না!"

পুরোহিত গোলক সার্ব্বভৌমের পশ্চাতে সনাতন আচার্য্য টিকি দুলাইতে দুলাইতে দত্তগৃহে পদার্পণ করিল। সনাতন বলিতেছিল,

"দেখুন সার্ব্বভৌমদা, এই যে পঞ্জিকা জিনিসটি, ওটি কলির শেষে ভ্রষ্টাচারী হবে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কিছু লেখে টেখে কি ?" সার্ব্বভৌম করচ হইতে সামুক বাহির করিয়া এক টিপ নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, "হুঁ, এ যুগে সন্দেহের মাত্রা কিছু বেশী, শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে, তা তোমার এরূপ সন্দেহ উৎপত্তির কারণ ?" "আর মশায়, এবার আষাঢ় মাসে হলো রথ, দুর্গোৎসব গিয়ে পড়লো কার্ত্তিক মাসে ? এমন বিপরীত ব্যবস্থা ত কখন দেখি নি! পাঁজির জন্মকাল হতে দেখে আস্‌চি যে মাসে যে তারিখে রথ হবে তার ঠিক তিন মাস পরে সেই তারিখে হবে দুর্গোৎসব—ব্যবস্থা এবারে উল্‌টে গেল! এ মশায় যদি ভ্রষ্টাচার না হয় ত কি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ কর্‌লে ভ্রষ্টাচার হবে ? এ যে ঘোর কলি!" সার্ব্বভৌম হাসিয়া বলিলেন, "সাধু, সাধু আমাদের টোল থেকে তোমাকে এবার জ্যোতির্ভূষণ উপাধি দেওয়া যাবে।"

তামাক সেবন করিয়া সনাতন আচার্য্য খোলা কাটিতে লাগিয়া গেল। পুরোহিত মহাশয় কদলীপত্রের একটী ঠোঙ্গা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে তাম্রকূট ধূম্রাস্বাদন করিতেছিলেন, এবং তাহার মুখ ও নাসিকা বিবর হইতে এট্‌নাগিরির ধূম্রোৎক্ষেপ লক্ষিত হইতেছিল। তামাক ছাড়িয়া পুরোহিত মহাশয় কম্বলাসনে উপবিষ্ট অদূরবর্ত্তী মজুমদার মহাশয়কে বলিলেন, "বলি মশায়, আপনার ত খবরের কাগজ টাগজ পড়া আছে, বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রের আপনি একজন লম্বরদার গ্রাহক, পৃথিবীর চারি খণ্ডের খবরই আপনি হামেশা পান; আপনি বল্‌তে পারেন, এই বুর-যুদ্ধটা কিরূপ ব্যাপার ? তিন বৎসর ধরে যুদ্ধ, এ কি রকম যুদ্ধ ? শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ ত এক দিনেই শেষ হয়েছিল, রাম রাবণের যুদ্ধ চলেছিল ছয় মাস, কুরু পাণ্ডবের আঠারো অক্ষৌহিণী

পারে ?" মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "বুয়ররা এক একটা দৈত্য, অর্থবল স্বর্গের অমৃত, দেবতা ইংরাজ সে অমৃতপানে মহা বলবান্, দৈত্যেরা অল্প দিনেই স্বদেশস্বর্গচ্যুত হবে।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আচ্ছা, বল্‌তে পারেন, ঐ একমুঠো লোক, ওদেরই বা এতটা বল আসে কোথা থেকে ?" মজুমদার তামাকে শেষ দম দিয়া বলিলেন, "অনুমান হয় ও জিনিসটা স্বদেশ-অনুরাগ আর স্বজাতি-প্রীতি। শুন্‌তে পাই ইংরাজরা ঐ অমৃত ফল স্বর্গ লঙ্কা থেকে এদেশেও এনেছে।"

বেলা দশটার সময় রাজেন্দ্রনাথ স্নান করিতে চলিলেন, ভৈরবেই তিনি স্নান করিয়া থাকেন। নদীতীরে দেখিলেন, নীলের জমীর ভিতর হইতে কয়েকজন তাগাদগিরি (ক্ষেত্ররক্ষক) বাহির হইয়া একটা পতিত জমির উপর হইতে কতকগুলি গরু তাড়াইয়া পাউণ্ডের দিকে লইয়া যাইতেছে, নীলের জমীর ভিতর দিয়াই লইয়া যাইতেছে, আর রাখাল তাগাদগিরি-চতুষ্টয়ের হাতে পায়ে পড়িয়া গরুগুলা ফেরত চাহিতেছে।

রাজেন্দ্রনাথের আর জলে নামা হইল না, তিনি একটা দাঁতন চর্ব্বণ করিতে করিতে নীলের ক্ষেতের দিকে ধাবিত হইলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া রাখাল তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল তিনি রক্ষা না করিলে তাহার মনিবের সর্ব্বনাশ হয়।

গরুগুলি দামু ঘোষের। দামু ঘোষ বসন্তপুরের সম্পন্ন গৃহস্থ। পূর্ব্বে প্রত্যহ ঘরে দুই মন আড়াই মন দুধ হইত, এখন বড় জোর আধ মন হয়, অনেক গরু মরিয়া গিয়াছে, চাষ আবাদেও কয়েক বৎসর অজন্মাতে সে কিছু দেনদার হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ঠাঁঠ বজায় রাখিতে হইয়াছে, চাকর বাকর, কুটুম কুটুম্বিতা সকলই পূর্ব্বের মত আছে। দামু ঘোষকে নীলকর ল্যাং সাহেব দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

ইহার কারণ অনেকে অনেক রকম বলে ; কেহ বলে দামুর একটী সুন্দরী বিধবা কন্যা আছে, ল্যাং সাহেব দয়া করিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করিতে চায়, কিন্তু দামু একেবারে মনুষ্যত্ববিহীন হয় নাই, সে তাহার বিধবা কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়া সাহেবের অনুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইতে পারিল না, সুতরাং দামু ল্যাং সাহেব ও দেওয়ান রাধামাধবের সমান বিরাগভাজন হইয়া রহিল। কেহ বলে গ্রামে পুলিশ সাহেব আসিলে তাহার খানার বাবদ ল্যাং সাহেব দামু ঘোষের মত প্রজাবর্গের নিকটও চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন, চাঁদা প্রায় সকলেই দিয়াছিল, কিন্তু দামু ঘোষ বিস্তর আপত্তি করিয়া শেষে দুই টাকার অধিক দেয় নাই ; এইজন্য অপমানাহত ল্যাং দামুকে জব্দ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কোন্ কারণটী সত্য, তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে দামুর প্রতি অত্যাচার হইত অনেক প্রকারে, তন্মধ্যে তাহার গরু গোচারণের মাঠ হইতে নীলের জমার ভিতর দিয়া তাড়াইয়া পাউণ্ডে দেওয়া একটা প্রধান। এজন্য দামু ঘোষের প্রত্যেক বার সাত আট টাকা লাগিত—মধ্যে মধ্যে এমন হইতই, কিন্তু উপায় ছিল না, তাহার এতগুলি গরু ঘরে বাঁধিয়া পুষিবার সামর্থ্য ছিল না, মাঠে বাহির হইলেও এই বিপদ !

রাজেন্দ্রনাথ এ বিপদের কথা জানিতেন, তিনি দেওয়ানজিকে দামু ঘোষের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোন ফল জন্মে নাই, তবে দেওয়ানজী প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু ছিলেন বটে।

রাজেন্দ্রনাথ তাগাদগিরিদিগকে গিয়া বলিলেন, "কেন বাপু গরীবের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে যাচ্ছ? গরুগুলা ত আর সত্যই তোমাদের নীলের জমিতে যায় নাই।"

একজন তাগাদগিরি উদ্ধত স্বরে বলিল, "ছান করতে যাচ্ছ যাও

নিয়ে যাব।"—ল্যাং সাহেবের তাগাদগিরি, তাহারা এক একজন নিজেকে এক একটা দারোগা বলিয়া মনে করিত।

রাজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছোট লোক তোরা তোদের ভারি স্পর্দ্ধা হয়েছে—আচ্ছা যা গরু নিয়ে, যাদের গরু তারা রাখ্‌তে পারে কিনা দেখ্।

তাগাদগিরিরা মহা উৎসাহে গরু তাড়াইয়া লইয়া চলিল। নদীর ধারে কিছু দূরে কয়েকজন কৃষক জমী চষিতেছিল, পাঁচ সাত জন রাখালও গরু চরাইতেছিল। দামু পূর্ব্বেই তাগাদগিরিদের কর্ত্তব্য-পরায়ণতার সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল, রাজেন্দ্রনাথ ও তাহার রাখাল সেই পথে আসিতেছে। দামু রুদ্ধ নিশ্বাসে রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে গরু ছাড়লো না।"

"না।"

দামু রাজেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু এখন আমি করি কি? রোজ রোজ আর পয়সা দণ্ড দেব কত? আর ত এ দেশে বাস করতে পারিনে।"

রাজেন্দ্র বলিলেন, "তাগাদগিরিদের নামে নালিশ করে দেখেছ?"

"হাঁ, কতবার থানায় নালিশ করতে গিয়েছি, দারোগা নালিশ নেয়নি, বলেছে, ও তুচ্ছ মামলা ঘরে ঘরে মিটিয়ে ফেল।"

"ম্যাজিষ্টরীতে কখন দরখাস্ত দিয়েছ।"

"না, অনর্থক পয়সা ব্যয় করে কি হবে? আমাদের ল্যাং সাহেব ম্যাজিষ্টর সাহেবের ভারি সাঙ্গাত।"

"তবে যেমন করে পার ছাড়িয়ে নেও। তোমরা এখানে এতগুলা মানুষ আছ, চারটে তাগাদগিরিকে তাড়িয়ে গরু ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না?"

দামু কিছু বিষণ্নভাবে বলিল, "আইন যে খারাপ!"

"তুমি আইন ভাঙ্গছ না। কেউ ডাকাতি কল্লে তাতে বাধা দেবে না? বলবে ডাকাতি করে নিয়ে যাক্, পরে নালিশ করব?"

কথাটা দামুর মনে লাগিল। সে রাখাল ও কৃষকগুলিকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই সব, যত টাকা খরচ হয় আমি করব, কেড়ে নে ঐ তাগাদ-গিরি শালাদের কাছ হতে গরু, নিত্যি আমার গরু পাউণ্ডে দেবে!"

কৃষকেরা জানিত দামুঘোষের যে কথা সেই কাজ, এমন একটা আমোদে তাহাদের অপ্রবৃত্তি জন্মিলনা, তাহারা ছোট লোক কৃষক, তাহারা এখনও ভদ্রলোক সাজিয়া 'ফ্যাসাদে' পড়িবার ভয়ে ফৌজদারীর হাঙ্গামা দেখিয়া গা ঢাকিতে শেখে নাই। সকলে পাঁচন হস্তে তাগাদগিরিগণের উপর গিয়া পড়িল, পাউণ্ড তখনও আধ ক্রোশ দূরে ছিল; যে তাগাদগিরি তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিতে আসিল, দুই পাঁচ জন রাখাল কৃষাণের হস্তে তাহাকেই সুদৃঢ় পাঁচনের রসাস্বাদন করিতে হইল। অবশেষে তাগাদগিরিরা গরু ছাড়িয়া কুঠীর দিকে পলায়ন করিল। দশমিনিটের মধ্যে ল্যাং সাহেব সংবাদ পাইলেন তাগাদগিরিদিগকে 'আধমরা' করিয়া দামুঘোষ লোকজন জুটাইয়া গরু ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, ইস্কুলের মাষ্টার রাজেন্দ্র দত্ত দামুঘোষকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে।

স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া রাজেন্দ্রনাথ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ক্রিয়া করিতে বসিলেন, মাঠের অপ্রীতিকর ঘটনায় তিনি বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন, প্রসন্ন মনে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিতেছিলেন না। আচমন করিয়া দুই একটা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন এমন সময় শুনিলেন, থানার দারোগা ও দুইজন কনেষ্টেবল স্বয়ং বহির্দ্বারে সমাগত, তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি ক্রিয়া করিতে বসিয়াছি এখন উঠিতে পারিব না। কাজ শেষ করিয়া দেখা করিব, তাঁহারা যেন ঘণ্টা দুই

দারোগা বলিয়া পাঠাইলেন, সরকারী কাজ এখনই তাঁহাকে বাহিরে আসিতে হইবে, তাঁহাদের বিলম্ব করিবার ফুরসৎ নাই।

রাজেন্দ্রনাথ অগত্যা সেই অবস্থাতেই উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। দারোগা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি থানায় চলুন, আপনার বিরুদ্ধে সিরিয়াস্ চার্জ্জ আছে।"

"আমার বিরুদ্ধে চার্জ্জ? কিসের চার্জ্জ, ফরিয়াদী কে?"

"ফরিয়াদী স্বয়ং ল্যাং সাহেব, আপনি তাঁহার তাগাদগিরিদের হাত হইতে গরু ছিনাইয়া লইয়াছেন, আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক না যাইলে আমাকে বাধ্য হইয়া আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

"আজ আমার পুত্রের অন্নপ্রাশন, অনেকগুলি লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়াছি, ক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই, এখন কি করিয়া থানায় যাই?"

দারোগা বলিলেন, "সাহেবের লোকের সঙ্গে হাঙ্গামা করিবার সময় ত সে কথা মনে ছিলনা! আপনার সঙ্গে ভদ্রতা করিতে গিয়া আমি মশায় চাকরী খোয়াইতে পারিব না, ল্যাং সাহেব স্বয়ং ফরিয়াদী না হইলে যাহা হয় করিতাম।"

রাজেন্দ্রনাথের পরিধানে গরদের ধুতি ও উত্তরীয় ছিল, অঙ্গুলী হইতে কুশ-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয় খুলিয়া ফেলিয়া তিনি থানায় চলিলেন। অন্নপ্রাশনের ক্রিয়া পড়িয়া থাকিল, তাঁহার অভাবে আর কে সে ক্রিয়া, সম্পন্ন করিবে? বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এই বিপৎপাতে অভুক্ত অবস্থায় গৃহ ত্যাগের উপক্রম করিলেন। রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রী পুত্রকে বুকে জড়াইয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া অশ্রু-ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রের জননী অন্নপ্রাশনের এই বিঘ্নে ও পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে গৃহ আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এক

খোকার অন্নপ্রাশন আর যথানিয়মে সম্পাদিত হইল না, লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রসাদ আনিয়া তাহার মুখে দিয়া কোনরূপে নিয়ম রক্ষা করা হইল। পাঁচজন আত্মীয়ের চেষ্টায় নিমন্ত্রিত লোক জন আহার করিলেন বটে, কিন্তু কাহারও মনে সুখ ছিল না। সকলে অপ্রসন্ন মনে দুই চারি গ্রাস খাইয়া উঠিলেন। রমণীগণের সকল আনন্দ তিরোহিত হইয়াছিল, নিমন্ত্রিতাগণ এই বিপদের সংবাদ শুনিয়া অনেকেই খাইতে আসিলেন না, যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে কিছু খাইলেন। রাজেন্দ্রের মাতা ও স্ত্রী জলবিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

রাজেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিবার জন্য রহিমতুল্লা দারোগা গ্রামের অনেক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন, কিন্তু অনুরোধে তিনি বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না; তিনি বলিলেন, "আপনারা বলেন কি? ল্যাং সাহেব ফরিয়াদী, আমি আসামীকে ছাড়িয়া দিয়া চাকুরী-টুকু ঘুচাইতে পারিব না। আমি উহাকে অন্যান্য আসামীর সঙ্গে মহকুমায় চালান দিব, জাণ্ট সাহেব জামিনে খালাস দিন উত্তম, না দেন আপনাদের খানা নষ্ট হইলে আমার হাত কি?"

দামু ঘোষ, পাঁচজন কৃষক ও তিন চারিজন রাখালের সঙ্গে আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাজেন্দ্রনাথকে সেই মধ্যাহ্ন রৌদ্রে বিনা ছাতায় পদব্রজে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী মহকুমায় চালান দেওয়া হইল; চারিজন কনেষ্টবল তাহাদের প্রহরী হইয়া চলিল,—হাটের লোক ছবির ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল, লজ্জায় ঘৃণায় রাজেন্দ্রনাথের মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। দারোগা দয়া করিয়া আর তাঁহার হাতে হাতকড়া লাগাইলেন না!

মহকুমার জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট সন্ধ্যাকালে রাজেন্দ্রনাথকে পঞ্চাশ

লেন, তাঁহার মাতা ও স্ত্রী জীবন্মৃতের ন্যায় বসিয়া আছেন, বাড়ী কার, তুলসী তলায় একটা দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

মা পুত্রকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, বাবার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে, এত বড় দিনটা একবিন্দু জলও মুখে ওঠেনি। চ' বাছা, এ দেশ ছেড়ে চলে যাই, ফিরিঙ্গীর অত্যাচার যেখানে নাই সেখানে যাই।"

রাজেন্দ্র নাথ নিরাশা বিজড়িত স্বরে বলিলেন, "কোথায় যাব মা, সর্ব্বত্রই এই রকম, জঙ্গলে গিয়ে বাঘ ভালুকের হাত হতে পরিত্রাণ আছে, কিন্তু ফিরিঙ্গার হাতে রক্ষা নাই। লোকজন কেউ না খেয়ে চলে যায় নি ত ?"

"আর বাবা তোর এই বিপদ, আমাদের ধড়ে কি প্রাণ ছিল, লজ্জা নিবারণ মধুস্থদন কোন রকমে কাজ শেষ করে দিয়েছেন, এখন মামলার কি হ'লো বল শুনি।"

"জামিনে খালাস দিয়েছে, দিন পড়ে গিয়েছে—কিছু টাকা জরিমাণা হবে বোধ হয়, সেজন্য আমি দুঃখিত নই, কিন্তু গরীব রাখাল কৃষাণগুলোর অদৃষ্টে কি আছে তাই ভাবছি!"

রাজেন্দ্রের স্ত্রী রাজেন্দ্রকে দেখিয়া মুখ চোখ হইতে অশ্রুর চিহ্ন মুছিয়া প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন। রাজেন্দ্র নিকটে আসিলে, তাঁহার হাত নিজের হাতে লইয়া বলিলেন—"জন্ম জন্ম যেন আমার এমন স্বামীলাভ হয়। চিরজন্ম যেন তুমি এমনি করে অত্যাচারীর হাত থেকে গরীব দুঃখীকে রক্ষা করে নিজে কষ্ট পাও।"

সহধর্ম্মিণীর মুখে এই অমৃতময়ী কথা শুনিয়া রাজেন্দ্রের চক্ষে আনন্দাশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া সকল কষ্টের অবসান হইল মনে করিলেন। তাহার পর শ্রান্ত দেহে শয্যায় পড়িয়া

যথা সময়ে মামলার বিচার হইয়া গেল। রাজেন্দ্র বিশ টাকা অর্থ অব্যাহতি লাভ করিলেন, অবশিষ্ট আসামীগণের প্রত্যেকের দুই স কারাবাস ও দশ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডের হুকুম হইল, অনাদায়ে আ দুই সপ্তাহ কারাদণ্ড। জয়েণ্ট সাহেব যখন বিচার করেন, তখন এজলাসে তাঁহার বাম পার্শ্বে ল্যাং সাহেব স্বয়ং উপবিষ্ট থাকিয়া মামলা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ফরিয়াদীর সহিত দুই একবার পরামর্শও করিতেছিলেন, আসামীর মোক্তারকে তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া ধমক খাইয়া বসিয়া পড়িতে হইয়াছিল।

জয়েণ্ট সাহেব মামলায় রায় প্রকাশ করিয়া চুরট টানিতে টানিতে ল্যাং সাহেবের টম্‌টমে উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে বসন্তপুরের কুঠীতে চলিলেন, সেদিন রাত্রে কুঠীতে সমারোহ পূর্ব্বক 'ডিনরের' আয়োজন হইয়াছিল।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে কলিকাতার ইংরাজ-সম্পাদিত এক-খানি সুপ্রসিদ্ধ দৈনিকে এই মামলার সম্বন্ধে যে প্যারা বাহির হইয়াছিল, নিম্নে আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করিলাম—

"এ দেশের উচ্চশিক্ষাভিমানী নেটিভ সম্প্রদায় আজ কাল প্রতি পদে যে ভাবে রাজভক্তিহীনতা প্রকাশ করিতেছে; তাহা কিরূপ একটা জটিল রাজনৈতিক সমস্যা (a serious political problem) তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। 'ঘুসির বদলে ঘুসি' এই ধুয়া ধরিয়া ইহারা প্রচলিত আইনকে যে ভাবে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। * * জেলায় বসন্তপুর গ্রামে Messrs Martin and Stuart কোম্পানীর এক নীলকুঠী আছে, মিঃ জন ল্যাং তাহার ম্যানেজার। ইনি একজন প্রজাহিতৈষী ও 'পাবলিক স্পিরিটেড্' জেণ্টলম্যান্। বসন্তপুরের গোয়ালারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক, তাহারা মধ্যে মধ্যে জোটবদ্ধ হইয়া নীলের জমিতে তাহাদের গরু প্রবেশ করাইয়া কোম্পানীর নীল তসরুফ করিত, মিঃ ল্যাং সেজন্য প্রথমে কোন

মন্দবুদ্ধি গোয়ালা রা এই মৌখিক নিষেধে কর্ণপাত করা আবশ্যক জ্ঞান করি
দেখি গত ২৫এ এপ্রিল প্রাতঃকালে দামু ঘোষ নামক একজন পরাক্রান্ত (influential)
অন্ধনা-সর্দ্দার তাহার ৫ গার দুই শত গরু নীলের জমিতে প্রবেশ করাইয়া নীল খাও-
হতে থাকে, তখন নীঃ ন রক্ষকগণ অগত্যা সেই সকল গরু ঘিরিয়া পাউণ্ডে তাড়াইয়া
লইয়া যাইতে উদ্যত হয়, ইহাতে স্থানীয় স্কুলের একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক স্বতঃপ্রবৃত্ত
হইয়া (voluntarily) দামু ঘোষের অনুচরগণকে উত্তেজিত করে ও নীলরক্ষকগণের
হাত হইতে গরু ছিনাইয়া লয়, তাহাদের অনেকে গুরুতররূপে আহতও হইয়াছিল।
এ দেশের ইয়ং নেটিভ গ্রাজুয়েটগণ নিত্য এই শ্রেণীর বেআইনি কার্য্যে প্রশ্রয় দান
করিয়া আসিতেছে। যাহা হউক সবডিভিজনাল অফিসারের বিচারে গ্রাজুয়েট
শিক্ষকের সামান্য অর্থদণ্ড হইয়াছে, অবস্থা বিবেচনায় ম্যাজিষ্ট্রেটের এত 'লিনি-
য়েণ্ট' ভাবে দণ্ড বিধান সঙ্গত হয় নাই; এরূপ সামান্য অর্থদণ্ডে এই শ্রেণীর
'রেজোলুসনারী স্পিরিটের লোকের আইনানুরাগ জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই।"

পুকুর পাড়ে।

পুকুর পাড়ে ব'সে ব'সে কত ভাবনাই যে ছাই ভস্ম ভাবি। কেন যে মিছে মিছে ভাবি তা জানি না।

আমরা হচ্চি একটা বনিয়াদি ঘর। স্বধু বনিয়াদি নয়, আমরা আর্য্যসন্তান, জাতিতে জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অনেক কালাবধি আমাদের দয়া, মায়া, বিদ্যা, বুদ্ধি, দান, ধ্যান ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা পৃথিবী শুদ্ধ লোক জানে। আর সেই সব কথাই এই পুকুর পাড়ে ব'সে ভাব্‌ছি। এ পুকুরটি খুব বড়, আর আমরা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল ক'রে আস্‌ছি। পুষ্করিণীটিতে এত মাছ ও এর আশে-পাশে যা জমি আছে তাতে এত গাছ-পালা যে এককালে আমাদের ফল-মূল, তরি-তরকারি ও মৎস্যাদি একেবারেই খরিদ ক'র্‌তে হোত না। এমন কি আমরা নিজেরা খেয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকৃত তাতে অনেক লোক প্রতিপালিত হ'ত—কখন হাটে বা বাজারে যেতে হ'ত না। কিন্তু কি ছিল আর কি হ'ল তাই ভাবছি।

পুকুরটি আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি—এক কালে ছিল বটে। তবে বড় পরিবারে যা ঘটে থাকে আমাদেরও তাই ঘ'টেছে। পরিবার যত বৃদ্ধি হ'তে লাগ্‌ল, জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে ততই ঈর্ষা ও কলহ বাড়্‌তে লাগ্‌ল। পরস্পরে ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি ক'রে যে কোন ফল নেই, একথা ঠাকুরদাদারা যে একেবারেই বুঝতেন না তা নয়; কিন্তু বুঝ্‌লে হবে কি, মানুষের স্বভাব যাবে কোথায়? পরস্পরের হিংসাও কম্‌ল না আর ঝগড়াও থাম্‌ল না। শনির দৃষ্টি পড়্‌ল; স্বয়ং শনি শীঘ্রই এলেন।

ঠাকুরদাদাদের এ সব ঝগড়া কেবল জ্ঞাতিবিরোধ ও সরিকে সরিকে যেমন কলহ হয়, তাই—তা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠাকুর-দাদাদের মধ্যে মনান্তর দেখে এক সুচতুর ধীবর সন্তানের মনে কিছু লোভ জন্মাল। সে মনে ক'রলে যে, জলেতে জাল ফেলে জেলেতে কি না ক'রতে পারে, কিন্তু ডাঙ্গাতে জেলের বুদ্ধি কি রকম খেলে একবার দেখ্‌তে হবে। এই মৎস্যজীবীটি দাদাদের প্রজা ও দয়ার পাত্র ছিল, কিন্তু তাহ'লে হবে কি, তার হাজারও হোক রক্তমাংসের শরীর ত? সে দাদাদের গতিক-সতিক ও কাণ্ড-কারখানা দেখে অনেক রকম মৎলব আঁট্‌তে লাগ্‌ল। সে ক্রমে ক্রমে সরিকদারদের সকলকে হাত করলে। মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা ও জুয়াচুরির বলে সে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াটি বেশ ভাল রকমে পাকা-পাকি ক'রে দিলে—কলহানল ধূ ধূ ক'রে জ্বল্‌তে লাগ্‌লে। জ্ঞাতিবিরোধ ত একটা কথার কথা হয়ে পড়েছে—জ্ঞাতিদের ভিতর ঝগড়া কাকেও বাধিয়ে দিতে হয় না, আপনিই বেধে যায়; তার উপর আবার জেলের কুমন্ত্রণা। কথায় বলে একেই মনসা তাতে আবার ধুনোর গন্ধ। খুব ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে, মামলা-মকর্দ্দমা ক'রে, এমন কি লাঠা-লাঠি ক'রে খুন-জখম পর্য্যন্ত হয়ে দাদারা যখন বিশেষ রকম কাবু হোয়ে প'ড়লেন, তখন মৃদুভাষী সুচতুর ধীবর নিজের জালটি বেশ ক'রে

ফেলে তাঁদের এক এক ক'রে সকলকে করতলস্থ ক'রলে। কিন্তু তাঁরা তখন জ্ঞাতিদ্রোহে এতদূর মুগ্ধ ও মত্ত যে তখনও তাঁদের চৈতন্য হ'ল না। তাঁরা একে একে সকলেই আপনাদের স্ব স্ব স্বত্ব সেই জেলেকে লেখা পড়া ক'রে দিলেন। যে পুষ্করিণী ও তার আশ-পাশের যে সব জমি ও বাগিচা তাঁরা বংশাবলী ধ'রে সুখে স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ ক'রছিলেন এতদিনে তা হাত ছাড়া হ'ল। একজন সামান্য মৎস্যজীবী—যে এতদিন তাঁদের যায়গায় উমেদারের ন্যায় বাস ক'রত, তাকেই কিনা মৌরস পাট্টা লিখে দেওয়া হ'ল। জেলেকে খাজনা কিছুই দিতে হবে না, সে কেবল পুকুরটার তদারক ক'রবে, ার পুকুরের মাছ যাতে চুরি না যায় ও পুকুরের উপর কেউ কোন রকমে উপদ্রব না ক'রতে পারে তা'রও বন্দবস্ত ক'রবে। আর ঐ ামস্ত ক'রতে যা কিছু খরচ হবে সে পুকুরের মাছ অল্প স্বল্প বিক্রী ক'রে তুলে নেবে। ও রও একটা সাব্যস্ত হ'ল যে দাদারা সকলেই ছিপ ও জাল দুই জিনিষ দিয়েই মাছ ধ'রতে পারবেন, কিন্তু সে কেবল নিজের খাবার জন্যে। আর তাঁরা যে জন্যই মাছ ধরুন না কেন, জেলের বিনা অনুমতিতে পুকুরের একটি বেঙ্গাচি পর্য্যন্তও ছুঁতে পারবেন না। প্রথমে জেলে নিজেও যেমন পুষ্করিণীর বন্দবস্ত করবার খরচ ব'লে মাছ বেচে বেশ দু-চার পয়সা ক'রে নিত, দাদাদেরও তেমনি আঢালাও রকমে ছিপে ও জালে দুরকমেই মাছ ধ'রতে দিত। ক্রমে জেলের লোভ বা'ড়্‌তে লা'গল, হাজার হোক ছোটলোক। সে যতই খায় ততই তার খিদে বাড়ে, যতই চুরি করে ততই তার অপহরণাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। লোকের যেমন খুন্ চাপে তারও তেমনি চুরি চা'পল। মানুষকে যেমন ভূতে পায় তাকেও তেমনি চুরিতে পেয়েছিল। যখন দেখলে যে জ্ঞাতিবর্গ সকলেই তার মুঠোর ভিতর, নড়বার-চড়বার বা ট্যা-পূ করবার ক্ষমতা নেই, তখন সে তাঁদের ভিতর

হুকুম জারি কোরে দিলে যে তাঁরা পুকুরে আর জাল ফেলতে পারবেন না। মাছ খাবার ইচ্ছে হ'লে ছিপের সাহায্যে যে মাছ পাওয়া যায় তাই খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যদি ছিপে মাছ না ওঠে তাহলে সে তাঁদের দুরদৃষ্ট। জ্ঞাতিদের মধ্যে তখন এক হাহাকার রব উঠল। তাঁরা একটি কমিটি ক'রে জেলেকুলতিলককে একখানি আবেদনপত্র দ্বারা জানালেন যে হুকুমটি তার ভাল হয়নি। আর নিজেদের ভিতর কানা-ঘুযো ক'রতে লাগলেন যে, "এ এক বেটা কোথা থেকে উড়ে এসে যুড়ে বো'সল; এ কি কথা, যে যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই।" কিন্তু জালজীবীর জালে একবার ধরা দিলে সে কি সহজে ছাড়তে চায়? সে প্রত্যুত্তরে বললে, "হাঁ, তোমরা যা ব'ল সেটা শুনলে ঠিক্ ব'লে মনে হয় বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ্‌লে বুঝতে পারবে যে তোমরা নিজেদের গলায় নিজেরা ছুরি দিতে বসেছ আমি যা করি সে কেবল পুষ্করিণীর ভালর জন্য, আর সেই সঙ্গে, বলা বাহুল্য, তোমাদেরও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে। আমার কথা শোনত ভাল, আর তা না হ'লে নিজেরাই পস্তাবে। আমি পত্তনিদার; পুকুরের যাতে ভাল হয় সে কি আর আমার ইচ্ছে নয়? আর পত্তনি লওয়ার মূল কারণই হ'চ্চে তোমাদের সকলের উন্নতি সাধন। তা না হ'লে আমার কি এত গরজ পড়েছিল যে আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই।" কথাগুলা শুনতে ভাল, আর দাদাদের জেলে যা বোঝালে তাঁরা তাই বুঝলেন। এইত গেল ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা।

আজ আমাদের অবস্থা কি ভয়ানক ও শোচনীয় তাই ব'সে ব'সে ভাবচি। আজ কিনা আমাদের নিজেদের পুকুরে চোরের মত মাছ ধরতে যেতে হয়! আজ কিনা আমাকে আহারাভাবে পুকুরের মাছ না পেয়ে স্বধু জল খেয়ে পেটভরাতে হয়! আবার শুনছি নাকি যে আর কিছুদিন গেলে জেলে বেটা—বেটা বল্‌চি ব'লেত জেলে দেবে

না ?—ভাল ক'রে জল খেতেও দেবে না। আমারও যে দশা জ্ঞাতি-ভায়াদেরও সেই দশা। পরস্পরে কলহ ক'রে জেলে বেটাকেই দেখছি বড়লোক ক'রে দেওয়া গেছে। জেলে আর তেমন মিষ্টি কথা কয় না, এখন তার সুর বদলেছে। কখন কখন যখন মেজাজ খুব ভাল থাকে তখন দু একটা ভাল কথা বলে, আর তাই শুনলেই এখন যেন প্রাণটা কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। এই যেমন সেদিন আমরা যখন তাকে ব'ল্লেম যে, "ওগো বাবা জেলেঠাকুর, তুমি আমাদের বাবার ঠাকুর, আমার মাছ না খেতে পেয়ে ম'লুম যে বাবা। পুকুরেত ঢের মাছ, এমন কি তোমার কুকুর বিড়ালটা পর্য্যন্তও আমাদের পুকুরের মাছ খেয়ে এত মোটা হোয়েছে যে ন'ড়তে পারে না। আর আমরা—হতভাগা আমরা, যারা হোলে আসল মালিক—আমর মাছ না খেতে পেয়ে মারা যাব ? —এ যে একগলা জলে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণায় মরা অপেক্ষাও কষ্টকর"।

এই সব কথা শুনে জেলেপ্রবর একটু মিষ্টি হাসি হেসে বল্লে, "বাবাজিরা বুঝ্‌বে না তা আমি কি ক'র্‌ব বল ? তোমাদের খাইয়ে যে মাছের অপব্যয় করিনি সে কেবল পুষ্করিণীটির ভালর জন্যে—তার মানে তোমাদেরই ভালর জন্যে। এই দেখ কেমন ভাল ভাল সাদা পাথরের ঘাট বেঁধেছি, কেমন সুন্দর সুন্দর বৈঠকখানা চারিদিকে প্রস্তুত ক'রে পুষ্করিণীর শোভা ও সেই সঙ্গে তার মূল্যও বৃদ্ধি করেছি। এ সব ক'রেছি ত কেবল পুকুরের মাছ বেচে—সে ঘরের পয়সা দিয়ে ত আর ক'রব না। তোমরা যদি সব মাছই খেয়ে ফেলবে তাহ'লে বেচ্‌ব আর কি ? তোমরা এমন নও যে আমার আপনার লোক ; তোমরা হ'লে ব্রাহ্মণ আর আমি হলেম জেলে, তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই, আর থাক্‌লেও রাখতে বা মানতে চাইনে। এ সত্ত্বেও আমি বিনা পয়সায় তোমাদের জন্যে কত ভাবি—এমন কি পরের ভাবনায় শিরঃ-পীড়া হবার উপক্রম হ'য়েছে। এর উপর যদি বল যে আমাকে ঘরের

পয়সা দিয়ে পুকুরের বা তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হবে তাহ'লে তোমাদের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত, দড়ির পয়সা যা লাগে তা বরং আমি নিজের গাঁট থেকে দিতে রাজী আছি।"

এই রকম ছু একটা মিষ্টি কথা আজও মাঝে মাঝে বলে। কিন্তু দেখ্‌ছি মিষ্টি কথার ভাগটা দিন দিন যেন ক'মে আস্‌ছে, আজকাল রাগের ভাবটা বেশী। কিছু ব'লতে গেলে চোক্‌ রাঙ্গান বা কামড়াতে আসবার ভাবটাই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্চে। এখন কি করি? ভাবছি তাই বসে বসে। উঃ! জ্ঞাতিদ্রোহে কি না হয়! এমন সোনার সংসার আমাদের একেবারে ছারখার হ'য়ে গেল! তাই বলি জ্ঞাতিদ্রোহী কেউ যেন কখন না হয়। বরং জ্ঞাতিতে ছুপয়সা বেশী খায় সেও ভাল, কিন্তু বাইরের লোককে নিজেদের কলহের ভিতর এনে আপনাদের সর্ব্বনাশ করা মূঢ়ের কাজ, সে সাপকে ছুধ কলা দিয়ে পোষা অপেক্ষাও খারাপ। কিন্তু ভেবে আর কি হবে? ভাবা বৃথা। বোসে বোসে ঠাকুরদাদাদের দোষ বা নিজের অদৃষ্টের দোষ ভাবলে ত আর পেট ভ'রবে না? আর এখনও যে জ্ঞাতবর্গ এককাট্টা হোয়ে জেলে বেটাকে বেশ ক'রে উত্তম মধ্যম দিয়ে সায়েস্তা ক'রে দেবে তারও কোন আশা বা সম্ভাবনা নেই। তবে এখন কি করি? শ্মশানে গিয়ে বাস করা ছাড়াত আর কোন উপায় দেখিনে। তাতেই বা দোষ কি? আমরা হচ্চি ঘোর শাক্ত—যা করেন মা কালী। অতএব এ ছুঃখ-সঙ্কুল গৃহস্থালি ছেড়ে শ্মশানে যাওয়া যাগ্‌। সেখানে গিয়ে ইষ্টদেবীর অর্থাৎ শক্তির যথাসাধ্য অর্চনা ক'রব। এস ভাই সব, দেখি সেই নীলবরণী, খর্পরখাণ্ডাধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী মহামায়ার প্রসাদে জেলে বেটার উপদ্রব ঠাণ্ডা করা যায় কি না।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যাঘ্রচর্ম্মসমাস্তীর্ণা আসন্দীতে সমাসীন রাজাকে তৈত্তিরীয়েরা মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করেন—

ব্যাঘ্রো বৈয়াঘ্রেঽধি। বিশ্রয়স্ব দিশো মহীঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু। মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ॥

হে ক্ষত্রিয়! ব্যাঘ্রচর্ম্মে ব্যাঘ্রবৎ অধিষ্ঠিত হইয়া সকল মহাদিক্ আশ্রয় কর। সমস্ত প্রজা তোমাকে কামনা করুক। রাজ্য যেন তোমা হইতে ভ্রষ্ট না হয়।

সকল বেদেই এক ধ্বনি। কিন্তু বহ্বৃচদিগের এই অভিমন্ত্রণটা নাই।

আসন্দীতে রাজা আসীন হইলে, তাঁহার স্বজনেরা বলিবেন—

ন বা অনভ্যুৎক্রুষ্টঃ ক্ষত্রিয়ো বীর্যাং কর্ত্তুমর্হত্যভ্যেনমুৎক্রোশাম।

চতুর্দ্দিকে ঘোষণা না হইলে ক্ষত্রিয় বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব চল, ইঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত করি।

আবার বলিবেন—

তথা।

তাই বটে।

তখন রাজস্বজনেরা এই মন্ত্রে ঘোষণা করিবেন—

ইমং জনা অভ্যুৎক্রোশত সম্রাজং সাম্রাজ্যং ভোজং ভোজপিতরং স্বরাজং স্বারাজ্যং বিরাজং বৈরাজ্যং পরমেষ্ঠিনং পারমেষ্ঠ্যং রাজানং রাজপিতরং ক্ষত্রমজনি ক্ষত্রিয়োঽজনি বিশ্বস্য ভূতস্যাধিপতিরজনি বিশামত্তাঽজন্যমিত্রাণাং হন্তাঽজনি ব্রাহ্মণানাং গোপ্তাঽজনি ধর্ম্মস্য গোপ্তাঽজনি।

হে জনগণ! তোমরা ইঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত কর—ইনি সম্রাট্ সাম্রাজ্যদক্ষ, ভোক্তা, ভোগপালক, স্বরাট্, স্বারাজ্যদক্ষ, বিরাট্, বৈরাজ্য-দক্ষ, প্রজাপতিরূপী, প্রজাপতিপদলাভের যোগ্য, রাজা, সকল রাজার পালক। ক্ষত্রজাতি জন্মিল, ক্ষত্রিয় জন্মিল, সর্ব্বভূতের অধিপতি

ল, প্রজাগণের ভোক্তা* জন্মিল, শত্রুগণের হন্তা জন্মিল, ব্রাহ্মণগণের ক্ষক জন্মিল, ধর্ম্মের রক্ষক জন্মিল।

সেকালের প্রক্লেমেশন্ এইরূপ ছিল। "ধর্ম্মস্য গোপ্তা" ইংলণ্ডের রাজারও এক উপাধি। বলা বাহুল্য, সে ধর্ম্মের অর্থ চর্চ্চ্ অব্ ইংলণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম্ম।

ঘোষণার পরে আচার্য্য রাজাকে এই ঋকে* অভিমন্ত্রিত করিবেন—

নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা সাম্রাজ্যায় ভৌজ্যায় স্বারাজ্যায় বৈরাজ্যায় পারমেষ্ঠ্যায় রাজ্যায় মাহারাজ্যায়াধিপত্যায় স্বাবশ্যায়াতিষ্ঠায় সুক্রতুঃ।

সকল অশুভের নিবারয়িতা, ধৃতব্রত, শোভনসঙ্কল্প ইন্দ্র গৃহে আগমন করিয়া সাম্রাজ্য প্রভৃতি সিদ্ধির জন্য এই আসন্দীতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

এই ঋকের প্রকৃত দেবতা বরুণ। এখানে প্রকরণের অনুরোধে ভাষ্যকার ইন্দ্র বুঝিয়াছেন। ইন্দ্রকেই নাকি দেবতারা প্রথম এই অভিষেকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত ঋকে আচার্য্য রাজাকে ইন্দ্রের কথা স্মরণ করাইতেছেন। যিনি

রথীতমং রথীনাম্······জেতারমপরাজিতম্—

যিনি বজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীম উগ্রঃ
সহস্রচেতাঃ শতনীথ ঋভ্বা—

যিনি শূরোভির্হব্যো যশ্চ ভীরুভি
যো ধাবদ্ভির্হূয়তে যশ্চ জিগ্যুভিঃ—

---

* ঐতরেয়ব্রাহ্মণের অনেক স্থানে আছে, অশ্নুতেহ প্রজানামৈশ্বর্য্যমাধিপত্যম্। প্রজাগণের ঈশ্বরত্ব অধিপতিত্ব লাভ করে। এ প্রজাভোগের অর্থও তাই।

* ঋগ্বেদসংহিতা, ১।২৫।১০। ভৌজ্যায় হইতে আতিষ্ঠায় পর্য্যন্ত পদগুলি ব্রাহ্মণে বেশী আছে। এইরূপ মন্ত্রের নাম প্রপদ।

যিনি   পতির্বভূথাসমো জনানাম্

একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা—

সেই ইন্দ্র। আদর্শ মহৎ ছিল কি!

আমি বলিয়াছি, এই ঐন্দ্র মহাভিষেক ও রাজসূয়ের পুনরভিষেক অনেকটা একরূপ। প্রভেদও আছে। দ্বিতীয়ে, অভিষেকের পূর্ব্বে অভিষেকজলের শান্তিবাচন করিতে হয়। প্রথমে তাহা নাই। শান্তি-বাচনের মন্ত্র এই। আগে ঋত্বিক্, পরে যজমান বলিবেন—

শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ
শিবয়া তন্বোপস্পৃশত ত্বচং মে।
সর্ব্বাঁ অগ্নীঁরপ্সুষদো হুবে বো
ময়ি বর্চো বলমোজো নিধত্ত॥

হে জলদেবতাগণ! শান্ত নেত্রে আমাকে দর্শন করিও, শান্ত তনুতে আমার ত্বক্ স্পর্শ করিও। তোমাদের জলস্থিত বাড়বাদি সকল অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, আমার মধ্যে কান্তি বল ওজঃ নিহিত কর।

শান্তিজলেও অগ্নির আবাহন! বর্চো বলম্ ওজঃ, তাছাড়া কামনা ছিলনা।

এখন অভিষেক। আসন্দীতে রাজা পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবেন। পত্নীও পার্শ্বে বসিবেন, কেন না এ সকল কর্ম্মে দম্পতীর সহাধিকার। সম্মুখে আচার্য্য পশ্চিমমুখ হইয়া দাঁড়াইবেন। এবং রাজার শীর্ষদেশে একটী আর্দ্রপত্রযুক্ত যজ্ঞডুমুরের শাখা ও একটী সুবর্ণময় কুশাগ্র রাখিয়া তার উপরে পূর্ব্বকল্পিত অভিষেকবারি এই ঋক্, এই যজুঃ, এই ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিতে করিতে ঢালিয়া দিবেন—

"ইমা আপঃ শিবতমা ইমা সর্ব্বস্য ভেষাদীঃ।

যাভিরিন্দ্রমভ্যষিঞ্চং প্রজাপতিঃ
সোমং রাজানং বরুণং যমং মনুম্।
তাভিরদ্ভিরভিষিঞ্চামি ত্বামহং
রাজ্ঞাং ত্বমাধিরাজো ভবেহ॥

মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥

দেবস্যত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নেস্তেজসা সূর্য্যস্য বর্চসেন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণাভিষিঞ্চামি বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽন্নাথায়। ভূর্ভুবঃ স্বঃ॥

এই অভিষেকবারি অতিশয় শান্তিকর। ইহা দারিদ্র্যাদি সকল রোগের ঔষধস্বরূপ। ইহা রাজ্যের অভিবৃদ্ধিহেতু। ইহা রাজ্যের ধারক এবং বিনাশরহিত।

হে ক্ষত্রিয়! যে বারিতে প্রজাপতি ইন্দ্র সোম বরুণ যম এবং মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই বারিতে আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি ইহজগতে সকল রাজার অধিরাজ হও।

হে ক্ষত্রিয়! তোমার জননীদেবী তোমাকে সকল মহাপুরুষের মহান্, সকল মনুষ্যের সম্রাট করিয়া প্রসব করিয়াছিলেন। তোমার জননী দেবী পুণ্যাত্মা।

হে ক্ষত্রিয়! প্রেরক দেব পরমেশ্বরের অনুজ্ঞায় বল সম্পৎ কীর্ত্তি এবং অন্নসমৃদ্ধির জন্য আমি অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বারা, পূষার হস্তদ্বারা, সূর্য্যের কান্তিদ্বারা, এবং ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়সামর্থ্যদ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি।”

তেজঃ, বর্চ্চঃ, ইন্দ্রিয়, বল, শ্রী, কীর্ত্তি! রাগ বহাল্ আছে। প্রথম তিনটা ঋক্, চতুর্থটা যজুঃ।

প্রাচ্যাং ত্বা দিশি বসবো দেবাঃ ষড়্‌ভিশ্চ পঞ্চবিংশৈরহোভিরভিষিঞ্চন্তু তেন চ তৃচেনৈতেন চ যজুষৈতাভিশ্চ ব্যাহৃতিভিঃ সাম্রাজ্যায়। দক্ষিণস্যাং ত্বা দিশি রুদ্রা দেবাঃ ষড়্‌ভিশ্চ পঞ্চবিংশৈরহোভিরাভিষিঞ্চন্তেতেন চ তৃচেনৈতেন চ যজুষৈতাভিশ্চ ব্যাহৃতিভির্ভৌজ্যায়।

ইত্যাদি। অভিষেক হইল। এখন দক্ষিণা। অভিষেক্তা ব্রাহ্মণকে রাজা সহস্রনিষ্কপরিমিত সুবর্ণ, ভূমি এবং পশু দান করিবেন। পারিলে আরও দিবেন। হে ইংরেজ! পরিহাস করিতেছি না, বিধিই এই।

তারপর—আমি যেমন আছে তেমনই লিখিতেছি—তারপর আচার্য্য এককাংস্যপাত্র সুরায় পূর্ণ করিয়া রাজার হাতে দিবেন। দিবার কালে মন্ত্রে বলিবেন—

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ॥

হে সোম! তোমার স্বাদুতম মদিরতম ধারায় যজমানকে শোধিত কর। ইন্দ্রের পানার্থ তুমি অভিষুত হইয়াছ।

রাজা সেই কাংস্যপাত্রস্থ সুরা এই দুই মন্ত্রে পান করিবেন—

যদত্র শিষ্টং রসিনঃ সুতস্য
যদিন্দ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ।
ইদং তদস্য মনসা শিবেন
সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি॥
অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে।
তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্‌॥

ইন্দ্র যাহা কর্ম্মবিশেষের দ্বারা সংস্কৃত করিয়া পান করিয়াছিলেন, এই পাত্রে সেই রসযুক্ত অভিষুত দ্রব্যের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, শান্তমনে সোমতুল্য সেইটুকু আমি এই পান করিতেছি।

হে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে, অভিষুত দ্রব্য

অপিবৎ শচীভিঃ—ডাক্তার মার্টিন্ হগ্ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন Drank with his associates. শচীতে তিনি সচিব বুঝিয়াছেন! ইন্দ্রাণী বুঝিলে এ মদিষ্ঠা সুরা আরও মাদিনী হয়। কিন্তু অনুবাদ হয় না। বেদে শচীশব্দে বাক্য, কর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা বুঝায়, আর কিছু বুঝায় না। সচিবও না, ইন্দ্রাণীও না।

সুরাপান করিয়া রাজা এই দুই ঋক্ উচ্চারণ করিবেন—

অপাম সোমমমৃতা অভূমা
গন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ
কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য ॥

শংনো ভব হৃদ আ পীত ইন্দো
পিতেব সোম সূনো সুশেবঃ।
সখেব সখ্য উরুশংস ধীরঃ
প্রণ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ ॥

হে মরণহীন সোম! তোমাকে পান করি, তবে আমরাও অমৃত হইব। আমরা দ্যুতিমান্ স্বর্গলোকে গিয়াছি, আমরা দেবতাদিগকে চিনিয়াছি। শত্রুতে আর এখন আমাদের কি করিবে? মানুষ হই, তবু বা হিংসকে আমাদের কি করিবে?

হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার সুখকর হয়েন, পীত হইয়া তুমিও আমাদের হৃদয়ের সেইরূপ সুখকর হও! হে বহু-কীর্ত্তি! তুমি ধীর, জীবনের জন্য আমাদের আয়ুঃ বর্দ্ধিত কর।

রাজসূয়েও যজমানকে সুরা পান করিতে হয়। যৎ সুরা ভবতি ক্ষত্ররূপং তৎ। রাগ কর আর যাই কর, ক্ষত্রিয়েরা মদ খাইত।

মিতাক্ষরাকার দেখাইয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রেও পৈষ্টী * সুরা ছাড়া আর কোন সুরা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। লাইকর্গসের বিধানে যে যবন মাংসও কদাচিৎ খাইতে পাইত মাত্র, তারও সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল না। বৃথামাংস ভক্ষণ ক্ষত্রিয়ের নিষিদ্ধ, কিন্তু সুরাপানে আমি বৃথা অবৃথা পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তারা অমিতপায়ী ছিল, এমত দেখাইতে পারিবে না। বেদোক্ত ক্ষত্রিয়েও না, স্পার্টাবাসী যবনেও না। হিমালয় পাদে থাকিয়াও ক্ষত্রিয় ইংরেজের পূর্ব্বপুরুষ টিউটন্‌জাতির মত চিরন্তন-শিশিরযামিনী অবিরলগলজ্জ্বলিত সুরায় জ্বালাইয়া রাখিত না। তবু একটা কথা নজর করিবার আছে। পাঠক দেখিবেন, পানমন্ত্রগুলির সকলেরই দেবতা সোম। সোমরস বেদের পবিত্র পান। মার্টিন্ হগ্ নিজমুখে খাইয়া দেখিয়াছেন, সে রস সুরার মত স্বাদু বা মাদক নয়। যাগে ছাড়া ত খাইবার বিধিও নাই। অভিষেকসুরায় সেই সোমের আরোপ হইতেছে। একটা অর্থবাদে তাহা আরও পরিস্ফুট—

যো হ বাব সোমপীথঃ সুরায়াং প্রবিষ্টঃ সহৈবৈতনৈন্দ্রেণ মহাভিষেকেণাভিষিক্তস্য ক্ষত্রিয়স্য ভক্ষিতো ভবতি ন সুরা।

ইহাতে আমার এই বিবেচনা হয় যে, হয়ত পরম্পরাগত আচারের অনুরোধেই কচিৎ সুরাপান বিহিত হইয়াছিল।

বলিয়াছি, তৈত্তিরীয়কল্পে অভিষেকের পর রাজাকে রথারোহণ করিতে হয়। রথে চড়িয়া অভিষিক্ত রাজা জনপদে বাহির হইতেন। কত শত প্রজারা আসিয়া তাঁর রথ ঘিরিয়া দাঁড়াইত। রাজা প্রার্থনা করিতেন—

অন্নবতামোদনবতামামিক্ষবতামেষাং রাজা ভূয়াসম্।

প্রভূতভক্ষ্যযুত প্রভূতঅন্নযুত প্রভূতক্ষীরাদিরসযুত—যেন এমন গ্রামসমূহের রাজা হই।

---

* ব্রীহিযবাদি অন্নের বিকারে যাহা জন্মে। যথা ধেনো বা হুইস্কি।

কিন্তু তৈত্তিরীয়ের রথ অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে।

এ দেশেও অভিষেক ছিল, দেখাইলাম। যে স্পর্দ্ধিনী ধারণা এই মহাভিষেক কল্পিত করিয়াছিল, তাও এই দেশের। বল, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের এত তৃষা বুঝি কোনও জাতির ছিল না। অধঃপাতও এমন কোনও জাতির হয় নাই। যে বলিষ্ঠ ওজোঘন অপূর্ব্ব শব্দবন্ধে সে বলিষ্ঠা ধারণা শরীরিণী হইয়াছিল, বার বার পাঠককে বিরক্ত করিয়া আমি তাহাও তুলিয়া দেখাইয়াছি। তিন সহস্র বৎসর পরে আজিও তাহা তেমনই বলিষ্ঠ, নষ্ট পৌরুষের মহারসায়ন।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গুহ।

কলাশিক্ষা।

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে কলাভ্যাস সম্বন্ধে অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করা গিয়াছে। তন্মধ্যে কলাশিক্ষার সোপানও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা গিয়াছে। স্থূলতঃ তিনটি সোপান উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) দেশের যাবতীয় কারুকর্ম্মালয়—অর্থাৎ দেশের প্রত্যেক কারুকের কর্ম্মস্থান; (২) করশিক্ষালয় বা ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুল—ইহা এদেশে নাই, কিন্তু আবশ্যক; (৩) দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিদেশের টেক্‌নিকাল কলেজ। এক্ষণে ঐ তিনটি সোপান সম্বন্ধে দুই

কলা বিষয়ক যে কোন চেষ্টাতেই অর্থের প্রয়োজন হয়। দুই কারণে অর্থ আবশ্যক। (১) প্রচলিত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া কোন কলার উন্নতি আবিষ্কারে যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহার এবং তাহার পরিবারের ভরণ-পোষণ আবশ্যক। যে কারুক দিন আনে দিন খায়, তাহার পক্ষে বৃথা 'কাজে,' ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় সময় ক্ষেপণ অসম্ভব। যাঁহারা দেশের কলাজীবীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন যে, তাহারা যাহা নিত্য উৎপাদন করিতেছে, তাহাদের পরিবার পোষণের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। আমি প্রকৃত কলাজীবীদিগের কথাই বলিতেছি, কলাজীবীর শ্রমে যাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাহারা নিজেরা হাতে কোন কলার কাজ করিয়া থাকে, কলিকাতা ছাড়া অন্যত্র তাহাদের তুল্য নিঃস্ব অল্প দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যে কত লোক ঋণগ্রস্ত, কত লোকের ঘরের চালে খড় নাই, অনুসন্ধান করিলেই তাহাদের সংখ্যা পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, কারুক নিজের দক্ষিণহস্তস্বরূপ যন্ত্রগুলিকে মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়া দিন চালাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কোথাও কোন কালে কোন কলার উন্নতি হয় নাই।

দেশী ও বিলাতি জিনিসের একটা বিশেষ প্রভেদ এই দেখা যায় যে, বিলাতি জিনিসের—যেমন জিনিসই হউক, তাহার একটা বাহ্য চাক্‌চিক্য থাকে, সে প্রকার চাক্‌চিক্য দেশী জিনিসের থাকে না; দ্বিতীয়তঃ দেশী জিনিস দেশে তৈয়ারি বলিয়াই হউক, কিংবা বিলাতি জিনিস বাক্‌সবন্দী করিয়া এদেশে আনিতে হয় বলিয়াই হউক, যে সে বিলাতি জিনিস বাক্‌সর ভিতরে, কাগজে মোড়াই হইয়া এদেশে আসে। ক্রেতা ভুলাইবার—বিশেষতঃ এদেশের ক্রেতা ভুলাইবার এমন উপকরণ আর একটি নাই বলিলেই চলে। বস্তুতঃ যে নিজের তৈয়ারি জিনিসের

কিন্তু উৎপন্ন জিনিসের বাহ্য চাক্‌চিক্য বৃদ্ধি করিতে গেলে সময় আবশ্যক, এবং সময় মূল্যবান্‌। সকল কারিগরই জানে বাহ্য চাক্‌চিক্যে ক্রেতা ভুলাইতে পারা যায়; কিন্তু সেই চাক্‌চিক্যের নিমিত্ত ক্রেতা অধিক মূল্য দিবে কি না, তদ্‌বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ থাকে। আজকালকার সস্তার বাজারে উৎকৃষ্ট দেশী জিনিসের ক্রেতা অল্প। কখন্‌ কবে কোন্‌ সৌখিন ক্রেতা আসিয়া জুটিবে, তাহার আশায় নিঃস্ব কারিগর বসিয়া থাকিতে পারে না।

উৎপন্ন দ্রব্যের চাক্‌চিক্য বৃদ্ধি নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ যন্ত্র ও উপকরণ আবশ্যক। যন্ত্র থাকিলেও উপকরণ জুটে না, উপকরণ থাকিলেও যন্ত্র জুটে না। বিদ্যা ও কলার মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, বিদ্যা চর্চ্চার নিমিত্ত পুস্তকালয় বা লাইব্রেরী আবশ্যক, কিন্তু কলাভ্যাসের নিমিত্ত তদ্‌ব্যতীত যন্ত্র ও উপকরণ আবশ্যক। আজকাল অনেক স্থলে বিনামূল্যে লাইব্রেরী ব্যবহার করিতে পারা যায়, কিন্তু দেশের মধ্যে এমন কোন একটি কারখানা আছে কি, যেখানে বসিয়া বিনামূল্যে কোন কলার উন্নতির চেষ্টা করা যাইতে পারে? অনেক সময়ে অনেক কারিগরের মাথায় নূতন নূতন খেয়াল প্রবেশ করে, কিন্তু অর্থ অভাবে, সুযোগ অভাবে সেই খেয়াল মাথা হইতে বাহিরে আসিতে পারে না। বিলাতে লোকের খেয়াল কাজে পরিণত করিবার নিমিত্ত লোক আছে; খেয়ালটা কাজে লাগিতে পারে কি না, অন্ততঃ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও লোক পাওয়া যায়। এখানে যাহার খেয়াল, তাহাকেই সমুদয় যোগাড় করিয়া লইতে হয়। তাহাতেও আপত্তি থাকিত না, যদি খেয়ালমাত্রেই কাজে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিত।

আমাদের দেশের কারিগরেরা যে যৎসামান্য যন্ত্র ব্যবহার করিয়া কাজ সুসম্পন্ন করে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অন্ততঃ

দুই খানা পা, বিলাতি কারিগরের যন্ত্র বিশেষ অপেক্ষাও বহুমূল্যবান্। তথাপি, বিভিন্ন কাজের নিমিত্ত তদুপযোগী যন্ত্র পাইয়া বিলাতি কারিগর যত অল্প সময়ে কাজগুলি শেষ করিতে পারে, দেশী কারিগরের ভাগ্যে তাহা কোথায়? একজন কামারকে একটা পেঁচ বা স্ক্রুপ কাটিতে দিলে তাহাকে হয়ত প্রথমে লোহা পিটিয়া পিটিয়া সরু ও গোল করিতে হইবে, উখা দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া সমান করিতে হইবে, এবং শেষে হয়ত উখা দ্বারাই দাঁত কাটিতে হইবে। দেশী জিনিস সস্তা না হইবার এই এক প্রধান কারণ। অর্থাৎ পরিশ্রম যতই সুলভ হউক, কলের ও হাতের কাজ কখন সমান মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে না।

প্রদেশবিশেষে এক এক কলার উৎকর্ষ দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঢাকার ও কটকের রূপার তারের কাজ ধরুন। দুই জায়গাতেই তারের কাজ হয় বটে, কিন্তু কটকের সেকরা যত সরু তারে কাজ করে, ঢাকার সেকরা তত সরু তারে কাজ করিতে পারে না। কিন্তু কটকের তারের কাজের পরিকল্পনা (design) উৎকৃষ্ট হইলেও তাহাতে বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষিত হয়, ঢাকার কাজের পরিকল্পনা উৎকৃষ্ট না হইলেও তাহাতে পরিকল্পনার শৌর্য্য (boldness of design) প্রকাশ পায়। উভয়েই সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু উহাদের যোগে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইতে পারে। যদি ঢাকার সেকরা কটকে, এবং কটকের সেকরা ঢাকায় গিয়া কাজ শিখিয়া আসিতে পারিত, তাহা হইলে উক্ত কলারও কতকটা উন্নতি হইতে পারিত। আমাদের কারিগরেরা স্ব স্ব কলায় কেন উন্নতি দেখাইতে পারে না, তাহার কারণ উল্লেখ করা গেল। দেখা গেল, মূলে তাহাদের অর্থাভাব বিদ্যমান। আরও একটি বিশিষ্ট অভাব, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষাভাব। কলাতেও বিদ্যা আবশ্যক। যে জ্ঞান অপরে সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করিতে গেলে তাহার নিকট প্রত্যক্ষ শিষ্য হইতে হয়, তদভাবে তাহার সঞ্চিত জ্ঞানের দ্বার-

স্বরূপ তাহার লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের ভাষায় এরূপ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক নাই। তার উপর, দেশের অধিকাংশ কারিগর দেশের ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে পারে না। বিদেশীয় ভাষায় প্রায় প্রত্যেক কলা সম্বন্ধেই কোন না কোন বই আছে। সেই সকল বহিতে যে জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে, তাহাও পাইলে আমাদের কারিগরেরা স্ব স্ব অবলম্বিত কলায় নূতন যুগ আনয়ন করিতে পারিত। আমি এমন দশটা উদাহরণ দিতে পারি, যেখানে যৎসামান্য দুই চারিটা সঙ্কেত পাইয়া কারিগর তাহার কাজে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিয়াছে। স্বয়ং উদ্ভাবনা করিতে পারিলে ত কথাই নাই। কিন্তু যাহা অপরে উদ্ভাবনা করিয়াছে, তাহা হইতেও বঞ্চিত হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। তাহা ছাড়া, যাহা কেহ জানিয়াছে, জানাইয়াছে; অপরে কেহ তাহাই আবিষ্কার করিতে বসিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না, অধিকন্তু সময়ের ও শক্তির অপচয় হয়। নিজের আবিষ্কার জগতে প্রচার করা, বিদ্যাব্যবসায়ীরা ধর্ম্মের মধ্যে গণনা করেন। কিন্তু সেইরূপ আবিষ্কার কলাব্যবসায়ী প্রায়ই গোপন করিয়া কিংবা নিজের আবিষ্কার-সত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। বিদ্যা ও কলার মধ্যে এই এক বিশেষ প্রভেদ আছে। বিদ্যা উদার, কলা অনুদার। কেহ কোন কলাবিষয়ে বিপুল গ্রন্থ লিখিলেও আসল জায়গাটিতে ফাঁক দেখা যায়। কলার সহিত অর্থের সম্বন্ধ থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। এই দোষ যে বিদেশীয়দিগেরই আছে, তাহা নহে। আমাদের দেশীয় কারিগরেরা স্ব স্ব কলা বিষয়ে স্বদেশীয়েরই নিকট মূক হইয়া থাকে। আশঙ্কা, পাছে গুপ্তবিদ্যা প্রকাশ পাইয়া তাহারা নিরন্ন হয়। এই আশঙ্কা এদেশেও যেমন, বিদেশেও তেমন, এবং কতটা স্বাভাবিক। তথাপি কলা বিষয়ে অনেক স্থূল স্থূল উপদেশ বিদেশীয় ভাষায় পুঞ্জীকৃত

আবশ্যক, কিংবা স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন। উভয় কল্পেই অর্থ আবশ্যক।

ম্যানুয়েল ট্রেনিংস্কুলে বিদ্যার সহিত কলার সংযোগ ঘটে। বিদ্যাকে ছাড়িয়া কেবল কলাশিক্ষা করিতে হইলে কারুকর্ম্মালয় বা ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল স্কুলে যাইতে হয়। এইরূপে ঐ দুই স্কুলের মধ্যে পার্থক্য দেখান যাইতে পারে। যতক্ষণ কেবল কলা (practice) লইয়া সন্তুষ্ট, ততক্ষণ উন্নতির পথ রুদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন। উহার সহিত বিদ্যার (theory) যোগ হইলে সোণায় সোহাগা, উন্নতির পথ স্পষ্ট হয়। এই জন্যই কারু-কর্ম্মালয়ের উপরে কলাভবনের স্থান দিতে হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা গিয়াছে যে, কলাভবনে কোন বিশেষ কলা শিখান হয় না, অথচ সকল কলার ভিত্তি স্থাপিত হয়। দেশের অবস্থানুসারে বলিতে গেলে দরিদ্র-দিগের নিমিত্ত কারুকর্ম্মালয়, তদপেক্ষা ভাল অবস্থাপন্ন কলাজীবীর নিমিত্ত কলাভবন। লেখাপড়ার মর্য্যাদা সকলেই বুঝে। কারুকের অবস্থায় কুলায় না বলিয়াই সে নিজের ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতে পারে না। কিন্তু যে কারুকের বা কলাজীবীর অবস্থায় কুলায়, আমার বিশ্বাস, কলাভবন থাকিলে সে তাহার ছেলেকে সেখানে শিক্ষালাভের নিমিত্ত পাঠাইতে ইচ্ছা করিবে। কারণ কলাভবনে দক্ষ হইয়া আসিলে তাহার পৈতৃক কলায় শ্রীবৃদ্ধি করিবার আশা থাকে। চাকরির দুর্গতি ও দুর্লভতা অনেকেই আজকাল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সুতরাং আশা হয় কলাভবনে ছাত্রের অভাব হইবে না।

বিলাতের ধনীলোকদিগের প্রায়ই একটা না একটা সখ থাকে। এদেশেও ধনীদিগের সখ আছে। কিন্তু এই সখ বদ্‌খেয়াল না হইয়া যদি সকল স্থানেই সংখেয়াল হইত, তাহা হইলে দেশের অনেক ভাবনা ক্রমশঃ কম হইতে পারিত। বিলাতেও বদ্‌খেয়ালী নাই, এমন নহে। কিন্তু সংখেয়ালীও অনেক আছে। আমাদের দেশে একপ সংখেয়ালীর

সংখ্যা কত, তাহা সকলেরই জানা আছে। এক একটা সখে ঝোঁক, এমন ঝোঁক যে তাহার নিমিত্ত অর্থ, সময় ও চিন্তা ব্যয় করিতে মনের কিছু মাত্র দ্বিধা না থাকা—এরূপ ঝোঁক, উন্মত্ততা থাকিলে কিছু না কিছু ফল ঘটেই। সেই সখে ঝোঁকের সহিত কিঞ্চিৎ চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতা থাকিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ ঝোঁকের সহিত সখ মিটাইতে গিয়া বিলাতে যে কত বিদ্যার, কত কলার উন্নতি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রত্যেক বিদ্যাতেই, প্রত্যেক কলাতেই এই সকল সখের লোকদিগের হাত দেখিতে পাই। এদেশে এই রকম সখের দলের সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বিদ্যা, কোন কলা লইয়া বিদেশীর নিকট স্পর্দ্ধা করিবার কিছুই জন্মিবে না। সমগ্র দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল বঙ্গদেশের পঞ্চাশ জন ধনী রাজা বা জমীদার পঞ্চাশটা কলা সখ করিয়া বসেন,—ভাবুন দেখি, তাহা হইলে কাহারও কাছে আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতে হয় কি? অপর পঁচিশ জন রাজা বা জমীদার যদি পঁচিশটা বিদ্যার উন্নতি কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এদেশের একটা যুগান্তর উপস্থিত হয় না কি? এই রকম সখের দিকে যখন দেশে ধনাঢ্যদিগের মতিগতি হইবে, তখনই দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে, নতুবা নহে।

ইচ্ছা করিলে অনেক ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড কলাশিক্ষার সাহায্য করিতে পারেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদ্যা ও কলাকে পৃথক্ রাখিয়া কেবল বিদ্যা প্রচারের দিকেই মনোযোগ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কলা-প্রচারের দিকে মনোযোগ করিলে শিক্ষণীয় দুইটি অঙ্গের পূর্ণতা ও সাফল্য হয়। দেশের দুই এক স্থানে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলের—কোন বিশেষ কলার অভাব মোচনের প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বর্ত্তমান কারুকরদিগকে উৎসাহদান করিলেও অনেক

বার্ষিক রিপোর্টে নাম লিখিয়া নহে; অতিরিক্ত কিছু চাই। সেই অতিরিক্তের সহিত অর্থের সম্বন্ধ আছে। কারুক দুইটি জিনিস বুঝে। (১) অর্থচিন্তা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ, (২) আকাঙ্ক্ষিত অস্ত্র বা যন্ত্রলাভ। প্রথমটি সকলেই বুঝে। দ্বিতীয়টি বিদ্যাব্যবসায়ীর বাঞ্ছিত পুস্তকলাভ অপেক্ষাও কলাব্যবসায়ীর পক্ষে অধিক মূল্যবান্। কারণ যন্ত্র তাহার ভবিষ্যতে অর্থলাভের উপায়স্বরূপ। অবশ্য কলা-ভেদে এরূপ যন্ত্র বা উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে। শিল্প বা কলাপ্রদর্শনীতে বাজে প্রশংসাপত্র বা টাকা না দিয়া এইরূপ আবশ্যক যন্ত্র বা উপকরণ পুরস্কারস্বরূপ দান করিলে শিল্পী বা কলাজীবী পুরস্কারলাভে বাস্তবিকই লাভবান্ হইতে পারে।

কলাশিক্ষার শেষ সীমা এক এক কলাতে পারদর্শিতালাভ। কলাভবনে কলাশিক্ষার ভিত্তি, টেক্‌নিকাল স্কুল বা কলেজে তাহার পরিণতি। ইহা নানা দেশে নানা নামে পরিচিত। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য, দক্ষ কলাবান্ করা। দুই একটা কলা শিখিবার পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। কিন্তু সেই দুই একটা ব্যতীত এদেশে বিশেষ বিশেষ কলাতে দক্ষতালাভের নিমিত্ত আবশ্যকীয় কলেজ নাই। স্থূলতঃ বলা গেল, নাই; কিন্তু পরে দেখা যাইবে যে, অজ্ঞাতভাবে অনেকগুলি আছে।

এদেশে টেক্‌নিকাল কলেজ বা উচ্চশ্রেণীর কলাভবন নাই দেখিয়া, যাঁহারা পারেন, তাঁহারা বিদেশে শিক্ষা নিমিত্ত যাইতেছেন। এই সকল বিদেশ যাত্রীদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তন্মধ্যে দুই চারিটি স্থূল স্থূল কথা বলা যাইতেছে। জাপানে কলাভ্যাস করিয়া কেহ কেহ দেশে ফিরিয়াছেন। এপর্য্যন্ত শুনি নাই; তাঁহারা দেশে আসিয়া কি করিতেছেন। সম্ভবতঃ এখনও কলাভ্যাসের সার্থকতা

গিয়া কলাভ্যাস করিতে চান, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে উপকার হইতে পারে। ১ম, যুবক-নির্ব্বাচন। বলা বাহুল্য, যে সে যুবক জাপানে গেলেই কৃতকর্ম্মা হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না। যিনিই যাইবেন, তাঁহারই উন্নতি হইতে পারে, চোখ ফুটিতে পারে; কিন্তু এখানে তাঁহাদের ব্যক্তিগত উন্নতি অবনতির কথা আলোচ্য নহে। জাপানগমনে যাঁহাদিগের দ্বারা দেশের কিছু উন্নতি হইতে পারে, তাঁহাদিগেরই কথা হইতেছে। এইরূপ উন্নতির আশা করিলে সাবধানে যুবক বাছাই করিয়া বিদেশে পাঠান কর্ত্তব্য। কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে দেখিতে পাই, শতকরা ৪।৫ জন কলা-অভ্যাসের উপযুক্ত, বাকি ছাত্র নানা কারণে অযোগ্য। রসায়নে এম্, এ, অন্ততঃ বি, এস্, সি, পরীক্ষায় যুবকের উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কারণ এমন কলাই নাই, যাহাতে রসায়নবিদ্যা না লাগে। চিত্রাঙ্কনাদি দুই চারিটি সুকুমার কলায় রসায়নজ্ঞান আবশ্যক না হইতে পারে। যে সকল কলাশিক্ষার নিমিত্ত যুবকেরা জাপানে প্রেরিত হইতেছে, এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া গেলে বহুকাল প্রবাসভোগ ও বহু অর্থব্যয় ঘটে।

২য়, এদেশে কলাশিক্ষা। এদেশে কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যাওয়া যেমন আবশ্যক, এদেশেই কলেজের বাহিরে নির্বাচিত কলাশিক্ষা সমাপ্ত করা তেমনই আবশ্যক। কোন্ কলা শিখিতে পাঠান হইবে, যিনি পাঠাইবেন, তাহা তিনি অবশ্য বিচার করিবেন। যদি একটা সাধারণ নিয়ম বলিতে হয়, তাহা হইলে সেই কলা, যে কলা এ দেশে আদৌ নাই অথচ সেই কলাজাত বিদেশীয় দ্রব্যের বহুল আমদানি আছে, কিংবা যে কলা এ দেশে যৎসামান্য ভাবে আছে অথচ উন্নতি বাঞ্ছনীয়,—সেইরূপ কলা শিখিতে পাঠান কর্ত্তব্য। শিক্ষণীয় কলা এইরূপে ভাগ

অবলম্বন করিবার সুযোগ, সমুদয় বিবেচনা করা আবশ্যক। কলা নির্ব্বাচিত হইলেই পাঠান উচিত নহে। বোধ করি, বিদেশে এমন কোন কলা নাই; যাহা কোন না কোন আকারে কোন না কোন অবস্থায় কোথাও না কোথাও এদেশে নাই।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য সুগম হইতে পারে। মিঃ বাগ্‌লের অধ্যাবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার কাচকরণ কলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে; কোন সংবাদপত্রে সে কথাটি জানিতে পারি নাই। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি দেশে থাকিয়া কায করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি? দেশে যে কায হইয়াছে, সে কাযের দোষগুণ উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন কি? দেশে যে সকল কাচের কারখানা অল্পবিস্তর আছে, তৎসমুদয় বেড়াইয়া সেখানে শিক্ষানবিশি করিয়া বিলাত গিয়াছিলেন কি? সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, কাচকরণের মূলতত্ত্ব বুঝিতে তাঁহাকে বিলাতে ছয়মাস থাকিতে হইয়াছিল। তিনি কি রসায়নে এম্ এ পরীক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন? গত বৎসর কলিকাতায় যে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে একটি জিনিস দেখিয়াছিলাম, যাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রবন্ধলেখকের ন্যায় ক্ষীণপ্রাণীরও মন উৎফুল্ল হইয়াছিল। সেটি পঞ্জাবের সিয়ানি কৃত কাচের ফ্লাস্ক ও কাচের দণ্ড। যে দেশে তেমন কাচ জন্মিতে পারে, এবং, বোধ করি, কারখানার বাহিরে জন্মিতে পারে, সে দেশেই অনেক শিখিবার আছে। অন্ততঃ বিলাতে তিন বৎসর না কাটাইয়া তাহার দুই বৎসর শিক্ষা করিবার উপকরণ এদেশেই আছে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, প্রবন্ধলেখকের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কোন বন্ধু বঙ্গদেশের গতাসু কাচ কারখানায় শিক্ষানবিশি করিয়া অনেকটা শিখিয়াছিলেন।

যুবক চীনের বাসন করা শিখিবার নিমিত্ত জাপানে গিয়াছেন; শুভসংবাদ বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানিতে চাই, সেই যুবকের যোগ্যতার কি লক্ষণ পাওয়া গিয়াছিল? এদেশে তাঁহার শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল? দেশের কোথায় কোন্ চীনের বাসনের কুমারের নিকট শিক্ষানবিশি হইয়াছিল, এবং কিসের অভাবে বা ত্রুটিতে তাহার বাসন ঠিক চীনের মত হয় না? যদি এ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ সন্ধান না লইয়া তিনি জাপানে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিব, একটা ভুল হইয়াছে, বনিয়াদ কাঁচা হইয়াছে। সে ভুলের শাস্তি অধিককাল বিদেশে বাস এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন। অর্থশাস্ত্র এমন পদার্থ নয় যে, তাহাকে চোখ ঠারিয়া ভুলাইতে পারা যায়। ফলে দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সেই যুবককে এদেশে আসিয়া অন্ততঃ এক বৎসর অধীত-বিদ্যার পুনরালোচনা করিতে হইবে। এইরূপ কেহ বা সাবান করা শিখিতে, কেহ বা খনিজ বিদ্যায় পারদর্শী হইতে জাপানে গিয়াছেন। আশা করি, তাঁহারা এ দেশে ঐ ঐ কলা শিক্ষা করিয়া, কলাপ্রতিষ্ঠার অনুকূল প্রতিকূল কারণ সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। কারণ দেশে সাবানের কারখানা অনেকগুলি আছে, এবং খনিজ বিদ্যার নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও আছে।

৩য়, কারখানা করিবার অর্থপ্রাপ্তি। মনে করা গেল যেন, যুবক বিদেশে কোন কলায় যথোচিত শিক্ষিত হইয়া দেশে ফিরিলেন। তারপর? যে বাঙ্গালী জাপানে পেনসিল করা শিখিয়া আসিয়াছেন, শুনিয়াছিলাম তিনি পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশের কোন সংবাদপত্র প্রবাসী বাঙ্গালীর নিমিত্ত এইরূপ সংবাদ বিতরণ করেন না। যাহাই হউক, ফলে আবশ্যক মূলধন যোগাড় হয়

'সেয়ানা,' এতই কৃপণ, এতই মূর্খ যে, লাভের স্পষ্ট পথ পড়িয়া থাকিতেও সে পথে যাইতে চান না?

যাহা হউক, এই ঘটনা হইতে একটি শিক্ষা হইয়াছে। আবশ্যক মূলধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে বিদেশে কলা শিখিতে যাওয়া না যাওয়া দেশের পক্ষে সমান কথা। সে স্থলে বরং না যাওয়াই দেশের মঙ্গল। নিরাশ মনে জীবন কাটাইয়া, অন্য যোগ্যতর ব্যক্তির উদ্যোগে কুদৃষ্টান্ত হওয়া অপেক্ষা না যাওয়াই ভাল।

এখন এই দীর্ঘপ্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। আশঙ্কা হইতেছে, অনেক বিষয়ের অবতারণায় ও সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তত্তৎ বিষয়ে সাধারণ পাঠকের সম্মতিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। তথাপি দেশের অগ্রণী-দিগকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিতে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পরব্রহ্ম ও মহেশ্বর।

উপনিষদে ব্রহ্মের দুইটী বিভাবের (aspect) পরিচয় পাওয়া যায়। একটী নির্ব্বিশেষ (নির্ব্বিকল্প বা নির্গুণ) ভাব, অপরটী সবিশেষ (সবিকল্প বা সগুণ) ভাব।

এতদ্ বৈ সত্যকাম পরং অপরঞ্চ ব্রহ্ম। [প্রশ্ন ৫।২]

"হে সত্যকাম! এই পর ও অপর ব্রহ্ম।"

দ্বে পরব্রহ্মণী অভিধ্যেয়ে, শব্দশ্চ অশব্দশ্চ * * শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।

[মৈত্রী ৬।২২]

দুই প্রকার পরব্রহ্ম ধ্যান করা উচিত,—শব্দ ও অশব্দ, শব্দ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম।"

দ্বেবাবব্রহ্মণোরূপে। [বৃহদারণ্যক ২।৩।১]

"ব্রহ্মের হয় দুই রূপ।"

এতাভ্যাম্ হি রূপাভ্যাম্ ব্রহ্মাঽভবৎ। [বৃহদারণ্যক ১।৪।১৫]

"ব্রহ্ম এই দুই রূপ বিশিষ্ট।"

দ্বেবাব খল্বেতে ব্রহ্মজ্যোতিষো রূপকে। [মৈত্রী ৬।৩৬]

"ব্রহ্মজ্যোতির হয় দুই রূপ।"

ব্রহ্মের এই সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করিবার জন্য উপনিষদ্ দুই প্রকার বাক্যের অবতারণা করেন। এক নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গ এবং অপর সবিশেষ লিঙ্গ। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ।
'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ'
ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষ লিঙ্গাঃ।
'অস্থূলম্' অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্
ইত্যেব মাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষ লিঙ্গাঃ।*

"ব্রহ্মবিষয়ে দুই প্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয়। এক সবিশেষ লিঙ্গ শ্রুতি, যেমন 'তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস।' অন্য

* শ্রুতি এই সবিশেষ ও নির্বিশেষ ভাব পৃথক্ করিবার জন্য অনেক স্থলে একটী বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। নির্বিশেষ ভাবের নির্দ্দেশে ক্লীবলিঙ্গ এবং সবিশেষ ভাবের নির্দ্দেশে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করিয়াছেন—যেমন 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্', এই নির্ব্বিশেষ স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ' এই সবিশেষ স্থলে পুংলিঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছেন। কোথাও কোথাও একই মন্ত্রে উভয়লিঙ্গই ব্যবহৃত দেখা যায়। যথা যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্ তদ্ অপাণিপাদম্ (এ অবধি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, অতএব ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ); নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদ্ অব্যয়ং তৎভূতযোনিং পরিপশ্যন্তিধীরাঃ (ইহা সবিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, সেই জন্য পুংলিঙ্গের প্রয়োগ)। মুণ্ডক ১।৬।৬॥ স পর্য্যগাৎ শুভ্রম্ অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ (নির্ব্বিশেষ লক্ষণ ক্লীবলিঙ্গ)। কবির্মনীষী পরিভূঃ

নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি, ‘যেমন তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন’।”

ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব তাহার অর্থ এই যে, সে ভাবের কোনও বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না; কোন চিহ্নের পরিচয় দেওয়া যায়না, যাহার দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়; কোন গুণের উল্লেখ করা যায় না, যাহার দ্বারা তাঁহার ধারণা করা যায়। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। [তৈত্তিরীয় ২।৪।১].

“যাঁহার ‘লাগ’ না পাইয়া বাক্য ও মন হটিয়া আসে”।

সেই জন্য বাধ্ব ঋষি বাষ্কলি কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিষয়ে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলেও, মৌনী থাকিয়া অবচন দ্বারা ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।* যাঁহাকে বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, যাঁহাকে লক্ষণে চিহ্নিত করা যায়না, তাঁহার পরিচয় কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে? “তিনি ইহা নহেন” এইমাত্র বলিয়া। ফলতঃ দেখা যায় উপনিষদ্ তাহাই করিয়াছেন—

স এষ নেতি নেতি আত্মা। [বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২].

অথাতো আদেশো নেতি নেতি,
ন হ্যেতস্মাদ্ অন্যৎ পরম্ অস্তি। [বৃহদারণ্যক ২।৩।৬]

“তাঁহার পরিচয় এই মাত্র যে তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন; তাঁহার পরে আর কোন কিছু নাই।”

সেই জন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ স্থলে শ্রুতি নঞএর এত ছড়াছড়ি করেন।

---

* বাষ্কলিনাচ বাধ্বঃ পৃষ্টঃ সন্ অবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ ইতি শ্রূয়তে “স হোবাচ অধীহি ভো ইতি স তুষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ ব্রূমঃ খলু ত্বং তু ন বিজানাসি। উপশান্তোয়মাত্মা।”

অস্থূলমনণুঅহ্রস্বমদীর্ঘম্, অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,
তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বং অনপরংঅনন্তর মবাহ্যম্। [বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯]

"তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন ; হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ; তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই ; ব্রহ্মের পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই।"

যত্তদ্ অদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্, অগোত্রমবর্ণমচক্ষুশ্রোত্রম্,
তদপাণিপাদম্। [মুণ্ডক ১।৬]

"যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ; যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।"

এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম। [ছান্দোগ্য ৪।১৫।১] "ঐ ব্রহ্ম অমৃত অভয়।"

অক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরম্। [কঠ ৩।২] "পরব্রহ্ম অক্ষর।"

'শুভ্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।' ঈশ—৮।

"তিনি তমোহীন, দেহহীন, ক্ষতহীন, স্নায়ুহীন, মলাহীন, পাপহীন।"

যথাহ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথসোঽভয়ং গতো ভবতি। [তৈত্তিরীয় ২।৭]

'যখন জীব এই অদৃশ্য (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অনাত্ম্য (আত্মার অতীত), অবাচ্য (বাক্যের অতীত), অনাধার (ব্রহ্মে) অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি ভয়ের অতীত হন।'

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়-সারং প্রপঞ্চোপশম্ শান্তং শিবমদ্বৈতম্ চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ [মাণ্ডুক্য ৭]

যিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন, যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত, আত্মপ্রত্যয়মাত্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধি), শান্ত, শিব, অদ্বৈত, তাঁহাকে তুরীয় বলে।" তিনি নিরুপাধি—অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ* উপাধি সম্পর্কশূন্য।

তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং,'—অর্থাৎ তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ সমস্তই অসৎ,—বাস্তব পক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, তাহা পরশ্ব থাকিবে না। যাহা গতকাল ছিল, তাহা আজ নাই। আজ যাহা নাই, আগামী কল্য তাহা হইবে। এইরূপ যাহা জাগ্রত অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না; স্বপ্নে যাহা দেখি, জাগ্রতে তাহা ছিল না, সুষুপ্তিতে তাহা থাকিবে না। অতএব তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল কালে সকল অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন; অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। সেইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন।

সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। [ছান্দোগ্য ৬।২।১] 'আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। [ঐতরেয় ১।১] 'আদিতে একই আত্মা ছিলেন।'

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্। [নৃসিংহ ৭] 'ব্রহ্মই এই সকল।'

আত্মৈবেদং সর্ব্বম্। [ছান্দোগ্য ৭।২৫।২]

'আত্মাই এই সকল।'

---

* The three ultimate categories of time, space and causality.

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। [বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯] 'এখানে বহু নাই [একই সব]।'

যস্মাৎপরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ। [শ্বেতাশ্বেতর ৩।৯] 'যাঁহার পর অপর কিছু নাই।'

সন্মূলম্ অন্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ সোম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ [ছান্দোগ্য ৬।৮।৪]

'হে বৎস! সৎরূপ মূলের অন্বেষণ কর। সমস্ত জাতবস্তুর সৎই মূল, সৎই আশ্রয়, সৎই প্রতিষ্ঠা।'

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্ * * * * * আত্মৈব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ আত্মৈ বেদং সর্ব্বম্। [ছান্দোগ্য ৭।২৫।১-২] 'তিনিই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে, এ সমস্তই তিনি। আত্মাই অধে, আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মাই সম্মুখে আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, যাহা কিছু সমস্তই আত্মা।'

অর্থাৎ জগতে যে কিছু পদার্থ আছে তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন কুণ্ডল, বলয়, হার প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও রসায়নের চক্ষে এক সুবর্ণ বই আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে, কেবল নামরূপের প্রভেদ মাত্র; কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয়; কাহারও নাম পর্ব্বত, কাহারও নাম নদী। হারের রূপ একপ্রকার, বলয়ের রূপ আর একপ্রকার, পর্ব্বতের রূপ একপ্রকার, নদীর রূপ আর একপ্রকার, কেবল এইমাত্র ভেদ। নাম ও রূপের ভেদ, বস্তুগত কোনও ভেদ নাই। যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ই

বস্তুতঃ সুবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যেও নাম ও রূপের প্রভেদে কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্ব্বত, কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত কাহারও রূপ বৃক্ষোচিত হইলেও সকলেই ব্রহ্ম। কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেইজন্য বলা হইয়াছে।

বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্। [ছান্দোগ্য ৬।১।৪]

'বাক্যের যোজনা, নামের প্রভেদ ; মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।'

অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ। [৬।৩।৩]

'তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদ সাধন করিলেন।'

তন্নামরূপাভ্যাংব্যাক্রীয়ত। [বৃহদারণ্যক ১।৪।৭] 'তাহা নামরূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন।' [ছান্দোগ্য ৮।১৪।১] আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্ণির্বহিতা। 'আকাশই (ব্রহ্ম) নামরূপের নির্ব্বাহক।'

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলাতে ইহাই বলা হয় যে ব্রহ্ম নির্দ্দোষভাবে সম (absolute homogeneity); 'নির্দ্দোষম্হি সমং ব্রহ্ম।' অর্থাৎ ব্রহ্ম ত্রিবিধ ভেদ বর্জ্জিত। জগতে তিন প্রকার ভেদ দেখা যায় ;—বিজাতীয় স্বজাতীয় ও স্বগত। ভিন্ন জাতীয় দুই পদার্থে যে ভেদ তাহাই বিজাতীয় ভেদ ; যেমন পশুতে ও মানুষে ভেদ। ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অন্যজাতীয় পদার্থই নাই, তখন ব্রহ্ম যে বিজাতীয় ভেদ বর্জ্জিত, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এক জাতীয় দুই ব্যক্তিতে যে প্রভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ ; যেমন রাম ও শ্যামে ভেদ। ব্রহ্ম যখন অদ্বিতীয়, সমকক্ষহীন, তখন তাঁহাতে স্বজাতীয় ভেদের সম্ভাবনা কোথায় ? একই ব্যক্তিগত যে প্রভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ ; যেমন একই বৃক্ষে পত্র শাখা ফুল ফল ইত্যাদির ভেদ। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ সম—সর্ব্বাংশে সর্ব্বাবয়বে এক,

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য; তাঁহাকে চিহ্নিত করা যায় না, লক্ষিত করা যায় না, পরিচিত করা যায় না; কোনই বিশেষণে (Predicate) বিশেষিত করা যায় না। অর্থাৎ তিনি কোন কিছুরই বিশেষ্য নহেন। কারণ

অন্যদেব তদ্‌বিদিতাৎ অথোঽবিদিতাদ্ অধি। [কেন, ৩] 'ব্রহ্ম বিদিত হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত হইতে পৃথক্।' সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাচ্চ [কঠ ২। ১৪] 'তিনি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত; অতীত হইতে বিভিন্ন এবং ভবিষ্যৎ হইতে অন্য।'

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন।

সর্ব্বকার্য্য ধর্ম্ম বিলক্ষণে ব্রহ্মণি। [তৈত্তিরীয় ভাষ্য] 'সমস্ত কার্য্য ও ধর্ম্ম (attribute) হইতে বিপরীত লক্ষণ ব্রহ্ম।'

তিনি বিষয় (object) ও নহেন, বিষয়ী (subject) ও নহেন, তবে তিনি কি? তিনি জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞান নহেন, জ্ঞেয় নহেন; দ্রষ্টা নহেন, দৃশ্য নহেন, দর্শন নহেন; তবে তিনি কি? তিনি স্থূল নহেন; তিনি সূক্ষ্ম নহেন; তিনি অণু নহেন, তিনি মহান্ নহেন; তিনি সৎ নহেন, তিনি অসৎ নহেন; তিনি চিৎ নহেন, তিনি জড় নহেন; তিনি সুখ নহেন, তিনি দুঃখ নহেন; অথচ তিনি সবই বটেন। সেই জন্য যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির সমন্বয়।*

* যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণ। Cardinal Nicholas of Cusa এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন "I made many efforts to unite the ideas of God and the world, of Christ and the Church into a single root idea, but nothing satisfied me until at last my mind's vision as if by an illumination from above soared up to that Perception in which God appeared to me as the Supreme Unity of all contradictions."

"দেশ, কাল ও নিমিত্ত যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর অদ্বৈতই বা কি? * * * *। ফলতঃ, তিনি দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন; জাতও নহেন, অজাতও নহেন; সৎও নহেন, অসৎও নহেন; ক্ষুব্ধও নহেন, প্রশান্তও নহেন।" ব্রহ্মে সকল দ্বৈতের অবসান, ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য যোগবাশিষ্ঠে কর্কটী-প্রশ্ন স্থলে পরব্রহ্মে সমস্ত বিরুদ্ধ লক্ষণের, সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে;—

কিমাকাশ মনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিং। 'এমন কি পদার্থ আছে যাহা আকাশ অথচ আকাশ নহে; যাহা কিছুই নহে অথচ কিছু বটে?

গচ্ছন্নগচ্ছতি চ কঃ কোঽতিষ্ঠন্নপি তিষ্ঠতি।
কশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ কশ্চিদ্ব্যোম্নি বিচিত্রকৃৎ॥

'কে এমন আছেন, যাঁহার গতি নাই অথচ গতিশীল; স্থিতি নাই অথচ স্থিতিমান্; কে চিৎ হইয়াও জড়; কে চিদাকাশে বিচিত্র নির্ম্মাণ করেন?'

কঃ সর্ব্বং নচ কিঞ্চিচ্চ কোঽহং নাহঞ্চ কিংভবেৎ।

'কে সকলই অথচ কেহ নয়; কে আমি অথচ আমি নয়?'

কেনাপ্যণুকমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনী।
কস্যাণোরুদরে সন্তি কিলাবনিভৃতাং ঘটাঃ॥

'কে অণু হইয়াও শতযোজনব্যাপী? কোন্ অণুর মধ্যে পর্ব্বতসমূহ অবস্থিত?'

অচন্দ্রার্কাগ্নিতারোঽপি কোঽবিনাশ প্রকাশকঃ।
অনেত্রলভ্যাৎ কস্মাৎ চ প্রকাশ সম্প্রবর্ত্ততি॥

'কে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, নক্ষত্র না হইয়াও নিত্য দীপ্তিমান; কে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও জ্ঞানের প্রকাশক?'

কোঽর্ণস্তমঃ প্রকাশঃস্যাৎ কোঽণুরস্তি চ নাস্তি চ।
কোঽণুর্দুরেপ্যদূরে চ কোহন্নুরেব মহাগিরি॥

'কে অন্ধকারে হইয়াও আলোক ; সৎ অথচ অসৎ ?' কে দূরে অথচ নিকটে ; অণু হইয়াও মহান্ ?'

নিমেষ এব কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোঽপি নিমেষকঃ।
কিম্ প্রত্যক্ষমসংরাগং কিং চেতনমচেতনং॥

'কে নিমেষ হইয়াও কল্প এবং কল্প হইয়াও নিমেষ?' কোন্ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ; কোন্ চেতন অচেতন ?"

আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং কো ভাষয়তি দৃশ্যবৎ।
কটকাদী ন হেম্নেব বিকীর্ণং কেন চ ত্রয়ম্॥

'সুবর্ণ হইতে যেমন কটক, কুণ্ডল ও হার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কাহা হইতে এই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন প্রতিভাসিত হইয়াছে ?'

দিক্কালাদনবচ্ছিন্নাদ্ একস্মাদসতঃ স্বতঃ।
দ্বৈতমপ্যপৃথক্ তস্মাৎ দ্রবতেব মহাম্ভসঃ॥

'সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ যেমন পৃথক্ নহে, সেইরূপ দেশ কালাদির সম্বন্ধ শূন্য কোন্ অসৎ অথচ সৎ বস্তু হইতে এই দ্বৈত অভিন্ন ?'

কেহ কেহ বলেন যে পরব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এতদূর অবধি বলা যায় যে তিনি সৎ, তিনি চিৎ এবং তিনি আনন্দ স্বরূপ। ইহার অধিক কিন্তু বলা যায় না। এই বাক্যের সমর্থন জন্য তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যের উপর নির্ভর করেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। [তৈত্তিরীয় ২।১।১] 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত।'

বিজ্ঞানং ব্রহ্ম। [ঐ ২।৫।১]

আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানৎ। [ঐ ৩।৬।১] 'ব্রহ্ম আনন্দ এইরূপ

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। [বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮] 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ।'

ব্রহ্মকে যদি সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, 'তিনি জ্ঞান, তিনি বিজ্ঞান, তিনি সত্য, তিনি অনন্ত, তিনি আনন্দ' ব্রহ্ম সম্বন্ধে যদি এত কথা বলা যাইতে পারে, তবে আর তিনি অনির্দ্দেশ্য, অলক্ষ্য, অতর্ক্য, অবাচ্য হইলেন কিরূপে? এ সকল শ্রুতিবাক্য সবিশেষ-লিঙ্গ অতএব নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম কখনই ইহাদিগের লক্ষ্য হইতে পারেন না। কারণ আমরা দেখিয়াছি যে পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন; চিৎও নহেন, জড়ও নহেন; সুখও নহেন, দুঃখও নহেন; অণুও নহেন, মহান্‌ও নহেন।

ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ। [শ্বেতাশ্বেতর ৪।১৮] 'তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, এক ও অদ্বিতীয় শিব।'

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্ নাসৎ উচ্যতে। [গীতা]

'পরব্রহ্মের আরম্ভ নাই; তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন।' ভাগবতের শ্রুত্যধ্যায়ে এইরূপ প্রশ্ন দৃষ্ট হয়—

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্য নির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণ বৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥

'হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, নির্গুণ, সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন; তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে সগুণ বাক্য সকল প্রযুক্ত হইতে পারে?' এখানেও দেখা যায় ব্রহ্মকে সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। তাঁহাকে চিৎও বলা যায় না; চিৎও যাহা, জ্ঞান বিজ্ঞানও তাহা। পরব্রহ্ম যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং,' যখন তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন তাঁহার জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? বিষয় (object) না থাকিলে, তিনি

তদাকং কেন পশ্যেৎ, কং কেন বিজানীয়াৎ।

[বৃহদারণ্যক]

'যে অবস্থায় সমস্ত একাকার, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে।' পরব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানেন, একথা বলাও সঙ্গত নহে।

এক এব আত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বেন চ উভয়থা ভবতীতি চেৎ ন।
যুগপৎ অনংশত্বাৎ, নহি নিরবয়বস্য যুগপৎ জ্ঞেয় জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ॥

[তৈত্তিরীয় ১।১২ শঙ্করভাষ্য]

'আত্মা নিজে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা উভয়ই এরূপ হইতে পারেন না। যাহা নিরংশ (অবয়বহীন), তাহা একসাথে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উভয়ই হইতে প্যারে না।' অতএব যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম চেতন হইয়াও জড়।

কশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ। •

ব্রহ্মকে অনন্ত বলায় তাঁহার আনন্দরূপত্বই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ যাহা সসীম, ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, তাহাতে আনন্দ হইতে পারে না।

ভূমৈব সুখং নাল্পেসুখমস্তি।

'ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।' কিন্তু পরব্রহ্ম সুখও নহেন, দুঃখও নহেন।

বেদ্যং সর্প! পরংব্রহ্ম নির্দ্দুঃখম্ অসুখঞ্চ যৎ।

[মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০।২২]

'হে সর্প! যিনি দুঃখও নহেন, সুখও নহেন, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম জানিবে।' আর তাঁহাকে ভূমা (অসীম ও অনন্ত) ও বলা যায় না। কারণ তিনি অণু হইতেও অণু, অথচ মহান্ হইতেও মহান্।

অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।

চ্ছিন্ন ; সুতরাং মহাশৈল অপেক্ষাও মহান্। অথচ জীবরূপে কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।"

সুতসংহিতায় সদাশিবের নমস্কার উপলক্ষে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ বলিতেছেন—

নমস্তে সত্যরূপায় নমস্তেঽসত্যরূপিণে
নমস্তে বোধরূপায় নমস্তেঽবোধরূপিণে
নমস্তে সুখরূপায় নমস্তেঽসুখরূপিণে। [৩।৩৩,৩৪]

'তুমি সত্যস্বরূপ, তুমি অসত্যস্বরূপ তোমাকে নমস্কার ; তুমি জ্ঞান-স্বরূপ, তুমি অজ্ঞানস্বরূপ তোমাকে নমস্কার ; তুমি সুখস্বরূপ, তুমি অসুখস্বরূপ তোমাকে নমস্কার' অর্থাৎ পরব্রহ্ম সৎ, অসৎ, চিৎ জড়, সুখ, দুঃখ এ সকলের সমন্বয় অনির্ব্বচনীয় বস্তু।

সুতসংহিতার ভাষ্যে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—'ভাবাভাবৌ অপি বস্তুতঃ পরমাত্মনোন পৃথক্ ইত্যভিপ্রায়েন বহুধা ভাবাভাবরূপতা-ভিধানং' অর্থাৎ ভাব ও অভাব বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে পৃথক নহে ; ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য নানারূপে তাহাকে ভাব ও অভাবরূপী বলা হইয়াছে।

কি সম্পর্কে শ্রুতি ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে সে নির্দ্দেশ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নহে, সবিশেষ ব্রহ্মের। শ্রুতি বলিতেছেন।—

ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্ তদেষা অভ্যুক্তা।
সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।
যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্॥

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি। তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃসম্ভূত আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ

'ব্রহ্মবিদের পরম প্রাপ্তি হয়। তদ্বিষয়ে এইরূপ উক্তি আছে—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (সচ্চিদানন্দস্বরূপ)। যিনি পরম আকাশে (দহরাকাশে) গুহাহিত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার সহিত সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ দেখেন। সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইল।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যিনি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন, যাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে, তিনি জগৎ-কারণ ব্রহ্ম। নিরুপাধি পরব্রহ্ম যখন মায়া উপাধি স্বীকার করিয়া সোপাধি হন, তখনই তাঁহা হইতে তত্ত্বসৃষ্টি (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত) আবির্ভূত হয়। ইহা কথনই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা হইতে পারেনা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্ম-সাগরের লহরী-লীলা। নিস্তরঙ্গ ভাবের নিরুপাধি অবস্থার পরিচয় নহে, সোপাধিক অবস্থার তরঙ্গায়িত ভাবের বর্ণনামাত্র। অতএব বুঝা গেল যে উপরোক্ত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম লক্ষিত হন নাই, সবিশেষ ব্রহ্ম (যাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়) তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ আমরা পরে দেখিব যে এই সবিশেষ ব্রহ্মই "তজ্জলান" শব্দের প্রতিপাদ্য। তাঁহা হইতেই জগৎ জাত, তাঁহাতেই অবস্থিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি সংহারের হেতু।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রেয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম !

[তৈত্তিরীয় ।৩।১]

'যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত রহিয়াছে, যাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা কর;

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যে পরব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য অলক্ষ্য, অবাচ্য; অর্থাৎ নির্দ্দেশের অতীত, লক্ষণের অতীত, বচনের অতীত। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে তিনি অজ্ঞেয়*—অর্থাৎ জ্ঞানাতীত। অর্থাৎ পরব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসগোচর। কোন বস্তুকে আমরা জানি কিরূপে? হয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা, কিম্বা মন অথবা বুদ্ধির দ্বারা। যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যাহা প্রত্যক্ষ গোচর, তাহাকেই তদ্দ্বারা জানা যায়। চক্ষু দ্বারা রূপ জানা যায়, কর্ণের দ্বারা শব্দ জানা যায়, নাসিকার দ্বারা গন্ধ জানা যায়, জিহ্বা দ্বারা রস জানা যায় এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শ জানা যায়। কিন্তু যাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জানিব কিরূপে? আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্

---

* হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) প্রভৃতি অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকগণ এক "unknowable" (অজ্ঞেয়) বস্তুর প্রচার করিয়াছেন। সে "unknowable" উপনিষদ্ প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম নহেন; বস্তুতঃ পক্ষে, সে "unknowable" সবিশেষ ব্রহ্ম—মহেশ্বরের একটী বিভাব (aspect) মাত্র। গীতায় তাহাকে মহেশ্বরের পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। সে প্রকৃতি পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিপাদিত "force," "power" বা শক্তিমাত্র। ইহা "unknowable" নহে। এ বিষয়ে স্পেন্সারের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহার প্রতিপাদিত unknowable যে শক্তির উপরে নহে, তাহা বুঝা যাইবে।

The power which the universe manifests to us, is utterly inscrutable—[First Principles 4th Edition—page 17.]

An infinite and eternal energy from which all things proceed—[Principles of Sociology—page 175.]

The power manifested throughout the universe distinguished as material, is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness. [Principles of Sociology III, page 171.]

The power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself

তথারসম্ নিত্যমগন্ধবচ্চ। [কঠ ৩।১৫]

অর্থাৎ 'ব্রহ্ম শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন অক্ষয় বস্তু।' অতএব তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বেদ্য হইবেন কিরূপে? একথা শ্রুতি ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন—

ন সংদৃশে তিষ্ঠতিরূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। [কঠ ৫।৯]

নৈনং দেবাঃ প্রাপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। [ঈশ ৪]

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈ র্ন তপসা কর্ম্মণা বা।

[মুণ্ডক ৩।১।৮]

নৈববাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। [কঠ ৬।১২]

'তাঁহার রূপ দৃষ্টিগোচর নহে; চক্ষুদ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না।' (চক্ষু এখানে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ মাত্র)।

'ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার লাগ পায় না। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের পূর্ব্বগামী।' 'তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা কর্ম্মেরও গ্রাহ্য নহেন।' 'বাক্য, মন, চক্ষু কিছুরই প্রাপ্য নহেন।'

মনকে অন্তঃকরণ বলে। ইহা ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ দ্বারা যেমন বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, মনের দ্বারা সেইরূপ আন্তরিক বিষয়ের (সুখ দুঃখ প্রভৃতির) উপলব্ধি হয়। পরব্রহ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির অতীত, সেই জন্য মনের দ্বারা তাঁহার কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

যন্মনসা ন মনুতে। 'যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, তিনিই ব্রহ্ম।'

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 'বাক্য ও মন যাঁহার কাছে পঁহুছিতে না পারিয়া হটিয়া আসে।' মনের উপর বুদ্ধি। নিশ্চয়

বুদ্ধিতে পতিত হয়, বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়। বুদ্ধি সান্ত, সগুণ পদার্থ। সে অনন্ত, নির্গুণ পরব্রহ্মের আকারে কিরূপে আকারিত হইবে? তা ছাড়া যাহা সাপেক্ষ (relative), সম্বন্ধযুক্ত, সোপাধিক, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে*। পরব্রহ্ম নিরুপাধিক নিরপেক্ষ (absolute) বস্তু; দেশ কাল ও নিমিত্ত সমস্ত সম্বন্ধ বর্জ্জিত; তিনি কিরূপে জ্ঞানের বিষয় হইবেন! তিনি চিরদিনই অজ্ঞেয় (unknowable)। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। [কেন ৩]'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না; তাঁহাকে আমরা জানি না; কিরূপে তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া যাইবে?'

আরও বক্তব্য এই যে, যিনি যাহাকে প্রকাশিত করেন, সে কখনও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না! সূর্য্যের দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত হয়। সূর্য্যকে কি জগৎ উজ্জ্বলিত করিতে পারে? ব্রহ্মের দীপ্তিতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় (বুদ্ধি, মন প্রভৃতি) দীপ্তিমান্; তাঁহারই প্রভায় সকলে প্রভান্বিত। তবে তাহারা তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে কিরূপে?

তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। [কঠ ৫।১৫]

---

* To think is to condition, to distinguish objects and bring them into relation with one another; to distinguish one object from another is to limit one by the other. But the absolute the infinite is without condition and so cannot be thought. Again our whole notion of existence is relative and we can form no conception of the absolute since it is merely the absence of relations; if we are to know the absolute, and infinite it must be classed. Classification involves recognition, but the Absolute can be like nothing else that we know and therefore cannot be

'তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান্; তাঁহার প্রভাতেই সকলে প্রভান্বিত।' সেই জন্যই তাঁহাকে বলা হয়।—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনো যৎ
বাচোহবাচম্ স উ।
প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষঃ চক্ষুঃ। [কেন ২।]

'তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু।' অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশেই ইহারা প্রকাশিত; তাঁহার প্রেরণায়ই ইহারা প্রণোদিত। ইহারা তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কিরূপে?

এ বিষয় কেন উপনিষদে অতি সুস্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে—

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

[কেন ৪—৮]

'যিনি বাক্যের বাচ্য নহেন, যাঁহা দ্বারা বাক্য বলিতে পারে তিনিই ব্রহ্ম; এই যে উপাসনার বস্তু ইহা ব্রহ্ম নহে।'

'যাঁহাকে মন দ্বারা মনন করা যায় না, যিনি মনকে মনন করেন তিনিই ব্রহ্ম; এই যে উপাসনার বস্তু ইহা ব্রহ্ম নহে।'

'যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না, যাঁহা দ্বারা চক্ষু দৃষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম ; এই যে উপাসনার বস্তু ইহা ব্রহ্ম নহে।'

'যাঁহাকে কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, যাঁহা দ্বারা কর্ণ শ্রুত হয় তিনিই ব্রহ্ম ; এই যে উপাসনার বস্তু ইহা ব্রহ্ম নহে।'

'যাঁহাকে প্রাণের দ্বারা প্রাণন করা যায় না, যাঁহা দ্বারা প্রাণ প্রাণিত হয় তিনিই ব্রহ্ম ; এই যে উপাসনার বস্তু ইহা ব্রহ্ম নহে।'

আর এক কথা। জানা অর্থে জ্ঞানের বিষয় হওয়া। যিনি বিষয় (object) এবং বিষয়ী (subject) উভয়েরই উপরে, তিনি কিরূপে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয় (object) হইবেন ? তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে 'অস্তি'—তিনি আছেন। তাহার অতিরিক্ত কিছু বলাও যায় না, জানাও যায় না।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

[কঠ ৬।১২]

'অস্তি—এই মাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না।'*

জ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান ; বোধের উপর প্রতিবোধ। ইহাকে সমাধি বা যোগজ মতি (Intuition) বলা যায়। সে অবস্থায় পরব্রহ্মকে জানা যায় কিনা ?

কেহ কেহ বলেন যে সাধারণ মন বুদ্ধির অগোচর হইলেও পরব্রহ্ম সমাধি-বেদ্য। এই মত সমর্থনের জন্য তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করেন।

---

* এ বিষয়ে মহাকবি গেটে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

"Who dare express Him ?"
And who profess Him,'
Saying, I believe in Him,
Who, feeling, seeing,
Deny His Being," etc,
[Goethe's Faust, Part I, Scene XVI]

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বাধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি। [কঠ ২।১২]

'অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ-দুঃখ অতিক্রম করেন।'

এখানে 'দেব' শব্দে কাঁহাকে উদ্দেশ করা হইয়াছে? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম না সবিশেষ ব্রহ্ম? শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। [কঠ ২।১২]

সে দেব কিরূপ? 'তিনি দুর্দ্দর্শ, গূঢ়, (প্রপঞ্চে) অনুপ্রবিষ্ট, পুরাতন এবং হৃদয়ের দহরাকাশে প্রতিষ্ঠিত।' এখানে যে সবিশেষ ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছেন তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? কঠ উপনিষদের আর একস্থলে উক্ত হইয়াছে—

হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।* [কঠ ৬।৯]

'তিনি হৃদয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।' "হৃদা" এই শব্দের প্রয়োগ থাকাতে বুঝা যাইতেছে যে এখানে পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরুষই লক্ষিত হইতেছেন।

---

* এই মন্ত্রের শ্বেতাশ্বতরে (৪।১৭) যে পাঠ দৃষ্ট হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, সবিশেষ ভাবই যে লক্ষ্য, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকে না।

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

'এই দেব বিশ্বস্রষ্ঠা মহাত্মা, জীবগণের হৃদয়ে সদা অবস্থিত আছেন, তিনি হৃদয়ে সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন ইত্যাদি।' যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হৃদয়াকাশে অবস্থিত

মুণ্ডক উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়েও ঐ পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেখানেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম লক্ষিত হন নাই।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ [মুণ্ডক ৩।১।৩]
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ [মুণ্ডক ৩।১।৮]

'জীব যখন জ্যোতির্ম্ময়, কর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মার জনক) পুরুষকে দর্শন করে, তখন সে পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইয়া পরম সমত্ব লাভ করে।'

'জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত (সাধক), ধ্যানযোগে নিষ্কল (অখণ্ড) পরমাত্মাকে দর্শন করে।'

যাঁহাকে নিষ্কল পরমাত্মা বলা হইল, তিনিও যে সেই গুহাহিত পুরুষ তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।

'এই যে অণু আত্মা (দহরাকাশে অধিষ্ঠিত), তাঁহাকে চিত্তের দ্বারা জানা যায়।' কঠ উপনিষদে বলা হইয়াছে।—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ [কঠ ৪।১]

'স্বয়ম্ভু (ভগবান্) ইন্দ্রিয় সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন; সেইজন্য জীবগণ বহির্ব্বিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। তবে

হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।' "প্রত্যগাত্ম" শব্দে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝায় না, গুহাহিত পুরুষকেই লক্ষ্য করা হয়।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ [কঠ ৩।১২]

'এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।' এখানেও সবিশেষ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ তাঁহারই সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—যে তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রত্যগাত্মা রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তৎসৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ [ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪]

'সংরাধন কালে তিনি দৃষ্ট হন, শ্রুতি স্মৃতি ইহার প্রমাণ।' এই ব্রহ্মসূত্রে সবিশেষ ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। কারণ সংরাধন অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদির অনুষ্ঠান। "সংরাধন কালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং চ ভক্তিধ্যান প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।"

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ব্রহ্মসন্ ব্রহ্ম অবৈতি, ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরম্। [তৈত্তিরীয় ২।১।১] 'ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মই হওয়া যায়। 'ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্ম জানা যায়। 'ব্রহ্মজ্ঞানী পরম (পদ) লাভ করেন।'
ইত্যাদিস্থলেও সবিশেষ ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী পরম বস্তু লাভ করেন, এই কথা বলিয়া শ্রুতি ব্রহ্মের পরিচয়ে বলিয়াছেন—

সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। [তৈত্তিরীয় ২।১।১]

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সচ্চিদানন্দ বলিয়া ব্রহ্মের যে ভাবের পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা তাঁহার সবিশেষ ভাব, নির্ব্বিশেষ ভাব

নহে; কেবলমাত্র সমাধি-লভ্য। এই সমাধি দ্বিবিধ; সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে; কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমস্ত ভেদ বুদ্ধি, সমস্ত দ্বৈত দর্শন তিরোহিত হয়। তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়—বিষয় ও বিষয়ী একাকার হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ উপনিষদে বলা হইয়াছে—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক
একত্বমনুপশ্যতঃ॥   [ঈশ ৭]

'যখন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থ আত্মাই হইয়া যায়, তখন সেই একত্ব-দর্শীর পক্ষে শোক, মোহের অবসর থাকে না।' কারণ

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদর মন্তরং কুরুতে।
অথ তস্য ভয়ং ভবতি।   [তৈত্তিরীয় ২।৭।১]

'দ্বৈত হইতেই ভয়ের উৎপত্তি হয়; যতক্ষণ অণুমাত্রও ভেদ দৃষ্টি থাকে, ততদিন ভয় দূর হয় না।' কিন্তু ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হইলেই সকল ভয়, ভাবনা, শোক, মোহ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এবিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা করিতে উদ্যত হইয়া নিজের যাহা কিছু পার্থিব সম্পত্তি ছিল তাহা মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নাম্নী পত্নীদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন; তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী যদি বিত্তপূর্ণা হয়, তবে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন তাহা কিরূপে হইবে? মৈত্রেয়ী বলিলেন।

যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। 'যাহাতে আমি

অমরত্ব লাভ করিতে পারিবনা তাহাতে আমি কি করিব?' আপনি আমার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বলুন। ঋষি তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া অবশেষে বলিলেন—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভুত্তত্কেন কংপশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃনুয়াত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহিগৃহ্যতে অশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাঽসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খলু অমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার।

'যখন দ্বৈত ভাব থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে ঘ্রাণ করে, একে অন্যকে আস্বাদন করে, একে অন্যকে বলে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শ করে, একে অন্যকে জানে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায় (আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না), তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহাদ্বারা এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয় তাঁহাকে কিসের দ্বারা বিজ্ঞাত হইবে?' সেই আত্মার পরিচয় "নেতি নেতি"—ইহা নয়, ইহা নয়। তিনি অগ্রাহ্য—তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, তিনি অশীর্য্য—শীর্ণ হন না, তিনি অসঙ্গ—আসক্ত হন না, তিনি

বিজ্ঞাত হইবে? হে মৈত্রেয়ি! এই তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করা হইল; ইহাই অমরত্ব লাভের উপায়। এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন।'

এই নির্বিকল্প সমাধির একাকার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কেন উপনিষদ্ বলিয়াছেন

যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্   [কেন]

'যিনি (ব্রহ্মকে) জানেন না, তিনিই জানেন; যিনি জানেন, তিনি জানেন না। ব্রহ্ম যিনি জানেন, তাঁহার অজ্ঞাত, আর যিনি জানেন না, তাঁহারই জ্ঞাত।' প্রথম দৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রলাপবাক্য মনে হইলেও কথাটি বড়ই ঠিক। যে পর্য্যন্ত জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভেদ দর্শন থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকেন; কিন্তু ভেদ বুদ্ধি রহিত হইয়া একাকার বোধ হইলে, তবে ব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েন। এ অবস্থা বচনাতীত। এ বোধ জ্ঞান নহে, অজ্ঞানও নহে, অনির্ব্বচনীয় কোন কিছু।

এতদূর অবধি পরব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ বিভাব, তাহারই যথাসাধ্য আলোচনা করা হইল। প্রবন্ধান্তরে তাঁহার সবিশেষ বিভাবের বিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সুন্দরী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আকাশে রৌদ্র ছিল, কিন্তু ঘনপল্লবযুক্ত বৃক্ষরাজি সে রৌদ্রের অতি অল্প অংশই বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছিল। রমা ও নবগোপাল, ছায়ায় ছায়ায়, কোথাও ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া কোথাও নিম্নশাখা হস্তদ্বারায় উত্তোলন করিয়া পথ করিয়া চলিল। দুইজনের পদতলে শুষ্ক পত্রের রাশি মচ মচ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর নীরবে অগ্রসর হইয়া, নবগোপাল রমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"রমা তোমার ভয় করছে না ত?"

রমা অবজ্ঞায় তাহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠযুগল স্ফীত করিয়া বলিল—"কিসের জন্যে?"

শুনিয়া নবগোপালের মন আনন্দিত হইল। এ প্রকৃতির বঙ্গ-বালিকা সে ত কখনও দেখে নাই। আর কিছুদূর যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা রমা তুমি কি কি জন্তু শিকার কর্‌তে চাও?"

রমা বলিল—"যে জন্তু পাব।"

"কি রকম জন্তু শিকার কর্‌তে তোমার বেশী আমোদ?"

"যে জন্তু দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর।"

"যেমন?"

"যেমন কুমীর কি বুনো শূয়োর কি বাঘ ভালুক।"

রমা বাঘ ভালুক শিকার করিতে প্রয়াসী শুনিয়া নবগোপাল মনে মনে হাস্য করিল। যাহার হস্তে বন্দুক স্থির থাকে না, সে ব্যাঘ্র মারিতে

চায়! কিন্তু সে ভাব মনে গোপন করিয়া, নবগোপাল উপদেশচ্ছলে তাহার তরুণী সঙ্গিণীকে বলিল—"আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন কি জন্তু মারতাম জান?"

"কি?"

"হাঁস কি খরগোস কি ঐ রকম কোনও ছোট জানোয়ার। তুমি ত কখনও কোনও জানোয়ার মারনি, তুমিও প্রথমে এই রকম ছোট জানোয়ার মার্‌তে শেখ। ক্রমে বড় জানোয়ার মার্‌তে পার্‌বে। এ বনে অনেক খরগোস পাওয়া যায়,"—

রমা নবগোপালের কথা শেষ হইতে না দিয়া বলিল—"খরগোস আমি মার্‌ব না।"

নবগোপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

রমা বলিল—"আহা! খরগোস মেরে কায নেই। ওরা ভারি নিরীহ জন্তু, কারু ত কোনও অনিষ্ট করে না! ওদের গা কেমন মোলাম, কান দুটি কেমন ঝোলা ঝোলা,—তুমি কখনও খরগোস পুষেছিলে?"

"না।"

"আমার একযোড়া খরগোস ছিল। আমার কাকা আছেন, তিনি আমায় এনে দিয়েছিলেন। তখন তারা খুব বাচ্ছা ছিল। আর গা এমন শাদা যেন দুধের মত, কেমন নরম, চোখ দুটি লাল লাল, আমি যখন খাঁচার কাছে যেতাম, খাবার দিতে কি আর কিছু করতে, আমার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকত।"

বলিয়া বালিকা মৌন হইয়া রহিল। নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"তাদের কি খেতে দিতে?"

"খেতে দিতাম কচি কচি ঘাস। আমি নিজে বাগান থেকে ঘাস তুলে আন্‌তাম। সকালে সকালে উঠে শিশিরে ভিজে ভিজে ঘাস, তাই

খাওয়াতাম। প্রথমে দুই হাতে দু মুঠো ঘাস নিয়ে দুজনকে খাওয়াতাম তাতে ভাল করে খেত না। একদিন কলকাতা থেকে আমাদের কপি এসেছিল, সেই কপির একটা পাতা নিয়ে দুটো খরগোসকে খাওয়াচ্ছিলাম। অত বড় পাতা, দুজন দুদিকে না খেয়ে, দুজনেই একদিকে খেতে আরম্ভ করলে। এর কাছে ও মুখ নিয়ে এলে, এ ওকে এমনি করে ঠেলে দেয়, এই রকম করে ঝগড়া ক'রতে ক'রতে এমন খেতে লা'গল কুর কুর করে, সে যদি দেখ্‌তে! তুমি কখনও খরগোসের খাওয়া দেখেছ?"

নবগোপাল বলিল—"পোষা খরগোসের খাওয়া দেখিনি বটে, তবে বনের খরগোসের খাওয়া দেখেছি। যখন ওরা চরে, সেই সময়েই মারবার সুবিধে কিনা। যখন চরে সেই সময়েই একটু স্থির থাকে, নইলে অন্য সময় নিশানা করবার অবসরই পাওয়া যায় না!"

রমা একদৃষ্টে নবগোপালের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে চাহনি ভর্ৎসনাপূর্ণ। নবগোপাল তাহা বুঝিতে পারিল। একটু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

রমা ধীরে ধীরে বলিল—"যে সময় ওরা খায়, সেই সময় তুমি মার? তুমি ভারি নিষ্ঠুর ত!"

নবগোপাল নিরুত্তর রহিল। শুধু মনে মনে ভাবিল—এ ত ভাল লোককে শিকার করিতে সঙ্গে আনা গিয়াছে! এ মন্তব্যে সে একটু অপ্রতিভ হইল বটে, কিন্তু কিশোর-হৃদয়ের এই করুণা চিত্রটি তাহাকে মুগ্ধও করিল।

শিকারের প্রসঙ্গে কথোপকথন ইতিপূর্ব্বে সে কখনও স্ত্রীজাতির সঙ্গে করে নাই। স্ত্রীজাতির মধ্যে তাহার মাতাই তাহার বিশেষ বন্ধু, কিন্তু তিনি যতই পুত্র-বৎসল হউন, নবগোপালের শিকারচর্চ্চাকে কখনই স্নিগ্ধ চক্ষে দেখেন না। সুতরাং তাঁহার সমক্ষে সে কখনও শিকার

প্রসঙ্গের অবতারণাই করে না। স্ত্রীজাতি-সুলভ কোমল মন্তব্য তাহার শিকারী-জীবনে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।

অথচ এই বালিকাটি পশুবধ সম্বন্ধে তাদৃশ কোমল হৃদয়ও ত নহে! নবগোপালের মনে হইল রমা নিজে খরগোস পুষিয়াছিল, তাই খরগোসের প্রতি উহার এত মায়া! একটা ঘটনা স্মরণ হইল। তাহার পরিচিত একটি ভদ্রলোক আছেন, তিনি ছাগকুলের ধ্বংসের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ বলিলেই হয়। পাঁঠার মাংস ভিন্ন তাঁহার ভোজন কোনও দিন সম্পন্ন হয় না। এক সময় কলিকাতা হইতে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু সমাগম হয়। তিনি একটি বৃহৎ ছাগল কিনিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু ঘটনাবশতঃ সেদিন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র একটিও ছাগল কিনিতে পাওয়া গেল না। তাঁহার ভৃত্য বহুগ্রাম পর্য্যটন করিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাঁহার একটি প্রকাণ্ডকায় পালিত ছাগল ছিল। তাঁহার একজন পারিষদ পরামর্শ দিলেন, আজ এই ছাগল কাটা যাউক। তিনি বলিলেন—"না, সে হবে না। আমি যার মুখে ঘাস জল দিয়েছি, তাকে আমি কাটতে পা'রব না।" নবগোপাল ভাবিতে লাগিল, পালক ও পালিতের সম্বন্ধ, সে ক্ষেত্রে একটি জীবের প্রতিই স্নেহবিস্তার করিয়াছিল। বালিকার হৃদয়, এ ক্ষেত্রে সে জাতীয় সর্ব্বজীবকেই আলিঙ্গন করিয়াছে।

রমার খরগোসের গল্প মধ্যস্থলে থামিয়া ছিল, তাহা আরও শুনিবার জন্য নবগোপালের মন উৎসুক হইল। এই সময় একটা কাঁটা গাছের ডালে রমার অঞ্চল জড়াইয়া গিয়াছিল। তাহা সাবধানে মোচন করিয়া দিতে দিতে নবগোপাল আবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল—"তোমার সে খরগোস এখনও আছে রমা?"

দুঃখিত স্বরে বালিকা বলিল—"না, সে কুকুরে মেরে ফেলেছে। একটাকে কুকুরে কাম্‌ড়ে দিয়েছিল, সেটা মরে গেল। আর একটাও

"কত বড় হয়েছিল ?"

"বেশী বড় হতে পায়নি। গাগুলি হলদে হলদে হতে আরম্ভ হয়েছিল। একটু বড় হলে পরই, দিনের বেলা ছেড়ে দিতাম, সারাদিন বাগানে খেলা করে চরে বেড়াত আবার সন্ধ্যাবেলা আপনিই ঘরে ফিরে এসে খাঁচার দোরটির কাছে চুপ করে দুজনে বসে থাকত। আমি এসে আদর করে তাদের সঙ্গে কথা কইতাম, খাঁচার দোরটি খুলে দিতাম, টুপ্ টুপ্ করে তারা ঢুকে পড়ত।"

এই সময় তাহারা যেস্থানে পৌঁছিল, সেখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দেখা গেল একটা ঢিবির মত রহিয়াছে, তাহার গাত্রে অনেক ছিদ্র। নবগোপাল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে রমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওগুলো কিসের গর্ত্ত জান ?"

রমা বিস্ময়ের স্বরে বলিল—"না।"

"শেয়ালের গর্ত্ত। ওতে শেয়াল থাকে।" বলিতে বলিতে একটা গর্ত্ত হইতে একটা শৃগাল বাহির হইয়া পড়িল। সে ইহাদিগকে দেখিয়াই এক লম্ফে বনের অন্তরালে লুক্কাইত হইল।

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"মার্‌বে রমা ?"

রমা চুপি চুপি বলিল—"হ্যাঁ।"

নিকটে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। নবগোপাল রমার হাতটি ধরিয়া তাহাকে বৃক্ষের অন্তরালে টানিয়া লইয়া গেল। বলিল—"এইখান থেকে নিশানা কর্‌তে হবে। আর একটা শেয়াল বেরুক।"—রমা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চুপি চুপি বলিল—"হাঁ।"

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। একটা বৃহদাকার শৃগাল গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া, চতুর্দ্দিকে ঘ্রাণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বন্দুক প্রস্তুত ছিল। ঘোড়া তুলিয়া, ছোট বন্দুকটি রমার হাতে দিয়া, নবগোপাল অতি মৃদুস্বরে রমার কর্ণে বলিল—"নিশানা কর। এই যে বন্দুকের মাছি এই মাছিটিকে ঠিক এমন ক'রে ধর যেন, আড়ালে শেয়ালটাকে দেখা যায়। ধরে ঘোড়া ফেল। যেন হাত কাঁপে না।"

রমার তীর ধনুক ছোড়া অভ্যাস ছিল, লক্ষ্য করা কার্য্যে সে একেবারে অনভিজ্ঞা নহে। লক্ষ্য স্থির করিয়া বলিল—"দেখ, হয়েছে?"

নবগোপাল তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, এক চক্ষু বুজিয়া দেখিয়া বলিল—"হয়েছে। আওয়াজ কর। হাত যেন কাঁপে না।"

রমা বন্দুক আওয়াজ করিয়া দিল। নবগোপাল বলিল—"হাত কেঁপে গেছে।" শৃগালটা অক্ষতদেহে এক লম্ফ দিয়া গহ্বর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঢিবির যে স্থানে গুলিটা গিয়া লাগিয়াছিল, তথা হইতে কিঞ্চিৎ চূর্ণ-মৃত্তিকা ঝরিয়া পড়িল।

নবগোপাল হাসিতে লাগিল। রমাও হাসিতে লাগিল। রমা বলিল—"এত করে শক্ত করে ধরলাম, তবু হাত কেঁপে গেল!" নবগোপাল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"প্রথম প্রথম ওরকম কেঁপে যায়। বারকতক পরে ঠিক হয়ে যাবে।"

রমা বলিল—"এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি এস। আবার বেরুলে আবার মার্‌ব।"

নবগোপাল বলিল—"পাগল! বন্দুকের শব্দ পেয়েছে, এখন আর সহজে বেরুবে না। এখানে থেকে আর কোনও ফল নেই। চল যাওয়া যাক।"

নবগোপাল বন্দুক দুইটি ও খাবারের থলি লইল। রমা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ছাড়িয়া টোটার বাক্সটি উঠাইয়া লইল। তখন এই ব্যাধযুগল গভীরতর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কিছুদূর যাইতে যাইতে বন্যহংসের স্বর শ্রুতিগোচর হইল। নবগোপাল অনুমান করিল, নিকটে জলাশয় আছে। স্বর লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে দুইজনে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া জলাশয় দেখা গেল। প্রায় ত্রিশ চল্লিশটা হংস চরিতেছে। কয়েকটা কিঞ্চিৎ উপরে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে অধিক বড় নহে, কৃষ্ণবর্ণ।

নবগোপাল বলিল—"রমা, তোমার বন্দুক তৈরি করে দিই।"

"এবার তুমি মার।"

"আমি ত কত মেরেছি—আগে তুমি কিছু মার।"

রমা বলিল—"আবার আমার হাত কেঁপে যাবে—সব হাঁস উড়ে যাবে।"

নবগোপাল বলিল—"এবার হাত কেঁপে গেলে তত ক্ষতি নেই। যখন এক ঝাঁক পাখী বসে থাকে, তখন নিশানা করাও সহজ, আর যদি হাত কেঁপে যায়, তাহলে একটাকে না লেগে, আর একটাকে লাগে, ফল সমানই হয়।" বলিয়া নবগোপাল রমার বন্দুক প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

শৃগালের বেলায় রমার কিছুই মনে হয় নাই। কিন্তু হাঁস মারিতে হাত উঠিতে চাহে না। আহা ওগুলি কেমন সুন্দর দেখিতে! কিন্তু আপত্তি করিতেও লজ্জা করিতে লাগিল। খরগোষে আপত্তি, সব তাতেই যদি আপত্তি, তবে নবগোপাল বলিতে পারে—"তবে শিকার করিতে আসিলে কেন?" সেই ভয়ে রমা কিছু বলিল না। মন বাঁধিয়া নবগোপালের হাত হইতে বন্দুক লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"দাও, এবার আমি তৈরি করি।

বন্দুক প্রস্তুত হইলে, রমা লক্ষ্য স্থির করিল। নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করিল—"দেখ, এবার ঠিক হয়েছে ?"

নবগোপাল দেখিয়া বলিল—"ঠিক হয়েছে। এবার আওয়াজ কর। হাত কাঁপলে ক্ষতি নেই।"

রমা ঘোড়া টানিয়া দিল। বন্দুক আওয়াজ হইয়া গেল। হংসগুলা ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল, দুইটা আহত হইয়া জলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

শিকারীর উৎসাহ রমাকে পাইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের মায়ার ভাব একেবারে কাটিয়া গেল। সে আনন্দে বলিয়া উঠিল—"ঐ দেখ দুটো পড়েছে।"

নবগোপাল অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল, রমা তখন যেন নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া, বলিল—"হাঁস মেরেছি দুটো, ভারি ত !" নবগোপাল বলিল—"হাঁস মেরেছ বলে নয়। এবার হাত ঠিক ছিল, কাঁপেনি।"

রমা হাসিয়া বলিল—"এবার যে তুমি বলেছিলে কাঁপ্‌লে ক্ষতি নেই, তাই আমি ওদিকে মনও দিইনি,—হাতও কাঁপেনি। প্রথমবার যদি হাত কাঁপার জন্যে অত করে সাবধান করে না দিতে, তা হলে সেবারও কাঁপ্‌ত না।"

নবগোপাল তখন রমাকে সেইখানে রাখিয়া, শিকারের হংস দুইটা সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইল। জলে নামিয়া যখন তাহাদিগকে থলির মধ্যে পূরিল, তখন তাহারা ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। রমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া নবগোপাল থলিটি তাহার হাতে দিয়া বলিল—"রমা, এই তোমার প্রথম শিকার হল। তুমি মাংস খাও ?"

"খাই বৈকি।"

"হাঁস ত আমি কখনো খাইনি।"

"কি মাংস খেয়েছ তবে ?"

"পাঁঠার মাংস খেতে আমার খুব ভাল লাগে।"

"কোনও পাখী খাওনি ?"

রমা একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"পাখী খেয়েছি তিতির আর বটের। হাঁস কখনও খাইনি।"

"হাঁস খেয়ে দেখো, হাঁসের মাংস ভারি চমৎকার।" রমা এক মিনিট কাল মৌন রহিল। পরে বলিল—"বাঃ এ হাঁস ত তুমি নিয়ে যাবে!"

নবগোপাল রমার হাতটি ধরিয়া সস্নেহে বলিল—"তা কখনও হয় ? তোমার প্রথম শিকারের জিনিস—তুমি নেবে।"

রমা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি হাঁসের মাংস ভালবাস না ?"

"ভারি ভালবাসি।"

"তবে অন্ততঃ একটা তোমায় নিয়ে যেতেই হবে।"

নবগোপাল বালিকার আগ্রহ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিল; এবং বলিল—"দেখ রমা, তোমার হাঁস যদি আমাকে খাওয়াবার এতই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে এক কায করনা কেন ?"

"কি ?"

"আমাকে আজ সন্ধ্যাবেলা তোমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন কর না কেন ?"

রমা বলিল—"সে ত বেশ। তবে আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার নেমন্তন্ন রইল।"

নবগোপাল পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল মাত্র, কিন্তু বালিকার উত্তরে, এই প্রথম তাহার মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইল। রমা যে তাহার সঙ্গে বনে শিকার করিতে আসিল, তাহাতে তাহার বাড়ীর লোক বিরক্ত

হইবে না? ইহা জানিবার অভিপ্রায়ে তখন সে রমাকে জিজ্ঞাসা করিল —"আচ্ছা, তুমি বাড়ী গিয়ে আমাকে কি বলে পরিচয় দেবে?"

"কেন, আমার বাড়ীর লোক কি তোমায় জানেনা নাকি মনে করেছ?"

"কি করে জান্‌লেন?"

"কেন, আমি বলেছি। পরশু তুমি যখন নৌকো থেকে আমায় বাড়ী পৌঁছে দিলে, তখন গিয়ে আমি তোমার কথা বল্লাম, তুমি পাখী দিয়েছ, তা সবাইকে দেখালাম।"

"আজ তুমি আমার সঙ্গে শিকার করতে আসবে, তা কাউকে বলে এসেছ?"

"কেন বলে আস্‌ব? বাড়ী গিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করে কেউ, তখন বল্‌ব।"

রমাদের পরিবার চিরদিন জঙ্গলের অধিবাসী। একজন বয়স্কা কন্যার যে অনাত্মীয় যুবা পুরুষের সহিত কোথাও যাওয়া উচিত নহে, ইহা তাঁহারা রমাকে শেখান নাই, তাহার কারণ এই যে মহেশপুর গ্রামে আর কোনও অনাত্মীয় যুবা পুরুষ ছিল না। তাহা ছাড়া, রমা পাড়ার আর যে কয়েকজন বালক বালিকা আছে, তাহাদের সহিত যেখানে ইচ্ছা খেলিয়া বেড়াইত, ইহার জন্য কখনও কেহ তাহাকে কোনও কথা বলা আবশ্যক মনে করে নাই।

সে যাহা হউক, নবগোপাল মনে মনে স্থির করিল, রমাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া, রমাকে বলিয়া যাইবে যে, আজ তাহার নিমন্ত্রণ খাওয়া হইতে পারে না। তাহার পিতার সঙ্গে আলাপ হইলে একদিন আসিয়া খাইবে।

তখন বোধ হয় বেলা তৃতীয় প্রহর। নবগোপাল রমার পানে

আর যে কোনও বঙ্গবালিকা হইলে বলিত—"না।" কিন্তু রমার সেরূপ সহবৎ শিক্ষা আদৌ হয় নাই। সে অম্লান বদনে বলিল—"খুব পেয়েছে।"

নবগোপাল বলিল—"আমারও ক্ষিধে পেয়েছে। এস জলের ধারে বসে দুজনে কিছু খাই।"

যেখানে ঘাস শুষ্ক ছিল, এমন স্থান অন্বেষণ করিয়া দুইজনে উপবেশন করিল। নবগোপাল তাহার খাবারের থলি হইতে লুচি মাছভাজা প্রভৃতি বাহির করিল, একটা বোতলে পানীয় জল ছিল। রমা বোতলে হাত দিয়া বলিল—"এ যে গরম।"

নবগোপাল বলিল—"রৌদ্রে গরম হয়ে গেছে। কিন্তু তার উপায় আছে।"

"কি বল দিখি ?"

"আচ্ছা আমি কি করি দেখ।" বলিয়া নবগোপাল থলির মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র লৌহ যন্ত্র বাহির করিয়া, কিয়দ্দূরে একটা বৃক্ষের ছায়াযুক্ত স্থান খনন করিতে লাগিল। পরে সেই ভূমির মধ্যে বোতলকে প্রোথিত করিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এস, আমরা ততক্ষণ খাই,—জল ততক্ষণ ঠাণ্ডা হোক্।"

দুইজনে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। আহারকালে প্রশ্ন করিয়া করিয়া নবগোপাল রমার গৃহের আত্মীয়গণের কথা অনেক জানিয়া লইল। আহার শেষ হইলে, নবগোপাল প্রোথিত বোতল তুলিয়া আনিতে গেল। যে সময় সে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, রমা তখন চীৎকার করিয়া উঠিল—"দেখো দেখো!"

নবগোপাল চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল একটা বৃহৎ বন্য শূকর ক্রোধভরে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্ত-মধ্যে নবগোপাল রমার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্বীয় বন্দুক উঠাইয়া

বন্যশূকরের সৌভাগ্যবশতঃ গুলিটা তাহার পদদেশে লাগিয়াছিল। সে একটা বীভৎস চীৎকার করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।

শূকর পলায়ন করিলে, দুই জনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া হাঁসিল। জলযোগও সমাপ্ত হইল। রমা সূর্য্যের পানে চাহিয়া বলিল—"এবার ফেরা যাক, নইলে আমার দেরী হয়ে যাবে।"

দুইজনে তখন গল্প করিতে করিতে গৃহাভিমুখে পদচালনা করিতে লাগিল। নবগোপালের জঙ্গলের পথে পর্য্যটন করা অভ্যাস ছিল, সে অধিক পথ ভুলিল না। বনের দৃশ্য দেখিয়া রমা বলিল—"তুমি মহাভারত পড়েছ?"

"পড়েছি ছেলে বেলায়।"

"আচ্ছা কোন্ পর্ব্ব তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?"

"দ্রোণপর্ব্ব আর কর্ণপর্ব্ব।"

"আমার সব চেয়ে ভাল লাগে কোন্ পর্ব্ব জান?"

"কোন্ পর্ব্ব?"

"বনপর্ব্ব। বনপর্ব্ব আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। এই বন দেখে আমার বনপর্ব্বের কথা খালি মনে হচ্চে। আমার সব চেয়ে সেইখানটা ভাল লাগে, যেখানে ভীম যুধিষ্ঠিরের জন্যে নীলপদ্ম আন্‌তে যাচ্চেন। সেই যেখানে আছে

অতঃপর ভীম,　　　　পরাক্রমে ভীম,
চলিলা উত্তর পথে,
দুই ভীতে যত,　　　　আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে।

সেই খান থেকে বরাবর অবধি ভীম কুবেরপুরী থেকে যুদ্ধ করে পদ্ম নিয়ে এলেন। আমাদের বন আছে কিন্তু পাহাড় নেই। পাহাড় দেখ্‌তে আমার ভারি ইচ্ছে করে। তুমি পাহাড় দেখেছ?"

"কত দেখেছি। পশ্চিমে অনেক পাহাড় আছে। তোমার দাদা পঞ্জাবে চাকরি করেন বল্লে, যদি কখনও পঞ্জাবে যাও, তা হলে অনেক পাহাড় দেখ্‌তে পাবে।"

বৃক্ষ ক্রমে বিরল হইয়া আসিতে লাগিল, বন কমিতে লাগিল। ক্রমে দূর হইতে মহেশপুর গ্রামও দেখা গেল। ক্রমে ইহারা একটী সঙ্কীর্ণ গোশকটের পথে আসিয়া পড়িল। এই পথে কিছু দূর আসিয়া রমা সহসা আহ্লাদে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। দূরে একটি মনুষ্য-মূর্ত্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া আনন্দে নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে বল দিকিন?"

"কে?"

"তুমি বল না!"

"আমি ত চিনিনে।"

"আমার বাবা।"—বলিয়া রমা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া,—কলহাস্তের সহিত পিতৃসম্ভাষণে ছুটিয়া চলিল।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

BENGAL LIBRARY
24 NOV
WRITERS BUILDINGS

... AL LIBRARY.
W... ERS' BUILDINGS
Recd. on the 21 JAN 1903

কর্ত্তব্য সাধন কর।*

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

বন্দর-ভূমির উপর একটী সুসজ্জিত পান্থনিবাসের ছাদ। রঙ্গ-মঞ্চের দূর-পশ্চাতে, সমুদ্রের দিগ্বলয় ও জাহাজের মাস্তুলাদি পরিদৃশ্যমান। যবনিকা উত্তোলিত হইবামাত্র শোক-বসনা কোন জননী আসীনা। ১৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র সেও শোক-বসন পরিয়া মাতার নিকট দণ্ডায়মান।

১ দৃশ্য।

মাতা ও পুত্র।

পুত্র। যাবে মাগো দেশান্তরে ?
মাতা। হাঁরে বাছা, ছাড়ি যাব দেশ।
পুত্র। কি মজা! ভ্রমণে যাব!
মাতা। যথেষ্ট রে সহিয়াছি ক্লেশ।
এ কয়েক মাসে যেন দশ বর্ষ বাড়িল বয়েস!
আছে কিছু সংস্থান —তাহে মোর নাহি চিন্তা লেশ।
আজি রাতে যাব মোরা "মার্কিনে," ছাড়িয়া জাহাজ,
মোর আশা নহে মিথ্যা, নিশ্চয় পাইবি সেথা কাজ।
কিন্তু আমি মরিব রে ভয়ে ভয়ে, যদি থাকি হেথা;
চল্ তবে, যাই বাছা,
পুত্র। তাহ'লে কি সুখী হবে মাতা ?

---

* গত ফরাসী-জর্ম্মান যুদ্ধের ঘটনা লইয়া এই নাটিকাটি রচিত। এই নাটিকার

মাতা। এমনি আশা তো করি।

(পুত্রের সমুদ্র দেখিতে মাতার নিকট হইতে দূরে গমন, মাতা তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া)

হায়! এ যুদ্ধের মুখে ছাই!

এই যুদ্ধে পিতা তোর —মরিলা জানি না কোন্ ঠাঁই।
আর, তুই প্রাণাধিক! —নিষ্কলঙ্ক সুন্দর এমন—
তোরো হবে সেই দশা হ'ল তোর পিতার যেমন!
জন্মভূমি! কত ভাল বাসিতাম তোরে হায় হায়!
তোর ওই মিষ্ট ভাষা আহা কি মধুর রসনায়!
ওই ভাষা ছিল মোর যৌবনের প্রণয়-ভীষণ,
ও ভাষায় বৎস মোর মা বলিয়া ডাকিল প্রথম!
হায় হায়! কিন্তু এবে বলিতেছি তোরে মা নিষ্ঠুর,
—মনে হয়, তোর নভ অন্ধকার, সমীরণ ক্রূর!
তুই যে করিলি ওরে! গতিহীন বিধবা আমায়
আর, এই সবে-ধন একমাত্র পুত্র মোর তায়।

পুত্র। সিন্ধু কি সুন্দর আহা! হবে তাহে সুদীর্ঘ ভ্রমণ!
বেশ মজা!—ওই ধোঁয়া! দেখা যায় মেঘের মতন!
—বৃহৎ জাহজ-খানা!

মাতা। ও যে বাছা বাষ্পযন্ত্র-তরী
আসিছে ফিরিয়া হেথা।

পুত্র। সিন্ধু কি সুন্দর আহা মরি!
—না না মা, বোঝাই হয়, দেখিনু সে জাহাজ হোথায়;
বলিল খালাসী এক —"উঠে বায়ু বা'র-দরিয়ায়।"
কাঁপিছে দেখনা ওই 'নিশানের যত ফিতাগুলি,
—তা-সহ নিশান যত —রজ্জু হতে আছে যাহা ঝুলি'।

দো-আঁশ্‌লা কাফ্‌রী কালো ধবল পটের নীচে-দিয়া
গেল চলি; সুচটুল কপি-সম খালাসীর মিঞা
নাবিছে মাস্তল-বাহি'; সমস্ত সে বন্দর ব্যাপিয়া
রয়েছে মালের গাঁট্‌, ফল-রাশি, আর কত টিয়া।

—আলকাতরার গন্ধ— কাঁপে পাল ফুর্‌ফুর্‌ করি';
আনন্দে দেখিনু আমি কালো রঙে আঁকা পটোপরি
সুস্পষ্ট অক্ষরগুলি —আমেরিক-প্রদেশের নাম
"ব্রেজিল," "লা প্লাটা," "লিমা," "ভাল্‌পেরেজো"—আরো কত স্থান।

কি মজা সমুদ্রে যাওয়া! আমি মা বিপদে নাহি ডরি,
খুব বেশি হয় যদি —হব মোরা শুধু ভগ্ন-তরী!
হোক্‌ না তুফান ঘোর —উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার,
সেতো মা আরো গো ভাল —আমি তোমা করিব উদ্ধার!

"রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো"-সম লভি' আমি সাগরের তীর
বানাব মা তোমা-তরে সেই মত পাতার কুটীর;
রব সেথা মোরা দোঁহে অতি সুখে একলা বিজন,
ও গো মা! তেমন সুখ হেথা তুমি পাওনি কখন।

কেননা, দেখি যে হেথা জনপূর্ণ লোকের সমাজে
কি এক বিষাদ ঘোর রহে সদা তব হৃদি-মাঝে!

মাতা। বাছা ওরে!
(স্বগত) এ বয়সে ভুলে যাওয়া সহজ কেমন!
(প্রকাশ্যে) আয় বাছা, করি এবে জাহাজের নিকটে গমন।

পুত্র। যাই আমি দৌড়িয়া;
মাতা। দেরে আগে একটি চুম্বন!
(মাতাকে চুম্বন দিয়া প্রস্থান)

২ দৃশ্য।

মাতা।

মাতা। আমি যদি নাহি হই সুখী গিয়া সুদূর প্রবাসে,
অন্ততঃ বাছাটি মোর হবে সুখী—যাব সেই আশে।
মাতৃভূমি—সেতো সুধু লোকদের অন্ধ সংস্কার,
তার তরে কেন মিছে স্কন্ধে লই বিপদের ভার।

সেই ভূমি—যে হরিবে বাছারে এ আসন্ন সংগ্রামে,
নিষ্ঠুর হইয়া যেগো খাদ্য-রূপে দিবেরে কামানে!
তবু ওরে মাতৃভূমি! তোরি নাম করিয়া গ্রহণ
সেই বীর পতি মোর রণেভূমে ত্যজিলা জীবন।

তিনি যদি দেখিতেন যাইতেছি ছা'ড়ি নিজগ্রাম
যেথায় গো এতদিন করিলাম সুখে অবস্থান,
—আর এবে শোক-বেশে সপ্তসিন্ধু করি' অতিক্রম
পুত্র লয়ে যাইতেছি করিতে গো ভাগ্য অন্বেষণ,

—সর্ব্বনাশ!—তাহা হলে হয়ে তিনি রক্তে-রক্তময়
—ওঃ! সে ভীষণ স্বপ্ন— ভাবিতেও মনে হয় ভয়।
কিন্তু আমি মাতা যে গো —যা' ভেবেচি উত্তম তাহাই,
পুত্রেরে বাঁচানো ছাড়া কর্ত্তব্য অন্য মোর নাই।

জিজ্ঞাসি যদ্যপি আমি চুপি চুপি অন্তর-আত্মায়,
শঙ্কিত সে মাতৃভাবে অন্তর-আত্মাও দিবে সায়।
শুখায়ে গিয়াছে মোর হৃদয়ের ভাব আর সব,
(রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে গুরুদেবকে দেখিয়া)

৩ দৃশ্য।

মাতা ও গুরুমহাশয়।

গুরু। যাইতেছ ?
মাতা। আজি রাতে।
গুরু। আর, পুত্র ?—
মতা। সেও সঙ্গে যাবে।
গুরু। শোনো বলি, আছে ক্ষুদ্র   পাঠশালা গ্রাম-প্রান্তভাগে ;
ক-খ শিক্ষা দেই সেথা   যত সব কৃষক-সন্তানে ;
সরল-হৃদয় অতি,   পরনিন্দা নাহি তারা জানে ;
কিন্তু শুনিল গো যবে   —তুমি দূরে করিছ প্রয়াণ
তাদের সাথীটি লয়ে,   —যাইতেছ ছাড়ি এই গ্রাম ;
প্রত্যাসন্ন বিপদের   অন্ধকার করিয়া দর্শন
তাদের সে নর্ম্ম-সখা   শত্রু-হতে করে পলায়ন ;
তখন তাহারা সবে   —শুনিবে কি, বলিল যে কথা ?—
বলিল—"সে পলাতক"   —সৈন্যদলে পলাতক যথা।
মাতা। শোনো বলি—
গুরু। সত্য বটে, তব পুত্র বালক এখনো ;
যা ইচ্ছা করাতে পার ;   কিন্তু এ কি তোমার ধরম
লয়ে যাওয়া দূরদেশে   না লইয়া সম্মতি তাহার ?
জানায়েছ কিগো তারে   যাহা কিছু আছে জানাবার ?
স্নেহের দুলাল তব   তোমা-কাছে জানিয়াছে কিবা
কারে বলে মাতৃভূমি,   —কারে বলে স্বদেশের সেবা ?
জানে কি এ যুদ্ধ-কথা ?   —শত্রু-পরে মোদের যে দ্বেষ ?
জানে সে কি শত্রুগণ   হইয়াছে দুইটি প্রবল ?

জানে সে কি, শত্রুগণ দেছে ভাঙি আমাদের অসি
জানে সে কি পিতা তার মরিয়াছে রণভূমে পশি ?

মাতা। হাঁ গো হাঁ ; আরো সে জানে, তার পরে কত ভালবাসা ;
জীবন-সর্ব্বস্ব সে যে —সে যে মোর একমাত্র আশা।
ছিনিয়া লইলে তারে হবে মোর নিশ্চয় মরণ ;

গুরু। ও কি কথা ? জননি গো !

মাতা। সেই রাত্রি আছে কি স্মরণ
কাঁদিনু তোমার কাছে ; সেই ঘোর সংগ্রামের শেষে,
দেশের সৈনিক এক —বন্দী হয়ে যায় শত্রু-দেশে—
পাঠাইল মোর কাছে পতির সে সম্মান-ভূষণ,
আর সেই কথাগুলি —তাঁর সেই অন্তিম বচন।
আছে কি স্মরণ তব, সেই রাত্রি আশ্বিনের মাসে
বাছার শয়ন-কক্ষে, জানু-ভরে সুপ্ত শিশু-পাশে,
প্রার্থনা করিনু আমি দেব-পদে পরাণ ভরিয়া,
বলিলাম "দয়াময় ! রাখ ওকে করুণা করিয়া,
আমা-তরে"—

গুরু। আমি ভেবেছিনু বুঝি —প্রতিশোধ তরে ;
ওই একমাত্র কথা —জাগে যাহা দেশের অন্তরে।

মাতা। না গো না, লয়েছে দেশ পতি মোর—আর কিবা চায় ?

গুরু। না, তুমি পাবেনা যেতে।

মাতা। আজি রাতে হইব বিদায়।

গুরু। ভীরুতা সে !

মাতা। শোনো বলি, আমি নহি রোমক-ললনা।

গুরু। দেখো পরে এর লাগি করিতে গো হইবে শোচনা।

গুরু। মাতা কি নহেন জন্মস্থান?
মাতা। সে মাতা চাহেন যে গো আপনার সন্তানের প্রাণ।
গুরু। পরাণ না দিলে পুত্র কে শুধিবে মাতৃ-অপমান?
মাতা। তাই বুঝি কাটাকাটি পরস্পর করিছ সম্প্রতি?
গুরু। পতি তব শুনিছেন বলিছ যা'।
মাতা। হাঁ গো, মোর পতি
বলিছেন, "শীঘ্র যারে! শীঘ্র যারে!" মোর কানে কানে;
গুরু। এ যে তব পতি-নিন্দা!— এ কথা বলিছ কোন্ প্রাণে?

৪ দৃশ্য।

মাতা, পুত্র ও গুরুমহাশয়।

পুত্র। জাহাজ ছাড়িবে শীঘ্র— পালগুলি কাঁপে দেখ বায়,
গুরুমহাশয় ওগো! চলিলাম—লইনু বিদায়।
গুরু। বৎস!—বৎস!
মাতা। শুনিও না ওঁর কথা, বলিবেন উনি
"যেও না জাহাজে এবে কর কাজ মোর কথা শুনি"
"দূর-দেশ" বলি' উনি তোরে বাছা দেখাবেন ভয়,
"অজ্ঞাত বিপদ যেথা, সুফলেরো নাহিক নিশ্চয়।"
তারপর, উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিয়া স্বদেশের নাম,
মিথ্যা আশা জাগাইতে করিবেন চেষ্টা অবিরাম;
বলিবেন,—"সুখ-সূর্য্য পুন হেথা হবে দীপ্যমান;
জয়ধ্বনি-রবে পুন বিকম্পিত হইবে নিশান;
আনন্দে করিবে যাত্রা সৈন্যগণ পুন শত্রুদেশে";
নারে বাছা শুনিস না এই সব কথা সর্ব্বনেশে।

উনি চান্, স্বপনের হাতে প্রাণ করিস্ বিসর্জ্জন ;
বড় বড় কথা বলি' করিবেন তোরে উত্তেজন।
নারে বাছা শু'নিস্ না ওই সব স্বপ্নময় ভাষা,
থাকে যদি আমা-পরে কিছুমাত্র তোর ভালবাসা।

শুরু। জননি, বুঝেছ ভুল, ইথে মোর নাহিক সংশয়
সৌভাগ্য, সুখশান্তি পাবে তুমি সে দেশে নিশ্চয়।
যাও তবে ; নভস্তল সুপ্রসন্ন, সাগর সদয় ;
সুবায় বহিছে এবে, শান্ত রহে তরঙ্গ নিচয়।

যাও তবে ; স্বর্ণখনি পাবে সেথা—কৃষিযোগ্য ভূমি,
ধনধান্যপূর্ণ দেশ, সুখস্বর্গ পাবে সেথা তুমি।
সংসারী কাজের লোক —একমাত্র স্বার্থ যার মনে,
তার কাছে দেশ শুধু কৃষিক্ষেত্র—বীজ যেথা বোনে।

" পিতৃ পিতামহদের চরণ-পরশ-পূত দেশ "
—এ কথা তাহারা ভাবে বাতুলতা—মূর্খতার শেষ।
তাছাড়া, ছাড়িছ কারে? —যে স্বদেশ শত্রু-পদাঘাতে
লাঞ্ছিত মরমাহত —শৃঙ্খল পড়ে যার হাতে।

পলাও পলাও তবে! —পূর্ণ হেথা দুর্ভিক্ষ মড়কে ;
এ দেশে থাকিলে তুমি মনে হবে রয়েছ নরকে!
(গভীর বিষাদ-ভরে) ঘোর কলি উপস্থিত মোদের এ পুণ্যদেশে এবে;
অবনতি-পথে সেগো ক্রমশই ধায় মহাবেগে।

এ বেগ থামিবে কভু —ফিরিবে আবার এর গতি,
হ'ব মহাজাতি পুন —জ্ঞানধর্ম্মে হইবে উন্নতি,
—এই এ দুরাশা-স্বপ্ন এই ঘোর উন্মাদ-বিভ্রম

গত যুদ্ধে যে ব্যাপার দেখিয়াছি আমি গো প্রত্যক্ষ
তাহাতে কাহার নাগো অশ্রুজলে ভাসি যায় বক্ষ ?
সে-সব কঠোর সত্য প্রকাশিব ছাত্রদের কাছে *
—যে বিষম দলাদলি ঢলাঢলি হয় দেশমাঝে !
স্বদেশের গুপ্ত শত্রু স্বদেশেরি লোক নীচপ্রাণ,
বিদেশের পদে তারা স্বদেশেরে করে বলিদান।
রাজধানী অবরোধি' শত্রুগণ যবে হ'ল শ্রান্ত
বলাবলি করে "ওরে ! রাক্ষসীটা এখনো যে জ্যান্ত"
অবরোধ ছাড়ি দিয়া 'যাবে চলি' হেন মনে হয়
—গৃহ-যুদ্ধ* বাধিল গো পুরীমাঝে এমন সময়।
স্বদেশের একদল —উন্মত্ত যতেক বর্ব্বর
না জানে স্বদেশ যারা, আর যারা না মানে ঈশ্বর—
আনিল বিপ্লব ঘোর ছারখার করি' সর্ব্বস্থান,
হত্যা করি' পরস্পরে· উঠাইল লোহিত নিশান ;
এদিকে শত্রুর দল সন্নিহিত শৈলপরে বসি'
আমোদ আহ্লাদে রত —কাণ্ড দেখি' করে হাসাহাসি।

পুত্র। থামো থামো গুরুদেব শুনি' মোর বড় লজ্জা হয়।

গুরু। না না বৎস, যায় নাই এখনো গো কাজের সময়।
কখন কখন রোগ উঠে যবে চূড়ান্ত সীমায়,
আপনা আপনি তাহা আরোগ্যের অভিমুখে ধায়।
দেখা যায় যুবাদের বৃথাগর্ব্ব—বৃথা আস্ফালন
—সে বিস্ফোটকে আমি কব্রিব গো অস্ত্র সঞ্চালন।
যখন দেখিব, তারা শুনি' এই কলঙ্কের কথা
লজ্জিত, তখনি আমি শুনাইব সান্ত্বনা-বারতা।

বলিব তাদের আমিঃ— এ ভীষণ যুদ্ধের সময়
দরিদ্র সৈনিক কত বীরত্বের দিল পরিচয়।
অনশনে মৃতপ্রায় তবু তারা থাকিতে জীবন
শত্রু-পদতলে কভু করে নাই আত্ম সমর্পণ;
করেছে কর্ত্তব্য, শুধু মাতৃভূমি মুখপানে চাহি',
বক্ষে অস্ত্র সহিয়াছে —পৃষ্ঠে কারো ক্ষতচিহ্ন নাহি!
তাদের বলিব আমি সেই সব বীরত্বের কথা,
মাতায়ে তুলিব সবে শুনাইয়া স্বদেশের ব্যথা;
উত্তেজিব ঘৃণা মনে, —জাগাইব অপমান-বোধ,
প্রস্তুত করিব সবে শেষে যাতে লয় প্রতিশোধ!

পুত্র। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

মাতা। ওগো ওগো! কি করিলে তুমি?
ভাবি দেখ ওই মোর সবে মাত্র একটি বাছুনি।
তুমি তো গো জান সব কি কষ্টে মরিল ওর পিতা,
রক্তাক্ত খড়েতে শুয়ে —ঘোষে যবে চৌদিকে বিজেতা।
মার্জ্জনা করিবে মোরে —মার্জ্জনীয় সংশয় আমার
—গিয়াছে গো অধঃপাতে এ জাতি উঠিবে নাকো আর!
উত্তর দেও গো মোরে, কেন চেষ্টা কর তুমি বৃথা?
কোন আশা নাহি মোর।

গুরু। জননি গো, শুন মোর কথা।
আমি গো সরল-মতি ভবিষ্যদ্‌বক্তা আমি নই,
তবু এ বিশ্বাস মোর নিশ্চিত তোমারে আমি কই—
যাহাই হোক্‌না কেন, যতই হোক্‌ না পরাজয়,
স্বদেশ এখনো মোরা উদ্ধারিতে পারিব নিশ্চয়।

গুরু। শিশুগণ! তোমাদেরি কাজ;
বলিলাম যেই কথা —বটে ইহা অসম্ভব আজ,
এখনো বটে গো দূরে —অতি দূরে সেই গম্যস্থান;
বহুকাল ধৈর্য্য চাই —আর চাই স্বার্থ বলিদান।
তোমরাই হয়ে যুবা প্রাণ দিবে স্বদেশের তরে,
মেদিনী কম্পিত হবে তোমাদেরি বীরপদ-ভরে!
তখন আমরা বৃদ্ধ —ধবল পলিত কেশ মাথে,
"ধন্য ধন্য" বলি' তোমা আশীষিব বিকম্পিত হাতে।
মাতা। লঘুচেতা এ জাতিরে তোমারো সন্দেহ হয় তবে?
গুরু। নব প্রাণ সঞ্চারিব —শিশুর শিক্ষক মোরা সবে।
দেও শিশু তোমাদের —হয় কিনা দেখ বীর তারা;
উদ্ধার করিব দেশ আমরা গো তাহাদেরি দ্বারা।
মাতা। দেশোদ্ধার, সেতো শুধু মিছা স্বপ্ন, কল্পনা-কাহিনী,
নিতান্তই অসম্ভব!
পুত্র। শোনোনা মা, কি বলেন উনি।
গুরু। তাই যদি ইচ্ছা করে সত্যই গো এদেশের লোক,
মতিভ্রম বাতুলতা যদি পারে করিতে বিলোপ,
উদ্ধারিতে পারে যদি আপনারে অজ্ঞান হইতে,
ভাল কথা, ভাল গ্রন্থ, শেখে যদি ঠিক্ নির্ব্বাচিতে,
খোঁজে যদি সুসঙ্গত স্বাভাবিক উন্নতির মার্গ,
নিয়ম সংযম মান, না বাধায় বিপ্লব-উপসর্গ,
প্রকৃত যে স্বাধীনতা —সেই পথ যদি তারা ধরে
—নিজের সম্মান রাখি' বিতরিয়া সম্মান অপরে—
করে যদি সযতনে জাতীয় দোষের সংস্কার,

সত্য বটে, ফলবতী শুভ শান্তি করিতে স্থাপন
আবার করিতে হবে ঘোরতর যুদ্ধ আয়োজন।
সে ঘোর বিষম যুদ্ধে বিকম্পিত হবে ইউরোপ,
কেননা, "ফুঁ-দিয়া" শুধু নাহি হয় বিঘ্নের বিলোপ।
সাধিতে এ কার্য্য কিন্তু একমাত্র আছে গো উপায়,
—সিপাহি হইতে হবে পুরবাসী প্রত্যেক জনায়।
সমস্ত সমগ্র দেশ হবে এক সৈন্য-পরিবার,
এক-ই কর্ত্তব্য-বোধে কাঁপিবে গো হৃদয় সবার।
জমিদার কর্ম্মকার পরস্পরে হবে গলাগলি,
মহারাজা চাষা-প্রজা করিবেক কথা বলাবলি।
এক-ই তাঁবুতে বাস, পানাহার হবে একত্তরে,
দেখা শুনা বাক্যালাপ সরবদা হবে পরস্পরে।
সেই মহাসৈন্য যবে সু-নেতার হইয়া অধীন,
দৃঢ় নিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করি' অনুদিন,
শ্রম-কার্য্যে সুপ্রসন্ন, পরিতুষ্ট বহিয়া বন্দুক,
পরস্পরে তুষিবারে পরস্পর সদাই উন্মুখ
—দৃঢ়পদে, শান্তভাবে নীরবে চলিবে সারি-সারি,
তখনি মা জন্মভূমি! সুনিশ্চিত বিজয় তোমারি!
ছাড়িয়া শোকের বাস জয়নাদ তুলিয়া গগনে,
প্রচণ্ড প্রবাহ সম প্লাবি' দেশ নিজ সৈন্যগণে,
মহিমা-মণ্ডিত তব সেই সে "তেরঙা" পতাকায়
আবার স্থাপিবে তুমি তোমার সে প্রাচীন সীমায়!

পুত্র। ঠিক বলেছেন উনি; দেখ মা, দিও না মনে স্থান
নিরাশার কুমন্ত্রণা।

মাতা। (গুরুমহাশয়ের প্রতি)
হায় হায়! করিলে কি?

গুরু। করা চাই কর্ত্তব্য-সাধনা।

মাতা। (পুত্রের প্রতি)
নিষ্ঠুর বৎস ওরে! তুইও কি তাহাই চাস্?

পুত্র। (মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) হাঁ মা!

মাতা। আচ্ছা ভাল, তাই হোক্ ঈশ্বরে করিনু সমর্পণ,
—বাছারে করুন রক্ষা!

গুরু। —দেশটিকে করুন রক্ষণ!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহেবজাতির কুটুম্ব-বাৎসল্য।

এদেশের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের কুটুম্ব-বাৎসল্যের নমুনা আজ কাল এতই সুলভ হইয়া উঠিয়াছে যে, যে কোন সপ্তাহের সংবাদপত্র হইতে অবলীলাক্রমে তাহার দুই একটি নমুনা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কুটুম্ব-প্রীতি ভাল জিনিস, কিন্তু ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সেই প্রীতি বিশ্ববাসিগণের সম্মুখে বিকশিত করিয়া তোলাতে নিজের ক্ষমতা, দর্প ও দুর্জ্জয় স্বার্থপরতা যতই প্রকাশ হউক, য়ুরোপীয়ের আন্তরিক দুর্ব্বলতা ও কর্ত্তব্যহীনতা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক মাত্রায় প্রকাশ হইয়া থাকে। আইন পরিচালক ধর্ম্মাবতার যখন আইনকে তাঁহার কূট যুক্তির দাসত্বে নিযুক্ত করেন, নিজের বিশ্বাসকে প্রতারিত

যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন, তথন আইনতন্ত্রতা ও সুশাসন ইতিহাসের পৃষ্ঠা জুড়িয়া মিথ্যা সাক্ষী দেয়।

মানুষ কল ও নহে, পুতুলও নহে, হৃদয়বিশিষ্ট জীব; প্রবলের হস্তে নিগৃহীত হইয়া, প্রবলের জুতা পিঠে বরদাস্ত করিয়া, কিঞ্চিৎ প্রতিকারের আশায় যথন সে ধর্ম্মাবতারের শরণ লয়, সে সময় সেই ধর্ম্মাবতার যদি করুণাপরবশ হইয়া তাহার পিঠের চামড়া শক্ত করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, এবং যে জুতা মারিবে তাহার প্রহারানুরাগকে ন্যায়-সঙ্গত অধিকার বলিয়া প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তবে তাহার কর্ত্তব্য কি? যদি তাহার কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব থাকে তবে সে বিচারা-ভিনয়ের প্রতীক্ষা না করিয়া পিঠে জুতা পড়িবামাত্র দেশী মুচির হস্তরচিত স্থূল নাগরা দ্বারা সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করিবে; তাহাতে কিঞ্চিৎ বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া পশ্চাৎ পদ হইবে না; কারণ সে বুঝিবে প্লীহা একবারের বেশী দুইবার ফাটিবে না, এবং একটা প্লীহার পরিবর্ত্তে একবার একটা নাসিকা ফাটাইতে পারিলে, অনেক প্লীহা রক্ষা পাইবে।

বস্তুতঃ দেশের মধ্যে বিচারের অভিনয় যেরূপ করুণ হইতে ক্রমে হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মানুষ আইন চালকগণের দুরদর্শিতার প্রতি হীনশ্রদ্ধ হইয়া স্ব স্ব ক্ষতিপূরণের বে-আইনি পথ দেখিলে আমরা বিস্মিত হইব না। ঘোরতর নিরপেক্ষতা ও সততার ঘোষণা জারি করিয়া যাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করে, সুবিচারের ছলনায় যাহারা অবিচার করে, তাহারা কখন সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি অটুট রাখিতে পারে না; আইনের বলে হঠাৎ মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য-জীবনের চরম কষ্ট?

এলাহাবাদের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সোমেশ্বর দাসের মামলার কেমন

নহে। আদালত ক্রমে যত উচ্চ হইয়াছে, বিচার ফল ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াছে, অবশেষে টক্ আঙ্গুরের গুচ্ছ নয়নের অন্তরালে একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে।

সোমেশ্বর দাসের ভাড়াটে লাফোসের মত সাহেব এ ভারতভূমিতে অল্প নাই, ইঁহাদের মূল মন্ত্র 'তোমারই শিল তোমারই নোড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।' সোমেশ্বর দাঁতের বেদনার আতিশয্যে এখন শয্যাগত! লাফোস দ্বিতীয় কোন সোমেশ্বরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কথা নাই, কারণ আমাদের দেশী লোকেরা শ্বেত মুখের বাক্য-সুধায় এতই আত্মবিস্মৃতি ঘটাইয়া বসে যে, তাহাদের সহোদরের পৃষ্ঠের জুতার ক্ষত তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। ঘুঁটেকে পুড়িতে দেখিয়া সেই সকল 'গোবর' না হাসিয়াই থাকিতে পারে না।

সুতরাং হাইকোর্টের বিচার-নৈপুণ্যে সোমেশ্বর দাসের পুষ্প-বিভ্রাটের ন্যায় অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রাটময় মামলা আরও যে দুই একটির সৃষ্টি না হইবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। সোমেশ্বর দাসের ফুলগাছঘটিত মামলা আদালতের চক্র হইতে 'দাঙ্গার' মার্কা লইয়া গজভুক্ত কপিত্থবৎ বাহির হইয়া আসিবার অল্প কাল পরেই উক্ত উত্তর-পশ্চিম (এখন যাহার নাম 'যুক্তপ্রদেশ' হইয়াছে) প্রদেশেই এই শ্রেণীর আর একটা মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে; এ বিচার অধিক কৌশলময়, অধিকতর চাতুরী দ্বারা ইহাকে ন্যায় বিচারে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই; উদাহরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কানপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের এক প্রান্তে বাবু বলদেবপ্রসাদ এক 'বাঙ্গলা' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সাহেব লোককে ভাড়া দিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয়ই বোধ করি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং তিনি [illegible]

টিট্‌লার নামক এক বীর পুরুষকে তাহা ভাড়া দেন। যেখানে বৃক্ষ সেখানেই সাহেব লোকের লম্ফ ঝম্ফ। লাফোস সোমেশ্বর দাসকে ফুলগাছের ফেরে ফেলিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে বাঙ্গলাসন্নিহিত আম্রবৃক্ষ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; বিশেষতঃ আমগুলি বড়ই উপাদেয়, উৎকৃষ্ট আম্র ও রম্ভার প্রলোভন কোন্ শ্বেতাঙ্গনন্দন সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে? সুপক্ক চূতফল দেখিয়া সাহেবের জিহ্বায় রস সঞ্চার হইল, তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গলাখানি ভাড়া লইয়া বৃক্ষগুলির পর্য্যন্ত মালিক হইয়া বসিলেন। বলদেবপ্রসাদ আম পাড়িতে গিয়া সাহেবের রোষানলে নিপতিত হইলেন, আম খাইলেন কাপ্তেন সাহেব, বাড়ীওয়ালা দেশী বাবুজী খাইলেন তাঁহার গালি। কারণ কাপ্তেন টিট্‌লার প্রজা হইয়াও রাজা—অন্ততঃ রাজকুটুম্ব, আর বলদেবপ্রসাদ রাজা (অর্থাৎ ভূম্যধিকারী) হইয়াও প্রজা—নেটিভ মাত্র, সাহেবের গালি ভিন্ন সুপক্ক আম্রে তাঁহার অধিকার কি?

অধিকার নাই দেখিয়া বলদেবপ্রসাদ এক বিচক্ষণতাপূর্ণ কার্য্য করিলেন, তিনি রামমোহন বাবু নামক একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট বাগান সমেত বাঙ্গলাখানি বিক্রয় করিলেন, রামমোহনের যে কেবল বিস্তর টাকা তাহাই নহে, দেশীয় সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট।

বাঙ্গলার সত্ত্বাধিকারীর পরিবর্ত্তন ঘটিলেও ভাড়াটিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিল না, কাপ্তেন টিট্‌লার "যথাপূর্ব্ব তথাপর" সেই বাঙ্গালায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহার অধিকার বহির্ভূত বৃক্ষসমূহের সুপক্ক ফলের আস্বাদন গ্রহণেও বিরত হইলেন না। তিনি কাপ্তেন, জানিতেন, 'ধনবানে কেনে ঘোড়া, বুদ্ধিমানে চড়ে', সুতরাং বাবু রামমোহনের ন্যায় ধনবান গাছ ক্রয় করিলেও, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান সে বাগানের ফলভোগ না করিবে কেন?

সাহেব কেবল গাছের ফল খাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিলেন না, জাতীয়-

ধর্ম্ম ব্যবসায়ের প্রতিও অনুরাগ প্রকাশ করিলেন, কালু নামক একজন ফল বিক্রেতাকে দ্বাদশমুদ্রায় বাগানের ফল বিক্রয় করিলেন। কালু ফলকর কিনিয়া গাছের নীচে দেরা দাণ্ডা ফেলিল। এবং তিন সপ্তাহ পরে আম্রগুলি পক্কপ্রায় হইলে, হাজার বারশ আম গাছ হইতে পাড়িয়া লইল।

রামমোহন যথাকালে এই সংবাদ পাইলেন ; রামমোহন বোধ করি কিছু স্থূলবুদ্ধির লোক, তিনি সহসা ঠাহর করিতে পারিলেন না একটা ফল বিক্রেতা কোন্ সাহসে তাঁহার বাঙ্গলা সংক্রান্ত বাগানের ফল প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে লুটপাট করিতেছে। তিনি ইহার প্রতি-বিধান সংকল্পে কানপুর কেণ্টনমেণ্টের ম্যাজিষ্ট্রেট, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, দানিয়ালের নবসংস্করণ মেজর রুকের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মেজর রুক যদি বুঝিতে পারিতেন—নরাধম রামমোহন পুরুষোত্তম টিট্‌লারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনায় আসিয়াছে, তাহা হইলে তিনি কিরূপ বিচার করিতেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার বীরপুরুষের বুদ্ধি, অতথানি তলাইতে পারিল না, তিনি স্থির করিলেন (এবং পরে সে কথা রায়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন) রামমোহন মিঃ টিট্‌লারের স্বার্থরক্ষার জন্য এই ফ্যাসাদে পদার্পণ করিয়াছেন ; টিট্‌লার সাহেব তখন স্থানান্তরে গমন করিয়া-ছিলেন, তাই তাঁহার ভৃত্যগণ ফল পাড়িয়া গোপনে বিক্রয় করিতেছে, অতএব ইহার প্রতিকার অবশ্য কর্ত্তব্য। মেজর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে দুইজন কনেষ্টবল সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া ফলবিক্রেতার কবল হইতে আমগুলি উদ্ধারপূর্ব্বক বাবু রামমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে, মেজর রুক ভ্রমে পড়িয়া কতকটা সুবিচারই করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে ফলবিক্রেতা কালু দেখিল, তাহার ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন হইল,

টাকা বারটি দেখিতে দেখিতে ত হুইস্কির বোতলে রূপান্তরিত হইয়াছে, এখন আমগুলিও বেদখল! সে কাপ্তেন টিট্‌লারের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল, কাপ্তেন টিট্‌লার বোধকরি তখন মহেন্দ্র পর্ব্বতে ধ্যানরত ছিলেন, ভক্তের বিলাপে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি কাণপুরে প্রত্যাগমন করিলেন, ও বাবু রামমোহনের নামে আম্রক্রেতাকে দিয়া ফৌজদারী জুড়িয়া দিলেন। এই দ্বিতীয় নম্বর ফৌজদারীটিও উক্ত ধর্ম্মাবতার মেজর রুকের নিকট উত্থাপিত হইল।

এইবার ধর্ম্মাবতারের চৈতন্যোদয় হইল, তিনি তাঁহার পূর্ব্বের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, রামমোহন যে কৌশল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সুবিচার আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে, এ কথা ভাবিয়া বোধ করি যথেষ্ট ক্ষুণ্ণও হইলেন, এবং এই মামলার বিচারাভিনয়ে তিনি যে রায় প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পাপের আঠার আনা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

মেজর ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে প্রকাশ করিলেন, কাপ্তেন টিট্‌লার বাঙ্গালায় বাস করিবার কাল হইতে বাঙ্গলা-সংলগ্ন গাছের ফল ও জমীর ঘাস ভোগ করিতেছেন, কাহারও কোন আপত্তি টেঁকে নাই, কাপ্তেন সাহেব স্থানান্তরে যাইবার পূর্ব্বে বাগানের ফল বিক্রয় করিয়া গিয়াছিলেন, এ সংবাদ জানিয়াও তিনি কাপ্তেনকে কোন কথা বলিলেন না, সাহেব যেমন স্থানত্যাগ করিলেন অমনই তিনি ফাঁকি দিয়া কনেষ্টবল বাহির করিয়া লইয়া গিয়া আমগুলি দখল করিলেন! এ আলবৎ চুরি, অতএব ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারায় রামমোহন অপরাধী গণ্য হইলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের চক্ষের উপর এলাহাবাদের সোমেশ্বর ঘটিত মামলার অনিন্দনীয় রায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনশিখার ন্যায় নৃত্য করিতেছিল, তিনি রায়ে ফস্ করিয়া লিখিয়া বসিলেন,

the accused was in the Allahabad Case." সুতরাং বিচারপতির হুকুম হইল, রামমোহনের চারিশত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে তিন মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস। নিজের জিনিস নিজে চুরি করা অপরাধে এমন দণ্ড আর কোন দেশে কোন বিচারক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই; ইহা অপেক্ষা কুটুম্ব-বাৎসল্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তও আমরা আর কোথাও দেখি নাই। রামমোহন, শুনিয়াছি, এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছেন, আপীলে কি ফল হইয়াছে তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই, তবে উচ্চ আদালতে মেজর রুকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায়ের যে খণ্ডন হইবে তাহার আশা অল্প; কারণ বিচারবিভাগে এরূপ অনেক পণ্ডিতই স্ব স্ব লাঙ্গুল সংগোপনপূর্ব্বক আইনের খণ্ডা হস্তে উপবিষ্ট আছেন।

যাহা হউক রামমোহনের কাহিনী শেষ করিয়া এখন উমাচরণের কাহিনী কীর্ত্তন করা যাউক। বাবু উমাচরণ দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের বাড় ষ্টেসনের ষ্টেসন-মাষ্টার। উমাচরণ বাবুর কুগ্রহ, সামান্য সামান্য কারণে উক্ত রেলের রিনাস্ নামধারী একটা ফিরিঙ্গী গার্ডের সঙ্গে তাঁহার কলহ উপস্থিত হইয়াছিল; সাহেব-গার্ড ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিল না, সে একদিন ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মেই উমাচরণ বাবুকে ঠেঙ্গাইল, তাঁহার গায়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল, তাঁহার পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া দিল; গার্ড রিনাসের ব্যবহারে চতুষ্পদের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

বাবু উমাচরণ দে শুনিয়াছি ভারি প্রতাপশালী ষ্টেসন-মাষ্টার, নাম ডাকও যথেষ্ট, কিন্তু তিনি গার্ডটার নিকট চতুষ্পদের ব্যবহার লাভ করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে পারিলেন না; যদি তিনি সেই গার্ডটা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সেই স্থানেই তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহার নাসিকার উপর দুই চারিটি অমোঘ মুষ্টিযোগ নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে গার্ডটাও কিছু শিক্ষা লাভ করিত

তাঁহার শক্তিরও কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ভাল মানুষের মত বাড়ের ফৌজদারী আদালতে নালিশ রুজু করিলেন, বাড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মিলনী এই মামলার বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন; এ বিচারেও কুটুম্ব-বাৎসল্য শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিচারাভিনয়ের একটু পরিচয় প্রদান করিলেই এ উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে; বিচারক মিঃ মিলনী আইনদণ্ডকে কিরূপে খণ্ডায় পরিণত করিয়াছেন তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

উমাচরণ বাবুর দুইজন সাক্ষী ছিলেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী। একজন সাক্ষী বলিলেন, তিনি গার্ডকে ঘুঁসি তুলিতে, উমাচরণকে লক্ষ্য করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে ও হিন্দীভাষায় গালি দিতে শুনিয়াছিলেন, তবে সেই ঘুঁসি ও সেই থুথু উমাচরণের দেহ পবিত্র করিয়াছিল কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না। দ্বিতীয় সাক্ষী উমাচরণের ঘাড়ে গার্ডের ঘুঁসি নিপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। উমাচরণ জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন, ঘুঁসি তাঁহার কপালে পড়িয়াছিল, সুতরাং কাহার কথা ঠিক তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিচারক ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিলেন, আসামী গার্ড যুধিষ্ঠির সাজিয়া বলিল, সে ঘুঁসি তুলিয়াছিল বটে কিন্তু উমাচরণকে সে আঘাত করে নাই। এই কথা শ্রবণমাত্র বিচারক মিঃ মিলনীর সংশয় ও দ্বিধা কাটিয়া গেল, প্রমাণ হইয়া গেল উমাচরণ প্রহার লাভ করেন নাই! মাকড় মারিয়া সাহেব গার্ড কুটুম্ব বিচারকের কাছে তাহা অস্বীকার করিবে এ কথা ধর্ম্মাবতার কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

কিন্তু গার্ড যত খানি অপরাধ স্বীকার করিয়াছে তাহাইত পিনাল কোড অনুসারে দণ্ডনীয়; সে নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে সে গালি

করিয়াছে, সরলভাবে ইহার বিচার করিলে গার্ডকে দণ্ড দিতে হয়। সুতরাং তিনি কূটনীতি অবলম্বন করিলেন, গার্ডটা যে 'সডেন্ প্রোভোকেশন'—আকস্মিক উত্তেজনা বশতঃ এই প্রকার বিচলিত হইয়াছিল যুক্তিদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়া ফেলিলেন; সিভিল সার্ব্বিস পাশ করিলে একটা ক্ষমতা জন্মে, যুক্তি প্রয়োগে খুব ওস্তাদ হওয়া যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইল, যত দোষ উমাচরণের, উমাচরণ গার্ডকে না ক্ষেপাইলেই পারিত। মামলা ডিস্‌মিস্! আইনের ছিদ্রপথে মহামতি বিচারক এমনই কৌশলে মন্ত্র চালনা করিলেন যে সুবিচারের মহিমা আঠার আনা বজায় রহিয়া গেল।

কিন্তু বিচারকের এরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনায় আইনের সম্ভ্রম রক্ষিত হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিচারক দেশের লোককে নিতান্ত নির্ব্বোধ মনে করেন কিনা তাহা আমরা স্থির করিতে অসমর্থ। তিনি নিজের খেয়ালকে আইনের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া নিজের রুচি ও বন্ধু-প্রীতি এই উভয়ই বজায় রাখিতে পারেন, কিন্তু যখন ভারতে ইংরাজ শাসনের অপক্ষপাত ইতিহাস রচিত হইবে, তখন এই সকল বিচারক কি তাহাতে স্বমহিমায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন না? এবং ইংরাজের অপক্ষপাত শাসন-নীতি ও নিরপেক্ষ আইন কলঙ্কলিপ্ত করিয়া রাখিবেন না?

'সডেন প্রোভোকেশন' বা সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ মানুষের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিতে পারে, আর সে অবস্থায় গুরুতর অপরাধ করিয়া বসিলে আসামী আইনের কৃপাপাত্র হইতে পারে, কিন্তু প্রোভেকেশনের কি কারণ থাকিতে পারে, তাহার বিচারও কি আবশ্যক নহে?—মিথু কুরমী পেটের দায়ে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলে কুলীগিরি করিতে গিয়াছিল; মিঃ, এ, টি ডগলাসের উপর সেই রেলের মাটীর কার্য্যের ভার ছিল, তিনি এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার; একটা সাঁকোর নীচে মিথু কাজ

করিতেছিল, পাঁচ টাকার কুলী যে—তিনশত টাকার এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের মত নিজের যুক্তি খাটাইয়া কাজ করিবে, আমরা সে আশা করি না, পৃথিবীর মধ্যে এক ক্ষমতাদর্পিত ইংরাজ মনিব ছাড়া যে আর কেহ সে আশা করেন তাহাও বোধ হয় না। মিথুর কাজ সাহেবের মনঃপূত হইল না, সাহেবের ধাঁ করিয়া 'সডেন্ প্রোভোকেশন'—সাময়িক উত্তেজনা হইল, উত্তেজনায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্তস্রোত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়, এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের শোণিত ধমনীতে প্রবল হইয়া পদদ্বয়কে পর্য্যন্ত অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল, সাহেবের কঠিন বুট মিথুর বক্ষে সবেগে নিপতিত হইল, প্লীহা ফাটিল, আধ ঘণ্টার মধ্যে মিথুর কুলী-লীলার অবসান হইল। যে সকল ইংরাজের সডেন প্রোভোকেশন এত সহজে হয়, তাহারা কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক তাহা সহজেই অনুমানসাধ্য। হয়ত কর্ত্তৃপক্ষের একটু কড়াকড়িতে, বিচারের একটু কঠোরতায় এই উত্তেজনার বেগ সংযত হইতে পারে, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কতটুকু আছে, তাহা এই এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারটির অপরাধের বিচারেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

কুলী খুন হইয়াছে, সুতরাং একটা বিচারাভিনয়ের আবশ্যক আছে, যথাকালে মিস্ত্রীসাহেব আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়া জলপাইগুড়ীর ডেপুটী কমিশনর মিঃ ফরেষ্ট সাহেবের সম্মুখে চেয়ার পাতিয়া বসিলেন। বিচার আরম্ভ হইল, জুরীর হাতে বিচার, জুরীগণ শ্বেতাঙ্গ, মিঃ ডগলাসকে নরহত্যা অপরাধ হইতে খালাস দেওয়া হইল, হাকিম বাহাদুরেরও সেই মত হইল; তিনি বলিলেন, অপরাধটা সামান্য আঘাতমাত্র, সে আঘাতে যে কুলীটা মরিল, সে আঘাতের প্রাবল্যে নহে, প্লীহার বার্দ্ধক্যে!—দণ্ড দেড়শত টাকা জরিমানা!—আঘাতে একটা লোক মরিল, আঘাতের দোষ হইল না, যত দোষ গিয়া পড়িল বেচারীর প্লীহার

দণ্ডটা এমনই অস্বাভাবিক ও বে-আইনি যে সংসারের সুখদুঃখে উদাসীন বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টও বিচারটা অত্যন্ত দৃষ্টি-কটু বলিয়া মনে করিলেন, ছোটলাট বাহাদুরের হৃদয়ঙ্গম হইল দণ্ডটা কিছু লঘুই হইয়াছে, মামলার পুনর্ব্বিচারের অনুমতি বাহির হইল। অগত্যা হাইকোর্টে মামলা উঠিল, বঙ্গের কৃতবিদ্য সম্প্রদায় মনে করিতে লাগিলেন এতদিনে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিল, লঘুদণ্ডে সাহেবেরও আর বুঝি নিস্কৃতির পথ থাকে না; দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদক মণ্ডলী শরৎ ঘনের প্রতি নির্ভরশীল পিপাসাতুর চাতকের ন্যায় হাইকোর্টের দিকে চাহিয়া থাকিলেন, হাইকোর্ট মুষলধারে বারি বর্ষণ করিয়া চাতকের পিপাসা মিটাইলেন! মাননীয় বিচারপতি ষ্টীফেন ও হেণ্ডারসনের বিচারে রায় প্রকাশ হইল, We pass an additional sentence to the accused of six week's simple imprisonment,—দেড়শত টাকা জরিমানার উপর দুই সপ্তাহের বিনাপরিশ্রম কারাবাস! কুলী বধ করিয়া এত অধিক দণ্ড আসামের সেই লায়েল্ ভিন্ন অল্পদিনের মধ্যে আর কে পাইয়াছে তাহা সহসা আমাদের স্মরণ হইতেছে না। সুতরাং আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে—এংলোইণ্ডিয়ান ডিফেন্স সভা হইতে জয়ঢাকবাহী পেদরু সাহেব পর্য্যন্ত আস্তিন গুটাইয়া হাইকোর্টকে শাসন করিতে উদ্যত হইবে। এই নেটিভ কুলী মিথু যদি সডেন প্রোভোকেশনে ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উল্টা রকম কাজ করিয়া বসিত, এবং অবশেষে তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ হইতে হইত, তাহা হইলে মিথুকে ফাঁসীতে লটকাইবার জন্য সমগ্র ইংরাজ সমাজ কি উদ্গ্রীব হইয়া উঠিত না?

ক্রমাগত আইনের ফাঁকে ফাঁকে বেড়াইয়া ইংরাজ-সমাজ এদেশে কিরূপ বিচার-অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অনেকবারই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, সে দিন শিয়ালকোটে গোরা সৈনিক হস্তে দেশীয় পাচক হত্যা-ব্যাপারে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নবম ল্যান্সার

গোরা রেজিমেণ্ট কয়েক বৎসর বুয়র-যুদ্ধে সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিশ্রান্ত হইয়া অল্পদিন পূর্ব্বে পঞ্জাবের শিয়ালকোটে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছে। যে দিন তাহারা শিয়ালকোটে উপস্থিত হয় সেই রাত্রে তাহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল, সেই উৎসবকালে একজন দেশীয় পাচক গোরার পদাঘাতেই হউক আর মুষ্ঠ্যাঘাতেই হউক সাংঘাতিক আহত হয়; এটী রাত্রিকালের ঘটনা; উৎসবান্তে পরদিন প্রভাতে হতভাগ্য পাচককে গোরাবারিকের চারি মাইল দূরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিপতিত থাকিতে দেখা যায়। মৃত্যুকালে সে প্রকাশ করে, সেনা-নিবাসের বীর পুরুষের বীরত্বেই তাহার প্রাণ গেল; কোন্ সৈনিক এরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, বুয়ারের লাথি পরিপাক করিয়া আসিয়া নির্জ্জীব ভারতীয় পাচককে লাথি মারিবার প্রলোভন সম্বরণ কোন্ সৈনিকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই পাচক নির্দ্দেশ করিয়া মরিতে পারে নাই। হয়ত তাহার সে অবসর ছিল না, হয়ত সে সেই নরপশুকে চিনিতে পারে নাই; সুতরাং কোন সৈনিকই অপরাধ স্বীকার করিল না, সকলেই একদম পরম ধার্ম্মিক সাজিয়া বসিল, অব্যাহতি লাভের জন্য তাহারা নানাবিধ যুক্তি ও প্রলাপের অবতারণা করিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রমাণ হইয়া গেল তাহাদেরই কোন একজন অপরাধী, সেনানিবাসে তাহাদের বাসস্থানের কাছেই নররক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। লর্ড কর্জ্জনের মাথায়ও টনক নড়িল, তিনি মহা উৎসাহে তদন্তের আদেশ প্রদান করিলেন; তদন্ত পুরাদমে চলিতে লাগিল, কিন্তু থলির ভিতর হইতে কোন ক্রমে বিড়াল বাহির হইল না, সকলেই বে-কবুল। অবশেষে লর্ড কর্জ্জন উত্যক্ত হইয়া সমগ্র সেনাদলকে দণ্ডিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেন, একজন সৈনিক-কর্ম্মচারীও তাঁহার অভিপ্রায় সৈন্যগণকে সমজাইয়া দিবার জন্য শিয়ালকোটে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু সেই সৈনিক কর্ম্মচারীর তিরো-

পদেশ পরম ধার্ম্মিক বীর পুরুষগণের হৃদয়ে কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইল না। অগত্যা লর্ড কর্জ্জন তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন, দিল্লীর দরবারের আমোদ দর্শনেও তাহাদিগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

এই শেষ হুকুমে তাহারা ভারি দমিয়া গেল, তাহারা যুক্তি দেখাইল দিল্লীর দরবারে বিলাত হইতে তাহাদের আত্মীয়জন আসিতে পারে, যদি তাহারা তাহাদের এই দণ্ডের কথা জানিতে পারে তবে বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হইবে, কিন্তু তথাপি তাহারা হত্যাকারীর সন্ধান বলিয়া দিল না। লর্ড কর্জ্জন শুনিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সৈন্যদলই মহাপরাক্রমে দিল্লী রক্ষণ করিয়াছিল, সুতরাং দয়ায় লর্ড কর্জ্জনের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি এই শেষ দণ্ড প্রত্যাহার করিলেন।

কিন্তু লর্ড কর্জ্জন অপরাধিগণের অপরাধ আবিষ্কারের জন্য যে একটু কড়া মেজাজ অবলম্বন করিলেন, ইহা এলাহাবাদের ইংরাজ দৈনিক পাইয়োনিয়ারের ভয়ঙ্কর অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি মুদ্রাযন্ত্র আলোড়ন পূর্ব্বক কুটুম্ব-বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, লর্ড কর্জ্জনও পাইয়োনিয়ারের শ্লেষ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলেন না। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে ঐ পল্টনের আর একটা গোরা পদাঘাতে এক পাঙ্খা-কুলীকে ভবপারে পাঠাইয়াছিল, সেই জন্যই বড় লাট কিছু অধিক বিচলিত, অধিক বিরক্ত হইয়াছেন, পাইয়োনিয়রই সহাস্য বদনে এ কথা প্রকাশ করিলেন, এবং অম্লান বদনে বলিলেন, "পাচক হত্যার সন্ধান না পাইয়া লর্ড কর্জ্জন বিরক্ত ও বিচলিত হইয়াছিলেন তাই তিনি একটা সামান্য কুলী হত্যায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন, বস্তুতঃ এরূপ ঘটনায় এত উত্যক্ত হইবার কোন হেতু দেখা যায় না। গোরা সৈনিক যখন নিদ্রাতুর পাঙ্খা-কুলীকে পদাঘাত

করে, তখন সাহেবের পায়ে জুতা ছিল না, অতএব কুলির মৃত্যুর জন্য তাহার অদৃষ্টই দায়ী, তাহাতে গোরা সৈনিকের এত অপরাধ হয় নাই যে সে জন্য গবর্ণর জেনারেলকে এত বিরক্ত ও বিচলিত হইতে হয়।”

অক্ষম, দরিদ্র নিহত ব্যক্তির প্রতি কি মর্ম্মান্তিক উপহাস! এদেশে ইংরাজের ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতি দিন দিন এমন কলুষিত হইতেছে যে একখানি প্রধান সংবাদপত্র কুটুম্ব-প্রীতিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া উৎপীড়কের নরহত্যাকারীর সমর্থন করিতে এরূপ যুক্তিহীন প্রলাপ জনসমাজে প্রচার করিতেও লজ্জিত হয় না!

এই কুটুম্ব-বাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া যখন ধৈর্য্যের মাত্রা অতিক্রম করে তখনই ইংরাজের প্রকৃত মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু ধৈর্য্যের মাত্রা অতিক্রম না করিলে ইহা কিরূপে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত উৎপীড়ন-গণ্ডীর মধ্যে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হয় তাহারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজকাল দেখিতে পাইতেছি, দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখের অযোগ্য নহে।

মিঃ বার্ণেস,—তাহার বর্ণ বার্ণিস্ করা, লাল, অথবা বাদামী তাহা আমরা বলিতে পারিনা, তবে সে দানাপুরের লোকো ফোরম্যান আফিসের একজন ড্রাইভার। চাকরীতে গাড়োয়ানি, সাহেবের মেজাজ কিন্তু লাট সাহেবের মত গরম, সাহেব মনের গরমে অস্থির হইয়া একটা দেশীয় ডাকপিয়নকে ধনঞ্জয় দান করিল, অপরাধ সে বেচারা নাকি কোন লেডিকে সম্মান প্রদর্শনে কৃপণতা করিয়াছিল। ডাকঘরে উপস্থিত হইয়াই গার্ডটা পিয়ন বেচারাকে প্রহার করিয়াছিল, এমন কি দানাপুর অঞ্চলের পোষ্টাল সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট সে সময়ে সশরীরে সেই ডাকঘরে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার অধীনস্থ পিয়নকে এই নরপিশাচের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই; শেষে গার্ড সাহেব দুঃখ প্রকাশ, ইংরাজীতে যাহাকে ‘এপলজি’ বলে তাহাই করিয়া গোলমাল

বহিলে কি সরকারী কর্ম্মচারীকে সরকারী আফিসে আসিয়া ঠেঙ্গাইয়া সাহেব কেবল এপলজির বলে রক্ষা পাইতে পাইত? পিয়নটা যদি লোকো ফোরম্যান আফিসে ঢুকিয়া সেই গার্ডটাকে লাথি মারিয়া আসিত তাহা হইলে কি এতদিন তাহার চাকরী থাকিত?

কিন্তু কাহাকে ছাড়িয়া কাহার কথা বলিব, শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া পুলিসের কর্ত্তারা যখন শান্তি ভঙ্গ করেন, অকারণে লোকের প্রতি উৎপীড়ন করেন, এবং এই কুটুম্ব-বাৎসল্যের প্রভাবেই তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত হয় না, তখন অন্যের অত্যাচার যে অবলীলাক্রমে বৃদ্ধি পাইবে তাহার আর সন্দেহ কি?

মিঃ বাস্কেট নূতন পুলিসের চাকরী পাইয়াছেন, তাঁহার মত অভিজ্ঞতা ও বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া এ দেশী লোক হয়ত পুলিসের জমাদারীও লাভ করিতে পারিত না, কিন্তু তিনি ইংরাজ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন সুতরাং অবলীলাক্রমে তিনি লাহোরের আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের পদ শোভিত করিবার অবসর পাইলেন। করমচাঁদ একজন বৃদ্ধ মুসলমান, লাহোরের চীফ্‌কোর্টে দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া যে দুপয়সা পায় তাহাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করে। মাস দুই পূর্ব্বে বৃদ্ধ একদিন আদালত-প্রাঙ্গনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে ধূমপান করিতেছে, এমন সময় মিঃ বাস্কেট তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কি, এত বড় স্পর্দ্ধা, সরকারকে দেখিয়া সেলাম করিস্ না।" বৃদ্ধ সরকারকে চিনিত না, করজোড়ে সবিনয়ে বলিল, 'গোস্তাকি মাফ্ কিয়ে জি!'—সাহেব শান্তিরক্ষক, শান্তির মহিমা তিনি ঘোষণা না করিয়া কিরূপে স্থির থাকেন? সুতরাং তিনি হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা বৃদ্ধের পৃষ্ঠে শান্তির মহিমা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন, করমচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে চিফ্‌কোর্টের রেজিষ্ট্রারের কাছেই এই শান্তি রক্ষার অপূর্ব্ব নিদর্শনের বিবরণ বিবৃত করিল, এবং

প্রতিকারের জন্য ধরিয়া বসিল। রেজিষ্ট্রার মহাশয় বড় পুলিস সাহেবকে সে কথা জানাইবেন ভরসা দিয়া রোরুদ্যমান করমচাঁদকে বিদায় করিলেন। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই, বোধ করি করমচাঁদের পৃষ্ঠের বেদনা দূর হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা অতঃপর আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সুতরাং এই আত্মীয়-বাৎসল্যে সরকারের সেলাম-লালসা কিরূপ দুর্দ্দমনীয় হইয়া আবার কখন কোন্ নেটিবের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতে পরিণত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বাস্তবিক সেলাম-পিপাসা এ দেশের দোকানদার, চাকর প্রভৃতি শ্রেণীর ইংরাজ হইতে অতি উচ্চপদস্থ ইংরাজের মধ্যে দিন দিন যেরূপ দ্রুতগতিতে সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে তাহাতে এই ব্যাধি দূর করিতে না পারিলে দেশীয়গণের আতঙ্ক ও যন্ত্রণা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া তুলিবে। মিঃ বাস্কেট সেলাম না পাইয়া রাগ করিয়া বেত চালাইলে তত বেশী বিস্ময় প্রকাশে কারণ নাই, কারণ একে তিনি অপরিণামদর্শী উদ্ধত যুবক, তাহার উপর অতি অল্প দিন তিনি 'সরকার' সাজিয়াছেন, দম্ভ ও ক্ষমতাগর্ব্ব নেশার মত তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অতি উচ্চপদস্থ অসাধারণ দায়িত্ব সম্পন্ন বৃদ্ধ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ যখন এই সেলামের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না, পরিত্যাগ করা দূরের কথা, যখন সেলামের অভাব দেখিয়া শানকীর উপর বজ্রাঘাত করেন, তখন মনে হয় গবর্ণমেণ্ট যেমন রাজভক্তির কাওয়াজ দেখিতে লালায়িত, ইঁহারাও সেইরূপ অন্তঃসারশূন্য সেলাম লাভে সমুৎসুক, গবর্ণমেণ্টের দোহাই দিয়া অনেকে যাহা চাহেন, নিজের পদ-গৌরবের দোহাই দিয়া ব্যক্তিগত ভাবে ইঁহারা তাহাই চাহেন। অথচ যাহা ইঁহারা চাহেন তাহা লাভ

আছে, দম্ভ আছে কিন্তু উপকার করিবার ইচ্ছা বা সহানুভূতি নাই। আচরণ করিবে কসাইয়ের মত অথচ দেবতার প্রাপ্য পূজা চাহিলে হয়ত লোকে ভয়ে ভয়ে তাহা দিতে পারে, কিন্তু তাহা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার কাপুরুষতা যাহাদের আছে, তাহারা যেন বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও জ্ঞানের গৌরব না করে।

ভারতের এক প্রান্তে তরুণ যুবক মিঃ বাস্কেট সেলাম না পাইয়া যে, মহিমার পরিচয় দিয়াছেন, সেদিন ভারতের আর একপ্রান্তে হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রৌঢ়বয়স্ক মহিমান্বিত রেসিডেণ্ট বাহাদুর ঠিক সেই মহিমার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক রাজশক্তির প্রচণ্ডতা বিঘোষিত করিয়াছেন। সংপ্রতি হায়দরাবাদের কোন উর্দ্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে সেখানে একজন দেশীয় সিপাহী হাসমৎগঞ্জ নামক স্থান হইতে নগরের দিকে যাইতেছিল, সেই সময়ে মহাপরাক্রান্ত রেসিডেণ্ট বাহাদুর পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি দেখিলেন সিপাহীটা তাঁহাকে সেলাম না করিয়াই প্রস্থান করিল। তিনি বোধ করি সেলামের সন্ধানেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপণ করিতেছিলেন, নতুবা বিশ্বসংসারের এত পদার্থ থাকিতে কোথা হইতে কে তাঁহাকে সেলাম না করিয়া প্রস্থান করিতেছে সেই দিকেই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে কেন? রেসিডেণ্ট বাহাদুর সেই সিপাহীটাকে ডাকিয়া সেলাম না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন সে তাঁহাকে চিনিতে না পারায় সেলাম করে নাই, তখন তাঁহার ক্রোধ বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণ করিল; তাঁহাকে চেনে না! যে জলে বাস করে, সে কুমীরকে চেনে না, যে মরুভূমিতে বাস করে সে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডকে চেনে না? ইহা কি সম্ভব? সুতরাং সিপাহীটা বদমাইসি করিয়া সেলাম করে নাই, ইহা তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্, দেশীয় চরিত্রে অভিজ্ঞ একজন বৃটীশ রেসিডেণ্ট কি করিয়া অবিশ্বাস করেন? বেচারীকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ রেসিডেণ্টী

পুলিশে চালান দেওয়া হইল, সিপাহীটা আবার নিজাম সরকারের লোক, সুতরাং রেসিডেণ্টী পুলিশ হইতে তাহাকে সিটী পুলিশে চালান দেওয়া হইয়াছে, ভয়েই বোধ করি বেচারার অন্তরাত্মা থাবি খাইতেছে! নিজাম বাহদুরের আইনে সিপাহীটার রেসিডেণ্টকে না চেনার অপরাধের কি দণ্ড হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যদি স্বয়ং নিজাম বাহাদুরকে এই সিপাহীটা সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া সেলাম না করিত, তাহা হইলে তিনি রেসিডেণ্টের মত ক্রোধে বিচলিত হইয়া মশা বধের জন্য কামান উদ্যত করিতেন না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মনের মহত্ব, হৃদয়ের সারবত্বা প্রভৃতির বিশেষত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়। যখন একটা ক্ষুদ্র সিপাহীর সেলামের অভাবে বৃটীশ রেসিডেণ্টকে এমন একটা হাস্যোদ্দীপক চপলতার পরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়, তখন সহজেই বুঝিতে পারা যায় সিংহের গুহাপ্রান্তে অবস্থিত, সিংহের করতলগত নিজাম বাহাদুরকে কিরূপ ভাবে কিরূপ উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করিতে হয়। হায় এই মহত্ব ও এই দূরদর্শিতা আজ মহাগৌরবে ভারত শাসন করিতেছে। হৃদয় যাহারা চায় না, তাহারা পায় না, অথচ হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি প্রেম আকর্ষণের জন্য একটা আগ্রহ, এবং অকৃতকার্য্য হইলে বেত্র উত্তোলন, ইহার মধ্যে যদি কিছু যুক্তি থাকে তবে তাহা স্বভাবের নিয়মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপণের নামান্তর মাত্র।

অধীনস্থ ভক্তি দূরের কথা—দেশী মনুষ্যজীবনের প্রতি যদি ইংরাজের কিঞ্চিৎ ভ্রূক্ষেপের অবসর থাকিত, তাহা হইলে কি আজ কাল এত ঘন ঘন ইংরাজ হস্তে নরহত্যার কথা শুনিতে পাইতাম? মৃগভ্রমে মনুষ্য হত্যাই বা কত হইতেছে! এইত সেদিন সংবাদ পত্রে পড়িতেছিলাম পঞ্জাবের ডাক্তার ফ্রাঙ্কলীন নামক এক শিকারী একদিন অপরাহ্ণ কালে অরণ্যে মৃগয়া করিতে যাইয়া একটী দেশী মনুষ্যকে মৃগয়া করিয়া

ফেলিয়াছেন, মনুষ্য টাকে সাহেবের হরিণ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল! এমন ভ্রম চিরকালই হইয়া আসিতেছে, এবং বিচারকগণ তাহা 'এক্সিডেণ্ট' বলিয়াই তৎপ্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে ক্রটী করিতেছেন না, সুতরাং এ প্রকার 'একসিডেণ্টের' আতিশয্যে প্রতি সপ্তাহেই সংবাদ পত্র হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া বিধাতার চরণ তলে বিলীন হইতেছে। কৈ, এ পর্য্যন্ত কোন দেশী শিকারীর ত কোন অরণ্য-অন্তরালবর্ত্তী সাহেব নন্দনকে শ্বেত ভল্লুক বলিয়া ভ্রম ঘটিল না, এবং একটা ভল্লুক নাশের দৃষ্টান্তও সংবাদপত্রের তাড়া উল্টাইয়া দেখিতে পাই না। তাহার কারণ দেশীয় শিকারীর এরূপ ভ্রমে তাহার জীবন নিরাপদ নহে। যে অপরাধে মানুষের ক্ষমা লাভের আশা থাকে না, সে অপরাধ ত জ্ঞাতসারে সে করেই না, অজ্ঞাতসারেই সেরূপ অপরাধ না করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু ইংরাজ শিকারিগণ সে বিষয় সম্পুর্ণ উদাসীন, তাহাদের গুলি ক্রমেই অধিক অসংযত হইয়া উঠিতেছে।

বস্তুতঃ এদেশের উদ্ধত ইংরাজ সমাজ দুইটি কারণে অধিক মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত ও হীনতাকলুষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রথম কারণ কর্তৃপুরুষগণের অর্থাৎ শাসন কর্ত্তা ও বিচারক এ উভয় দলেরই অন্ধ আত্মীয় বাৎসল্য। দ্বিতীয় কারণ নিজের সুখ সুবিধার প্রতি, নিজের স্বেচ্ছাচারের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ। প্রথম কারণে তাহারা অত্যাচারে অকুণ্ঠিত, দ্বিতায় কারণে নিঃসম্পর্কীয় নেটিভ দূরের কথা—নিজের ভৃত্যের প্রতি সহানুভূতি শূন্য। সমস্ত রাত্রি কলের মত পাখা টানা চাই, কিন্তু কলের অপেক্ষা অধিক বাধ্য হওয়া আবশ্যক। কল বিগড়াইয়া বসিলে সাহেব গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া নিস্ফল ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করেন, কিন্তু ভৃত্যের পাখার দড়িতে টান একটু কম পড়িলে তাহার প্লীহা বিদীর্ণ না করিয়া আর শান্তি নাই।

এই প্রসঙ্গে আসানসোলের এক জোড়া মামলার কথা উল্লেখ

করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হইবে যে কুটুম্ব বাৎসল্য আজকাল এদেশে কি ভাবে ন্যায় ও ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিতেছে। এই মামলা দুটির দুই জন আসামী দুই জাতীয়, একজন সাহেব বা ফিরিঙ্গী আর একজন বাঙ্গালী। ঘটনা কি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

বেঙ্গলী পত্রিকার আসানসোলস্থ সংবাদ দাতার মুখে জানিতে পারা গিয়াছে, গত ৯ই অক্টোবর রাত্রে মিঃ সর্টলেট্ নামক কোন শ্বেতাঙ্গ স্থানীয় পুলিশ সব ইনেস্পেক্টরকে পত্র লিখিয়া এত্তেলা করিয়াছিলেন যে, ডাক্তার বাবু চারুচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস, মহাশয়ের কয়েকজন চাপড়াসী সাহেবের নিজ গৃহেই প্রবেশ ও তাহার সহধর্ম্মিণীকে উত্তম মধ্যম দান করিয়া আসিয়াছে! দারোগা মহাশয় সে রাত্রে আর ইহার তদারকে যান নাই সুতরাং মিঃ বার্টলেট পরদিন প্রভাতে ডিষ্ট্রিক্ট মেডিকেল আফিসার ডাক্তার গণেশ (guiness) কে সঙ্গে লইয়া থানায় উপস্থিত হইলেন; অপরাহ্নে দারোগা বার্টলেট দম্পতিকে লইয়া ডাক্তার মিত্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অভিযুক্ত অপরাধিগণকে যথাকালে জামিন লইয়া খালাস দেওয়া হইল। সবইনেসপেক্টর যে ভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন তাহা ডিভিসনাল ইনেস্পেক্টরেরও অনুমোদিত হইল, কিন্তু পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের (তিনি সাদা আদমী নহেন) এই তদন্ত মনঃপূত হইল না। তিনি নূতন করিয়া মামলার তদন্ত আরম্ভ করিলেন, ডাক্তার মিত্রও আসামী শ্রেণীভুক্ত হইলেন, এবং অত্যুৎসাহী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর আসামীগণকে পিনাল কোডের ধারায় যতগুলি অপরাধ হইতে পারে, সেই সমস্ত অপরাধেই (সাংঘাতিক আঘাত, ডাকাতি, রমণীর লজ্জাশীলতায় আক্রমণ, কুঅভিপ্রায়ে অনধিকার প্রবেশ ইত্যাদি ইত্যাদি) চার্জ্জ করিলেন এবং

ডাক্তার মিত্রর ন্যায় সম্ভ্রান্ত আসামীকেও তিনি পদব্রজে রাণীগঞ্জে যাইবার আদেশ করিলেন, রাণীগঞ্জ আসানসোল হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ। বিস্তর অনুরোধ উপরোধের পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের অন্তরে বোধ করি কিঞ্চিৎ করুণার সঞ্চার হইল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আদেশ করিলেন আসামীগণ নিজের খরচে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে রাণীগঞ্জে যাইতে পারিবে; ডাক্তার মিত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে (নিজের খরচেই) যাইবার জন্য আদেশ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে প্রার্থনা সুযোগ্য পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ডাক্তার মিত্রকে চাষার দলে মিশিয়া ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতেই যাইতে হইল। মামলা এখন বিচারাধীন সুতরাং আগ্রহ সহকারে ইহার শেষ ফলের প্রতীক্ষা করা ভিন্ন এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা আপাততঃ বলিবার নাই।

এখন দ্বিতীয় মামলাটার কথা বলি।—করবেট একজন শ্বেতাঙ্গ ফিরিঙ্গী যুবক গার্ড, বয়স কম, কাজেই ক্রোধ কিছু বেশী। গত ১৯শে অক্টোবর তাহার এক মুসলমান ভৃত্য বাজার করিতে যায়; বোধ করি ফিরিতে একটু বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। করবেটের তাহা সহ্য হইল না, হঠাৎ তাহার 'সডেন্ প্রভোকেশন' উপস্থিত! ক্রোধান্ধ হইয়া সে হতভাগ্য ভৃত্যকে এমনই প্রহার করিল যে ভৃত্যটি সে 'প্রভোকেশনের' বেগ সামলাইতে পারিল না, পড়িল ও মরিল। তাহার ঢক্কাকার প্লীহা ছিল কি না, এবং তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ সাহেবের লাথি সেই প্লীহার উপর নিপতিত হইয়া তাহা বিদীর্ণ করিয়াছিল কি না, সে কথা যথাকালে আদালতে প্রমাণিত হইবে। আপাততঃ এইটুকু জানিতে পারা গিয়াছে যে, আসান্‌সোলের উল্লিখিত নিরপেক্ষ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর এই নরহত্যাকারী করবেটকে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বিচার লাভের জন্য রাণীগঞ্জ পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার মিত্র

ও করবেটের অপরাধের তুলনায় উভয়ের প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন-টেনডেণ্ট যে ব্যবহারের তারতম্য প্রদর্শন করিলেন তাহাতে বিস্ময় দমন করা যায় না। কিন্তু যখন মনে হয় এই ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আমাদেরই একজন স্বদেশী, এবং তিনিই তাঁহার পদের দায়িত্ব ও ন্যায়ের সম্মান অসঙ্কোচে বিসর্জ্জন দিয়া ডাক্তার মিত্রের ন্যায় একজন পদস্থ সম্ভ্রান্ত স্বদেশবাসীকে যে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন, তাহা একজন গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ফিরিঙ্গীকে অবলীলাক্রমে প্রদান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন ক্ষোভ ও ঘৃণায় আমরা ম্রিয়মাণ না হইয়া থাকিতে পারি না। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বাবু রাসবিহারী বিশ্বাস শ্বেতাঙ্গের কুটুম্ব নহেন, তাঁহার এই শ্বেতাঙ্গ প্রীতির কোন গুরুতর কারণও আমরা আবিষ্কার করিতে পারি না, তবে একটা কারণ আমরা অনুভব করিতে পারি বটে, তাঁহার হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তাঁহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে তিনি কলের ন্যায় তাহাই করিয়া-ছেন। বালুকার নিজের কোন তাপ নাই বটে, কিন্তু প্রখর সূর্য্য কিরণ যখন তাহার উপর প্রতিফলিত হয়, তখন তাহার উত্তাপ সূর্য্যরশ্মি অপেক্ষা অসহ্য হইয়া থাকে।

যাহা হউক, বিশ্বাস মহাশয়ের কর্ত্তব্যানুরাগে আমাদের আশা হইয়াছে তিনি শীঘ্রই উন্নতি মার্গের আর এক সোপান উর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইবেন, এবং তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহার অসহ্য উত্তাপে অধিকতর অভিভূত হইবে। আজ যদি সাহেব লোকের কুটুম্ব-বাৎসল্য এমন দেশব্যাপী মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করিত তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার প্রভু সম্প্রদায়ের মানসিক প্রসন্নতা সম্পাদন সঙ্কল্পে ন্যায় ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের মস্তকে এ ভাবে পদাঘাত করিতেন না। গোরা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেণ্টগণ যখন নেটিভ পীড়ন করিয়া

এই দেশীয় ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ যে সহজে সেই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিবেন এ আশা আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতা-ভিখারী, গৌরব-লোলুপ অপদার্থগণ কবে বুঝিবে যে এ ভাবে আত্মবিক্রয় দ্বারা ক্ষমতা ও গৌরব লাভ অপেক্ষা স্বাধীন চিত্তে, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চাষ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা সহস্রগুণে বরনীয়।

B[illegible]GAL LIBRARY.
W[illegible]TERS' BUILDINGS
Recd. on the 21 JAN 1903

উত্তর ইতালীর উদ্ধার।

কাভুর।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন চার্লস অ্যালবার্ট ভগ্নাশ হইয়া স্বীয় রাজদণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিলেন, যখন ভিক্টর ইম্যানুয়েল যৌবন-সুলভ আশায় আশান্বিত হইয়া সেই রাজদণ্ড সযত্নে কুড়াইয়া লইলেন, তখন বাহ্যদৃষ্টিতে ইতালীতে যথেচ্ছাচারী অষ্ট্রীয় শাসনের জয় হইয়াছে। বাস্তবিক সে সময় ইতালীর অবস্থা ঘোর তমসাচ্ছন্ন। রাষ্ট্রবিপ্লবের বৎসর ইতালীতে কথঞ্চিৎ আশার বিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই বৎসরের সঙ্গে আশার জ্যোতিও নিভিল এবং ইতালী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নৈরাশ্যের তিমির গর্ভে নিমগ্ন হইল। উত্তর-ইতালীতে অষ্ট্রীয়ার শাসন-বন্ধন অপরিমিত ভাবে কঠোর হইল।

সিসিলীরাজ, টস্কানীর গ্রাণ্ড ডিউক্ এবং অষ্ট্রীয়ার অন্যান্য অধীন রাজন্যবর্গ আপন আপন দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া, পূর্ব্ববৎসরের কষ্ট ও দুর্গতির প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আর পীডমণ্ট—যে পীডমণ্ট সমস্ত ইতালীর আশাকেন্দ্র ও ভরসাস্থল,সে পীডমণ্ট নোভারার

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সর্ব্বপ্রকারে এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন ত্রিশ বৎসরের উদ্যম, অধ্যবসায়, ক্লেশ সব বিফল হইল। ঘৃণ্য অষ্ট্রীয়ার রাজশক্তি পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ইতালী যেমন জাতীয় একতা ও জাতীয় স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর না হইয়া পরজাতীয় রাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, এখনকার ইতালীকেও প্রায় সেইরূপই বোধ হইতে লাগিল ভায়েনার সামনীতিবিশারদ রাজপুরুষগণ ইতালীকে হালুয়ার ন্যায় খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ইতালী এখনও বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট, ও পরপদানত; বিদেশীয় অষ্ট্রীয়ার অত্যাচারে তাহার দেহ প্রাণ নিষ্পিষ্ট ও অসাড় হইয়া রহিল। ম্যাট্‌জিনি বলিতেন, "পোপ ইতালীজাতির প্রাণ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আর ইতালী যখনই কোনরূপ সজীবতার লক্ষণ দেখাইতেছে সেই মুহূর্ত্তেই অষ্ট্রীয়া প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া তাহার শরীরের উপর আক্রমণ করিতেছে। ইতালীর খণ্ডীকৃত শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের উপর পোপের অথবা অষ্ট্রীয়ার অধীনের কোন লোক অবস্থিত থাকিয়া, অমানুষিক অত্যাচারে ইতালীকে নিঃশেষে প্রাণশূন্য করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ইতালী কি সত্যই ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ইতালী? ম্যাট্‌জিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গের স্বার্থত্যাগ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও শিক্ষা কি বৃথা গিয়াছিল? তাঁহারা কি কোন ফলই উৎপন্ন করিতে পারেন নাই? সহস্র সহস্র স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণের রক্তপাত কি বৃথা গিয়াছিল?

যদি ঐ প্রকার মনে করি তবে আমরা সাংঘাতিক ভ্রমে পতিত হইব। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ইতালীয়গণ স্বেচ্ছায়, অক্ষম হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। ইতালীরাজ্যকেও পরপদানত ও জড়ের ন্যায়

জীবাত্মা মোহনিদ্রায় সুপ্ত ছিল। কিন্তু এখনকার ইতালী শত শত বৎসরের মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত, উত্থিত ও নিজ দুর্ব্বলতা দূর করিতে দৃঢ়-চেষ্টিত। ১৮২১, ১৮৩১ এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ও রাজ্যবিপ্লবসকল ইহার প্রমাণস্থল। ইতালী তাহার দুর্দ্দশা, অবনতি, জাতীয় একতার অভাবের বিষময় ফল বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তাহা মোচনের চেষ্টা প্রাণপণে করিতে সাহস পাইয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা অতীব পরিস্ফুটরূপে জানা যাইতেছে। ম্যাটজিনি বলিতেন, "আমরা সজীব হইতে চাই, সভ্য সমাজভুক্ত মানবের সমস্ত অধিকার ও স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করি, ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী হইয়া চলিতে বাসনা করি, জগতের অন্যান্য প্রাণীবৃন্দের সহিত আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, আমরা ভ্রাতৃবৃন্দের পরিবর্ত্তে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে রাজনিযুক্ত গুপ্তচর চাই না, আমরা শুভানুধ্যায়ী উপদেশক চাই, প্রভুত্বপ্রিয়, অত্যাচারী প্রভু চাই না, আমারা স্বদেশ চাই, কারাগৃহ চাই না।"

ইতালীয়গণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই জাতীয় স্বাধীনতা পাইতে প্রয়াসী হইয়াছিল, এবং জাতীয় একতাপ্রয়াসী লোকের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। ম্যাট্‌জিনির লেখা হইতে বুঝা যায় যে, সে সময়ে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা জাতীয় একতা লাভের ইচ্ছা হইতে প্রবলা হইয়াছিল। সত্য বটে স্থানে স্থানে ম্যাটজিনির দল আংশিক স্বদেশ-প্রীতির সীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত ইতালীর জাতীয় একতার বিষয় চিন্তা করিতে পারিতেন, কিন্তু ইতালীর সকল স্থানের সকল লোকই স্বাতন্ত্র্যকে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া মনে করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। জাতীয় একতার বিষয় তাহারা ভাল বুঝিত না বলিয়াই তাহার জন্য মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে নাই।

একটী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত উদার মতের পরিপোষণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, যে পর্য্যন্ত ঘৃণ্য অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য ইতালীতে থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাহারা পাষণ্ডরাজ ফার্দ্দিনান্দের মত অত্যাচারী রাজার নিকট হইতে কোন প্রকারের উদার ব্যবস্থাত্মক অঙ্গীকার পাইবে না, কারণ অষ্ট্রীয়া হইতে সূত্রাকর্ষণের সঙ্গে বম্বার (ফার্দ্দিনান্দের) গতিশক্তির নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল।

এইরূপে একসময়ে সমভাবে নেপল্‌সবাসীরা, টস্কান্ রোমান্ ও পীডমণ্টীজ্ সকলেই একই সত্য নির্দ্ধারণে উদ্যোগী হইয়া অবিরাম গতিতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। ম্যাটজিনি ও তাঁহার অনুচরবর্গও ইতালীয়গণকে কেবল ঐ কথাই অবিরতভাবে বুঝাইতেছিলেন, যে মহাভয়ঙ্কর, নৃশংস, লোকক্ষয়কর রক্তময় যুদ্ধ—অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধই ইতালীর স্থায়ী স্বাধীনতা লাভের একমাত্র বিহিত উপায়।

ম্যাটজিনি এইরূপ করিয়া লোক মাতাইতেছিলেন, অধিকন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকালে ইতালীয়েরা জাতীয় স্বাধীনতার স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছিল। শত শত স্বদেশানুরাগী মহাত্মাগণের মনশ্চক্ষুর উপরে মুহূর্ত্তের জন্য ইতালীর মহাগৌরবকর ভবিষ্যৎ দৃশ্যাবলী প্রতিভাত হইতে লাগিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাস্তব ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে জীবিত ছিলেন না।

এখন পাঠকবর্গ বলুন দেখি এ সব কি কিছুই নয়? যুগ যুগান্তরের মোহনিদ্রার পর যে, ইতালী জাগ্রত, উত্থিত ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী, ইহা কি জাতীয় ইতিহাসে কিছুই নয়? শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবনতিকর, হেয়ঙ্কর, অযশস্কর দাসত্বপাশে বদ্ধ হইলেও জীবাত্মা মুক্ত, মন স্বাধীন, ইতালীয়গণের মানসিক এ অবস্থা কি কিছুই নয়? ঐ দুই সময়ের মধ্যে

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ইতালী ম্যাটজিনিকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ও উপদেশ-বাক্য সাগ্রহে শুনিয়াছিল এবং তদনুযায়ী কতকগুলি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল।

ম্যাট্‌জিনি ইতালীয়গণের হৃদয়ে যে শিক্ষা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে অবিরত চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা সমস্ত মনুষ্যজাতির শিক্ষার সারভাগ। তাহার ফলে ইতালীয়েরা জাতীয় একতা ও স্বাধীনতার স্বর্গীয় পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে শিখিয়াছিল। এবং সেই একতা ও স্বাধীনতা পাইবার জন্য জীবনের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি উৎসর্গ করিতে শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। পরম শিক্ষাগুরু ম্যাটজিনি বলিতেন "প্রত্যেক মানবের জীবনের একটী করিয়া উদ্দেশ্য আছে; এবং আপন আপন কর্ত্তব্য (duty) পালনই তাহার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। দেবালয়গুলিকে আমরা যেমন পবিত্র রাখিতে যত্নশীল, আমাদের শরীরস্থ আত্মাকে সেইরূপ পবিত্র রাখিতে আমরা বাধ্য। অহমিকা (egotism) হইতে ইহাকে দূরে রক্ষা করিতে হইবে। নিজ জীবনের সম্পাদ্য বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য যে চেষ্টা ও পর্য্যালোচনা তাহাও ধর্ম্মাত্মক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যে সকল মনুষ্যের মধ্যে তুমি বাস করিতেছ তাহাদের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ দ্রব্যের, তাহার অনুসন্ধান করিবে, পরে অবিচলিত অধ্যবসায়ে অনন্যমনা হইয়া নিজ বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে সেই অভাব মোচনে বদ্ধপরিকর হইবে। যুবক ভ্রাতাগণ, যখন তুমি মনোমধ্যে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারিবে তখন কিছুতেই তুমি পশ্চাৎপদ হইও না; অগ্রে গম্যমান তোমার পদদ্বয়কে কোন দ্রব্যে আটকাইতে দিও না। তোমার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়া তাহার সম্পূর্ণ সাধন কর। তুমি সহানুভূতি পাও বা বাধা বিপত্তি পাও, সহকারী মিত্র পাও বা অন্যে তোমার কার্য্যে যোগ না দেয়,

হও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হও। তোমার সম্মুখে উপায় উন্মুক্ত; তুমি দুঃখে, কষ্টে, শোকে ও তাপে অভিভূত হইয়া কোন রকমে যদি নিজ জীবনের স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সাধন না কর তবে তুমি নীচ, কাপুরুষ, আত্মঘাতী ও নিজের কাছে অবিশ্বাসী।" ম্যাটজিনির উক্তির সহিত স্বর্গগত মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীর "ভারতী"তে প্রকাশিত পত্রোক্তির সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে।

যে সকল ইতালীয়গণ মহাত্মা ম্যাট্‌জিনির এই সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা সংখ্যায় বড় কম ছিল না। তাহাদের জীবনের সম্পাদ্য তাহারা স্থির করিয়াছিল; পরে সম্পাদ্য-সাধনে কিংকর্ত্তব্য বিষয়েও তাহারা স্থিরচিত্ত হইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের উপায় উন্মুক্ত এবং তাহার শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে তাহারা কৃত-সংকল্প ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তবে এখন দেখা যাইতেছে যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ইতালী হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ইতালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং এই পার্থক্য প্রধানতঃ মহাত্মা ম্যাট্‌জিনির শিক্ষা প্রচার ও উপদেশের ফল। অথচ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ইতালীতে ম্যাট্‌জিনির চেষ্টা যে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই তাহাই আধুনিক ইতালীর উন্নতির বিশেষ লক্ষণ। সৃষ্টির আদি হইতে একটা প্রবাদ আছে "মৃত্যু না হইলে পুনর্জন্ম হয় না।" বর্ত্তমান ইতালীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল যে, ম্যাট্‌জিনি মহোদয়ের লক্ষিত আদর্শ একেবারে লোপ পাইয়া যায়। কথাটা একটু সবিস্তারে আলোচনা করিব। ফাইফ সাহেব বলিয়াছেন "ম্যাট্‌জিনির আদর্শ-ইতালী প্রজাতন্ত্র-শাসনবিশিষ্ট, সে শাসনব্যবস্থায় কুসংস্কারাপন্ন ধূর্ত্ত পুরোহিতদলের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সাধারণ লোক পর্য্যন্ত ইহাতে যোগদান করিতে পারিবে। এই কুসংস্কারাপন্ন পুরোহিত-

নাই। স্বাধীনতার জন্য এই শাসন-প্রণালী কাহারও নিকট ঋণী নহে; সাম্যনীতির দৃঢ় ভিত্তিতেই সে ব্যবস্থা রক্ষিত।" ম্যাট্‌জিনি অতি কঠোরভাবে নিজ এই মহান্‌ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং জাতীয় স্বত্ব যে উপায়েই হউক রাখিবার জন্য অতীব অধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে কার্য্যকুশল ব্যবহারাভিজ্ঞ, সামনীতিবিশারদ যে মন্ত্রীবরেরা বিদেশীয় সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক ইতালীর জাতীয় স্বাধীনতা ও একতার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন উপরোক্ত দুই কারণে ম্যাট্‌জিনি তাঁহাদের কার্য্যে যোগদান করিতে বিরত হইয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ম্যাট্‌জিনি তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বভাবের লোকের দ্বারা ইতালীর যাহা হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছিল এবং তাঁহার যথাসাধ্য তিনি করিয়াছিলেন। ব্যবহারজ্ঞ, রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রিগণকে কোথায় লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া বোধ হয় তিনি কখন তাঁহার প্রদর্শিত উপায়ে পারিতেন না। কিন্তু কেবল প্রজাতন্ত্রাদর্শ লোপ পায় নাই, সেই নিও-গুয়েলফিক দলও লোপ পাইয়াছিল। তাহারা জ্ঞানী, প্রজাতন্ত্রোন্মত্ত ম্যাট্‌জিনি ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বা কোন পার্থিব শাসনকর্ত্তার শক্তিকে বিশ্বাস না করিয়া, সংস্কৃত জ্ঞানবিশিষ্ট পোপের নৈতিকশক্তিতেই ইতালীর নবজীবনের সমুদয় আশা স্থাপন করিয়াছিল। তাহারাও আপন আদর্শত্যাগে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথমেই দেজীগলিও (Daziglio) এই ভ্রম দেখিতে পান, কারণ সেই বৎসর তিনি রোম হইতে লিখেন "আমার বিশ্বাস যে পোপ (Pio nono) পাও নোনের ইন্দ্রজাল স্থায়ী হইবে না। তিনি নিজে দেবতা হইলেও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা রাক্ষস, তাঁহার রাজ্য বিশৃঙ্খলাপন্ন ও কলুষিত, তিনি কখনই এত বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিতে

সক্ষম হইবেন না।” দেজ্রীগলিওর এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি শীঘ্রই ফলিয়াছিল।

পোপ পায়ো নোনো (Pio nono) অতি শান্ত ও দয়ালু প্রকৃতির পুরোহিত ছিলেন। তিনি ইতালীর নবজীবনের মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতা সম্যক বোধ করিতে পারিলেও তাঁহার রাজ্যকে এই পবিত্র কার্য্যের কেন্দ্রস্থল করিয়া নিজে কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণে সম্পূর্ণ শক্তিহীন ছিলেন। জিওবার্টি, যিনি কিছুকাল নিও-গুয়েলফিক দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে রিনোভামেণ্টো (Rinnovamento) নামক সংবাদপত্রে প্রচার করিলেন যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব উদ্দেশ্য, কার্য্যপদ্ধতি ও নীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং এখন তাঁহার অতি স্পষ্ট-রূপে বোধ-গম্য হইয়াছিল যে, সার্দ্দিনীয় রাজ্যের—যে সার্দ্দিনীয় রাজ্য ইতালীর মধ্যে একমাত্র স্বাধীন—আধিপত্যই ইতালীর ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার মূল-ভিত্তি। তিনি বলিলেন “পীডমণ্টের বর্ত্তমান তরুণ বয়স্ক নৃপতি ব্যতীত আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না, যে আমাদিগকে নরক তুল্য দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। ফার্দ্দিনান্দ, লিওপোল্ড, প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যাহারা প্রজাবর্গের সমক্ষে ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক উদার ব্যবস্থাত্মক নিয়মপত্র অঙ্গীকার করিয়া পরে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভিক্টর ইম্যানুয়েল তাহাদের মধ্যে কাহারও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নাই, অধিকন্তু আপনার অঙ্গীকৃত ব্যবস্থাবলীর সংরক্ষণ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী।” ক্রমে ক্রমে ইতালীর স্বদেশ-প্রেমিক মনুষ্যবর্গের পূর্ব্ব মতসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া সার্দ্দিনীয় রাজ্যই তাহাদের যাবতীয় আশার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল এবং সার্দ্দিনীয়ার তরুণ বয়স্ক রাজার চতুষ্পার্শ্বে সকল দিক হইতে তাহারা আসিয়া একত্রিত হইতে লাগিল।

যে সকল সংস্কার অর্জ্জন করিয়া আসিতেছিলেন, সে সকল জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সম্পূর্ণ অনুকূলে অবস্থিত ছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্যাভয়ের ডিউকেরা সুন্দরভাবে সামনীতির আশ্রয়ে আল্‌পস পর্ব্বতের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনাদের রাজ্যবিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন, আমরা আরও বলিয়াছি যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমস্ত ইতালীর মধ্যে যদি কখনও কোথাও সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাহাও এই পীডমণ্টে, পীডমণ্টের সীমার মধ্যেই একটা স্বর্গীয় স্বাধীনভাব পর্য্যবসিত ছিল। ১৮২১ ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে বোধ হয় অন্যান্য রাজগণ অপেক্ষা পীডমণ্ট বেশী কিছু করে নাই। নেপল্‌সের যথেচ্ছাচারী শাসন ও পীডমণ্টের শাসনের মধ্যে ম্যাট্‌জিনি বাস্তবিক কোন পার্থক্য দেখিতেন না, কিন্তু ইতালীর উদারনৈতিক দলস্থ লোকেরা অন্যান্য রাজ্যাপেক্ষা পীডমণ্টের শাসন-প্রণালী ও ব্যবস্থার বিভিন্নতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বিনা কারণে এ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় নাই। ইতালীর খণ্ডীকৃত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকলের মধ্যে পীডমণ্টের রাজাই একমাত্র স্বজাতীয়, তাঁহার মাতৃভাষা ইতালীয়ান, এবং তাঁহার প্রত্যেক ধমনীতে ইতালী জাতির রক্ত প্রবাহিত; যে সকল লোক তাঁহার রাজ্যে বাস করে, তাহাদের ভাষা ও রক্ত হইতে তাঁহার ভাষা ও রক্ত অভিন্ন; অধিকন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পীডমণ্টের রাজা চার্লস্ আলবার্ট, অন্যান্য নৃপতিবর্গের অপেক্ষা না করিয়া, নিজ প্রকৃতি-পুঞ্জকে স্বেচ্ছায় এক প্রতিনিধি সভার নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা সকল দান করিয়াছিলেন; সর্ব্বোপরি এই চার্লস্ আলবার্টই প্রথমে ইতালীয় স্বাধীনতার পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অসি নিষ্কাসন করেন, এবং অষ্ট্রীয়ার মহাশক্তিকে বিলক্ষণরূপে দেখাইয়াছিলেন যে অষ্ট্রীয়া মহাবলশালী ও মহাপরাক্রান্ত হইলেও

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর ইম্যানুয়েল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর। সেই সময়ে ইতালীর ও পীডমণ্টের জাতীয় উন্নতির আশার জ্যোতি মলিন হইলেও ভিক্টর ইম্যানুয়েল অষ্ট্রীয়ার সেই মহাবীর বৃদ্ধ সেনাপতি র‍্যাডেট্স্কীকে সন্ধি প্রস্তাব লইয়া যে সকল কথা বলেন তাহাতে মস্তক অবনতকর বা নিরাশাব্যঞ্জক কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। তিনি বলিলেন, "সেনাপতি, তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছ তাহাতে সম্মতি দান অপেক্ষা আমার সহস্র-বার রাজ্য পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ। আমার পরম পূজনীয় পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, আমি ধর্ম্মবোধে তাহা সংরক্ষণে দৃঢ়সঙ্কল্প। যদি তোমরা আমাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে চাও, তাই হউক; আমি তাহাতে অসম্মত নহি; এই যুদ্ধে আমি তোমাদিগকে দেখাইব যে পীডমণ্ট সার্ব্বজনীন জাতীয় সমুত্থানে কি করিতে সমর্থ। যদি আমি অকৃতকার্য্য হই তাহাতে আমার লজ্জা বা অপমান কিছুই নাই; আমার বংশ সহস্রবার সিংহাসন ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু অপমান বা অযশ কখনই সহ্য করিবে না।" নূতন তেজে বীর্য্যবন্ত, যৌবনসুলভ উৎসাহে উন্মত্ত, তরুণবয়স্ক পীডমণ্টাধিপতির এই অটল ও নির্ভীক স্বভাব সিংহাসনে অধিরোহণাবধিই অতীব স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল, এবং তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছিলেন। "আমার পরমপূজনীয় পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন আমি ধর্ম্মবোধে তাহা সংরক্ষণে দৃঢ় সঙ্কল্প" এই কথা কয়েকটী তিনি যাবজ্জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা হইয়াই প্রজাবর্গকে যে প্রথম ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "আমাদের সম্মান বজায় ও অকলঙ্কিত রাখিবার জন্য আমাদের সমুদয় চেষ্টা নিযুক্ত করিতে হইবে। আমাদের দেশের সমস্ত অভাব ও ক্লেশ নিঃশেষে দূর করিতে হইবে।

করিবার জন্য আমি আমার প্রজাবর্গকে অনুযোগ ও আদেশ করিতেছি, আমি শপথ গ্রহণ করিয়া এই পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব এবং আমি প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে, সহানুভূতি, সাহায্য ও অবিচলিত বিশ্বাস প্রাপ্ত হইবার জন্য সমুৎসুক থাকিব।”

এই ঘোষণাপত্রে প্রচারিত প্রতিজ্ঞা হইতে ভিক্টর ইম্যানুয়েল কখনও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। বাহ্যদৃষ্টিতে ইতালীর অবস্থা ঘোর তমসাচ্ছন্ন বোধ হইলেও, গত কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী স্থির ভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে ইতালী কিরূপ উৎসাহের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অভিযান দুর্মোচনীয়, ঘোর দুঃখে শেষ হইলেও ইতালীর জাতীয় বিদ্রোহ-ব্যাপারে ও ইতিহাসে ইহা একটী অতীব অবশ্যলক্ষ্য বিষয়। সীমণ্ডস্ সাহেব বলেন “ইতালীর মহাপুরুষগণ স্বদেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া যে পবিত্র শোণিতপাতে করিয়াছিলেন তাহাদ্বারা জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত হইয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে একজন নৃপতি (Charles Albert) আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। এই বিদ্রোহ স্যাভয়ের রাজবংশকে উত্তরোত্তর উৎকর্ষনীতির মার্গানুসরণ করিতে আবদ্ধ করিয়াছিল এবং স্যাভয়ের রাজবংশ কখন ঐ নীতির অন্যথা করিয়া ব্রতচ্যুত হয়েন নাই।”

যখন ইতালীময় এইরূপ প্রতিঘাত ক্রিয়া চলিতেছিল ভিক্টর ইম্যানুয়েল ও তাঁহার মন্ত্রী দেজিগলিও অতি প্রশান্তভাবে ও নির্ভয়ে সার্দ্দিনীয় রাজ্যের পূর্ণব্যবস্থাকরণে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমতঃ ঘরাও বিবাদ মিটাইতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন। জেনোয়াতে অদ্যাবধি প্রজাতন্ত্রোন্মত্ত ম্যাট্‌জিনির দল নানাপ্রকার অনর্থ ঘটাইতেছিল; ম্যাট্‌জিনি স্বয়ং তাহাদের চালক ও নেতা স্বয়ং। ম্যাট্‌জিনি ও

কর্তৃগণকে ঘোর বিশ্বাসঘাতক বলিয়া দোষারোপ করিতে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন "বিশ্বাসঘাতক কার্লো আলবার্টের বংশধর রাজা হওয়া অপেক্ষা ইতালীর দাসত্ব-শৃঙ্খল অনেক গুণে ভাল।" ম্যাট্‌জিনি সম্পূর্ণরূপে অদম্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার কাজ অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গতভাবে নিষ্পন্ন করিবার জন্য তাঁহাপেক্ষা যোগ্যতর অন্য লোকে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল।

ঘরাও বিবাদে অপ্রতিহত থাকিয়া ভিক্টর ইম্যানুয়েল ও দেজিগলিও ধীর মন্থরগতিতে সংস্কার-কার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রথমবিপত্তি যাজকবর্গ লইয়া। সার্দ্দিনীয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যেই ৪১টী মোহান্তের গদি ও ১৪০০র উপর মঠ অবস্থিত, এবং অষ্টাদশ সহস্র লোক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। বস্তুতঃ প্রত্যেক ২১৪ জন লোকের মধ্যে একজন যাজক। সংখ্যাধিক্যে বড় আসিয়া যায় না, কিন্তু সার্দ্দিনীয়বাসী প্রত্যেক যাজকের বিচার তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মাধিকরণ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি হইবে না, দোষী ব্যক্তিগণ তাহাদের মঠে আশ্রয় লইতে পারে ও যাজকবর্গের আশ্রয় দিবার সত্ব আছে এবং দণ্ডবিধি আইনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মধ্যকালের রীতি অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষ অধিকার অদ্যাবধি তাহাদের বর্ত্তমান, এই গুলি যখন আমরা চিন্তা করি তখনই কেবল আমরা সংস্কারকগণের দুরতিক্রম্য বাধা ও বিপত্তির পরিমাণ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। যদি ইংলণ্ডের ইতিহাসে কেহ ঐরূপ তুল্য অবস্থার নজীর চান তবে তাঁহাকে দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকাল অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই সময়ের দ্বিতীয় হেন্‌রী ক্লেরেণ্ডনের ব্যবস্থানুসারে বেকেটের সঙ্গে যাজকগণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তুমুল ঝগড়া বাধাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় হেনরীর ন্যায় ভিক্টর ইম্যানুয়েলও সমস্ত

এই ন্যায়, সৎ, উচ্চ ও প্রশংসনীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলে অনেক ঘটনা দণ্ডায়মান ছিল, সেগুলি উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান যাজক ধর্ম্মাধিকরণ-গুলির সম্পূর্ণ সত্ব ও অধিকারের অস্তিত্ব, শিক্ষা বিষয়ে জেসুইটদলের অসীম ও অনন্যসাধারণ কর্তৃত্ব এবং দেশে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্দীপনে নিযুক্ত কর্ম্মচারিবর্গের কার্য্যাবলী।

ভিক্টর ইম্যানুয়েল পৌরবর্গ ও যাজকবর্গের মধ্যে সংঘর্ষণ যথাসাধ্য পরিহার-মানসে বিশেষ উৎসুকচিত্তে ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে শরৎকালে কাউণ্ট সীকার্ডী (Sicardi) নামক এক ব্যক্তিকে বিশেষ রাজপ্রতিনিধি করিয়া পোপের নিকট প্রেরণ করিলেন। সার্দ্দিনীয় রাজ্যস্থিত যাজক-বর্গের অবস্থা বা তাহাদের উক্ত রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ কোন প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে পোপ অতি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিলেন। পোপের প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন "ভগবান্ পোপ সার্দ্দিনীয়রাজকে প্রসন্ন করিবার জন্য নরকের দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত কিন্তু নিজের বা নিজের রাজ্যের শক্তির হ্রাস করিতে তিনি কিছুতেই রাজী নহেন।" এইরূপে প্রতিরুদ্ধগতি হইয়াও রাজা, সীকার্ডির সাহায্যে সংস্কার-কার্য্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যাজকগণের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় "ফোরো ইক্লাসিয়াষ্টিকো" (Foro Ecclesiastico) নিঃশেষে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের বিশেষাধিকার ও সত্ব সকল অতি সুবিবেচনার সহিত সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। যাজকগণ বজ্রনির্ঘোষে নাস্তিক বিধর্ম্মী রাজা ও তন্মন্ত্রীর উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ যাজকবর্গ এই সময়ে এমন একটী অন্যায় ও অসহনীয় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল যে ভিক্টর ইম্যানুয়েল ও তাঁহার মন্ত্রী যাজক-সমস্যা পূরণ করিবার বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া নূতন শক্তি বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সীকার্ডিয়ান আইন (Sicaardian Law) পাশ হইবার অল্প দিন পরে সার্দ্দিনীয় রাজ্যের বাণিজ্য-মন্ত্রী সাণ্টা রোজা

(Santa Rosa) পরলোক প্রাপ্ত হন। যাজকগণের মধ্যে কেহই তাঁহার অন্তিম-সংস্কার করিতে রাজী হইলেন না। জীবদ্দশায় তিনি অতি বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন কাটাইয়া রোমচার্চের সহ নিজ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মরিয়াছিলেন। তথাপি যাজকবর্গ ঐরূপ করিয়াছিল বলিয়া যাজক-ব্যাপার সংস্কারে ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে ঐ ঘটনাটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছিল।

দুইটী অতি প্রয়োজনীয় কারণে আমি এই যাজক-ব্যাপার একটু সবিস্তারে আলোচনা করিলাম। প্রথমতঃ—যে ভিক্টর ইম্যানুয়েল ইতালীর রাজা হইতে এবং পোপের প্রাসাদের ছায়ার উপরিভাগে রাজধানী স্থাপন করিতে দৈব-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ভিক্টর ইম্যানুয়েলের সঙ্গে পোপের বিবাদের সূত্রপাত এইখানে। এইরূপে, এইখানে সৃষ্ট-বিবাদ এখনও নিঃশেষ হয় নাই কিন্তু সংকটময় অবস্থার সংকটত্ব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বিংশ বৎসরব্যাপী ইতালীর নবজীবনদাতাগণের সহিত পোপের এই ব্যাপার লইয়া যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা আমরা কখনই ভুলিব না। এই ব্যাপারের সিদ্ধান্ত-করণ তাহাদের কাছে কঠিনতমরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে—এই ঘটনা হইতেই আমরা একজন পরম রাজনীতিজ্ঞ, মন্ত্রণাকুশল, ব্যবহারজ্ঞ ইতালীয়ের নামের পরিচয় প্রাপ্ত হইব। তাঁহার নাম এই ব্যাপারের সঙ্গে অসাধারণ ভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি কাউণ্ট কামিলো ডি কাভুর।

[ক্রমশঃ]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্মের স্বাবলম্বন-নীতি।*

প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এই পৃথিবীতে কত কত জাতির অভ্যুদয় ও বিলয় ঘটিয়াছে, আবার নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ভারত, চীন, ক্যাল্‌ডিয়, মিডিয়, ব্যাবিল্‌ন, পারস্য, ফিনিসিয়, মীসর প্রভৃতি জনপদসমূহ এক সময়ে জগতের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছিল, কালের পরিবর্ত্তনে ঐ সকল দেশের সভ্যতা এক্ষণে লোকস্মৃতির অতীত হইয়া যাইতেছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, রুসিয়া, ফ্রান্‌স প্রভৃতি সাম্রাজ্যসমূহ অধুনাতন ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় হইলাছে। রাজ্যসমূহের এইরূপ অবিরত উত্থান ও পতন ঘটিতেছে। জগতের সুসভ্য জাতিসমূহ এই ক্ষণস্থায়ী রাজ্যকে চিরস্থায়ী করিবার প্রয়াসী হইয়া নানা কৌশল করিয়াছেন। অনিত্য সংসারে নিত্যতা স্থাপন করিব, মরণশীল জগতে অমর হইয়া পড়িব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা বাষ্পযান, জলযান, ব্যোমযান প্রভৃতি নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। পর্ব্বত কন্দরে প্রাকার-বন্ধন, নদী পৃষ্ঠে সেতু-নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি দৈব আপৎসমূহ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ও সর্ব্বপ্রকার কৌশল ব্যর্থ করিয়া সর্ব্বসংহারক কাল ঐ সকল রাজ্যের বিধ্বংশ সাধন করিয়াছে। তথাপি রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাজ্যসমূহকে শাশ্বতিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের এই অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তির স্তুতিবাদ করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীতে আর এক শ্রেণীর

পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা জগতের প্রত্যেক বস্তু নশ্বর হইলেও এমন একটী পদার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন যাহা অনন্তকালস্থায়ী ও যাহার উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই। সেই অনাদি, অনন্ত ও নিত্য পদার্থের নাম আত্মা এবং যাঁহারা সেই আত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের নাম অধ্যাত্মবিদ্ বা দার্শনিক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণ আত্মার সম্বন্ধে নানা বিচিত্র তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ সকলের আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ভারতীয় মণীষিগণ সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত যে স্বাবলম্বন নীতির উপদেশ দিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনাই এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এই দুইটী মানবের পরম পুরুষার্থ। অভ্যুদয় শব্দের অর্থ পার্থিব সম্পদ্। ধন, জন, মান, সম্ভ্রম, কীর্ত্তি, সুখ, স্বচ্ছন্দতা ইত্যাদি সমস্তই অভ্যুদয় পদবাচ্য। নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ পরম মঙ্গল বা মুক্তি। যাহার অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর নাই তাহাকে নিঃশ্রেয়স বলে। কোন মনুষ্য অভ্যুদয় কামনা করেন, কেহ বা নিঃশ্রেয়স প্রার্থনা করেন। এই দুই শ্রেণীর লোকের চরম লক্ষ্য ভিন্ন হইলেও তাঁহাদের কৃতকৃত্যতা লাভের উপায় প্রায় একই রূপ। অভ্যুদয় লাভের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কারণ ধর্ম্ম এবং অধোগতির প্রত্যক্ষ কারণ অধর্ম্ম। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন ঃ—"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাৎ ভবত্যধর্ম্মেণ" অর্থাৎ ধর্ম্ম দ্বারা উর্দ্ধগতি ও অধর্ম্ম দ্বারা অধোগতি হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এতদুভয়ের সাধারণ নাম অদৃষ্ট। অদৃষ্টই জীবের একমাত্র পরিচালক। জীব সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার আত্মায় তজ্জনিত যে সংস্কার বিদ্যমান থাকে উহাই যথাক্রমে শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট বা সামান্যতঃ অদৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অদৃষ্টের পার্থক্য বশেই জীব বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় নিপতিত হয়। মৃগনাভি-সুবাসিত বস্ত্রকে

তিরোহিত হয় না, সেইরূপ শত শত জন্মেও আমাদের স্বোপার্জ্জিত সংস্কারসমূহ আত্মা হইতে বিদূরিত হয় না। কুম্ভকারের চক্র যেমন অন্তর্গত শক্তিপ্রভাবে অনবরত ঘূর্ণমান হইতে থাকে সেইরূপ আমরাও অন্তর্নিহিত অদৃষ্টের বশে নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছি। যেমন কোন কাচকুপীর মধ্যে কতকগুলি মধুকরকে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখ বদ্ধ করিলে ঐ মধুকরগুলির কেহ ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ, কেহ অধোদেশে গমন, কেহ বা মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু কেহই উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হয়না, সেইরূপ জীবসকল শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট দ্বারা সংসারচক্রে আবদ্ধ, কেহ সুরলোক, কেহ নরলোক, কেহ বা তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু কেহই পরিত্রান লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই সংসরণশীল জীবসকল যে অদৃষ্টের অধীন হইয়া সতত বিচরণ করিতেছে উহা তাহাদের স্বোপার্জ্জিত পদার্থ। যাঁহারা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শুভাদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহারাই সাংসারিক অভ্যুদয় লাভ করিতে সমথ হইবেন আর যাঁহারা অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দুরদৃষ্টভাগী হইয়াছেন তাঁহারা চিরকাল ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত হইবেন। এস্থলে আমরা স্পষ্টই দেখিলাম অভ্যুদয়লাভের একমাত্র উপায় শুভাদৃষ্ট সঞ্চয়। আমরা নিজে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি তাহারই ফল এক্ষণে উপভোগ করিতেছি, আবার এক্ষণে যে সকল কর্ম্ম করিতেছি তাহারই ফল ইতঃপর ভোগ করিব। অতএব আমাদের নিজের সুখদুঃখ নিজেরই হস্তে নিহিত আছে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন ঃ—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্রৈর্গ্রথিতোহি লোকঃ॥

বলেন তাঁহারা নির্ব্বোধ। আমি করিতেছি এরূপ ভাবনাও বৃথাভিমান মাত্র। লোকসকল স্বকীয় কর্ম্মসূত্র দ্বারা গ্রথিত। এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে অন্যের উপর নির্ভর করিলে অভ্যুদয় লাভ হইবে না, আত্মনির্ভরশীলতাই অভ্যুদয় লাভের একমাত্র উপায়।

যাঁহারা নিঃশ্রেয়স প্রার্থনা করেন তাঁহাদেরও স্বাবলম্বন নীতির আশ্রয়গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। সংসার দুঃখবহুল। ইহাতে দুঃখের ভাগ অত্যন্ত অধিক ও সুখের ভাগ অত্যন্ত অল্প। যদিও ইষ্টসংযোগাদি-জনিত কিঞ্চিৎ সুখ কখনও উপলব্ধ হয় কিন্তু পরিণামে সেই সুখ দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। নিবিড় তিমির পুঞ্জের মধ্যে একটী খদ্যোত আলোকের ন্যায় এই অনাদি সংসারে অশেষ দুঃখরাশির মধ্যে সামান্য সুখ-কণিকাকে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। এই হেতু কেহ কেহ এই সংসারকে তাপক ও জীবকে তপ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভই তাঁহাদের পরম অভীপ্সিত। আত্মজ্ঞানই এই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে ঃ—

"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।" আত্মাকে শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে ও প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আত্মার যে স্বরূপ বর্ণিত আছে উহা শ্রবণ করিতে হইবে, অনন্তর তদ্বিষয় মনে ধারণা করিতে হইবে, পরে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক আত্মস্বরূপ চিন্তা করিতে হইবে, পরিশেষে আত্মার দর্শনলাভ হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই আত্মাকে কে দর্শন করিবেন? ইহার উত্তর—আত্মাকে আত্মাই দর্শন করিবেন। চক্ষুঃ আত্মাকে দেখিতে পান না, কর্ণের আত্মদর্শনের ক্ষমতা নাই, নাসিকা আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ, আত্মদর্শন জিহ্বার সামর্থ্যাধীন

বা বিশ্বব্যাপক আত্মাকে কিরূপে প্রত্যক্ষ করিবেন? এই হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন:—"আত্মনৈব আত্মা দ্রষ্টব্যঃ,"—আত্মাদ্বারাই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,"—কেবল আত্মাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়; জন্ম, জরা, মরণ, ব্যাধি, শোক, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ইত্যাদি অতিক্রম করিবার অন্য উপায় নাই। এই সকল শ্রুতিদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে আত্মা নিজেই আত্মার মোক্ষসাধন করেন, অপর কেহই আত্মার মুক্তিসাধনে সমর্থ নহে।

উল্লিখিত যুক্তিসমূহের মর্ম্মার্থ এই যে আত্মার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স আত্মকর্ত্তৃকই সংঘটিত হইয়া থাকে। অন্যের সাহায্যে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে না। হিন্দুদার্শনিকগণ অদৃষ্টবাদী সন্দেহ নাই। কিন্তু অদৃষ্টও পুরুষকারের নামান্তর মাত্র। কোন মুহূর্ত্তে আমরা পুরুষকারদ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করি, সেই কর্ম্ম পরমুহূর্ত্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু উহার প্রতিবিম্ব আমাদের স্বচ্ছ জ্ঞানধন আত্মায় থাকিয়া যায়। এই সকল কর্ম্ম প্রতিবিম্বের নাম সংস্কার এবং ঐ সংস্কারসমূহের সমষ্টিই অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টের শুভাশুভতত্ত্ব অনুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। অতএব হিন্দুদার্শনিকগণ অদৃষ্টবাদী হইয়াও পুরুষকারেরই সমর্থন করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের যে প্রণালী দৃষ্ট হয়, জাতিবিশেষের অভ্যুত্থান ও পতনেও অবিকল ঐ প্রণালী পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্বাবলম্বন ব্যতীত কোন জাতিই অভ্যুন্নতি লাভ করিতে পারে না। অন্যে সাহায্য করিবে, অন্যে ধরিয়া তুলিবে, অন্যে পথ প্রদর্শন করিবে ইত্যাদি মনে করিয়া যে জাতি বসিয়া থাকে তাহার কখনও উত্থান হইতে পারে না। হিন্দুজাতি এক সময়ে স্বাবলম্বন-নীতির গুণে জগতের সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে

করিয়াছিল। বৈদিক ঋষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি উচ্চারণ করিতেন, নির্জ্জনে বসিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিতেন,—তাঁহারাই আবার স্বহস্তে হলচালনা ও দুগ্ধদোহন করিতেন। স্বহস্তে রন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিয়া অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেবের তুষ্টিবিধান করিতেন। পরিধেয় বস্ত্রের জন্য তাঁহারা অন্যের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন না। গৃহের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিতেন। এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত স্বয়ংই প্রস্রবণাদি হইতে বহন করিয়া আনিতেন। একাধারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের শারীরিক বলবীর্য্যের হানি হইত না, মানসিক শক্তিরও হ্রাস হইত না, পরন্তু প্রত্যেক গৃহস্থ স্বাধীনভাবে অন্যমুখনিঃপেক্ষ হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন। জগতে যদি স্বাধীনতা থাকে তাহা হইলে তাঁহারাই যথার্থ স্বাধীন ছিলেন। বহু গৃহস্থ সমবেত হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। স্ত্রীপুরুষ সকলেই বীর, সকলেই স্তোতা ও সকলেই পরিচারক। ভারতের সেই শারীরিক ও মানসিক তেজস্বিতার দিন এক্ষণে কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যখন চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল তখনও ভারতবাসী স্বাবলম্বননীতি বিস্মৃত হন নাই। তখনও তাঁহারা বুঝিতেন "ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থম্"। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রধান নিয়ন্তা ভগবান্ মনু মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেনঃ—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"।

ব্যক্তি ও জাতির জীবন পৃথক্ ভাবে লক্ষ্য না করিয়া যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের বিষয় সামান্যতঃ আলোচনা করি তাহা হইলেও স্বালম্বননীতির কার্য্যকারিতা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। সন্ধ্যা, বন্দনা, জপ, তপঃ, হোম, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতি সমস্তই

হইবে; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি কেহই অপরের পাপ-পুণ্যের ভাগী নহেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন:—লোক মৃত্যুকালে দেহাদি সমস্তই লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু পুণ্য ও পাপ তাহারা সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করে। বস্তুতঃ, হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র আত্মোৎকর্ষবিধান, ইহারই অপর নাম আত্মনির্ভরশীলতা বা স্বাবলম্বন। হিন্দুশাস্ত্রে যে মুক্তির বর্ণনা আছে তাহাও আর কিছুই নহে, আত্মার উদ্ধার মাত্র। বৈদান্তিক বলেন—আত্মবীর্য্য দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংসকর, কপিল বলেন আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া লও, পাতঞ্জলি বলেন জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন কর, নৈয়ায়িক বলেন আত্মার মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত কর। প্রায় সকল দর্শনেরই সারমর্ম্ম এই যে আত্মাকে আত্মবীর্য্য দ্বারা রক্ষা কর। আত্মা সুরক্ষিত হইলেই পরম শান্তি লাভ হইবে, যেহেতু আত্মা স্বভাবতঃ নিত্যশুদ্ধমুক্ত স্বভাব। যিনি আত্মশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন তিনি যথার্থই নিরাশ্রয়। মনুসংহিতায় লিখিত আছে:—

যদ্ যৎ পরবশং কর্ম্ম তৎ তদ্ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদ্ আত্মবশন্তুস্যাৎ তৎ তৎ সেবেত যত্নতঃ॥ ১৫৯॥
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥ ১৬০॥

যে যে কর্ম্ম পরবশ তাহা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে, আর যাহা যাহা আত্মবশ তৎসমস্ত যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে। পরবশ সমস্তই দুঃখ এবং আত্মবশ সমস্তই সুখ। সুখ ও দুঃখের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপ জানিবে। ভগবান্ মনু লোকসকলকে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করিয়া বলিয়াছেন:—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

"ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সুহৃৎ। মৃত্যুকালেও ধর্ম্ম মানবের অনুগমন করে, অন্যান্য সমস্তই শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়"। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ আত্মবশ কর্ম্মের প্রশংসাচ্ছলে আত্মনির্ভরশীলতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। গীতা শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বাবলম্বননীতির উপদেশ দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়বীর অর্জ্জুন জ্ঞাতিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "ভগবন্ স্বজনগণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে ও মুখ শুষ্ক হইতেছে"। তখন ভগবান্ তাঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে প্রোৎসাহিত করিয়া বলিয়াছেন :—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ (২—৩) ॥

"হে পার্থ কাতরতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার যোগ্য নহে; হে পরন্তপ তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও"। ভগবান্ আরও বলিয়াছিলেন :—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ (২—৪৭) ॥

"হে অর্জ্জুন কর্ম্মেই তোমার অধিকার। কর্ম্মফলে কদাচ নয়, তুমি কর্ম্মফলার্থী হইও না। অকর্ম্মে যেন তোমার আসক্তি না হয়"। ভগবান্ তদনন্তর বলিয়াছিলেন :—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্ন্ কর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসীধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ (৩—৮) ॥

"হে অর্জ্জুন তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর, যেহেতু অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেয়ঃ। কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহিত হইবে না।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ॥ (১৮—৫৬)॥

"স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে।"

কর্ম্ম ও আত্মনির্ভরশীলতার পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রকারগণ এইরূপে প্রশংসা করিয়াছেন। অহো আমাদের কি দুর্ভাগ্য, আমরা এই সকল উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সামান্য চেষ্টাও করিতেছি না। আমাদের শাস্ত্রে সমস্তই আছে কিন্তু ব্যবহারে কিছুই নাই। এক সময়ে ভারতবাসী রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই সমগ্র জগতের উপদেষ্টৃ পদে বৃত হইয়াছিল কিন্তু অধুনা তাঁহাদের কি ঘোর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভারতের উপদেশ লাভ করিয়া অনেক জনপদ উন্নত হইয়াছে, ভারত অনেককে ধর্ম্ম দিয়াছে, জ্ঞান দিয়াছে ও উপদেশ বিতরণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতের নিজগতি অধোমুখী। আমাদের নৈতিক উন্নতি নাই, ধর্ম্মের উন্নতি নাই, সমাজের শৃঙ্খলা নাই, সমস্তই আমরা হারাইয়াছি। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের লোক কিরূপ তেজস্বী ছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য কঠোপনিষদ্ হইতে একটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিলাম। তাহা এই :—

উত্তিষ্ঠথ জাগ্রথ প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ ১৪

উত্থিত হও, জাগরিত হও, উপদেষ্টা লাভ কর। তোমরা যে পথের পথিক তাহা ক্ষুরের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ, উহা দুর্লভ ও দুর্গম॥

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সুন্দরী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর আগত প্রায়। গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরস্থিত সকলেরই আহারাদি শেষ হইয়াছে। বৃদ্ধা পিসীমা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার কিছুদূরে বসিয়া লছমী একটি আঙিয়া সেলাই করিতেছে। বাড়ীতে আর কেহই নাই।

পিসীমা লছমীর হস্তস্থিত কারুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আর একটা আরম্ভ করেছিস্ যে দেখছি লছমী।"

লছমী তাঁহার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। অতদূর হইতে তাঁহাকে কিছু বলা না বলা সমান। লছমী আপন মনে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

পিসীমা কিয়ৎক্ষণ আবার মালাজপ করিলেন। লছমী যে অংশে সূচীচালনা করিতেছিল সে অংশটি শেষ হইলে, অপর একটি ভাঁজ সন্তর্পণে খুলিল। নীল সাটিন মধ্যাহ্নের আলোকে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া পিসীমা বলিলেন—"এবার যে ভারি বাহারের আঙিয়া হচ্চে দেখছি! এটা কার জন্য তৈরি কচ্ছিস্, রাজির জন্যে, না রমার জন্যে?"

এই প্রশ্নে লছমীর মুখ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কারুকার্য্যটি সে নিজ আসনে নামাইয়া রাখিয়া, পিসীমার নিকট উঠিয়া গেল। তাঁহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া হাতের আড়াল দিয়া বলিল—"এটা

শুনিয়া পিসীমা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"কতদিনে নারায়ণ যে মুখ তুলে চাইবেন তা জানিনে।"

লছমী বলিল—"ভেবনা দিদি, শিগ্‌গিরই রমার বর আস্‌বে। খুব সুন্দর, ধনী, বিদ্বান বর আস্‌বে।"

পিসীমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তোর মুখে ফুল চন্নন পড়ুক। সুন্দর, ধনী, বিদ্বান বরে কায নেই,—একটি যেমন তেমন—কাণাখোঁড়া না হয়,—গেরস্তঘরের বর এলেই বাঁচি। জাত রক্ষে হয়। হে মধুসূদন—তুমি না জাতরক্ষে করলে কে করবে বাবা।"

লছমী বলিল—"তোমাদের দেশের চাল ভারি খারাপ। রমা এই মোটে চৌদ্দ বছরের, এখনি তোমাদের জাত যাচ্চে! রাজপুতানায় আমাদের কুড়ী বছরের মেয়ের বিয়ে হয়—তবু জাত যায় না!"—

লছমীর বক্তব্য শেষ না হইতেই, সদর দরজার শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। লছমী উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজার পানে চাহিয়া রহিল। পিসীমা লছমীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া উৎসুক নেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

শিকল আবার বাজিল। লছমী আপন মনে বলিল—"কে এল এ সময়?" বলিয়া শীঘ্র গিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল। খুলিয়া দেখিল, গদাধর চট্টোপাধ্যায়। গদাধর আজ তিন দিন হইল সোণা-পুরের কাছারিতে খাজনা জমা দিতে গিয়াছিলেন। কল্য তাঁহার বাটী আসিবার কথা ছিল—আজ আসিবেন কেহ মনে করে নাই।

লছমীকে গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীর সব ভাল?"

লছমী বলিল—"সব ভাল দাদা বাবু—আপনি ভাল আছেন?"

গদাধর—"হাঁ। ভাল আছি লছমী।"

একথা বলিতে বলিতে গদাধর বারান্দায় উঠিয়া তাঁহার ভগ্নীর

বাহির হইয়া, বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভ্রাতার প্রতি শঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"এবার এত সকাল সকাল ফির্‌লে যে, শরীর গতিক ভাল ত গদাই ?"

গদাধর সহাস্যমুখে ইঙ্গিতের দ্বারায় কুশল জানাইলেন।

দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন—"খাওয়া হয়েছে ?"

গদাধর বলিলেন—"ভাত খাইনি, চান করে একটু জল খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

বৃদ্ধা কিছুই শুনিতে পাইলেন না, শুধু ভ্রাতার ওষ্ঠকম্পন মাত্র দেখিনে পাইলেন। লছমীর মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে চাহিলেন।

লছমী তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল—"ভাত খান নি, চান করে জল খেয়ে এসেছেন।"

পিসীমা বলিলেন—"আহা ! এতখানি বেলা অবধি খাওয়া হয় নি ! মুখ শুকিয়ে গেছে একবারে ! আমি এখনি গিয়ে ভাত চড়িয়ে দিচ্চি। ডাল আছে, তরকারি আছে, মাছের অম্বল আছে—চারটি পুরোণো চালের ভাত চড়িয়ে দিচ্চি—এখ্‌খুনি হয়ে যাবে। হাত পা ধুয়ে ততক্ষণ একটু সরবৎ খাও। হরিলুটের বাতাসা রয়েছে—ভিজিয়ে সরবৎ করে দিচ্চি এখুনি। লছমী—জল এনে দে। আমি রান্নাঘরে চল্লাম।" বলিয়া ক্ষিপ্রপদে পিসীমা প্রস্থান করিলেন। গদাধর লছমীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজু, রমা কোথায় ?"

লছমী উত্তর করিল 'কি জানি, কোথায় খেলা কর্‌তে গেছে বুঝি।'

রান্নাঘরে গিয়া পিসীমা দেখিলেন, উনানের আগুন প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে। একগোছা শুষ্ক তালপাতা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। উনান দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। খানকতক পাতলা কাঠ উনানে দিয়া, পিসীমা হাঁড়িতে জল চড়াইয়া দিলেন। তখন

হইতে হরিন্নুটের বাতাসা পাড়িলেন। একটি পাথরের গেলাসে বাতাসা ভিজাইয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই সরবৎ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। কিঞ্চিৎ নেবুর রস তাহাতে মিশাইয়া, লছমীর হস্তে ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিলেন।

যথা সময়ে অন্ন প্রস্তুত হইল। গদাধর ভোজন করিতে বসিলেন। লছমী একখানি পাখা লইয়া নিকটে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। অন্যদিন রমা এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। লছমীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন—"রমা, রাজু এখনও আসে নি ?"

"কই না। আসবে এখনি।"

"কতক্ষণ গেছে ?

"তা জানিনে ত। আমি বাড়ী ছিলাম না।"

নীরবে গদাধরের ভোজন শেষ হইল। তিনি যখন মুখ প্রক্ষালন করিতে বসিয়াছেন তখন নৃত্য করিতে করিতে দশবর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়াই লছমী জিজ্ঞাসা করিল—"রাজি, তোর দিদি এল না ?"

রাজলক্ষ্মী বলিল—"দিদি আমার সঙ্গে গিয়েছিল বুঝি ?"

"তবে সে কোথা ?"

"সে ত গেছে শিকার করতে।"

গদাধর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কি হয়েছে ?"

অঞ্চলের একটি অগ্রভাগ অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে রাজলক্ষ্মী বলিল—"দিদি ত গেছে শিকার করতে !"

"দিদি গেছে শিকার করতে ! কি শিকার করতে গেল আবার ?

"এই বাঘ টাঘ, হরিণ টরিণ।"

গদাধর হাস্য করিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার কন্যার এই বুঝি একটা নূতন খেয়াল হইয়াছে। তীর ধনুক লইয়া বাঘ মারিতে যাওয়া হইয়াছে! বলিলেন—"কোথায় বাঘ মারতে গেছে—আম বাগানে?"

"আম বাগানে কেন? জঙ্গলে। সেই পাখীধরা দিদিকে নিয়ে গেছে।"

এ কথা শুনিয়া গদাধর অশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"পাখী ধরা কে?"

লছমী জিজ্ঞাসা করিল—"পাখীধরা আবার এসেছিল নাকি?"

রাজলক্ষ্মী উত্তর করিবার পূর্ব্বে গদাধর লছমীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"পাখীধরা আবার কে?"

লছমী তখন পরশ্ব দিবসের ঘটনা, রমার মুখে যেরূপ শুনিয়াছিল, সেইরূপ বলিল। রাজলক্ষ্মী যোগ দিল—"দিদি তার নৌকোয় পাখী দেখতে গিয়েছিল—এক নৌকো পাখী—কত রকমের পাখী—একশো দুশোটা!

শুনিয়া গদাধর অত্যন্ত দুশ্চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, কোনও দুষ্টলোক আসিয়া রমাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে—কন্যা জন্মের মত গিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখনি অন্বেষণে বাহির হইতে হইবে,—পুলিসে খবর পাঠাইতে হইবে। ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত বলিলেন—"গেল যে, কাকে বলে গেল?"

রাজলক্ষ্মী বলিল—"কেন, পিসীমাকে বলে গেছে।"

গদাধর ভগ্নীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি ত কিছু জানিনে।" রাজলক্ষ্মী বলিল—"বাঃ দিদি তোমায় বল্লে পিসীমা, পাখীধরা আসবে, আমি তার সঙ্গে জঙ্গলে শিকার করতে যাব? তুমি বল্লে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।"

ছিগের বাড়ী খেলা করিতে যাইবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এখন অবগত হইয়া পিসীমাও দারুণ দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

যাহা হউক, গদাধর উন্মত্তবৎ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে পরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পাইলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহারা কেহ রমাকে দেখিয়াছে কিনা। কেহই দেখে নাই। অবশেষে হরিপদ নামক একজন জেলিয়া, সে বলিল মধ্যাহ্নকালে নদী হইতে মাছ ধরিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছিল রমা একজন বন্দুকধারী বাবুর সঙ্গে যাইতেছে।

চট্টোপাধ্যায় এতক্ষণ মনে মনে একজন লম্বা চুল ও দাড়ীযুক্ত ছিন্নবসন অস্নাত অনার্য্য অসভ্য "পাখ্‌মারা"র মস্তক চূর্ণ করিতেছিলেন, হঠাৎ "বাবু"র নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। বলিলেন—"বাবু? কি রকম বাবু? কি রকম চেহারা?"

হরিপদ বলিল—"কেন,—ভদ্দরলোক যেমন হয়, বেশ ফিটফাট্ চেহারা, সীঁথিকাটা,—দেখে বড়মানুষের ছেলে বলে মনে হল।—কেন চাটুয্যে মশায়, কি হয়েছে!"

গদাধর তখন তাহাকে ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। সে বলিল—বটে! "তা কোন ভয় করবেন্ না দাদাঠাকুর সে বড় ঘরের ছেলে—জমিদার টমিদারের ছেলে হবে,—শিকার করতে এসেছিল—আমোদ করে হয়ত মেয়েকে নিয়ে গেছে একটু দূর—পৌঁছে দেবে এখন।"

গদাধর বলিলেন—"তুমি কি করে জানলে বড়ঘরের ছেলে?"

হরিপদ বলিল—"কেন, ঐ যে নদীর ঘাটে তার নৌকো বাঁধা রয়েছে। বরকন্দাজ, সেপাই সব বসে রয়েছে।"

গদাধর ভাবিলেন,—ঘাটে গিয়া তাহাদের নিকট খবর লইতে হইতেছে, লোকটা কে। সুতরাং হরিপদকে সঙ্গে লইয়া ...

উপস্থিত হইলেন। নৌকাখানি তীরে লাগানো রহিয়াছে। দাঁড়ী মাঝিরা কেহ রন্ধন করিতেছে কেহ বা বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। ফৌজদার সিংহ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া, দুলিয়া দুলিয়া তুলসীদাস পাঠ করিতেছিল,—তাহার নিকট গদাধর উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"এ নৌকো কোথা থেকে এসেছে বাপু ?"

ফৌজদারসিং রামায়ণখানি বন্ধ করিয়া বলিল—"বিশালাক্ষী জানতে হো ?"

গদাধর বাঙ্গলা ছাড়িয়া হিন্দী ধরিলেন—বলিলেন—"জানতা হায়।"

ফৌজদার চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"বিশালাক্ষী সে আয়া।"

"ই কিসকা নাউ হায় ?"

ফৌজদারসিং গর্ব্বিত ভাবে বলিল—"জিমিন্দার বাঁড়ু্রাজয়া বাবুকা নাম শুনে হো ?"

গদাধর একটু হাস্য চাপিয়া বলিলেন—"শুনা হায়।"

"উনহীকা বেটা, নব্বুবাবুকা নাও হয় ইয়া। বাবুসাব শিকার খেলনেকো আয়েঁ।"

গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুম্‌রা বাবু কব আবেগা ?"

"কব্ আবেঙ্গে ?—আজ আবেঙ্গে।"

গদাধর বলিলেন—"নেই—নেই—কিস্‌বখোৎ আবেগা ?"

অনর্থক প্রশ্নে বিরক্ত হইরা ফৌজদারসিং বলিল :—

"কিস্ বক্ত আবেঙ্গে ? সো মুঝে মালুম্ নহি।"—বলিয়া সিংহজী সুর করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন—

"জাম্ববন্তকে বচন সুহায়ে।"

হরিপদ অনুচ্চস্বরে বলিল—"দূর বেটা জাম্বুবান্।"

গদাধর তখন হরিপদকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তিনি

অবগত ছিলেন। সে যে একটি বিশেষ সচ্চরিত্র যুবা তাহাও তিনি বারম্বার শুনিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মনের আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা দূর হইতে লাগিল। কিন্তু বিরক্তি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল না। নবগোপাল নিতান্ত বালক নহে। একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যাকে একাকী বনে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যে কতদূর অবিবেচনার কার্য্য,—তাহা তাহার বুঝা উচিত ছিল। ভাবিয়া রাখিলেন—তাহার দেখা পাইলে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিবেন।

তখন তিনি ধীর পদে গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হরিপদ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিছুদূর যাইতেই দেখিলেন রমা ও নবগোপাল আসিতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রমা ছুটিয়া আসিয়া পিতার হস্তধারণ করিয়া বলিল—"বাবা, আমি দুটো বুনো হাঁস মেরেছি।"

গদাধর চক্ষু রাঙাইয়া কন্যার দিকে চাহিলেন। রুষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা গিয়েছিলি ?"

"শিকার করতে গিয়েছিলাম।"

গদাধর কম্পিতস্বরে বলিলেন—"বাড়ী যা।"

রমা পিতার মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। পূর্ব্বে কখনও এরূপ ভাব দেখে নাই। নবগোপালের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গদাধর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? যা, বাড়ী যা না।"

রমা মৃদুস্বরে বলিল—"ঐ যে বাবুটি আসছেন, ওঁরি সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। ওঁকে আজ আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছি যে বাবা।"

গদাধর অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন—"আচ্ছা আচ্ছা, বাড়ী যা এখন।" বলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন।

রমা বলিল—"তবে তুমি ওঁকে নিয়ে এস সঙ্গে করে।" রমা চলিয়া গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃক্ষলতার অন্তরালে পড়িল।

রমা যে সময় নবগোপালের পার্শ্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল, নবগোপাল সেই সময় গদাধরের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হরিপদকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়াছিল। সে নিকটে গেলেই নবগোপাল স্বীয় হস্তস্থিত বন্দুক প্রভৃতি তাহার হস্তে দিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"সাবধান করে ধর।"

রমা চলিয়া গেলে, নবগোপাল অগ্রসর হইয়া সহাস্যমুখে গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে নমস্কার করিল।

গদাধর তাহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া একটু উচ্চস্বরে কহিলেন, "বিশালাক্ষীর কান্তি বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের পুত্র আপনি ?"

নবগোপাল মস্তক কিঞ্চিৎ অবনমিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইল তাহাই বটে।

গদাধর বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

নবগোপাল মনে মনে বলিল—"হুঁ। লক্ষণ ভাল নয়।" প্রকাশ্যে সস্মিতমুখে বলিল—"বেশ।" বলিয়া হরিপদকে নিকটে ডাকিল। তাহাকে বলিল—"নদীর ঘাটে আমার নৌকো বাঁধা আছে—জিনিষ-গুলো সেখানে পৌঁছে দিতে পার্‌বি ?"

হরিপদ বলিল—"কেন পারব না হুজুর।"

নবগোপাল পকেট হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিল—"যা, সাবধানে নিয়ে যা, যেন ফেলে দিস্‌নে।"

বখসিস্‌ প্রাপ্ত হরিপদ আহ্লাদে জোরে জোরে পা ফেলিয়া নদী-তীরাভিমুখে চলিয়া গেল।

নবগোপাল অত্যন্ত সপ্রতিভ ও কিঞ্চিৎ গর্ব্বিত ভাবে গদাধরের

মুখের পানে চাহিল। সে স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পথের উপর একটা ইষ্টকরচিত সেতু ছিল। গদাধর নবগোপালকে সেই দিকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

সেতুর নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র নবগোপাল উঠিয়া উপবেশন করিল। গদাধর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আপনি সদ্বংশ-জাত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কিন্তু আজ যে কার্য্যটি আপনি করেছেন—তা কি আপনার উচিত হয়েছে?"

ইতিমধ্যে, নবগোপাল পকেট হইতে একটি সিগারেট্ কেস্ বাহির করিয়া, একটি সিগারেট লইয়া মুখে ধারণ করিয়াছিল। গদাধরের বক্তব্য শেষ হইলে, একটি ক্ষুদ্র রূপার বাক্স হইতে একটা ভেষ্টা বাহির করিয়া, বুটের নিম্নে ঘর্ষণ করিল। প্রজ্জ্বলিত শলাকা সিগারেটে সংলগ্ন করিয়া, দুই তিন বার টানিয়া, সিগারেটটি মুখ হইতে খুলিয়া দ্বিতীয়া ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যে ধারণ করিয়া উদ্ধতভাবে বলিল—"কি হয়েছে?"

গদাধর বলিলেন—"আজ যে আপনি আমার বয়স্কা মেয়েটিকে সঙ্গে করে বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন—সেটা কি আপনার উচিত কার্য্য হয়েছে?"

সিগারেট মুখে করিয়া, একটু হাসিয়া, নবগোপাল বলিল—"কেন? ক্ষতিটা কি?"

গদাধর যদি ভুলিতে পারিতেন যে তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরের সহিত কথা কহিতেছেন, তাহা হইলে তিনি একথার উপযুক্তরূপ জবাব দিতে পারিতেন। নবগোপালের সপ্রতিভ ও গর্ব্বিত ভাব দেখিয়াও গদাধর একটু থতমত খাইয়া গেলেন। যে সকল "মিষ্ট মিষ্ট" কথা বলিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আর খুঁজিয়া পাইলেন না। যে সুর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হঠাৎ ভারি নামিয়া গেল। সুতরাং বলিলেন—"ক্ষতিটা কি

হয়েছে শুন্‌বেন ? তবে বলি। আমি গরীব মানুষ,—সামান্য চাকরি করে দুপয়সা রোজগার করি—তাতেই কোন মতে পরিবার প্রতিপালন হয়। আজ কাল যে দিন সময় হয়েছে অনেক টাকা না হলে মেয়ের বিয়ে হয় না। তাই আজও মেয়েটির বিয়ে দিতে পারিনি। এর উপর যদি রাষ্ট্র হয় যে আমার চৌদ্দ বচরের সোমত্ত মেয়ে জমিদার বাবুর ছেলের সঙ্গে জঙ্গলে শিকার করতে যায়, তা হলে কি আমার মেয়ের আর বিয়ে হবে ?”

গদাধর যতক্ষণ গরম হইয়া কথা কহিয়াছিলেন,—নবগোপাল ততক্ষণ উদ্ধতভাব ধারণ করিয়াছিল। এখন গদাধরকে নরম স্বরে নামিতে দেখিয়া নবগোপালও ঔদ্ধত্য পরিহার করিল—অথচ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—“শুনুন। আপনি আমাকে যে ভৎসনা করলেন, নিশ্চয়ই আমি তার কতকটা অর্জ্জন করেছি। আপনি আপনার মেয়েকে যুবতী বলে বর্ণনা করলেন। ওবয়সের মেয়েকে আমি যুবতী বলে মনে করিনে—বালিকা মনে করি।—সে থাক্—সে মতামতের বিষয়। আপনি একটা সম্ভাবিত ক্ষতির কথা বল্লেন। আমি আজ, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বে, আপনার কাছে একটা প্রস্তাব করব স্থির করেছিলাম। তবে আজই করবার অবসর পাব তা ভাবিনি। আপনার মেয়ের কাছে শুনেছিলাম আপনি অনুপস্থিত,—এখন দুই একদিন ফিরবেন না। যা হোক,—আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তা হলে এই সম্ভাবিত ক্ষতির আশঙ্কা—আশা করি অমূলক আশঙ্কা,—দূর হতে পারে।”

গদাধর একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“কি আপনার প্রস্তাব ?”

নবগোপাল পূর্ব্ববৎ শান্ত স্বরে কিন্তু সস্মিতমুখে নয়,—স্বাভাবিক ভাবে বলিল—“আমার প্রস্তাব—আপনি বিবাহে আমাকে আপনার কন্যাদান করুন।”

এ কথা শুনিয়া গদাধর কয়েক মুহূর্ত নির্ব্বাক রহিলেন। ধীরে

ধীরে সেতুর উপর উঠিয়া নবগোপালের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নবগোপালের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—"আপনি কি যথার্থ বলছেন?

নবগোপালের দৃষ্টি প্রশ্নকর্ত্তার মুখের প্রতি নহে, দূরে বায়ুকম্পিত বৃক্ষাবলীর দিকে। দৃঢ়স্বরে বলিল—"অযথার্থ কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।"

গদাধর কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। নবগোপালও নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। পরে গদাধরের প্রতি শান্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আপনি এখনও আমার প্রস্তাবের উত্তর দেন নি।"

গদাধর বলিলেন—"আপনি এ প্রস্তাব করে আমাকে অত্যন্ত সম্মানিত করলেন। আপনাকে জামাতা পাওয়া আমার মত লোকের পক্ষে আশার অধিক সৌভাগ্যের বিষয়। আপনার প্রস্তাব শিরোধার্য্য। কিন্তু একটা কথা,—অপনার পিতাঠাকুর সম্মত হবেন কি?"

নবগোপাল বলিল—"খুব সন্দেহ।"

"তবে? তা হলে কি করে হবে?"

এতক্ষণে নবগোপাল আবার হাসিল। বলিল—"বিবাহ আমি করব, আমার পিতাকে ত বিবাহ করতে হবে না।"

"আপনার পিতার যদি মত না হয়, তা হলে বিবাহ করতে সাহস করবেন?"

গদাধর এই "সাহস" কথাটা এইখানে ব্যবহার করিয়া বড়ই ভাল করিলেন। নবগোপাল তেজস্বীভাবে বলিল—"ভয় আমি কোন জিনিষকে করিনে,—এমন কি পিতার ক্রোধকেও না।"

গদাধর একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"আপনার কথা শুনে খুসী হলাম। কিন্তু একটা কথা বলি। আপনি বালক—সাংসারিক অভিজ্ঞতা আপনার অল্প। আপনার পিতা যদি এ বিবাহে বিরোধী হন, তা হলে

নবগোপাল বলিল—"কেমন করে ?"

"আপনাকে বন্দী করে। আমার চাল কেটে আমায় গ্রাম থেকে উঠিয়ে দিয়ে।"

"আপনি ত তাঁর জমিদারীতে বাস করেন না।"

"না করি। আপনার পিতার পাল্লায় দুশো লাঠিয়াল আছে।"

নবগোপাল হাসিয়া বলিল—"জানি। তা হলে আমাদের এমন স্থানে যেতে হবে যেখানে তাঁর লাঠিয়াল পৌঁছতে পারবে না।"

গদাধর বলিলেন—"ঠিক। কিন্তু একটা বিষয় আপনাকে সাবধান করে দিই। যতদিন বিবাহ নিরাপদে শেষ না হয়, ততদিন এ বিষয় কারু কাছে প্রকাশ করবেন না। আমার কাছে প্রতিশ্রুত হতে পারেন যে এ বিষয় গোপন রাখবেন ?"

নবগোপাল দৃঢ়ভাবে বলিল—"অবশ্যই না। আমি একথা গোপন রাখতে প্রতিশ্রুত হব না। আমি আজই গিয়ে অন্ততঃ আমার মাকে এ কথা বলব।"

গদাধর নিরাশ হইয়া বলিলেন—"তা হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। আপনি বুঝতে পারছেন না।"

নবগোপাল বলিল—"সে জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। সে ভার আমার। আমি যদি এ বিবাহে আমার পিতামাতার সম্মতি সংগ্রহ করতে পারি, তা হলে আমার পক্ষে সে খুব সুখের বিষয় হবে। আমি অবশ্যই তার জন্যে চেষ্টা করব। যদি কৃতকার্য্য না হই, তা হলে অগত্যা তাঁদের বিনাসম্মতিতেই আমাকে বিবাহ করতে হবে। কিন্তু গোপনতার আশ্রয় নিতে আমি অক্ষম।"

নবগোপালের কণ্ঠস্বর মানসিক দৃঢ়তাব্যঞ্জক। গদাধর দেখিলেন—তাঁহার মত ফিরান সম্ভব নহে। তখন বলিলেন—"অচ্ছা দেখবেন—

"আজই ফিরব।"

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—"তবে শুন্‌লাম যে রমা আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছে, কি করে যাবেন আজ?"

নবগোপাল বলিল—"তাকে বলবেন আর একদিন এসে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করব।" বলিয়া নমস্কার করিয়া নবগোপাল বিদায় চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এখন বাড়ী থাকবেন ত?"

"আমি প্রায়ই বাড়ী থাকি।"

"আচ্ছা—তবে শিগ্‌গির একদিন আসব।" বলিয়া নবগোপাল বিদায় গ্রহণ করিল। গদাধরও মৃদুপদক্ষেপে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঢাকা ও ঢাকেশ্বরী।

ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়, তবে এই মাত্র জানা যায় যে মহাভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয়বীরগণ রাজত্ব করিতেন।* খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীর রাজ বালাদিত্য পূর্ব্ব-সমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া কাশ্মীরীদিগের বসবাসের জন্য এখানে কালম্ব্য নামে একটি জনপদ স্থাপন করেন।† খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে গৌড়রাজ্য পাল-

বংশীয় রাজগণের অধিকৃত হইলে এখানেও তাঁহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন।*

ঢাকার প্রচীনতা প্রমাণ করিতে যাইয়া বিশ্বকোষকার বলিয়াছেন, “ঢাকা নাম কত দিন হইতে প্রচারিত তাহা স্থির করিবার উপায় নাই, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলা-লিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ‘ডবাক’ ও সমতট জয় করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ ও সমুদ্র-কূলবর্ত্তী-স্থান পূর্ব্বকালে সমতট নামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশা-পাশি থাকায় এখনকার ঢাকাকেই পূর্ব্বোক্ত ‘ডবাক’ বলিয়া অনুমিত হয়”। ঢাকা নাম ‘ডবাকের’ রূপান্তর মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং বিশ্বকোষকারও ঢাকার প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপরোক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি যে ঢাকা নাম অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, এবং উহা ইংরাজদিগের প্রদত্ত আধুনিক নাম কখনই নহে। টেলার সাহেব (Dr. Taylor) বলেন “ঢাক” বৃক্ষের প্রাচুর্য্যবশতঃই এই স্থানের নাম ঢাকা হইয়াছে। কেহ কেহ ৺ ঢাকেশ্বরীর নাম হইতেও ঐ নাম হইয়াছে অনুমান করেন।†

বর্ত্তমান ঢাকানগরীর পশ্চিমপ্রান্তে ৺ঢাকেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থান এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ; কিন্তু, এক সময় ইহা রাজধানীর অন্তর্গত হইয়া লোকালয় পরিশোভিত ছিল; স্থানটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ

---

* বিশ্বকোষ—

† Dr. Taylor in his Topography and Statistics of Dacca, states that the word is supposed by some to be derived from the name of a tree (Butea frondosa), while others refer its etymology to the goddess Dhakeswari—literally the “concealed goddess”—a shrine ... King Ballal Sen, exists on the west

হইয়াও যেন শান্তিনিকেতন। কল-কণ্ঠ-বিহগের অস্ফুট কাকলির সহিত সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টারোল বিমিশ্রত হইয়া স্থানটিকে বাস্তবিকই আনন্দ-মুখরিত করিয়া তুলে। প্রকৃত পক্ষেই সমগ্র ঢাকা নগরীর মধ্যে এরূপ পবিত্র স্থান আর দ্বিতীয়টি নাই। শ্যাম পত্র পূর্ণ আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আপন আপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এরূপভাবে আলিঙ্গন সংবদ্ধ হইয়া শান্তিকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছে যে মধ্যাহ্ন-ভাস্করের প্রদীপ্ত কিরণ-জালও উহা ভেদ করিয়া মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং নিদাঘ-মধ্যাহ্নেও সুশীতল বায়ু-স্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায়।

৺ঢাকেশ্বরী কতকাল যাবত জনসাধারণের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহা স্থির করা সুকঠিন। এ সম্বন্ধে যতগুলি প্রবাদ বা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা লিখিত হইতেছে। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—"এখানে ঢক্কা বাদ্য-প্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, সেই জন্য দেশীয় লোকেরা এই স্থানকে ঢক্কা (ঢাকা) বলিয়া থাকে। ইহার অপর নাম "জাঙ্গির পত্তন"* (জাহাঙ্গীরাবাদ)।

আর একটী প্রবাদ এই যে, যে সময়ে ভগবান বিষ্ণু চক্রদ্বারা সতীদেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সতীর কিরীটের "ঢাক"† এই স্থানে পতিত হয় তজ্জন্য ইহা একটি উপপীঠ মধ্যে গণ্য। "ঢাক" পতিত হওয়াতেই এই স্থানের নাম ঢাকা ও অধিষ্ঠাত্রীদেবীর নাম ৺ঢাকেশ্বরী

---

* "বৃদ্ধ গঙ্গাতটে বেদ বর্ষ সাহস্র বাত্যয়ে।
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈ জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ॥
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কা বাদ্য-প্রিয়া সদাঃ।
গাস্যন্তি পত্তনং ঢক্কা সংজ্ঞকং দেশবাসিনঃ"॥
(ভঃ ব্রহ্মখণ্ড, ১৯অঃ)

† ঢাক=উজ্জ্বল গহনার অংশ বিশেষ, reflector. জরাও কাজের নীচে "ঢাক" দেওয়া হয়, তাহাতে কারুকার্য্য প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর দেখায়। "ঢাক"

হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন মহারাজ মানসিংহ বঙ্গ-বিজয় কালীন ঢাকাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় কর্ম্মকারগণের কার্য্য-নিপুনতার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া জনৈক কর্ম্মকার দ্বারা মহাকালীর একখানি হিরণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অমনি এক ব্যক্তিকে উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। পাছে কর্ম্মকার স্বর্ণ অপহরণ করে এই সন্দেহে তাহাকে একটি সুরক্ষিত কুঠরীতে বসিয়া সারাদিন কাজ করিতে হইত; সন্ধ্যাকালে কর্ম্মকার বেচারি সর্ব্ব সমক্ষে গৃহে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু, সুচতুর কর্ম্মকার রাত্রিকালেও বাড়ীতে বসিয়া হিরণ্ময়ী মূর্ত্তির অনুকরণে অপর একখানি পিত্তল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে উভয় মূর্ত্তিই মহারাজ মানসিংহের সমীপে আনীত হয়। মহারাজ মানসিংহ কর্ম্মকারের কার্য্য নিপুনতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যথেষ্ঠ পুরস্কৃত করেন; এবং হিরণ্ময়ী মূর্ত্তিটি তদীয় রাজধানীতে ও পিত্তল মূর্ত্তিটি এই স্থানে মহা সমারোহে স্থাপিত করেন। সকলের বিশ্বাস যে এই পিত্তল মূর্ত্তিটিই ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু বস্তুতঃ মূর্ত্তিটি পিতল নির্ম্মিত নহে, উহা অষ্টধাতু নির্ম্মিত।

অধিকন্তু মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজয় কালীন ঢাকাতে আসিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেও পারে। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই তিনি চাঁদ রায় কেদার রায়কে শাসন করিতে বিক্রমপুরে আগমন করেন; কিন্তু, ঢাকায় অট্টালিকা পরিশোভিত রাজধানী তখন বর্ত্তমান ছিল কিনা? ঢাকায় মুসলমান রাজধানী তখন স্থাপিত হইলে মহারাজ মানের ঢাকায় আগমন সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারিত। সুতরাং তিনি ঢাকায় আসিয়াছিলেন কিনা তাহা অত্যন্ত সন্দেহজনক। ঢাকেশ্বরী যে মহারাজ মানসিংহের স্থাপিত নহেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ

ঢাকেশ্বরীর মন্দিরের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেই উহা যে অতি প্রাচীন তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। উহার গঠন-প্রণালী বৌদ্ধ মঠের ন্যায়। হিন্দুদেব-মন্দির বৌদ্ধ মঠের অনুকরণে গঠিত দেখিয়া ইহাকে আদৌ বৌদ্ধ মন্দির পরে হিন্দু মন্দিরে পরিণত মনে হইতে পারে। কারণ বহু বর্ত্তমান হিন্দু মন্দির আগে বৌদ্ধদিগের মন্দির ছিল, পরে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সে সকল হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয় প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা হইলে মন্দিরটি অন্যূন দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এবং মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া টেলার সাহেবও উল্লেখ করিয়াছেন।

দুর্গামঙ্গল গ্রন্থে বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে তাহা পাঠ করিলে জানা যায় ৺ঢাকেশ্বরী বাড়ীর নিকটস্থ কোনও উপবনে তাঁহার মাতাকে গর্ভাবস্থায় বনবাস দেওয়া হইলে তদীয় জননী ৺ঢাকে-শ্বরীর অনেক আরাধনা করেন। তদনুসারে তাঁহার গর্ভে বল্লালের জন্ম হয়। তিনি বনে লালিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বল্লাল হইয়াছে। মহানুভব বল্লাল ভূপতি রাজ-সিংহাসন পরিগ্রহ করিয়া বনাকীর্ণ আবর্জ্জনা সম্পূরিত উক্ত স্থানকে জনসাধারণের বাসোপযোগী করিয়া তথায় ৺ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহার সম্মুখভাগে এক অল্প-পরিসর পুষ্করিণী খনন করান; এবং তাঁহার আদেশ অনুসারেই ৺ঢাকেশ্বরীর সেবার জন্য কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতে থাকেন। ৺ঢাকেশ্বরীর বর্ত্তমান জনৈক পাণ্ডা শ্রীযুক্ত ব্রজলাল তেওয়ারী মহাশয় বলেন, এক সন্ন্যাসী পূর্ব্বে মায়ের সেবায় নিযুক্ত ছিল, এবং সন্ন্যাসীর মৃত্যুর পরে উহা তাঁহাদের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

যাহা হউক এই প্রবাদটির উপর কতক আস্থা স্থাপন করা যাইতে

করণে গঠিত, এবং মহারাজ বল্লালও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের দ্বন্দ্বের সময়েই, রাম পালে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সুতরাং বল্লালের সময়ে মন্দির নির্ম্মাণ পদ্ধতিও যে কতকটা বৌদ্ধ মঠের ন্যায় হইবে তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

সুতরাং ঢাকা নামের প্রাচীনতা প্রমাণিত হইলে ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীও যে অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্থাপিত আছেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহের কারণ নাই। আমাদের মতে ৺ঢাকেশ্বরীর মন্দির খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ৺ ঢাকেশ্বরী কতকাল হইতে এখানে আছেন তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, তবে বলা যাইতে পারে যে বল্লাল-জননী কর্ত্তৃক তিনি জনসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে সুপরিচিত হইয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

দেশীয় শিল্পচর্চ্চা সম্বন্ধে

ভাউনগরীয় অভিমত।

নিত্য-ব্যবহার্য্য শিল্প বিষয়ে ভারত বড় পশ্চাৎপদ, একথাটা আজকাল শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই কিছু কিছু অনুভব করিতেছেন; এবং এই অবস্থার প্রতিকার-কল্পে নানাবিধ উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছে; সে গুলির কিছু কিছু আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পারিত তবে কেহই তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু আমাদের দেশে তাদৃশ বৃহৎ কর্ম্মশালা (factory) প্রতিষ্ঠা-উপযোগী মূলধন কোথায়? অর্থের অভাব যে বড় বেশী তাহা নহে কিন্তু যাহারা সে অর্থের ঐরূপ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের হাতে সে অর্থ নাই; তাহারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন, একটা বৃহৎ কারখানা চালাইবার উপযোগী অর্থ কাহারও নাই। তবে দশ জন মিলিয়া চাঁদা করিয়া হয়তো সে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে, সুতরাং যৌথ কারবার (Joint Stock Company) আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু যতদূর দেখা গিয়াছে যৌথ কারবার চালাইবার উপযোগী শিক্ষা আমাদের হইয়াছে মনে হয় না। পরস্পরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এত অল্প ও ঈদৃশ বৃহৎ ব্যাপারের পরিচালন শক্তি আমাদের এত অল্প যে ফলে আমাদের সমস্ত আরব্ধ যৌথ কারবার গুলি পরিচালনার বিশৃঙ্খলা এবং সততার অভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং যৌথ কারবার করিয়া বৃহৎ কারখানা পরিচালন করার চেষ্টা এখন কিছুদিন আমাদের না করাই ভাল মনে হয়। বিশেষতঃ গুটিকয়েক কারবার নষ্ট হওয়ায় আমাদের দেশের লোকের যৌথ কারবারের উপর শ্রদ্ধা একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ দেশব্যাপী সন্দেহ বহন করিয়া কোনও বিপুল কারবার চলিতে পারে না।

এই কথা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে আমাদের শিক্ষার অভাবই এই প্রকার ব্যবসায়ে বিফল-প্রযত্ন হওয়ার কারণ। সুতরাং দেশব্যাপী শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। সুপরিচিত পার্শী সার মান্‌চরজী ভাউনগরীর* ইহাই অভিমত। তাঁহার মতে উন্নত-শিক্ষা

* পাঠকগণকে একটা কথা জানাইয়া রাখি। এই পার্সিপ্রবরকে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ 'Punch' পত্রিকা নাম দিয়াছেন—"Mr. Bow-(much)-and-agree," —ইহাঁর উপরওয়ালাদের মতে সায়-দেওয়া-প্রকৃতিটি এতই সর্ব্বজনবিদিত, এবং

প্রাপ্তি দেশের শিল্পের পরিসর প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়; সুতরাং ইহা বিদূরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দেশব্যাপী বিশাল শিল্পশিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত কর। এই প্রস্তাবের দুইটী অর্থের পৃথক আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম কথা উন্নত শিক্ষা-পদ্ধতি দেশীয় শিল্পের পক্ষে হানিকর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যুক্তি দুইটী। সার মানচরজী বলেন যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে রুচি বিগড়িয়া যায়, দেশীয় অপরিচ্ছন্ন জিনিস আর তাহার ভাল লাগে না; বিলাতি সুদৃশ্য জিনিস না হইলে তাহার মন ওঠে না; এই প্রকারে দেশীয় শিল্পগুলি ক্রমে অনাবশ্যক হইয়া মারা যাইতেছে। দৃষ্টান্তঃ—শিক্ষিত লোকে আর খড়ম পায়ে দেয় না, বিলাতি জুতা না হইলে চলে না। কথাটা অংশে সত্য বটে; কিন্তু এ সম্বন্ধে দুটি আপত্তি আছে। প্রথমতঃ আজকাল উচ্চশিক্ষার একটু বিপরীত ফল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় উচিত মূল্যে ব্যবহারোপযোগী দেশী দ্রব্য পাইলে বিলাতী অপেক্ষা তাহার বেশী সমাদর করে। ফলে গুটিকয়েক নব্য দেশীয় শিল্প উদ্ভূত হইয়াছে। খড়ম অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে বটে কিন্তু আজকাল খুব ভাল ভাল জুতা এদেশে প্রস্তুত হইতেছে এবং শিক্ষিত লোক তাহার যত আদর করিবেন ততই তাহা বাড়িয়া চলিবে। সুতরাং উচ্চশিক্ষা নীচ শিল্প উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে উন্নততর শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। এ হিসাবে উচ্চশিক্ষা নিন্দনীয় নহে।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে উচ্চশিক্ষায় কতকগুলি "ভদ্রলোকের" সৃষ্টি করিতেছে এবং যাহারা শিল্পচর্চ্চা দ্বারা দেশের এবং নিজের উন্নতি সাধন করিতে পারিত এই প্রকার কতকগুলি লোককে শিল্পানুশীলন হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। এ কথার অর্থ যদি ইহাই হয় যে উচ্চশিক্ষায় কোনও লাভ নাই এবং শিল্পের চর্চ্চামাত্রই একমাত্র লাভজনক কর্ম্ম তবে

মনের যে বিস্তার সম্পাদন করে তাহার সহিত তুলনীয় জগতে অপর কিছু আছে কিনা জানি না। এবং যথার্থ উচ্চশিক্ষা মনের যে বিস্তৃতি সম্পাদন করে তাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে করিতে পারে। আর এক কথা, বর্ত্তমান কালে উচ্চশিক্ষার প্রধান অর্থ বিজ্ঞান শিক্ষা। উন্নত প্রণালীর বিজ্ঞান চর্চ্চা যে শিল্পচর্চ্চার মজ্জাস্বরূপ একথা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। শিল্পী উচ্চ বিজ্ঞান শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইয়াও অথবা তাহা অল্পমাত্র জানিয়াও অভ্যাস বশতঃ অক্লেশে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু যদি দেশের শিরোভূত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা না থাকে, যাঁহারা অলক্ষ্যে শিল্পের জীবন দান করেন তাঁহারা যদি বিজ্ঞানকে বিসর্জ্জন করেন তবে সেই শিল্পের জীবন ক্ষণস্থায়ী হইয়া পড়ে। উপযোগী পরিবর্ত্তন অভাবে শিল্পের পদ্ধতি পুরাতন হইয়া পড়িবে এবং ক্রমশঃ তাহার অপকর্ষ সাধিত করিবে ও বিজ্ঞানালোকিত বিদেশী ব্যবসায়ী ক্রমে আসিয়া দেশীয় শিল্পের অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন করিবে।

সুতরাং উচ্চশিক্ষা কোনও ক্রমে বর্জ্জনীয় নয়, উচ্চশিক্ষা শিল্পের উপকারী বন্ধু, শত্রু নহে। তবে হয়তো অর্দ্ধশিক্ষা হানিকর হইতে পারে। কিন্তু এটাও ভুল বিশ্বাস। যদি শিক্ষা বাস্তবিক শিক্ষা হয় তবে তাহার যতটুকুই হউক না কেন তাহা নিষ্ফল নহে। আজ কাল ইহা নির্দ্ধারিত সত্য যে শিক্ষিত শ্রমজীবী (তাহার বিদ্যার দৌড় যতদূরই হউক না কেন) অশিক্ষিত শ্রমজীবী অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে করিতে পারে।

তবে উচ্চশিক্ষার প্রতি এ বিদ্বেষ কেন? ইহার কারণ এই যে উচ্চশিক্ষায় কতকগুলি ভদ্রলোকের সৃষ্টি করিতেছে। অল্পমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি কোনও প্রকার শিল্পে শ্রমজীবীস্বরূপে নিযুক্ত হইতে ঘৃণা বোধ করে। সুতরাং বোধ হয় কতকগুলি লোককে উচ্চশিক্ষা হইতে নিরস্ত

করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু কাহাকে নিবৃত্ত করিবে? কি উপায়ে নিবৃত্ত করিবে? যে উপায় উদ্ভাবন কর না কেন তাহাতে অযথা এক শ্রেণীর লোকের উপর অত্যাচার করা হইবে।

আমার মনে হয় উপযুক্ত শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে এ অভিযোগ দূর হইতে পারিবে। দিন কাল যেমন পড়িয়াছে, লোকে ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছে উচ্চশিক্ষার কি মর্য্যাদা; সুতরাং সম্যক্‌রূপে শিল্পশিক্ষার উপায় করিতে পারিলে ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে যাহারা অর্থের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতে আইসে তাহাদের অনেকে শিল্পশিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে এবং শিল্পচর্চ্চায় অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে ক্রমে ভদ্রসমাজও শিল্পশিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে। আর এক কথা, অজ্ঞ শিল্পজীবীকে আমরা যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখি শিক্ষিত শিল্পীকে সেরূপ দেখিব না।

সুতরাং উচ্চ শিক্ষা আবশ্যক হইলেও সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষাও আবশ্যক। শিল্পশিক্ষাই আমাদের দেশের প্রধান অভাব। সুতরাং একটা বৃহৎ শিল্পশিক্ষা যজ্ঞের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক।

শিল্পশিক্ষার এই প্রস্তাবের আলোচনা দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) কোন্ শিল্প শিক্ষা দিবে? (২) কি উপায়ে শিক্ষা দিবে? শিক্ষার উপায় অবশ্যই নির্ব্বাচিত শিল্পের প্রকৃতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে; কিন্তু মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে বিদ্যালয়ে আদর্শ দ্বারা শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা কর্ম্মশালায় "হাতে কলমে ধরিয়া" শিক্ষা প্রদান শিল্পীর পক্ষে বেশী উপকারী। স্বীকার করি শিল্পশিক্ষার অন্ততঃ দুইটি স্তর আছে; নিম্ন স্তরের শিক্ষা মোটামুটী কাজের জন্য, তাহাতে কোনও কার্য্যের অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্বগুলি বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক করে না; অপর স্তরে এগুলি জানা শিল্পের ও শিল্পীর উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমি বলি

যে এই উন্নত শিক্ষা ব্যাপারেও আদর্শ প্রয়োগ (models, experiments) অপেক্ষা প্রকৃত বস্তু দেখাইয়া সতত্ব শিক্ষা প্রদান শিল্পীর পক্ষে উপকারী হইবে। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে (laboratory) বিজ্ঞানের সম্যক চর্চ্চা হইতে পারে কিন্তু শিল্প তাহা হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিবে না। সুতরাং যে কোনও রূপ শিল্প আমরা শিক্ষা দিই না কেন তাহা বিদ্যালয়ে না দিয়া ব্যবসায়োপযোগী কর্ম্মশালায় শিক্ষাগার স্থাপন করিয়া সেইখানে শিক্ষানবীস = (apprentice) দিগকে শিক্ষা প্রদান করিব।

কিন্তু কোন্ শিল্প অনুশীলন করিব, কাহাকে শিক্ষা দিব ? শিক্ষয়িতব্য শিল্পের নির্ব্বাচনে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। প্রথম আরম্ভের পক্ষে শিল্প নির্ব্বাচন করিতে আমাদের গুটিকতক কথা মনে রাখা দরকার। আমাদের দেশে আজকাল শিল্পচর্চ্চার প্রবৃত্তি উৎপাদিত করাই প্রথম আবশ্যক। সুতরাং আমাদের শিল্প নির্ব্বাচন ব্যাপারে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার যে তাহা ফেল পড়িয়া এই প্রবৃত্তি একেবারে বিনষ্ট না হয়। যেমন কোনও ব্যবসায়কে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখিলে সমগ্র জাতির মধ্যে সেই শিল্পানুশীলনে যেরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইবে ঠিক তেমনি কোনও ব্যবসায় ফেল পড়িলে জাতীয় প্রবৃত্তি বহুকালের জন্য দমিয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করা উচিত যাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কাজে কাজেই কোনও অপরিজ্ঞাত শিল্প অবলম্বন না করিয়া যাহা দেশে প্রচলিত আছে এরূপ কোনও শিল্প অবলম্বন করিতে হইবে ; এবং তাহাতে যত কিছু উন্নতি সাধন সম্ভব তাহা করিয়া তাহাতে নবজীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই নূতন কারখানায় শিক্ষানবিস উন্নত পদ্ধতির শিল্প শিক্ষা করিবে।

আমাদের প্রথম অবলম্বনীয় ব্যবসায়; তাহার পর শিল্পের মধ্যে তন্তুবায়ের ও কুম্ভকারের ব্যবসায়ের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন্ত শিল্পের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করা সঙ্গত। লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসায় এবং ক্রমশঃ লৌহমিশ্র পদার্থ (ores) হইতে লৌহ বাহির করা, এগুলিও সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বন করা যাইতে পারে।

লৌহের কারবার খুব বড়ই হইবে এবং তাহাতে কি উপায়ে অ্যাপ্রেণ্টিস রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে তাহা অনেকটা বুঝা যায়, কিন্তু বস্ত্র বয়ন ও হাঁড়ী গড়ার ন্যায় ছোট শিল্প এবং কৃষিকার্য্য কি প্রকারে কারখানায় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে একথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। আমি কৃষিকার্য্যকে দৃষ্টান্তস্বরূপ লইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। বস্ত্রবয়নের যেমন অনেক নূতন নূতন যন্ত্র আবিস্কৃত হইয়াছে, মৃৎপাত্র গঠনের যেমন নূতন নূতন উন্নত পদ্ধতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের অনুকম্পায় কৃষিকার্য্যেও তেমনি অনেক নূতন নূতন প্রক্রিয়ার উপ-যোগীতা অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু গরীব চাষা তাহা জানে না, জানিলেও উপায়াভাবে সে সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে পারে না। হয়তো তাহার অর্থ অল্প, হয়তো ক্ষেতগুলি ছোট ছোট ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রক্ষিপ্ত; এইরূপ নানা কারণে সে সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হইতে নিবারিত হইতে পারে। যদি একজন বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তি যাইয়া এক স্থানের সমস্ত কৃষাণগুলিকে একত্র করিয়া সকলের দ্বারা তাহাদের সেই যুক্ত জমী কর্ষণ করে তবে সে অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া গুলি তাহাতে প্রয়োগ করিতে পারে; কারণ প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে এখানে একটি বিশাল অবিচ্ছিন্ন জমী হইতেছে। তাহাতে সেই প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে; এবং প্রত্যেকের ক্ষুদ্র সম্বলে যাহা তাহারা করিতে

নূতন প্রক্রিয়া ও নূতন যন্ত্র প্রয়োগে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এই সংযোগের ফল (co-operation) তাহারা কতক নিজেদের মধ্যে বাঁটিয়া লইবে কতক বা একটা সাধারণ গোলায় জমা রাখিবে।

এই প্রকার একটা বৃহৎ কারবারে বহুবিধ শিক্ষনীয় তত্ত্ব আছে, বহুবিধ যন্ত্র ও প্রক্রিয়া আছে, সেগুলির শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা কোনও প্রকারেই অসম্ভব নয়। তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতির ব্যবসায়েও এই প্রকার শ্রম-সংযোগ (co-operation) দ্বারা প্রভূত উপকার হইতে পারে। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে ইহাতে অধিক অর্থ আবশ্যক করে না। যে মূলধনটা খাটিতেছে সেইটিকে গুছাইয়া খাটাইতে পারিলেই চলে, হয়তো আর কিছু অল্প যোগ আবশ্যক। সুধু চাই শিক্ষিত লোকদিগের উদ্যোগ এবং উৎসাহ।

সুতরাং শ্রম-সংযোগের দ্বারা শিল্পের উন্নতি ও শিল্পশিক্ষা বিধান করা যাইতে পারে এবং ইহা অল্পায়াস সাধ্য। এইরূপ শ্রমসম্মিলনের বিস্তারিত বিবরণ সময়ান্তরে দিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে প্রসঙ্গক্রমে যতদূর বলিয়াছি তাহাই বোধ করি যথেষ্ট হইবে।

এই গেল শিল্প ব্যবসায়ীর কথা; কিন্তু সকলেই কিছু শিল্প ব্যবসায় অবলম্বন করিতে যাইতেছে না। যাঁহারা অপরাপর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের দ্বারা শিল্পের কি উপকার সম্ভব হইতে পারে? তাঁহারা কোন্ কার্য্য দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারেন? তাঁহারা যদি সকলে বিদেশীদ্রব্যের ব্যবহার পরিহার করেন তবে তাঁহারা দেশীয় শিল্পের বিস্তর উপকার করিতে পারেন একথা সকলেই বলিয়া থাকেন। নানা কারণে আমি এ পদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না; তবে যতদূর সম্ভব অযথা অধিক ব্যয় না করিয়া দেশীয় বস্তু বিলাতীর

আমেরিকা এবং জাপানে তাহা হইয়াছে। কিন্তু কথাটা বলা যতদূর সহজ, কাজে ততদূর সহজ নহে। আমি জানি অধিক ব্যয় না করিয়াও বিলাতীর পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য অনেক দেশীয় দ্রব্য আজকাল পাওয়া যায়; কিন্তু না হয় প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু সেই দ্রব্য পাইব কোথায়? কলিকাতার মত এত বড় সহরে দেশীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার দুইটি কি তিনটি দোকান আছে, মফঃস্বলে তো সে সবের কথাই নাই। সুতরাং স্বদেশী দ্রব্যের সরবরাহের ব্যবস্থা সম্যকরূপে না করিতে পারিলে প্রতিজ্ঞা কার্য্যকারী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

কিন্তু ইহা কি উপায়ে করা যাইতে পারে? আমার মনে হয় এখানেও শ্রমসংযোগ বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে। মনে কর একটি সহরের দশজন কর্ম্মচারী মিলিয়া একটি যৌথ ভাণ্ডার করিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহারা বন্দোবস্ত করিলেন তাঁহারা দেশীয় বস্তুই ব্যবহার করিবেন। এই ভাণ্ডারে নানাবিধ সর্ব্বদা ব্যবহারের দেশীয় দ্রব্য থাকিবে। ভাণ্ডার হইতে তাঁহারা সকল জিনিষই ক্রয় করিবেন; অন্য লোকেও যেটা সুবিধাজনক মনে করে কিনিবে। কিন্তু নগদ মূল্যে সকলেই ক্রয় করিবেন ইহ নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। নগদ মূল্যের কারবারে অনেক সুবিধা আছে, তাহার মধ্যে একটি এই যে যখন যে জিনিষটির দরকার তৎক্ষণাৎ আমদানী করা যাইবে, টাকার জন্য বসিয়া থাকিতে হইবে না; মোটের উপর মূলধনটা সমস্তই খাটিবে। অংশীদারের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক অংশীদারকে কার্য্যের তত্ত্বাবধারক হইতে হইবে; ক্রেতাগণের মধ্যে লাভের এক অংশ বিভক্ত হইবে; কর্ম্মচারী অংশীদারগণ এক অংশ লইবেন এবং এক অংশ কারবারের মূলধন বর্দ্ধিত করিবে।

এই উপায়ে যৌথ ভাণ্ডার পরিচালনা করিলে সম্যকরূপে লাভবান হইবার প্রত্যাশা করা যায়। [illegible]

প্রধানতঃ নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার উপযুক্ত করা উচিত। ক্রমে ব্যবসায় ফাঁপিয়া উঠিবে। চুরী না হইতে পারে এজন্য প্রত্যেক জিনিষ আমদানী হইবামাত্র অংশীদারগণ সম্মিলিত হইয়া তাহার দাম কষিয়া দিবেন এবং প্রত্যেক দ্রব্যের রসীদ দিয়া তাহার ডুপ্লিকেট যাহাতে রাখা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই ডুপ্লিকেট মিলাইয়া সমস্ত দ্রব্য ও অর্থের হিসাব করিবেন। এটা মনে রাখা আবশ্যক যে শৃঙ্খলাই এরূপ ব্যবসায়ের জীবন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মফস্বলে এই প্রকার ভাণ্ডার খুলিলে যে কেবল দেশীয় দ্রব্যের কাটতি বেশী হইবে তাহাই নহে, সেই ব্যবসায়াবলম্বী ভদ্রলোকদিগের অবস্থাও প্রভূত পরিমাণে উন্নত হইয়া চলিবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

জাপানে ভারতীয় ছাত্র।

কিছুকাল পূর্ব্বে চীনের সহিত জাপানের যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল সেই যুদ্ধে চীন পরাভূত হইয়াছিল; বিশাল বাহিনী ও বহু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াও চীন নব বাহুবলদৃপ্ত জাপানের নবশক্তির নিকট হীনতা স্বীকার করিয়াছিল; সেই সময় হইতেই সূর্য্যকরোজ্জ্বল জাপানের প্রতি বহির্জ্জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে জাপানীগণ পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিসমূহের মধ্যে অন্যতম বলিয়া

হইতেই জানিতে সমুৎসুক হইলেন, যে 'অসভ্য জাপান' কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ব্বরের রাজ্য বলিয়া সভ্যতার ইতিহাসে স্থান লাভ করিতে পারে নাই, কিছুদিন পূর্ব্বেও যাহাদের জাতীয় জীবনের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান ছিল না, বহিঃপৃথিবীর অনন্ত-কর্ম্ম-সমুদ্রের তরঙ্গরাশি যাহাদিগের মাতৃভূমিকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই, সেই জাপানবাসী সহসা কোন্ ইন্দ্রজালে নবজীবন লাভ করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি সমূহের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইল! তাঁহারা অল্পকালের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অদ্ভুত পারদর্শিতা, সুগভীর শিল্পানুরাগ এবং স্বদেশোৎপন্ন সামগ্রীর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ জাপানের এই দ্রুত-উন্নতির কারণ। জাপানের এই নবজাগ্রত জীবনের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়া ও সেখানে কিছুকাল যাপন করিয়া আসায় বিশেষ ব্যয়বাহুল্য নাই জানিতে পারিয়া, আমাদের দেশের উন্নতি-প্রার্থী উদ্যমশীল যুবকগণ জীবনদ্বন্দ্বের আবশ্যকানুরূপ শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থ জাপানই উপযুক্ত স্থান বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। সুদূরবর্ত্তী বহুব্যয়সাধ্য ইউরোপের পরিবর্ত্তে অদূরবর্ত্তী অল্পব্যয়সাধ্য জাপান শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র ভাবিয়া সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আমরা বিগত ভাদ্রমাসের 'ভারতী'তে 'ভারতবাসীর জাপানে শিল্প শিক্ষা' সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য প্রকাশ করার পর এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে সমুৎসুক পাঠকদের নিকট হইতে বহু প্রশ্নের দ্বারা অভিপ্লাবিত হইয়াছি। তন্মধ্যে প্রবীন জিজ্ঞাসার উত্তর—অর্থাৎ—এ পর্য্যন্ত যে সকল ভারতীয় ছাত্র জাপানে গিয়াছেন তাঁহাদের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

যে ভারতীয় ছাত্র জাপান যাত্রার সর্ব্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক, তিনি

জাতি ভারতের সর্ব্বশেষ স্বাধীন জাতি, তাঁহাদের সেই স্বাধীন জীবনের স্পন্দন এখনও একেবারে থামিয়া যায় নাই, সুতরাং তাঁহাদেরই কোন উদ্যমশীল যুবক যে সর্ব্বপ্রথমে এই পথে অগ্রসর হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি, ইহা তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রেরই বিশেষত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই মরাঠা যুবকটির নাম শ্রীযুক্ত কে, ভি, কুলকারনী ;—যে সময় তিনি বরোদার মহারাজার প্রতিষ্ঠিত কলাভবনে শিল্প শিক্ষা করিতেছিলেন সেই সময়ে তিনি জাপানের শিল্প বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া জাপান যাত্রার সংকল্প করেন, কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিরূপে তিনি প্রবাসজীবনের ব্যয়ভার বহন করিবেন, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি বরোদার মহারাজা সার সয়াজিরাও গায়কবাড়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, শিল্পবিজ্ঞানে মহারাজার বিশেষ অনুরাগ সত্ত্বেও মিঃ কুলকারনী সেখানে সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোদ্যম হইলেন না, মিঃ কুলকারনী সেখান হইতে কোহ্লাপুরের রাজদরবারে তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, মহারাষ্ট্রকুলরবি ছত্রপতি মহারাজা শিবাজীর বংশধর তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মিঃ কুলকারনীর সাহায্যকল্পে বার্ষিক চারিশত টাকার এক বৃত্তি দুই বৎসরের জন্য মঞ্জুর করিলেন, অন্যান্য কতিপয় স্বদেশহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তির নিকটও তিনি বার্ষিক দুইশত টাকা সাহায্য লাভ করিলেন, তিনি স্থির করিলেন এই ছয় শত টাকাতেই জাপানে তাঁহার ও তাঁহার একটি পরিচারকের বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে ; অনন্তর মিঃ কুলকারনী বোম্বে আসিয়া তত্রত্য জাপানী কন্সলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন, বার্ষিক ছয় শত টাকায় জাপানে দুই জন

নিরুৎসাহ হইলেন না, তিনি স্থানান্তরে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং গোয়ালিয়রে আসিয়া গোয়ালিয়রের মহারাষ্ট্র ভূপতির সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মহারাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, বিদ্যোৎসাহী মহারাজা মিঃ কুলকারনীর উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনানুসারে মাসিক একশত পঁচিশ টাকার বৃত্তি ও সহস্র মুদ্রা পাথেয় প্রদানে সম্মত হইলেন, ছয় মাসের বৃত্তি ও পাথেয় তাঁহাকে তখনই প্রদান করা হইল। গোয়ালিয়রপতির নিকট এই বৃত্তি লাভ করিয়া মিঃ কুলকারনী কোহলাপুরের মহারাজ প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ এবং জি, এস্, পরাঞ্জপে নামক একটি দরিদ্র কিন্তু অধ্যবসায়ী মরাঠা যুবককে পরিচারকরূপে লইয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে একখানি ইতালীয় জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক জাপান যাত্রা করিলেন। জাপানে উপস্থিত হইয়া মিঃ কুলকারনী টোকিয়োর ইম্‌পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় সংস্পৃষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিশেষ ছাত্ররূপে খনিবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। জাপানের এই ইনজিনিয়ারিং কলেজে নয়টি বিভিন্ন বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগে তিন বৎসর করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহার পর পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে সাধারণ ছাত্রগণ 'কোজা কুশি' (Koja-Kushi) নামক উপাধি লাভ করে, এই উপাধিটি এ দেশী ইনজিনিয়ারিং কলেজের 'লাইসেনসিয়েট সিভিল ইনজিনিয়ারিং' (L. C. E.) নামক উপাধির সমকক্ষ। মিঃ কুলকারনী জাপানের এই ইনজিনিয়ারিং কালেজে সাধারণ ছাত্ররূপে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, জাপানী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহই সাধারণ ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিতে পারে না, কিন্তু তাহাতে এদেশী শিক্ষার্থিগণের কোন ক্ষতি নাই, কারণ জাপানী ছাত্রগণের বৃত্তি সম্বন্ধীয় কতিপয় অধিকার ও

ধিকার ভিন্ন বৈদেশিক ছাত্রগণের সহিত তাহাদের আর কোনই বৈষম্য নাই; বিশেষ ছাত্রের ও সাধারণ ছাত্রের আর সকল বিষয়েই সমান অধিকার। মিঃ কুলকারনী সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ছাত্র বলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মিঃ কুলকারনী বিশেষ পারদর্শিতার সহিত তাঁহার আরব্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। শিক্ষা শেষ হইলে তিনি আরও ছয় মাস কাল জাপানের কয়লা ও কেরোসিন তৈলের খনি সমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। অনন্তর ১৯০১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গোয়ালিয়র রাজ্যে জরিপ বিভাগের সহকারী সুপারিনটেন্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; এখন তিনি দুইশত টাকা মাসিক বেতন ও ভাতা লাভ করিতেছেন। মিঃ কুল-কারনী গোয়ালিয়ার রাজ্যের খনিজ পদার্থ-বিষয়ক অর্দ্ধ-বার্ষিকী রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, এই রিপোর্ট পাঠ করিয়াই মহারাজা বুঝিতে পারিয়া-ছেন তিনি অযোগ্য পাত্রে ভার ন্যস্ত করেন নাই।

জি, এস্, পরাঞ্জঁপে নামক যে অধ্যবসায়ী গরীব ছাত্রটি মিঃ কুলকারনীর পরিচারকরূপে জাপান যাত্রা করিয়াছিল, সে মিঃ কুলকারনীর ভাত রাঁধিয়া বা রুটী পাকাইয়াই সময় নষ্ট করে নাই, টোকিয়োর উচ্চশ্রেণীর শিল্প বিদ্যালয়ে সে রসায়ন বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে সাবান প্রস্তুত প্রভৃতি আরও দুই একটী অর্থকরী শিল্পশিক্ষায় সে মনোযোগী হয়। কিন্তু অর্থাভাবে কিছুদিন পরেই তাহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়, শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার আর তাহার সুবিধা হইল না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পরাঞ্জঁপে দেশে ফিরিয়া বোম্বের কোন ভদ্রলোকের সহিত অংশে পারেল নামক স্থানে এক সাবানের কারখানা খুলিয়াছে, এই কারখানাই এখন Di...

এই কারখানার সাবান প্রদর্শিত হইয়াছিল, এই কারখানার সাবান এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে ইহা প্রদর্শনী হইতে রৌপ্য পদক লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রের পর বঙ্গভূমি জাপান যাত্রায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। জাপানে ভারতবাসী তৃতীয় ছাত্র বাবু রমাকান্ত রায়। তিনি জাপানে উপস্থিত হইয়া মিঃ কুলকারনীর সহিত এক বিদ্যালয়ে খনিবিদ্যা বিষয়েই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে মিঃ কুলকারনী লৌহখনি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন, রমাকান্তবাবু কয়লার খনিতেই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। রমাকান্তবাবু ডিপ্লোমা লাভ করিয়া প্রায় এক বৎসরকাল সুবিখ্যাত মাটসুই কয়লা খনিতে হাতে কলমে কাজ শিখিয়াছেন।

জাপান প্রবাসী চতুর্থ ভারতীয় ছাত্রটি দক্ষিণাপথবাসী মরাঠা যুবক, কোহলাপুরে তাহার বাস, নাম মিঃ জি, এস্, সালিগ্রাম। মিঃ কুলকারনী গোয়ালিয়রের মহারাজার নিকট আশানুরূপ বৃত্তি লাভ করিয়া কোহলা-পুরের মহারাজা প্রদত্ত বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করিলে মিঃ সালিগ্রাম সেই বৃত্তি লাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজদরবারের বৃত্তি কেবল আবেদন মাত্রেই লাভ হয় না, সেজন্য অনেক আয়োজন করিতে হয়, অনেক রকম জোগাড় যন্ত্র চাই, মিঃ সালিগ্রাম বোধ করি সেরূপ জোগাড় যন্ত্র করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাই তিনি মিঃ কুলকারনীর প্রত্যাখ্যাত বৃত্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি ভগ্নমনোরথ না হইয়া ব্যয় সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অবশেষে অমরাবতী ও কোহলাপুরের কতিপয় সহৃদয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চাঁদা করিয়া তাঁহার পাথেয় ও এক বৎসরের ব্যয়ের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেন। তাঁহার দ্বিতীয় বর্ষের ব্যয়ও তাঁহার বন্ধুগণ চাঁদা করিয়া তুলিয়া-

তাঁহাকে এখনও এজন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ১৮৯৯ অব্দের এপ্রিল মাসে মিঃ সালিগ্রাম একখানি জাপানী ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া জাপান যাত্রা করেন। জাপানে উপস্থিত হইয়া প্রথম দুই তিন মাস তিনি জাপানী ভাষা শিক্ষায় মনঃসংযোগ করেন, তাহার পর তিনি টোকিয়োর উচ্চ শ্রেণীর শিল্প বিদ্যালয়ে (Higher Technological School) রাসায়নিক শিল্প বিভাগে প্রবেশ করেন, রসায়ন বিদ্যা শিখিয়াও অবসরকালে তিনি তৈল, রঙ্গ ও বার্ণিস ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত কলেজ সমূহ অপেক্ষা এই শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্রম নিম্ন হইলেও হাতে কলমে এখানে অনেক শিখিতে পারা যায়। শিক্ষা সমাপ্ত করিতে তিন বৎসর সময় লাগে, কিন্তু ভারতীয় ছাত্রগণ শেষ ছয়মাস বাদ দিলেও পারেন। ১৯০১ অব্দের জুন মাসে মিঃ সালিগ্রাম শিক্ষার পারদর্শিতা স্বরূপ ডিপ্লোমা লাভ করেন, তাহার পর কিছুকাল একটা তৈলের কারখানায় কাজ শিখিয়া সেই বৎসর অক্টোবর মাসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কোহলাপুরের মেসার্স কে, জি, গাড্‌গিল কোম্পানীর সহিত মিশিয়া তিনি এখন নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য ও রঙ্গ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত আছেন, আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে মিঃ সালিগ্রাম এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন। বিলাতী ল্যাভেণ্ডার ও ফরাসী অডিকলোন দেশীয় কুপ্পে ভর্ত্তি হইয়া আমাদের দেশী পারফিউমারগণের যে 'ওরিজিনালিটী' পরিব্যক্ত করিতেছে, মিঃ সালিগ্রামের চেষ্টা ও যত্নে তাহার মৌলিকতার গর্ব্বহ্রাস হইলেই, তিনি দেশের অনেক উপকার করিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। মিঃ সালিগ্রামই টোকিয়স্থ উচ্চ শ্রেণীর শিল্প বিদ্যালয়ের একমাত্র ভারতীয় গ্রাজুয়েট্।

তম্বত নামক আর একটি দক্ষিণাপথবাসী যুবক জলগাঁওয়ের কয়েকজন সদাশয় ভদ্রলোকের সাহায্য পাইয়া দেশলাই নির্ম্মাণ শিক্ষা ও দেশলাইয়ের কলকারখানা পরিদর্শনের অভিপ্রায়ে জাপান যাত্রা করেন। ইনি বোম্বে ভিক্টোরিয়া জুবিলি শিল্প বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র—L. M. E. পরীক্ষায় তিনি পাশ করিয়াছিলেন। মিঃ তম্বত জাপানে প্রায় পনের মাস দেশলাইয়ের কলে কাজ শিক্ষা করেন। তিনি কেবল দেশলাই নির্ম্মাণেই তাঁহার সকল সময় ব্যয় করেন নাই, ছত্র নির্ম্মাণ ও আরও কতিপয় সাধারণ অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কয়েকটি হাত কলের নমুনাও লইয়া আসিয়াছেন। ১৯০০ অব্দের জুন মাসে তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া মিঃ কে, জি, গোখলের সহিত অংশে একটি দেশলাইয়ের কারখানা খুলেন; মিঃ গোখলেও সুশিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং এই দুইজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগে যে দেশলাইয়ের কারখানাটি বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে তাহার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, বিশেষতঃ এই কারখানাটি সুরাটের সন্নিকটে গায়কবাড়ের সীমান্তবর্ত্তী ভায়েরা নামক স্থানে সংস্থাপিত হওয়ায় গায়কবাড় মহারাজা নানাভাবে ইহার সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কারখানাটি প্রথমে বিশেষ উন্নতি দেখাইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে অবশেষে মিঃ গোখলের সহিত মিঃ তম্বতের বনিবনাও হইল না, তাঁহারা বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়াছেন। এমন দুইজন যোগ্য ব্যক্তি একযোগে একটা কারখানা চালাইতে পারিলেন না, ইহা ভারতের জাতীয় জীবনের দৌর্ব্বল্যের সূচনা করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

১৯০০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে দুইটি শিখ যুবক শিক্ষা লাভের জন্য জাপান যাত্রা করেন; অমৃত বাজার পত্রিকায়

গুলি কথা প্রকাশিত হইলে, তৎপ্রতি শিখদিগের আমলওয়ালিয়া নামক সম্প্রদায়স্থ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, স্ব সম্প্রদায়স্থ যুবকগণকে জাপানে শিক্ষিত করিলে দেশের ও স্বজাতির মঙ্গল আছে বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন, তদনুসারে তাঁহারা নিজের সম্প্রদায়ের ভিতর চাঁদা তুলিয়া এই সৎসংকল্পে একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করেন, অল্প দিনের মধ্যেই এই ভাণ্ডারে ছয় সহস্র টাকা জমিয়া গেল। এই টাকা দিয়াই তাঁহারা উক্ত শিখ যুবকদ্বয়কে জাপানে প্রেরণ করেন, যুবকদ্বয়ের নাম পুরাণ সিং ও দামোদর সিং। পুরাণ সিং তখন লাহোর কলেজে বি, এ, পড়িতেছিলেন, দামোদর সিং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই যুবকদ্বয় জাপানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে মেকানিকেল ইন্‌-জিনিয়ারিং ও কাচ নির্ম্মাণ বিদ্যা শিখিতে অভিলাষী হন, কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন যে বোম্বে নগরেই মেকানিকেল ইন্‌জিনিয়ারিং শিখিতে পারা যায় এবং কাচ নির্ম্মাণ বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া কোন লাভ নাই কারণ ভারতে কাচের কারবার নানা কারণে চলিতে পারে না, তখন সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া মিঃ পুরাণ সিং টোকিয়োর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজে ভৈষজ্য বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করিলেন। এখন তিনি সুবিখ্যাত রসায়ন বিদ্যাবিৎ ডাক্তার নাজাই (Ph. D.) মহোদয়ের শিক্ষাধীনে আছেন, ডাক্তার নাজাই জাপানবাসী হইলেও তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন। মিঃ দামোদর সিং বৈদ্যুতিক ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। আর দুই বৎসরের পর এই পঞ্জাবী যুবকদ্বয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে।

এই শিখ যুবকদ্বয়ের জাপান যাত্রার পর দুইজন বাঙ্গালী যুবক জাপানে গমন করেন, তাঁহাদের একজন মিঃ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয়ের নাম মিঃ সরোজেন্দ্র গুহ ; এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি উদ্দেশ্যে জাপান যাত্রা

করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত। কারণ তিনি কোন বিদ্যা না শিখিয়াই পাঁচ ছয় মাস পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, দ্বিতীয় যুবকটি জাপানে সাবান নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সংবাদ পত্রে পাঠ করা গিয়াছে তিনি ময়মনসিং জেলায় এক সাবানের কারখানা খুলিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। শুনিতেছি পঁচিশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া এই কারখানার কাজ আরম্ভ হইবে, মুলধন আড়াই হাজার অংশে বিভক্ত হইবে, প্রত্যেক অংশের মূল্য হইবে দশ টাকা। আমরা আশা করি দেশের ধনবান সম্প্রদায় কতকগুলি করিয়া অংশ ক্রয় পূর্ব্বক এই স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ মুক্ত করিবেন। উপযুক্ত অর্থাভাবে যদি সরোজেন্দ্র বাবুর শিক্ষা নিষ্ফল হয় তাহা হইলে আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। দশ টাকা দিয়া এক একটি শেয়ার ক্রয় করেন, এ নির্ধন বাঙ্গালা দেশেও এরূপ আড়াই হাজার লোকের অভাব নাই।

আমরা যে কয়জন উৎসাহী যুবকের নাম উল্লেখ করিলাম তাঁহারা ব্যতীত এ পর্য্যন্ত আরও কতিপয় যুবক অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার জন্য জাপান যাত্রা করিয়াছেন। ১৮৯৮ অব্দে মিঃ এন্, ডি, সেবেদী নামক একটি দক্ষিণী যুবক কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্যে কাচ নির্ম্মাণ কৌশল শিখিবার জন্য জাপান যাত্রা করেন, কিন্তু তিনি যে কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়ছিলেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। জনরব এই যুবকটি জাপানের কোন বিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন, গত দুই বৎসর হইতে মিঃ সেবেদীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সংপ্রতি অযোধ্যা প্রদেশ হইতে আরও দুইটি যুবক জাপান যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম বা উদ্দেশ্য আমরা অবগত নহি।

যাহা হউক, এই তালিকা হইতে পাঠকগণের একথা সহজেই

উপাধিধারী কোন যুবকই শিল্প বিজ্ঞান বা রসায়নাদি শিক্ষার জন্য জাপান যাত্রা করেন নাই ; প্রতিভাবান উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণ যতদিন পর্য্যন্ত জাপানে গিয়া নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া না আসিতেছেন তত-দিন জাপানের সংস্রবে আমাদের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না। জাপানে বাস করিতে হইলে আমাদের দেশের যুবকগণ মাসিক পঞ্চাশ টাকাতেই সুখ স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারেন, এই টাকাতেই বিদ্যালয়ের বেতন, পুস্তকাদি ক্রয় ও বাসা খরচ চলিতে পারে। যদি অনেকে একত্র থাকেন তাহা হইলে ব্যয় আরও কম পড়িবে। জাপানের পাথেয় যাতায়াতে চারিশত টাকার অধিক পড়ে না, আড়াই হাজার টাকা হইলেই একটি ছাত্র জাপান হইতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া দেশে ফিরিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস ভারতের অনেক লোকই সন্তানগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও কার্য্যকরী শিক্ষার অনুরোধে এই টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ।

B[illegible]GAL LIBRARY.
W[illegible]TERS' BUILDINGS
Recd. on the 21 JAN 1903

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS
Recd. on the 21 JAN. 1903

অসির ফসল

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে।)

“লোয়ার”-নদীর ধারে আছে ক্ষুদ্র কোন এক গ্রাম,
সেথা দিয়া যায় চলি' অশ্বারোহী কুমারী “জোয়ান”।*
বলে গ্রামবাসীগণে, “অস্ত্র লয়ে চল্ সবে চল্”!
গ্রামের মোড়োল এক —পিছে যার ভীত বৃদ্ধ দল—
উত্তর করিল, “দেখ, দীন দুঃখী লোক সব এরা,
—ইংরাজ করিল বধ যারা ছিল আমাদের সেরা।
এসেছিল তারা কাল; টাল্‌বটের † তুরঙ্গের খুর
মোদের সন্তান-রক্তে হইয়াছে সিক্ত ভরপূর।
মোরা যারা আছি বেঁচে —অনাথ, বিধবা, বৃদ্ধ যত;
মোদের সমাধি-স্থানে পোঁতা গেছে নব “ক্রুশ” কত!”
কিন্তু সে কুমারী বীর চাহি' তীব্র বিজয়-গরবে
বলি উঠে, “বালবৃদ্ধ যে আছিস্ আয় তোরা সবে”!
মোড়োল বলিল পুন অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন,
“হায় হায়! শত্রু যে গো শস্ত্র সব করেছে হরণ
—কুঠার, বল্লম, অসি আর ছিল যত ধনুর্ব্বাণ।
আমাদের খুব ইচ্ছা তব সাথে করিগো প্রয়াণ,
কিন্তু যে গো আমাদের সামান্য ছুরিটিও নাই,
কেমনে বলগো তবে তোমা-সাথে মোরা যুদ্ধে যাই?”

* Joan of Arc.
† ইংরাজ সেনাপতি।

তখন কুমারী বীর বসি' তাঁর অশ্বের আসনে,
করযোড়ে ভগবানে প্রার্থনা করিলা একমনে।
পরে বলিলেন পুনঃ "এই মাত্র বলিলে না তুমি
ক্রুশে ক্রুশে পরিপূর্ণ তোমাদের সমাধির ভূমি" ?
—"হাঁ গো আমি বলিয়াছি" ; —"আয় তবে সমাধির স্থানে" !
সমস্ত গ্রামের লোক হ'ল জড়ো তাঁর আহ্বানে ;
—তার মাঝে অনেকেই অনুতপ্ত অপ্রতিভ লাজে—
তখন কুমারী বীর চালাইয়া শ্বেত অশ্বরাজে
আইলা শ্মশান ভূমে ; করিলেন আবার প্রার্থনা ;
শুনিলেন অন্তর্যামী —বলিল যা' সে বীর ললনা।
কুমারী দেখিলা, পূর্ণ ক্রুশ-কাঠে শ্মশান বিশাল
—প্রতি ক্রুশ বিরচিত তাড়াতাড়ি কাটি' দুই ডাল—
সহসা গো অলৌকিক কাণ্ড এক ঘটে সে শ্মশানে,
—যত ছিল ক্রুশ-শাখা পরিণত হইল কৃপাণে !
ঝিকিমিকি করে অসি লাগি' তাহে সূর্য্যের কিরণ ;
কবর যতেক ছিল লভি' যেন সহসা চেতন
বলে, "লও এই অসি —পাইয়াছি ঈশ্বর আদেশ,
এই সব অসি লয়ে উদ্ধার করহ নিজ দেশ"।
বিস্মিত গ্রামের লোক লুটাইল কুমারীর পায় ;
তখন বলেন তিনি, "অস্ত্র ধরি আয় সবে আয় !
আমা-দিয়া ভগবান ঘুচাবেন তোদের যাতনা
জানিস্, এরাজ্য'পরে আছে তাঁর অশেষ করুণা"।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সুন্দরী।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া, শিকারের থলিটি হাতে করিয়া, ক্ষুণ্নমনে ধীরে ধীরে রমা গৃহে ফিরিল। খিড়কী দরজা দিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখে বারান্দায় বসিয়া তাহার সহোদরা রাজলক্ষ্মী বাড়ীর বিড়ালটার লাঙ্গুলে একটা রঙ্গীন ফিতা বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অসৌখীন বিড়াল ক্রমাগত লাঙ্গুল টানিয়া টানিয়া লইতেছে, কিছুতেই গহনাটি পরিবে না। রমা তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। রাজলক্ষ্মী সেই শব্দে, উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল, দিদি। দিদির মুখে ও কেশে ধূলা, বস্ত্র স্থানে স্থানে ছিন্ন,— হাতে একটা অপরিচিত থলি তাহার গাত্রে রক্তের চিহ্ন। রমাকে দেখিয়াই রাজলক্ষ্মী বলিল—"হ্যাঁলা দিদি, কোথায় গিয়েছিলি বল দিকিনি? বাবা আসুক, তোকে ছেঁচ্‌বে।"

রমা বলিল—"কোথায় গিয়েছিলাম জানিস্‌নে?" বলিয়া থলিটি তুলিয়া ধরিল।

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস হইয়া কহিল—"ওমা, কি মেরে এনেছিস্ দিদি?" বলিয়া ক্ষিপ্রপদে সোপান অবতরণ করিয়া রমার নিকট দাঁড়াইল। রমা থলির মুখটি অতি সন্তর্পণে খুলিয়া, ভগ্নীকে দেখিতে ইঙ্গিত করিল। রাজলক্ষ্মী দেখিয়া বলিল—"কি পাখী?"

"হাঁস।"

"কটা?"

উন্মত্ত ষণ্ড কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইলে লোকে যেরূপ উৎসাহের সহিত পদচালনা করে, রাজলক্ষ্মী এই কথা শ্রবণমাত্র তদ্রূপ গতিতে রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে "ওগো দিদি দুটো হাঁস মেরে এনেছে গো" শব্দে বাড়ী তোলপাড় করিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে রমা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, পেয়ারা গাছের একটা ডালে থলিটি ঝুলাইয়া রাখিতেছিল। রাজলক্ষ্মীর চীৎকারে পিসীমা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু স্ফীত, গণ্ডে সদ্যপতিত অশ্রুচিহ্ন। তিনি রমার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"কোথায় গিয়েছিলে পোড়ার মুখী?"

উচ্চস্বরে কথা কহিবার মত মেজাজ রমার তখন ছিল না। রমা চুপ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমা অনর্গল তিরস্কার করিয়া যাইতে লাগিলেন। বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ প্রভৃতি রমার অনেক অপরাধেরই তিনি উল্লেখ করিলেন।—ক্রমে লছমী আসিয়া উপস্থিত হইল।

রমার অবস্থা দেখিয়া লছমীর দুঃখ হইল। পিসীমার কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার মানসে লছমী বলিল—"আহা! মেয়ের চেহারা হয়েছে দেখ না! আয় গা ধুইয়ে দিই গে।"—বলিয়া রমাকে লইয়া পুষ্করিণী তীরে লইয়া চলিল। পথে যাইতে লছমী রমাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কোথা গিয়েছিলি?"

"শিকার করতে।"

"কার সঙ্গে?"

"সেই পাখীধরার সঙ্গে।"

"পাখীধরার সঙ্গে একলা যে গেলি,—সে যদি জঙ্গলে গলা টিপে

রমা বলিল—"ভারি সাধ্যি কি না!"—রমার নির্ভীকতায় লছমী মনে মনে খুসী হইল।

রমা যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বাড়ী আসিল তাহার পিতা তখনও ফিরেন নাই। পিসীমার ক্রোধ তখন অনেকটা নিরস্ত হইয়াছে। তিনি হরিনামের মালা লইয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন। রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন—"যা দিকিন রাজি, দেখ্ তোর বাবা কোথায় গেল। বল্ দিদি বাড়ী এসেছে। আহা বামুন সারা বেলাটা হন্তে কুকুরের মত ছুটাছুটি করে বেড়াচ্চে।"

রাগে রমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছিল,—সে আর প্রকাশ করিল না যে পিতার সঙ্গে পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ হইয়াছে। যাহা হউক, রাজলক্ষ্মীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। গদাধর কন্যার সহিত শীঘ্রই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার দিদি বলিলেন—"ওগো, তোমার গুণের মেয়ে বাড়ী এসেছে।" বলিয়া আরও কিঞ্চিৎ অগ্নিবর্ষণ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, গদাধর ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে কহিলেন। লছমী মনে করিয়াছিল গদাধর ফিরিলে রমার উপর আর একটা ঝড় ও শিলাবৃষ্টি বহিবে, কিন্তু গদাধরের প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল;—কিছু বিস্মিতও হইল।

রমার প্রতি স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই না কি দুটো হাঁস শিকার করেছিস্ রমা?"

পিতার এই অভাবনীয় ব্যবহারে রমার মন বিষণ্ণতার গহ্বর হইতে একলম্ফে উৎসাহের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিল। সে বলিল—"হ্যাঁ বাবা,—দেখবে?"

"কৈ দেখি।"

রমা ছুটিয়া গিয়া পেয়ারা গাছের ডাল হইতে থলিটা নামাইয়া

আনিল। দেখিয়া তাহার পিতা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। রমা তখন সবিস্তারে শিকারের কাহিনী বর্ণনা করিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, তুমি হাঁসের মাংস ভালবাস ?"

"খুব ভালবাসি।"

"সেই পাখীধরা বাবুটি বল্‌ছিলেন হাঁসের মাংস খুব ভাল। তিনি কখন আসবেন ?"

"তিনি আজ চলে গেছেন—আর একদিন আসবেন বলেছেন।"

লছমী দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্য হইয়া সকল কথা শুনিতেছিল, এই সময় সে বলিল—"পাখীধরার যে ব্যবসা করে, সে আবার 'বাবু' হয় না কি ?"

গদাধর আড়ালে চক্ষু টিপিয়া লছমীকে চুপ করিতে সঙ্কেত করিলেন। লছমী বুঝিল ভিতরে তাহা হইলে কোন কথা আছে। তাহার বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু গদাধরের ভাব দেখিয়া সে ইহাও বুঝিতে পারিল যে, এ রহস্য যাহাই হউক, কোনওরূপ দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

* * * * *

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে,—বালিকাগণ নিদ্রাগত। দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে ;—ভারি গ্রীষ্ম। একটুও বাতাস বহিতেছে না। বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া গদাধর ধূমপান করিতেছেন। কুলুঙ্গিতে একটি কেরোসিনের বাতি।

কিয়ৎ পরে তিনি ডাকিলেন—"লছমী"

"কি বাবু ?"

"তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

"হয়েছে। কেন ?"

"একবার এ দিকে এস দিকিন।"

লছমী আসিল। গদাধর বলিলেন—"এক খানা আসন টাসন কিছু এনে বস, অনেক কথা আছে।"

ব্যাপারটা জানিবার জন্য লছমী অত্যন্তই উৎসুক ছিল; অনুরোধমত উপবেশন করিল।

গদাধর তখন বলিলেন—"যাকে আমরা পাখীধরা মনে করেছিলাম, সে পাখীধরা নয়।"

"কি তবে ?

"সে কান্তি বাঁড়ুয্যের ছেলে।"

"সেই বিশালাক্ষীর জমিদার কান্তি বাঁড়ুয্যে ?"

গদাধর তখন, হরিপদ জেলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া, নবগোপালের সহিত কথোপকথন ও তাহার কর্ত্তৃক বিবাহ প্রস্তাব প্রভৃতি সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শেষে বলিলেন—"কি করা যায় বল দিকিন ?"

লছমী চিন্তিত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল—"তাইত !—ছেলের মা বাপ যে রাজি হয়, এ ত খুব অসম্ভব কথা। কিন্তু ছেলে যখন নিজে বিয়ে করতে চাচ্চে—। ছেলের বয়স কত ?"

"এই বিশ বাইশ আন্দাজ হবে।"

লছমী পূর্ব্বমত বলিল—"ছেলে যখন সেয়ানা হয়েছে,—তখন আমরা যদি বিয়ে দিই তা হলে খুব অন্যায় হবে না বোধ হয়।"

গদাধর বলিলেন তাঁহার বিশ্বাসও সেই প্রকার। "আচ্ছা দিদিকে ডাক দিকিন,—তিনি কি বলেন।"

লছমী উঠিয়া বৃদ্ধাকে ডাকিয়া আনিল। গদাধর বলিলেন—"লছমী দিদিকে তুমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।"

লছমী অনেক পরিশ্রমে, অনেকক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে ব্যাপারটা অবগত করাইল। অনেক কথাই বারম্বার আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল।

বিশেষতঃ লছমী যখন বলিল—"জমীদারের ছেলে"—তখন তিনি কিছু-তেই বুঝিতে পারেন না,—খালি বলেন—"কোথাকার জেলে বল্লে ?"—যাহা হউক ক্রমে তিনি সকল কথা বুঝিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—"তাইত ! বিয়ে কর্‌তে চায়। আমাদের কি এমন ভাগ্যি হবে ? এত সুখ কি কপালে নেকা আছে ?" ইত্যাদি।

গদাধর অধীর হইয়া বলিলেন—"এখন তোমার মতটা কি ? ছেলে যে বাপ মার অমতে বিয়ে কর্‌তে চাচ্চে,—বিয়ে দেওয়া উচিত কি ?"

পিসীমা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"ছেলে যদিও বিয়ে কর্‌তে চাইচে বটে,—বিয়ে যদি দিই,—তাহলে তার মা বাপ কি বউকে ঘরে তুলে নেবে ?—আবার ছেলের বিয়ে দেবে হয়ত।"

গদাধর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—"আজকালকার ছেলে দুটো বিয়ে কর্‌বে না। তা ছাড়া, বাপ মার ঐ এক ছেলে,—একবার বিয়ে করে ফেল্লে কি আর বউকে ফেল্‌তে পারবে ?"

দিদি অত্যন্ত দ্বিধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গদাধর কলিকায় হাত দিয়া দেখিলেন অগ্নি নির্ব্বাপিত। কলিকাটি নামাইয়া লছমীর হাতে দিয়া বলিলেন—"একটু তামাক সাজ ত।"

দিদি খালি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"আহা সে ভাগ্য কি হবে আমাদের। রমা কি এমন তপিস্তে করেছে !" ইত্যাদি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নবগোপাল যে সময় পাখী কিনিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, সেই সময়েই এ দিকে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। যে দিন সে নৌকা-বোঝাই পাখী লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিল, তাহার পর দিন প্রভাতেই কান্তিচন্দ্র কন্যা দেখিতে সূর্য্যপুর যাত্রা করেন। পিতা

গোপাল তাঁহার যাত্রার প্রকৃত কারণ সন্দেহ করিল না। সে দিন সারাদিন যদি সে পাখীর বাসস্থান নির্ম্মাণ উপলক্ষ্যে অতিমাত্র ব্যস্ত না থাকিত তাহা হইলে বাড়ীতে কিঞ্চিৎ "কাণাঘুসা" শুনিতে পাইত।

গদাধার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথনের পর নবগোপাল নদীর ঘাটে ফিরিয়া আসিল। নৌকায় অরোহণ করিয়া খুলিতে আজ্ঞা দিল।

সূর্য্য তখন অস্তগমন করিতেছেন। পিয়ালীর সঙ্কীর্ণ বক্ষ আলোকে ঝলমলায়মান। নবগোপাল ছত্রীর নিম্নে বিছানা পাতিয়া দুই পার্শ্বে জানালা দুইটী খুলিয়া দিল। শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল এবং জল ও দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তীরস্থিত বৃক্ষগুলি রৌদ্র মাথায় করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। তাহারা কোন্ দিকে যাইতেছে?— রমা যেখানে আছে, সেই দিকে।

নবগোপালের মন ভারি চঞ্চল।—তাহার মন যে ঔপন্যাসিক প্রেমে হাবুডুবু করিতেছিল তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তবে রমার ছবি তাহার মনে বারম্বার প্রতিবিম্বিত হইতেছিল তাহার আর সংশয় নাই। রমার চরিত্রের কমনীয় মাধুর্য্য এবং বিশেষ করিয়া তাহার নির্ভীক সরলতা, নবগোপালের মনকে অভিভূত করিতেছিল। যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা অপরিচিত, যাহা নূতন, তাহার আকর্ষণ অল্পবয়সের মনে অত্যন্ত প্রবল। নবগোপালের মন এখন এই আকর্ষণের বশীভূত। প্রেমে প্রথমদর্শনবাদ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রথম দর্শনের একটা আকর্ষণকে প্রেম বলিয়া ভুল করেন। হৃদয়ের পরিচয়ে প্রেমের বিকাশ। প্রথম দর্শনে হৃদয়ের পরিচয় হয় না। প্রথম দর্শন প্রেম জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে—কিন্তু একটা আকর্ষণ জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট বটে। কিন্তু শুধু আকর্ষণ মাত্র। তাহার অপেক্ষা আর একটা প্রবলতর আকর্ষণ উপস্থিত হইলেই মন নূতন পথে ছুটিবে।

আকর্ষণ ঘনীভূত হইয়া যখন স্থায়িত্বলাভ করে, তখনই তাহা প্রেম, —পূর্ব্বে নহে।

নবগোপালের নৌকা গ্রামে পৌঁছিল। সে ভৃত্যগণকে বন্দুক প্রভৃতি লইয়া অগ্রসর হইতে বলিল,—সে নদীতে স্নান করিয়া তবে বাড়ী যাইবে।

স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নবগোপাল যখন গৃহে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফটকের নিকট জমাদার বরুণ চৌবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে সেলাম করিয়া হাসিমুখে বলিল—"দাদা বাবুকা সাদিমে হামকো দোশালা বখ্‌সিস মিলনা চাহিয়ে।"

নবগোপাল শুধু একটু হাসিয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু ভারি বিস্মিত হইল। ইহারা কোথা হইতে খবর পাইল! সে যখন গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল, তখন কোনও মাল্লা কি সিপাহি অলক্ষ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইয়াছে না কি? ভারি আশ্চর্য্য ত!

যাহা হউক, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় কক্ষে উপস্থিত হইল। কক্ষ অন্ধকার ছিল। তখনি ঝি আসিয়া আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই তাহার মাতা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ হাস্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবু সারাদিন কোথা ছিলি?"

"শিকার করতে গিয়েছিলাম মা।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"বোকা ছেলে! এত দেরী করে ফিরতে হয়? সারাদিন তোকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চি।" বলিয়া তিনি তাঁহার অঞ্চলের এক অংশ নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন। নবগোপালের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট হইল,—সে দেখিল অঞ্চলে কি জড়ান রহিয়াছে। মাতার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—

"তোকে একটা জিনিষ দেখাব বলে।"—মাতার চক্ষু কৌতুকপূর্ণ।

"কি জিনিষ?"

"আজ উনি সূর্য্যপুর থেকে ফিরেছেন।—একটা জিনিষ দেখ্‌বি?"

"কি? ব্যাপারটা কি?"

মা, একবার পুত্রের মুখের পানে চাহেন, একবার অঞ্চলাগ্রের প্রতি নেত্রপাত করেন, এইরূপ করিতে করিতে সন্তর্পণে জিনিষটি বাহির করিলেন। পাতলা কাগজে মোড়া একখানি ক্ষুদ্র ফোটোগ্রাফ্। উন্মোচন করিতে কুর্ কুর্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ছবিটি আলোকের কাছে ধরিয়া তারিফের স্বরে বলিলেন—"ভাখ্।"

নবগোপাল সরিয়া গিয়া, ছবিটি ভাল করিয়া দেখিল। মার হাত হইতে তাহা লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কার ছবি?"

মা সকৌতুকে ছবিখানি আঁটিয়া ধরিয়া রহিলেন। বলিলেন—"এখন দিচ্চিনে। বল্ আগে কেমন মেয়েটি।"

নবগোপাল বলিল—"বাঃ, বেশ মেয়েটি ত! কে?"

ছবি পুত্রের হাতে দিয়া মা বলিলেন—"যেই হোক্। পেলে বিয়ে করিস্?"

নবগোপাল বিস্ময়ে মার মুখের পানে চাহিল। মা সহাস্যমুখে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্—বিয়ে করবি?"

নবগোপাল বলিল—"এত দেশ থাক্‌তে আমি বিয়ে করতে যাব কেন?"

মা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন কর্ত্তা আজ মেয়ে দেখিয়া ফিরিয়াছেন। মেয়েটি ভারি সুন্দরী। নাম সুশীলা। যেমন মুখ চোখ্, তেমনি রং। দেখিয়া কর্ত্তার ভারি পছন্দ হইয়াছে। বিবাহ স্থির।

মা ভাবিয়াছিলেন এ সংবাদে নবগোপাল পুলকিত হইবে এবং সে

সে ভাব গোপন করিতে বৃথা চেষ্টা করিবে। কিন্তু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন তাহার মুখে চক্ষে দারুণ নিরুৎসাহ। দেখিয়া মার হাস্য-কৌতুকের ভাব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমন করে রৈলি যে ?"

নবগোপাল বলিল—"মা, আমিত এ মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে পারব না।"

মা আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কেন রে ? কি হয়েছে ?—কেন এ মেয়ে সুন্দর নয় ?"

নবগোপাল তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলিয়া বলিল। প্রথম দিনের পাখী উড়িয়া যাওয়ার ঘটনা হইতে শিকার কাহিনী, পরে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন, বিবাহ প্রস্তাব এবং সেই কন্যাকেই বিবাহ করিবার তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা সমস্তই বলিল।

মা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নবগোপালও নীরবে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কাটিলে—মা বলিলেন—"ছি বাবা, ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও। তুমি একজন এতবড় জমিদারের ছেলে, তুমি কি একজন সামান্য গোমস্তার মেয়েকে বিয়ে করতে পার ? লোকে শুন্‌লে বলবে কি ?"

নবগোপাল নিরুত্তর রহিলেন।

সারা সন্ধ্যা মা তাহার সহিত যাপন করিয়া আরও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। শুধু তিনি নবগোপালকে অত্যন্ত দুঃখকাতর করিয়া তুলিলেন। পুত্রের দুঃখে মাতার হৃদয় গলিল। শয়নের পূর্ব্বে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন—পরদিন কর্ত্তার নিকট এ কথা পাড়িয়া যদি কিছু কূলকিনারা করিতে পারেন ত চেষ্টা দেখিবেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

হীরবিজয় সূরী।

মোগল সম্রাটগণের শিরোমণি জগদ্বিখ্যাত আকবর জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পণ্ডিত মাত্রকেই যে উপযুক্ত সম্মান করিতেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। যে কোন ধর্ম্মের বা যে কোন সম্প্রদায়েরই হউন না কেন সৎ ও জ্ঞানী হইলেই তাঁহার নিকট প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। পরম ঐশ্বর্য্যশালী আমীর অপেক্ষা দরিদ্র ভিক্ষুক জ্ঞানবান হইলে তাঁহার নিকট অধিক মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইত। গুণী ব্যক্তি কিরূপ আদর পাইবার যোগ্য তাহা মোগল সম্রাটগণের মধ্যে আকবরই সম্যক জ্ঞাত ছিলেন।

আমরা এস্থলে প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত মহাত্মা কিরূপে আকবর কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ও সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব; এবং সেই সঙ্গে সূরীর জীবনের কতিপয় ইতিবৃত্ত পাঠকবর্গকে উপহারে প্রদান করিব।

খৃষ্টোত্তর ১৫২৬ অব্দে মার্গশীর্ষ মাসীয় শুক্ল নবমী তিথিতে প্রহ্লাদনপুরে হীরবিজয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জনকজননী জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বাল্যকালেই ইঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন ও চারি বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমে মারবাড়ের অন্তর্গত শিরোহী নগরে সূরি-পদ প্রাপ্ত হন। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্যগণ "সূরী" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে ইঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল; জৈনশাস্ত্রে ইঁহার ন্যায় ব্যুৎপত্তি সে সময়ে অল্প লোকেরই মধ্যে দৃষ্ট হইত। ইঁহার প্রণীত "হীরপ্রশ্ন গ্রন্থ" নামক পুস্তক জৈনগণের

অতি আদরের বস্তু। হীরবিজয় সূরীর অনন্যসাধারণ চরিত্রবল ও অতুল জ্ঞানের নিকট অনেক অভিমানীর মস্তক স্বতঃই অবনত হইত।

গুজরাটের অন্তঃপাতী গন্ধার বন্দরের সন্নিকটে বিচরণ কালে হীরবিজয় সূরী হিন্দুস্থানে আসিবার জন্য আকবর কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হন। খৃষ্টোত্তর ১৫৮২ অব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে ইনি আগরার নিকটবর্ত্তী ফতেপুরে আগমন করেন—আকবর এ সময়ে এই স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রধান অমাত্য প্রখ্যাত আবুল ফজল কর্ত্তৃক বাদশাহের নিকট আনীত হইলেন। বিমলহর্ষগণী শ্রীশান্তিচন্দ্র উপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেক মুনি ইঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। প্রহরেক পর্য্যন্ত নানা প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা হইল। পরিশেষে আকবর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে "আপনি স্বর্ণ রৌপ্যাদি কিছুই গ্রহণ করিবেন না, অতএব আমার নিকট যে সমস্ত জৈন ধর্ম্মপুস্তক আছে তৎসমস্ত গ্রহণ করুন।" আচার্য্য গ্রন্থ সকল গ্রহণ করিয়া আগরার জৈন ভাণ্ডারে প্রদান করিলেন। তৎপরে ফতেপুর হইতে আগরায় আগমন করিয়া ১৫৮২ অব্দের শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস তথায় যাপন করিলেন; এই চারি মাস জৈন সাধুগণকে এক গ্রামে অবস্থিতি করিতে হয়, গ্রামান্তর গমন নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসের পর শৌরীপুর জৈনতীর্থে গমন করিলেন; শৌরীপুর মথুরার নিকট। যদুবংশীয় শৌরী নামক রাজা কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয় ও প্রথমে যদুবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এস্থলে দ্বাবিংশতিতম তীর্থঙ্কর শ্রীনেমিনাথ স্বামীর চরণ ও অন্যান্য কয়েকটী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেন। হীরবিজয় আগরায় প্রত্যাগমন করিয়া জ্ঞানচাঁদ কল্যাণ মল নামক শ্রাবকের ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর শ্রীপার্শ্বনাথ স্বামীর প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন। পুনরায় ফতেপুরে গমন করিয়া আকবরের সহিত সাক্ষাৎ

অষ্ট দিবস পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যে প্রাণিবধ স্থগিত থাকুক” ইহা প্রার্থনা করিলেন। আকবর প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে বলিলেন “আপনার ৮ ও আমার ৪ দিন মোট ১২ দিন আমার রাজ্যে প্রাণিবধ হইবে না।” এই বলিয়া ছয়টী সনন্দ লিপিবদ্ধ করাইলেন। গুজরাট, মালব, আজমীর, দিল্লী ও লাহোর, মুলতান এই পঞ্চ সুবায় পাঁচখানি ও সূরীকে তাহার একখানি প্রদান করিলেন, এবং স্বহস্তে কতিপয় পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীকে মুক্ত করিলেন। আচার্য্য ১৫৮৩ খৃঃ অব্দের চতুর্ম্মাসও সূরী ফতেপুরে যাপন করিলেন। তৎপরে কিয়ৎকাল ভিরামনগর, আগরা প্রভৃতি অঞ্চলে পরিব্রজন করিয়া যখন দক্ষিণাপথে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন আকবর তাঁহাকে আর একটী সনন্দ প্রদান করিলেন। নিম্নে তাহার ভাবার্থ লিখিত হইল। ইহা হইতে মুসলমান রাজার প্রজার প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাসের একটি চিত্র পাওয়া যাইবে। এই প্রীতি ও বিশ্বাসের জন্যই মোগল-সিংহাসন প্রজার মনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

জলালুদ্দীন মহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজীর ফরমান।

জলালুদ্দীন আকবর বাদশাহ হুমায়ুন বাদশাহের পুত্র—বাবর শাহের পুত্র—উমর সেখ মির্জ্জার পুত্র—সুলতান আবু সৈয়দের পুত্র—সুলতান মহম্মদ শাহের পুত্র—মীরশাহের পুত্র—আমীর তৈমুর সাহেব ফিরানের পুত্র।

“মালব, গুজরাট, অকবরাবাদ, লাহোর, মুলতান, অহমদাবাদ, আজমীর, মীরাট, বাঙ্গলা প্রভৃতি আমার অধীনস্থ প্রদেশ সকলের ও ভবিষ্যতে যাহা আমার অধীন হইবে তাহাদের সুবাদারগণের অবগতির জন্য লিখিত হইতেছে যে, আমার ইচ্ছা যে আমার সমস্ত প্রজাগণ সন্তুষ্ট থাকে। বিশেষ বৃদ্ধাবস্থায় আমার এই অভিলাষ যে যাহারা আমার

মঙ্গল কামনা করে তাহারা যেন সতত সুখী থাকে। তজ্জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যাঁহারা উত্তম বিচারকর্ত্তা ও যাঁহারা সমস্ত জীবন পরমেশ্বরের চিন্তায় অতিবাহিত করেন, তাঁহাদিগকে আমি দূর দেশ হইতে আহ্বান করি ও তাঁহাদিগের সহিত আলাপে সুখী হই। আমি শুনিয়াছিলাম যে গুজরাট দেশে শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য্য পণ্ডিত ও ঈশ্বরভক্ত। আমি তাঁহাকে এখানে আহ্বান করিয়াছিলাম ও তাঁহার সহিত আলাপে সম্যক্ সন্তুষ্ট হইলাম। ইনি পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে গুজরাটের অন্তর্গত সিদ্ধাচল, গির্ণার পর্ব্বত, তারঙ্গা পাহাড়, কেশরিয়ানাথের পাহাড়, আবু পাহাড়, রাজগৃহের সন্নিকট পঞ্চ পাহাড় (বৈভারাদি), বাঙ্গলার অন্তর্গত পার্শ্বনাথ পাহাড় প্রভৃতি যে সমস্ত জৈন তীর্থ আছে তাহার নিম্নে বা চতুর্দ্দিকে কোনও প্রকার প্রাণিবধ না হয়। ইনি বহুদূর হইতে আসিয়াছেন ও ইহার প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত। যদ্যপি এই প্রার্থনা মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি যাঁহারা ঈশ্বরকে সম্যক্ অবগত আছেন তাঁহাদের এই নিয়ম যে তাঁহারা অপরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না, বা তাহাদের প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করেন না, এইজন্য ইহার প্রার্থনা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্ত পর্ব্বত বহুদিন যাবৎ শ্বেতাম্বর জৈনগণের অধীন আছে বলিয়া ইহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল যে, গুজরাটের অন্তঃপাতী সিদ্ধাচল, গির্ণার পাহাড়, তারঙ্গা, কেশরিয়ানাথ, আবু পাহাড়, রাজগৃহের পঞ্চ পাহাড় ও বাঙ্গলার প্রার্শ্বনাথ পাহাড়—এই সমস্ত তীর্থস্থল ও পাহাড়ের তলভূমি—যাহা আমার রাজ্যে আছে—শ্বেতাম্বরাচার্য্য হীরবিজয় সূরীকে প্রদত্ত হইল। বিশেষ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তীর্থস্থান পূর্ব্ব হইতেই শ্বেতাম্বরগণের ছিল। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য কর্ত্তৃক দিবাভাগ প্রকাশিত থাকিবে ও চন্দ্র দ্বারা রজনী

ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সূর্য্যচন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশিত থাকিবে। কোনও ব্যক্তি এই পাহাড় সকলের নিম্নে ও চতুর্দ্দিকে, পূজাস্থলে ও তীর্থস্থলে প্রাণিবধ করিবে না—এই আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে, অল্পমাত্রও বিভিন্নতাচরণ করিবে না। নূতন ফরমান চাহিবে না। ইতি ৭ই রবিয়ুল অউবল, ২৭ জুলসি।”

এই সনন্দ গ্রহণ করিয়া হীরবিজয় স্থরী মারবাড়ে আগমন করিলেন, শ্রীশান্তিচন্দ্র উপাধ্যায় আকবরের নিকটেই থাকিলেন। শিরোহীতে আগমন করিয়া স্থরী প্রথম তীর্থঙ্কর শ্রীঋষভদেব স্বামীর ও দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর শ্রীঅজিতনাথ স্বামীর প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পর ইনি মারবাড় ও গুজরাটেই পরিব্রজন করিতেন। দুঃখের বিষয় যে আমরা এই মহাত্মার শেষ জীবনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। বিদ্যাসাগর ন্যায়রত্ন শ্রীমন্মুনি শান্তিবিজয় প্রণীত “মানব ধর্ম্ম সংহিতা” নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল ও বৈচিত্র্য।

ধর্ম্ম কথাটী সকলের মুখেই শুনা যায়। ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তাহাও সকলে জানে। “ধর্ম্ম জানেন”, “ধর্ম্ম সহিবে না” প্রভৃতি কথা সর্ব্বদাই লোকে ব্যবহার করে। কিন্তু সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করুন, ধর্ম্ম কি? লোকে শীঘ্র কোন উত্তর দানে সমর্থ হইবে না, প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিয়া উঠিতে পারিবে না। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিবেন, বেদবিহিত কার্য্য ও আচরণ

ধর্ম্ম, ইত্যাদি। লোকে শুনিবে আর বলিবে হাঁ তাই বটে, কিন্তু তাহার মনে হইবে এ ছাড়া আরও কিছু আছে। ধর্ম্ম বলিতে আরও কিছু বুঝায়। বাস্তবিক ধর্ম্মশব্দের ধাতুগত অর্থ দেখিতে গেলে যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধর্ম্ম। এক্ষণে এই অর্থের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। অগ্নির ধর্ম্ম, বায়ুর ধর্ম্ম, মনুষ্যের ধর্ম্ম, পশুর ধর্ম্ম প্রভৃতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে ধর্ম্মশব্দের দুই অর্থ আছে, একটী সামান্য ও একটী বিশেষ। এই উভয়বিধ অর্থেরই ধর্ম্মশব্দের ধাতুগত অর্থের সহিত সামঞ্জস্য আছে। জীব মাত্রেরই সুখ দুঃখের অনুভূতি আজন্মসিদ্ধ, প্রকৃতিসিদ্ধ। জীব মাত্রেই চায় যে সুখ হউক, যেন দুঃখ না হয়। সুখের অনুভূতি প্রথমে, দুঃখানুভূতি পরবর্ত্তী। "বাধনা লক্ষণং দুঃখং।" বাধা পাইলেই দুঃখ হয়। দুঃখের এই সংজ্ঞা সর্ব্ববাদিসম্মত। নব-প্রসূত শিশুর ভিতর প্রকৃতির কার্য্য যতক্ষণ অবাধে হইতেছে ততক্ষণ সে সুখী। যেমনি অভাব হইল, প্রকৃতির কার্য্যস্রোতে বাধা পড়িল, অমনি শিশু কাঁদিয়া উঠিল। তাহার দুঃখের অনুভূতি হইল। এইরূপ রক্তপ্রবাহে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, গমনাগমনে, কথাবার্ত্তায়, কার্য্যকলাপে, চিন্তাস্রোতে, কল্পনায়, খেলায় যখনই বাধা উপস্থিত হয় অমনি দুঃখের অনুভব হয়। জীব স্বভাবতঃই সুখ চায় এবং দুঃখ পরিহার করিতে চাহে। যাহা সুখের অনুকূল তাহা গ্রহণ করে, যাহা দুঃখের প্রবর্ত্তক তাহা পরিত্যাগ করে। এইরূপে বস্তু ও কার্য্যসকল গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা গ্রাহ্য তাহাই ইষ্ট, যাহা ত্যাজ্য তাহাই অনিষ্ট। এইরূপে ইষ্টানিষ্টের জ্ঞান হয়। ইষ্টানিষ্ট হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান হয়। ধর্ম্মের এই সাধারণ অর্থ। যাহা সুখকর, যাহা ইষ্ট, তাহাই গ্রাহ্য, তাহাই ধর্ম্ম। কারণ তাহা ধারণ করিয়া রাখে; তাহা জীবকে ধারণ করে, জীবকে নষ্ট হইতে দেয় না। ধর্ম্মের এই এক অর্থ। আর ধর্ম্ম বলিতে ধর্ম্ম বিশ্বাস (religion)ও বুঝায়, যথা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ;

ইতর প্রাণীর সুখ ও মনুষ্যের সুখ তুলনা করিলে দেখা যায় যে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন উভয়েতেই সমান; প্রকৃতির নিয়মে এই তিনের অবাধ গতিতে সুখ ও বাধায় দুঃখ উভয়েরই হয়। মনুষ্য যতদিন নিম্নস্তরে থাকে, ততদিন তাহার সুখদুঃখে ও ইতর প্রাণীর সুখ দুঃখে বড় প্রভেদ দেখা যায় না। এই অবস্থায় লোক দুঃখ পরিহারের চেষ্টা করে; রোগ, মৃত্যু ও অন্নাভাবের পরিহার করিবার জন্য চেষ্টা করে। তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাবও তদনুরূপ হয়। এই অবস্থায় মনুষ্য দুঃখকে মূর্ত্তিমান করিয়া পূজাদির দ্বারা তাহার তুষ্টিসাধন করিয়া তাহার নিগ্রহ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। তখন এই মূর্ত্তিমান দুঃখ তাহাদের দেবতাপদবাচ্য হয়। তাহার অপ্রীতিকর কার্য্য করিলেই তাহাকে রুষ্ট করা হয়, তাহাতে দুঃখ হয়। তাহা অনিষ্টকর, সুতরাং ত্যজ্য, এইরূপ কার্য্য অধর্ম্ম-কার্য্য। এই দুঃখ-মূর্ত্তি-পূজার কারণ দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, "কার্য্য হইলেই কারণ আছে" এই জ্ঞান সামান্য অভিজ্ঞতা হইতেই সিদ্ধ হয়। প্রকৃতির গতিতে বাধা পড়িয়া দুঃখ হয়, কিন্তু কে বাধা দেয় তাহা দেখা যায় না। অথচ যখন বাধা হয়, তখন অবশ্য বাধা দিবার কেহ আছে। যে বাধা দেয় তাহাকে দেখি না তবে সে এক শক্তি। এই শক্তির অস্তিত্বে অভিজ্ঞতার ফল মনুষ্য ভিন্ন ইতর প্রাণীতেও লক্ষিত হয়। কিন্তু শক্তি অমূর্ত্ত। মূর্ত্তিমান জগতে মূর্ত্তিমান মনুষ্য-সমাজের নিম্ন অবস্থায় সে শক্তির স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। তাই তাহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া, কাটিয়া, ছাঁটিয়া আপনার মনের মত করিয়া, কল্পনায় গড়িয়া পূজা করে। সুখও কোন শক্তি দ্বারা হইতে পারে ইহা তখন মনেই হইতে পারে না। যে স্রোত চলিয়া আসিতেছে তাহা যতক্ষণ চলিবে ততক্ষণ ত সুখ হইবেই। কেবল বাধা পড়িলেই না দুঃখ। তাই মূর্ত্তিমান দুঃখের পূজা। দুঃখ-দেবতার মূর্ত্তিপূজাও সেই দুঃখের অনুরূপ। এই ধর্ম্মের

প্রথম স্তর। এইখানে ভূত, প্রেত, রোগ প্রভৃতির বৃক্ষাদিতে বা মূর্ত্তিতে পূজা প্রচলিত হয়।

ক্রমে জিজ্ঞাসু মানবহৃদয় সুখের বিষয় ভাবিতে থাকে। তাহাতে প্রথম সিদ্ধান্ত এই হয় যে সুখস্রোতে বাধা না দিলে সুখ ভঙ্গ হয় না, সুতরাং দুঃখ হয় না। সুতরাং বাধা প্রদানে দুঃখ উৎপাদন করিবার যাঁহার ক্ষমতা আছে, দুঃখ প্রদানে বিরত থাকিয়া সুখকে অটুট রাখাও তাঁহার হাত। এই জন্যই দুঃখকর্ত্তা দুঃখরূপী দেবতার অর্চ্চনা। তাহা দুঃখ পরিহার ও সুখলাভের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই, যেমন দুঃখের কর্ত্তা আছে তেমনি সুখের কর্ত্তাও আছে। তাঁহার নিকট হইতে এই প্রবহমান সুখস্রোত চলিয়া আসিতেছে। এই স্থলে দুই শক্তির অনুভব দৃষ্ট হয়। এক শক্তি সুখদায়ক, অপর শক্তি সেই সুখের প্রতিরোধক। এই সৃষ্টিস্থিতিকারিণী শক্তি ও বিনাশকারিণী শক্তির অস্তিত্ব সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসেই লক্ষিত হয়। এই উভয় শক্তিই বাইবেলের ঈশ্বর ও শয়তানের যুদ্ধ বিগ্রহরূপ পুরাণ কথা আবেস্তার অহুরমজ্‌দ ও আহিরিমানের আখ্যায়িকা এবং অপরাপর পুরাতন জাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দেবাসুর যুদ্ধের পুরাণ কথার মূল ভিত্তি। তৃতীয় সিদ্ধান্ত সুখ এক প্রকার নহে। সুখ নানাবিধ। দুঃখও নানাবিধ। এই বিবিধ সুখের ও বিবিধ দুঃখের অবশ্য বিবিধ কর্ত্তা আছে। এইখানে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরে বিবিধ শক্তির অনুভূতি ও বিকাশ দেখা যায়। বেদের সংহিতা ভাগ এই স্তরের অন্তর্গত।

এ স্তরে কেবল শক্তির অনুভূতি ও শক্তির নাম কল্পনা। রূপ-কল্পনা কচিৎ দৃষ্ট হয়। বেদের মন্ত্রের অর্থ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সেই সুখেচ্ছা ও দুঃখ-পরিহার-বুদ্ধি এই শক্ত্যনুভূতির মূল। এবং সেই বুদ্ধি পরিচালিত হইয়াই তৎতৎ শক্তির মন্ত্ররূপিণী স্তবস্তুতির

হয়। শক্তির অনুভূতি সহজ ব্যাপার নহে। এই শক্ত্যনুভূতি পূর্ণ হইলেই তাহা শব্দব্রহ্ম সাহায্যে মন্ত্ররূপ ধারণ করে। মন্ত্র অনুভূত শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। এই জন্যই মন্ত্রের প্রতিবর্ণের, তৎতৎ স্থানের, তৎতৎ বর্ণাদির স্বরের ও ছন্দের সার্থকতা আছে। তাহার কোনটীই পরিহার করা চলে না। তাহার কোনটীর পরিবর্ত্তন করা চলে না। হস্ত স্থানে পদ দিলে এবং পদ স্থানে হস্ত দিলে মোটের উপর শরীরের অবয়বের অভাব হয় না বটে, কিন্তু যেরূপ বিকটভাব হয়, মন্ত্রেরও শব্দবিন্যাসের ও স্বরাদির পরিবর্ত্তনেও তাহাই হয়। ইহা অতিশয় গূঢ় রহস্য, গুরু-বক্ত্রগম্য। সংহিতাভাগে বিবিধ শক্তির বিকাশের সহিত এক অনন্ত ও আদ্যা শক্তির বিকাশও আছে।

এই বিবিধ শক্তির অনুভূতির অস্পষ্ট ও স্থূলাবস্থায়, নামরূপ ও মূর্ত্তি-কল্পনা ও তাহার পূজা দৃষ্ট হয়। আদি ইহুদি, মিসর, গ্রীস ও রোমের আদি ধর্ম্ম-বিশ্বাস এই স্তরের অন্তর্গত। ভারতবর্ষে যেমন বৈদিক বিস্পষ্ট অভিব্যক্তির স্থূল অস্পষ্ট পৌরাণিক অবস্থা দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত দেশ সমূহের ধর্ম্মবিশ্বাসে বিস্পষ্ট অভিব্যক্তির অভাব, ও কেবল স্থূল, অস্পষ্ট পৌরাণিক ভাবই দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় স্তরে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচারের দ্বারা এই বিবিধ শক্তি যে এক আদ্যাশক্তির বিবিধ বিকাশ তাহারই অনুভূতি, পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তি উক্ত আদ্যাশক্তির বিভূতি মাত্র এই সিদ্ধান্ত হয় তখন "একং সৎ" এর অনুভূতি হয় এবং সেই একং সৎকে "বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এই সিদ্ধান্ত হয়। এই অনুলোম বিলোম বিচারে এক হইতে বহুত্বের এবং বহুত্ব হইতে একের অনুভূতি হয়। স্থূলাবস্থায় ইহাকেই একেশ্বরবাদ বলে। সূক্ষ্মাবস্থায় ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতি। এই স্থূল ঈশ্বরবাদই পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ধারণায় অক্ষম। তৎচিন্তনে সে আত্মহারা হইয়া পড়ে, কূল কিনারা দেখিতে পায় না; সুতরাং কিছুই বুঝিতে পারে না। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া স্তবস্তুতি করিতেছে, কাহার উদ্দেশ্যে পূজা করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারে না। তখন ইহাদের তৃপ্তির জন্য, ইহাদের মঙ্গলের জন্য, মহাপ্রাণ পরহিতৈষী মহর্ষিগণ মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া দেন, সে মূর্ত্তি এরূপভাবে গঠিত যে তাহা পূজ্য। শক্তির সংজ্ঞা মানচিত্র স্বরূপ হয়। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক অংশ উক্ত শক্তির গুণ, মহিমা ও বিবিধ ক্রিয়ার পরিচায়ক হয়। সুতরাং সাধক উক্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষতঃ বা ধ্যানগত যে অবস্থাতেই দেখুন না কেন উপদেশের সাহায্যে তাঁহার উক্ত শক্তির ধারণা সহজ হইয়া আইসে। ক্রমে ভেকশিশুর লাঙ্গুলের ন্যায় উক্ত মূর্ত্তির অভাব হইলেও আর কোন ক্ষতি হয় না। কারণ তখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। শক্তির অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, ঊষা প্রভৃতির বিবিধ শক্তিবোধক নামের কল্পনা হইয়া থাকে। নামের পর রূপ কল্পনা, তদনন্তর পূর্ণমূর্ত্তি কল্পনা। তাহাতে নির্দ্দিষ্ট শক্তির কোন প্রকার বিপর্য্যয় না ঘটিয়া বরঞ্চ বিশদ বিকাশ বা স্ফূরণেরই সম্ভাবনা। বালকমাত্রেই জানে যে ভারতবর্ষের মানচিত্রখানি ভারতবর্ষ নহে, তাহার কাল দাগগুলি প্রকৃত নদী নহে; তাহার হিজিবিজি রেখাগুলি প্রকৃত পর্ব্বত নহে; সে গুলি চিহ্নমাত্র— তাহারা স্থানবিশেষের সাঙ্কেতিক প্রতিকৃতি মাত্র। কল্পনায় তাহাদের প্রকৃত স্বরূপের অনুভব করিয়া লইতে হয়। সমস্ত দেশ পর্য্যটন না করিয়া কেবল ম্যাপ দৃষ্টে কল্পনা ও গুরুর উপদেশে তাহার সকল বিষয়েই ধারণা হয়। সাধকের মূর্ত্তি-পূজাও সেইরূপ। সাধক জানেন যে তাঁহার সম্মুখস্থিত বা অন্তরস্থিত মূর্ত্তি সেই শক্তি নহেন। তাঁহার পরিচায়ক মানচিত্র মাত্র। পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে শিরোভাগ পর্য্যন্ত প্রতি অংশ উক্ত শক্তির পরিচায়ক। সাধক মূর্ত্তির পূজা করেন না, মূর্ত্তিকে

অবলম্বন করিয়া মহাশক্তির পূজা করেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই সত্বরজস্তম-গুণের ক্রিয়ানুসারে ভাবের বিভিন্নতা, বিস্ফুট বা জড়ভাব লক্ষিত হয়। আর এক কথা, বিচ্ছিন্ন বা বিস্তীর্ণ কোন বস্তুর ধারণা করিতে হইলে, নামরূপ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কুম্ভ, মীন, সিংহ প্রভৃতি রাশিগণের নামরূপ কল্পনার উদ্দেশ্যই তাই। কালবলে সদ্গুরু ও সদুপদেষ্টার অভাবে সকল সূক্ষ্ম বিষয়েরই অবনতি হইয়া থাকে। সুতরাং অবনতি দেখিয়া মূলের অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না। যেখানে মূল অটুট, সত্যের উপর স্থাপিত সুতরাং অমর, সেখানে তদুদ্গত বস্তুরও নাশ হয় না। তবে কালক্রমে অজ্ঞান-সঞ্চিত আবর্জ্জনার অপসরণ সময়ে সময়ে হইতে পারে ও হয়। তাহাতে আসল জিনিষটী প্রকৃতভাবে প্রকটিত হয়। রূপান্তর না হইলেও নামান্তর হইবার সম্ভাবনা। আর মূলে গোল থাকিলে সামান্য বাত্যাঘাতে, সামান্য তাড়নে সকল নষ্ট হইয়া যায়। এই সাময়িক আবর্জ্জনা অপসরণ করাকে ধর্ম্মসংস্থাপন কহে। আবর্জ্জনা অপসরণ করিয়া সত্যের প্রকাশ করাই ভগবানের অবতার হওয়ার কারণ। যেমন শূকর স্বভাবতঃ কর্দ্দম ভালবাসে, পরিষ্কার স্থান অপেক্ষা কর্দ্দমময় স্থানই তাহার অধিকতর প্রিয়। মানবও চিত্তের স্বচ্ছতা ও মলিনতা অনুসারে ধর্ম্মের স্বচ্ছ বা মলিনভাব অবলম্বন করে। এই ব্যাপার প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে।

ঋষিপ্রণীত বৈদিক ধর্ম্মের পৌরাণিক অবস্থা প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারই লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের লোক দ্বিজাতি ও শূদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দ্বিজাতিগণ মার্জ্জিত-বুদ্ধি, আর শূদ্রগণ জড়বুদ্ধি। যাহা মার্জ্জিত বুদ্ধির ধারণা যোগ্য তাহা জড়বুদ্ধির বোধগম্য নহে। দ্বিজাতিগণের মধ্যেও স্ত্রীগণ পুরুষগণ অপেক্ষা জড়বুদ্ধি এবং পুরুষের মধ্যে অনেকেও জড়বুদ্ধি থাকে। অতি

তাই কারুণিক শাস্ত্রকার শূদ্র, স্ত্রী ও দ্বিজবন্ধুর জন্য পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম বিষয়কে অজ্ঞানী সংসারীর নিত্য পরিচিত বিষয় ও বস্তুর সাজে সাজাইয়া স্থূল করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়াছেন। কিন্তু বোধগম্য করিবার জন্যই যে সূক্ষ্মকে স্থূল করা হইতেছে তাহা অবসর পাইলেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে স্থূলাবরণ ভেদ করিয়া সূক্ষ্মের অনুভূতি কিছু কঠিন নহে। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সসীম হইতে অসীমের অনুভূতিই ক্রমিক ও যুক্তিসিদ্ধ। এই কারণেই ভারতবর্ষে অধিকারী-ভেদে ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা। অন্যত্র ধর্ম্ম সামাজিক অঙ্গ স্বরূপ, ভারতবর্ষে ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক এবং সমাজ তাহার অঙ্গস্বরূপ। প্রথমতঃ দৈহিক ও সামাজিক সুখের বিধান তৎপরে আধ্যাত্মিক সুখের বিধান। দুয়ে মিলিত হইয়া সেই সনাতন ধর্ম্ম। অগ্রে শরীর রক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, খাদ্যাখাদ্য বিচার, পান ভোজনের ব্যবস্থা, প্রতি দৈনিক ক্রিয়ার কাল নির্দ্দেশ, তৎপরে শিষ্টাচার ও সমাজ শাসন; তৎপরে সাধন ভজন। প্রথম গুলি সম্যক্-রূপে পালিত না হইলে শেষটী হওয়া কঠিন। প্রথম গুলি শেষটীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে শেষটী সিদ্ধ হয় না বলিয়া, কেবল প্রথম গুলির সাধনে তৎপর ব্যক্তিও ধার্ম্মিক পদবাচ্য হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ, আর জ্ঞান তাহার ফল। বৃক্ষাভাবে যেমন ফলের অভাব হয় সেই রূপ প্রথম গুলির অভাবে শেষটীরও অভাব হয়। এই জন্যই প্রথম গুলির এত প্রাধান্য লক্ষিত হয়। লক্ষ্য কিন্তু সেই চরম ফললাভ। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেই বিপর্য্যয় ঘটে। ফলে লক্ষ্য না থাকিলে বৃক্ষে আস্থা জন্মে না, এরূপ অবস্থায় সমাজে বিপ্লব ঘটে। অনতিকাল মধ্যেই লোকে এই বিপর্য্যয়ের বিষময় পরিণাম অনুভব করিয়া হতাশ হইয়া

মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া আবর্জ্জনার অপসরণ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন।

শিশু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কেবল জিজ্ঞাসা করে, এ কে? এটা কি? এটা কেন? কিন্তু আমি কে? আমি কি?—একথা জিজ্ঞাসা করে না। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "তুমি কে?" সে এই মাত্র উত্তর দিবে "আমি খোকা," আর কোন উত্তর দিতে পারে না, আর কোন পরিচয় দিতে পারে না। জ্ঞানের স্পষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে "আমি কে?" এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। তখন সে আত্ম-পরিচয় শিখে। মানবের ধর্ম্মরাজ্যেও এই গতি। চতুর্থ স্তরে উচ্চ প্রশ্নের উদয় হয়। এই স্তরে আত্ম বিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত হয়—এই স্তরে উপনিষদ্ দেবীর আবির্ভাব—এই স্তরেই প্রবোধ চন্দ্রের উদয়। এই স্তরে সাধক বিচারের চরম সীমায় উঠিয়া বলেন "সোঽহম্ সোঽহম্ সোঽহম্।" এস্তর ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

প্রেতাত্মার পূজা সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অন্তর্গত। আত্মা অমর, তাই মানুষ আপনাকে অমর ভাবে। তাই মানুষ মনে করে মরিলেই সব ফুরায় না। জীবিত কালে যে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনীর সহিত একত্রে থাকিয়া তাহাদের সুখ সম্পাদন করিয়া আপনারা সুখী হইয়াছে, তাহারা আর দৃশ্য জগতে নাই, তাহাদের স্থান শূন্য। তাহাদের নিকট যে সুখ পাইত তাহার অভাব হইয়াছে, মনুষ্য-হৃদয় স্বভাবতঃই বিশ্বাস করিতে চাহেনা যে তাহাদের সব ফুরাইয়াছে। মনে করে অদৃশ্য অবস্থায়ও তাঁহারা অন্নজলপ্রার্থী ও সেবাপ্রার্থী। তাঁহাদের ঈপ্সিত বিষয় বা কার্য্য না করিলে তাঁহারা রুষ্ট হইবেন এবং দুঃখ উৎপন্ন হইবে। এখানেও সেই সুখেচ্ছা ও দুঃখ-পরিহার-বুদ্ধি এই প্রেতাত্মা পূজার কারণ। প্রেতাত্মা পূজায় মূর্ত্তির প্রয়োজন

ব্যতীত অন্তরালে স্থূল দৃষ্টির বাহিরে সূক্ষ্ম কি এক আছে, এই বিশ্বাস মনুষ্যের অতিশয় আদিম অবস্থায়ও দৃষ্ট হয়। এই বিশ্বাসই পরকালে বিশ্বাসের, স্বর্গ নরকে বিশ্বাসের কারণ।

মূর্ত্তিপূজা দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম বাহ্যিক, ২য় আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক মূর্ত্তিপূজায় যদিও মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া কোন মহাশক্তির পূজা করা হয়, ইহাতে এক দোষ আসিয়া পড়ে। সাধকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় সাধক আসল ছাড়িয়া নকলে মগ্ন হইয়া পড়ে, শাঁসে ফেলিয়া খোসা লইয়া ব্যস্ত হয়। এই দোষ প্রবল হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য আভ্যন্তরীন মূর্ত্তিপূজার আবির্ভাব হয়। বাইবেলের ওল্ড টেস্‌টামেন্ট, মুসলমানধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম এই আভ্যন্তরিক মূর্ত্তিপূজামূলক, এই সকল ধর্ম্মে বহুকে কমাইয়া অল্প করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও তিনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বস্তু মাত্রেরই আদি, মধ্য ও অন্ত আছে। এই বস্তুগত আদি ও অন্ত লইয়াই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার, শক্তির কল্পনা, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের God the father. God the son, এবং God the holy ghostএর কল্পনা। এই কয় ধর্ম্মে দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূর্ণ বিকাশ। শয়তান প্রায় Godএর সমান।

তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মাচরণ, সাধন, ভজন এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের সম্মিলিত অবস্থা। যজ্ঞাদি বহু কালসাধ্য বহু আয়াসসাধ্য। তন্ত্রে যজ্ঞাদি দ্বারা লব্ধব্য বিষয় লাভের সহজ উপায় সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধক যাহাতে সহজে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে নীত হইতে পারে, যাহাতে সহজে অহংতত্ত্বের বিশেষ অনুভূতি হয়, তন্ত্রে তাহারই উপায় বর্ণিত হইয়াছে। যোগমার্গ তন্ত্রের অন্তর্গত। ভক্তিমার্গও এই মিলিত স্তরের অন্তর্গত। এখানে সেই আদ্যাশক্তির কেবল মধুর ভাবের পূজা।

নিরূপণ ও সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। ইহাই দার্শনিকস্তর। এই স্তরের সিদ্ধান্তবাদের উপরই বৌদ্ধধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলভিত্তি। এই বৌদ্ধধর্ম্ম বিশ্বাসই ইহুদীদিগের স্থূল একেশ্বরবাদের ও তদুদ্ভূত খ্রীষ্টধর্ম্মের ও মুসলমান ধর্ম্মের মূল।

ভারতবর্ষে যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতিস্রোত আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্মস্থান। এইখানেই তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পোষণ হইয়াছে। বৃক্ষ ফলবান হইলে অপরে সে ফলভোগ করিতেছে, তাহাদের আর ফললাভের পূর্ব্বে যে সকল যত্ন করিতে হয় তাহার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের স্পষ্ট বিকাশ লক্ষিত হয় না। অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন প্রথম স্তরস্থিত ইউরোপীয় জাতিসমূহের সমক্ষে যখন তৃতীয় স্তরস্থিত খ্রীষ্টের প্রেমের ধর্ম্ম উপস্থিত করা হইল, তাহারা তখন তাহা গ্রহণ করিল। কিন্তু আসল জিনিষটা বিকৃত হইয়া গেল। শীতপ্রধান দেশে আঙ্গুর জন্মে, তাহা মধুর ও সুরস। যদি উষ্ণপ্রধান দেশে ঐ আঙ্গুরের চাস করা যায়, আর তাহাতে ফল জন্মে, সে ফলের নাম আঙ্গুর হয় বটে, কিন্তু তাহার আকার বিভিন্ন, স্বাদ বিভিন্ন ও রসও ভিন্ন হয়। প্রথম অবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম্মেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম-বিশ্বাসও সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়ায় এইরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল মহম্মদ তৎকালীন আরব জাতির উপযোগী করিয়া ইহুদীধর্ম্মকে কাটিয়া ছাঁটিয়া তৈয়ারি করিয়াছিলেন, তাই তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাই মুসলমান জাতির মধ্যে উন্নতি বা অবনতি কিছুই দৃষ্ট হয় না।

ইউরোপ এখনও যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রকৃত ভাবগ্রহণ করিতে পারে নাই; তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এখনও নানা প্রকার বিচার সিদ্ধান্ত

যে, সকল জাতির ভিতরই ১ম হইতে ৫ম স্তরের লোক বিদ্যমান আছে। এক স্তরের লোক বাহিরে উচ্চস্তরের ভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, ধারণা করিতে পারে না, হতগজ হইয়া চলিতে থাকে। তাহার ফলও বিষময় হয়। খ্রীষ্টানজাতির মধ্যে ধর্ম্মের নামে যেরূপ নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, নগ্ন অজ্ঞ অসভ্য জাতিরা ধর্ম্মের নামে সেরূপ নৃশংস আচরণ করে কি না সন্দেহ। বিজ্ঞ বৃদ্ধ ধর্ম্মচার্য্যেরা শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন, রাজা তাঁহাদের মত সমর্থন করিয়াছেন, আর কত শত নরনারী প্রেমময় ঈশ্বরের তৃপ্তি-উদ্দেশ্যে অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত অবস্থায় আহুতি স্বরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টের প্রেমের ধর্ম্মের নিশানের তলে অসংখ্য নরনারীকে বলিদান দেওয়া হইয়াছে এ উৎসব অসভ্যদিগের ধর্ম্মোৎসব নহে, সভ্যদিগের যুদ্ধোৎসব। অধিকারিভেদে ধর্ম্মোপদেশের সামঞ্জস্য না থাকিলে এইরূপ বিপর্য্যয়ই ঘটে। ভারতবর্ষে অধিকারিভেদে ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই এরূপ বিপর্য্যয় ঘটে নাই। সনাতন ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের বিদ্বেষ করেন না। তাহার কারণ এই সনাতন ধর্ম্মমতে সকল সাধন ভজনের লক্ষ্য ধর্ম্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। সে ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় না। তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার যো নাই। তাহা সাধন-বিমার্জ্জিত বুদ্ধির সুপক্ব ফল। বৃক্ষ পরিণত হইলে তাহা আপনিই প্রকটিত হয়। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, একেবারেই সুপক্ব অবস্থায় প্রকটিত হয়। যদি কোন লোককে বলি "তুমি আমার উপর রাগ কর কি আমায় ভালবাস," সে কি তাহা করিতে পারে? যদি তাহাকে বলা যায়, "এই এই রকম কায কর, তাহা হইলেই রাগ করা বা ভালবাসা হইবে," আর সে যদি তাহাই করে তাহা হইলে তাহা যাত্রার সং ভিন্ন আর কিছুই নহে—প্রকৃত ভালবাসা বা রাগের কার্য্য নহে। রাগের বা ভালবাসার হেতু আছে, সেই হেতুর অভাবে

তৎতৎ বৃত্তির বাহ্যিক কার্য্য সকল দেখান থিয়েটারের অভিনয় মাত্র। সনাতন ধর্ম্ম যাহাকে ধর্ম্মজ্ঞান বলিয়া লক্ষ্য করেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, অন্য ধর্ম্মে তাহার আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না। সে ধর্ম্মজ্ঞানের হেতু আছে। সেই হেতু সাধন-মার্জ্জিত বুদ্ধি। যদি অপর ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সাধন ভজনে সাধকের বুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযোগী হয় হউক না, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই হইল। তবে ঋষিগণ আপনাদের পরীক্ষিত সিদ্ধিদায়ক পন্থা আপনাদের সন্তান সন্ততি ও শিষ্যপরম্পরাকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"মা ভৈষ্ঠ বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসার সিন্ধোস্তরনেহ স্ত্যুপায়ঃ
যেনৈব গতা যতয়োঽস্য পারং
তদেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি"

তাঁহারা অপর ধর্ম্মের পন্থা পরীক্ষা করেন নাই এবং করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। তাই তাঁহারা অপর ধর্ম্মের দ্বেষ করেন না। পুরুষ ক্রমাগত সংস্কার দুরপনেয় জানিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়া ইতঃভ্রষ্ট ততঃ নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় আপন সন্তান সন্ততি ছাড়া অপরকে এমার্গের উপদেশ দিবার বিধান করেন নাই।

একই ধর্ম্মের বিবিধ সম্প্রদায় দেখা যায়। অভিব্যক্তি লইয়া মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় এই সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিবাদ সে কেবল অহঙ্কারের সঙ্ঘর্ষ। আমিই সেখানে প্রধান। "আমি বলিতেছি এই মত ঠিক, তুমি কি বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হও।" "পৃথিবীতে দুইখানি মাত্র আক্কেল আছে, তাহার দেড়খানা আমার আর অর্দ্ধ খণ্ড অপর লোকে ভাগ করিয়া লইয়াছে।" এই অভিনিবেশই সকল সাম্প্রদায়িক মতভেদ ও কলহের মূল। মূল ঠিক আছে। লাণ্ঠানের ভিতর বাতি জ্বলিতেছে। সে লণ্ঠনে

বিবিধ রঙ্গের বিবিধ পরকোলা। আলোকে আকৃষ্ট পতঙ্গ সকল সেই পরকোলাগুলির উপর পড়ে। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিবে লাল আলো দেখিয়াছি, কেহ বলিবে সবুজ, কেহ বলিবে নীল। প্রত্যেকেই আপন আপন মত সমর্থন করিতে যত্নবান হইয়া কলহ করিবে। জগতে ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া কলহও এই-রূপ। যে সকল পতঙ্গ কোন প্রকারে লণ্ঠনের ছিদ্র দিয়া প্রকৃত আলোক দেখিয়াছে, অনুভব করিয়াছে এবং পরিণামে তাহাতে মিশিয়া গিয়াছে, তাহারা আর ফিরিয়া আসিয়া কাহাকে কোন কথা বলে নাই। তাই বলিতেছি বাহিরেই গোলমাল, ঝগড়া ও বিচার। ভিতরে সব একাকার। সেখানে যে অনুভূতি ও জ্ঞান তাহা উচ্ছিষ্ট হয় না, সুতরাং সেখানে প্রশান্ত নির্ব্বাত নিষ্কম্পভাব। শান্ত! শান্তি! শান্ত! চারিদিক শান্তিময়।

এখন দেখা যাইতেছে যে এই সুখেচ্ছা ও দুঃখ-পরিহার-বুদ্ধিই ধর্ম্ম বিশ্বাস ও নীতির মূল। ইহাই বল্লভাচারীর পুষ্টিমার্গের সূত্রস্থান। ইহাই বেদান্তবাদীর মূলসূত্র। ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তক। ইহাই খ্রীষ্টানধর্ম্মের ভিত্তি। ইহাই মুসলমানধর্ম্মের মূল। আত্মা সুখস্বরূপ, তাই জীব সুখ চায়। মায়াবিজড়িত বলিয়া বুঝিতে পারে না সে সুখ কি? জানে না তাহা কোথায় পাওয়া যায়। নিজেও অন্ধ, যাহাকে জিজ্ঞাসা করে সেও অন্ধ। তাই এত ছুটাছুটী, তাই এত উপায় উদ্ভাবন। তাই এত ধর্ম্ম সম্প্রদায়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ, সাধুগণ, ঋষিগণ, এই সুখ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরেন, আর বাঁশরী-মুগ্ধ গোপাঙ্গনাদের ন্যায় লোকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যায়। যদি বল তাহারা কি বিচার করে না? না, তাহারা সুখের গন্ধ পায়, স্বভাবতঃ সুখের অস্তিত্ব অনুভব করে, স্বভাবতঃ বুঝিতে পারে তাহারা যাহা চায়, উহা তাহাই, তাই

বলিয়া অধর্ম্মের পরাজয় হয়। এই সুখের নকল করিয়া অধর্ম্ম প্রথমে স্ফূর্ত্তি পায়। নীরবে তাহার গতি লক্ষিত হয়, ক্রমে বঞ্চনা ধরা পড়ে, তখন যায়ত ভালই, নচেৎ সমগ্র শক্তি একত্রিত হইয়া তাহার নাশ করে। তখন সমস্ত দেবগণ শক্তিসমূহ মূর্ত্তিমতী জগদম্বা মহিষাসুর বধ করেন। দেবগণের জয় হয়, ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড়ে। সাধু মহাত্মার এত সম্মান কেন? মুকুট-শোভিত নৃপতি-মস্তক, কৌপীনধারী বৃক্ষতলবাসী সাধুর চরণে কেন লুণ্ঠিত হয়? রাজা পার্থিব ধনে ধনী হইয়াও আপনাকে দরিদ্র মনে করেন। তাঁহার প্রাণ যে মহাধনের জন্য লালায়িত, সে মহাধন তাঁহার নাই। সে ধন পাইলে তাহার কাছে এ পার্থিব ধন তুচ্ছ হইবে। রাজা জানেন যে কৌপীনধারী সেই মহাধনে ধনী, অন্ততঃ সেই মহাধনের তত্ত্ব পাইয়াছেন। তাই রাজা তাঁর পদানত, কারণ নির্ধন ধনীর পদানত হয়, ধনী নির্ধনের পদানত হয় না। আশা—অভাব মোচন, যদি সেই মহাধনের তত্ত্ব পান, যদি কোন প্রকারে সেই মহাধন লাভ হয়। সমাজনীতি, রাজনীতি, সাধারণ নীতি সমস্তই এই সুখেচ্ছা ও দুঃখ-পরিহার বুদ্ধির উপর স্থাপিত; পাপপুণ্য জ্ঞান এই সুখেচ্ছা ও দুঃখ-পরিহার বুদ্ধির উপর স্থাপিত।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে।

আমরা কটক হইতে দেশে আসিতেছিলাম। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। এখন যেমন হাবড়া ষ্টেসনে বেলা ৩টার সময় টিকিট কিনিয়া মাদ্রাজ মেলট্রেনে উঠিয়া বসিলাম আর পরদিন প্রাতে ৮টা। ৯টার সময় একেবারে কটকে উপস্থিত হইলাম, তখন এপ্রকার ছিল না। তখনকার উড়িষ্যা যাইবার পথের দুর্গমতা উপলব্ধি করিতে হইলে আজকাল প্রত্নতত্ত্ববিদের আশ্রয় লইতে হয়। যখন উড়িষ্যায় ষ্টীমার চলিল তখন চলাপথের মাহাত্ম্য অনেক কমিয়া আসিল। তারপর এই নূতন রেলপথ খুলিয়া চলাপথ ত গেলই—ষ্টীমারও যেন কানা পড়িয়া গিয়াছে। এখন কটক যাইতে হইলে কেহ সাধ করিয়া আর চলাপথে যাইবেন না সুতরাং সেকালের উড়িষ্যাপথের কাহিনী পাঠ করিয়া বর্ত্তমান কটকযাত্রিগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কি ছিল আর কি হইয়াছে।

আমার পিতা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিত। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের সে প্রকার আকর্ষণ আজকাল কই দেখিতে পাই না। আমাদের আসিবার পূর্ব্বদিন স্কুলের ছাত্রগণ আমাদের বাসায় সমবেত হইয়া আমার পিতাকে বিদায়-পত্র প্রদান করিল। সেই কাঁদুনি সুরে গান করিয়া কবিতা পাঠ এখনও বেশ মনে পড়ে। বাবা যখন তাহাদের অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করিলেন তখন তাহারা যথার্থ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। সরল হৃদয় উৎকল যুবকেরা এই প্রকারে তাহাদের গুরুকে বিদায় দিয়া তাঁহার

রাত্রে তিনখানি শকট আসিয়া আমাদের দ্বারে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সেগুলিতে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বোঝাই করা হইতে লাগিল। খুব প্রাতে আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক আমরা শকট-আরোহণে মহানদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। স্কুলের ছাত্র, প্রতিবাসী, অনুগর্ত লোকজন সকলেই আমাদের সঙ্গে আসিতে লাগিল। আমার পিতা তাহাদের সহিত পদব্রজে আসিতে লাগিলেন।

কটক ছাড়িয়া বাঙ্গালার দিকে আসিতে হইলে প্রথমেই মহানদী পার হইতে হয়। মহানদী পার হইবার জন্য বড় বড় ক্ষেয়া নৌকা ছিল। দুইখানি সুবৃহৎ নৌকা পাশাপাশি বদ্ধ। এই প্রকার যোড়া নৌকা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। কদাচিৎ দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় প্রতিমা তুলিবার জন্য অথবা দক্ষিণ দেশীয় বিচালির নৌকা এই প্রকার যুগল মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। মহানদীর নৌকা দুইখানি এত বৃহৎ যে তাহাতে একেবারে ১১ কি ১৪ খানি শকট, ২৫।৩০টা শকট-বাহী বলীবৰ্দ্দ, গাড়ী, আরোহী, মালপত্র সমস্ত পারাপার করা হইত। নৌকায় দাঁড় টানা হইত না। লগি ঠেলিয়া এক পার হইতে অপর পারে যাইত। এই লগিগুলি এক একটি সুদীর্ঘ অখণ্ড বংশ। সমস্ত দিনে বোধ হয় দুইবার কি তিনবার মাত্র ক্ষেয়া দেওয়া হইত। কারণ এই সকল গরু, গাড়ী, মালপত্র উঠাইতে নামাইতে এবং এক পার হইতে অপর পারে যাইতে যথেষ্ট সময়ের আবশ্যক।

যথাসময়ে আমরা মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর তীরে উপনীত হইলাম। তখনও দেখিলাম মহানদার দক্ষিণ তীরে আমাদের অনুগামী সহৃদয় উড়িয়া, বাঙ্গালী এবং পাঠানেরা দাঁড়াইয়া আছেন। উৎকলে পাঠানদের প্রভুত্ব বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। এখনও অনেক পাঠান-বংশজাত জমীদার, তালুকদার ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কটকে আমাদের পাড়ায়

করিতেন। তিনি কি একটা হাকিমী করিতেন এবং তাঁহার ভূসম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল।

মহানদী পার হইয়া আমরা বরাবর উত্তর মুখে আসিতে লাগিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা বাগান কোথাও বা দূরে পশ্চিমে দিগন্তের কোলে মেঘের ন্যায় নীলাচলের শৃঙ্গমালা। পথের ধারে মাঝে মাঝে অগভীর জলাশয়ে পদ্ম, কহ্লার, কুমুদ এবং নীলোৎপল ফুটিয়া আছে। কখন কখন ২।৪ জন পথিক বা ২।৪ খানা শকট ধীরে ধীরে হেলিতে দুলিতে কটক অভিমুখে যাইতেছে। শকট-চালক এক একবার আপন মনে উচ্চস্বরে গান ধরিতেছে—"নব ঘন কালিয়ারে, তুলাগি মো প্রাণ গলা," আর এক একবার গরুর লাঙ্গুল তাড়না করিয়া তাহাকে দ্রুততর যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। পথের এক পার্শ্বে টেলিগ্রাফের লাইন। গাড়িতে বসিয়া বসিয়া যখন অতিশয় কষ্টবোধ হইত তখন আমরা মধ্যে মধ্যে চলিয়া যাইতাম। এই মানব-বিরল প্রান্তরের পথে অবরোধ প্রথার আবশ্যকতা ছিল না, তাই আমার মাতৃদেবীও মধ্যে মধ্যে গাড়ির সহিত চলিয়া আসিতেন। যখন বাবা এবং মা উভয়েই চলিয়া আসিতেন তখন আমাদের বড় স্ফূর্ত্তি হইত। আমরা দৌড়িয়া দৌড়িয়া অনেক অগ্রে চলিয়া যাইতাম। মাঠের মাঝে সরল বিস্তৃত রাজপথ; আমরা যত দূরেই যাই না কেন তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তরাল হইতাম না। আমরা তিনটি ভাই দৌড়াইয়া গিয়া এক একটা টেলিগ্রাফের স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইতাম আর ধাতুস্তম্ভের গাত্রে কর্ণসংলগ্ন করিয়া শুনিতাম তারে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ করিয়া কেমন একটা শব্দ হইতেছে। আমরা মনে করিতাম তারে খবর যাইতেছে তাহারই শব্দ। এক একবার স্থির চিত্তে শুনিতাম যদি সম্বাদের কোনও কথা বুঝিতে পারি। এক একবার মনে হইত যেন খুব দূরে

ভাল আছি।" তখন মনে ধারণা ছিল পত্রেই হউক আর টেলিগ্রাফেই হউক "তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি" ইহাই সকল সম্বাদের প্রধান এবং সার।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথের পার্শ্বে এক একটা আড্ডাতে আমরা আশ্রয় লইতাম। এই আড্ডাগুলিকে "চটী" বলে। ৪।৫ ক্রোশ অন্তর পথের ধারে দুই তিন খানি মুদীর দোকান এবং ৪।৫ খানা সুদীর্ঘ তৃণাচ্ছাদিত কুটীর। কুটীরগুলি পথিকদের থাকিবার আশ্রয়। সকল চটীর নিকটে গ্রাম থাকে না। এক একটা চটী গ্রাম হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরেও অবস্থিত আছে। যে সকল চটী এই প্রকার গ্রাম হইতে অনেক দূরে অবস্থিত সে সকল চটীতে দোকানদারেরা রাত্রে অবস্থান করিত। যেখানে গ্রাম নিকট সেখানে তাহারা সমাগত পথিক-দিগের প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্যাদি দিয়া তাহার মূল্য মায় ঘরভাড়া পর্য্যন্ত আদায় করিয়া রাত্রি ৯টা ১০টার সময় দোকান বন্ধ করিয়া গ্রামে চলিয়া যাইত। যেখানে গ্রাম নিকটে অথবা আড্ডাধারীরা রাত্রে আড্ডায় অবস্থান করে, সেখানে পথিকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি যাপন করিতে পারে। কিন্তু যদি গ্রাম নিকটে না থাকে এবং আড্ডা-ধারীও রাত্রে আড্ডায় না থাকে তাহা হইলে সে সকল স্থলে প্রায়ই রাত্রে ডাকাতি হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য নিকটে গ্রাম না থাকিলে পথিকেরা অগ্রে গিয়া জিজ্ঞাসা করে যে আড্ডাধারী রাত্রে চটীতে থাকে কি না।

সন্ধ্যার সময় আমরা কোনও চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় রন্ধনাদি পূর্ব্বক আহার শেষ করিতাম ও ৪।৫ ঘণ্টামাত্র বিশ্রামপূর্ব্বক রাত্রি ২৷৷০টা কি ৩টার সময় গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া পরদিন বেলা আটটা কি নয়টার সময় আর একটা চটীতে উপস্থিত হইতাম। দিনমানে আড্ডাতে

আবার গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নূতন আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ, এই আমাদের দৈনিক কার্য্য। সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকা থাকিলে মধ্যে মধ্যে বড় বিপদে পড়িতে হইত। আমাদের সহিত আমার এক দুগ্ধপোষ্যা সহোদরা ছিল। তাহার জন্য প্রত্যহ দুগ্ধ সংগ্রহ এক অবশ্যকর্ত্তব্য এবং অতিরিক্ত কার্য্য হইয়াছিল। উড়িষ্যার পথে দধি ও দুগ্ধ অত্যন্ত সুলভ। এক সের দুগ্ধ বা দধির মূল্য দুই পয়সার অধিক নহে, কিন্তু সকল দিন পাওয়া যাইত না। সময়ে সময়ে এক সের দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার জন্য আট আনা কি দশ আনা পুরস্কারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া দোকানদারকে গ্রামে পাঠাইতে হইত। ৩।৪ দিন অন্তর এক একটা সহর বা সমৃদ্ধ গ্রাম পাওয়া যাইত, সেই সকল গ্রামে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য মিষ্টান্নাদি সংগৃহীত হইত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় বোধ হয় "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধকে ব্যবহারে আনা" এদেশে প্রচলিত হয় নাই—হইলে, আমাদের দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য অত কষ্ট পাইতে হইত না। ফলতঃ Condensed milk তখন বাঙ্গালায় আমদানী হইলেও বাঙ্গালী মহলে বড় প্রচলিত হয় নাই এবং কলিকাতার বাহিরে পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

এই প্রকারে ১৩।১৪ দিন অতীত হইলে আমরা সুবর্ণরেখা পার হইয়া বাঙ্গালার প্রবেশ করিলাম। বালেশ্বরের সীমানা পার হইয়া মেদিনীপুরের এলাকায় পদার্পণ করিলাম। কিন্তু এখনও উড়িয়া ভাষা ও উড়িয়া আচার ব্যবহারের হাত হইতে নিস্তার পাই নাই। যেখানে এক জেলা শেষ হইয়া অপর জেলা আরম্ভ হইয়াছে সেই স্থানে ডাকাতের ভয় কিছু অধিক। উড়িষ্যার পথে কোথায় বা ভয় ছিল না ? তথাপি দুই জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ডাকাতেরা অতি সহজে আইনের চক্ষে ধূলি দিতে পারিত। উড়িষ্যা এবং বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী স্থানে

উৎকলের পার্ব্বত্য জাতি। তাহারা উড়িয়া এবং পাহাড়ি উভয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। আকৃতি প্রকৃতি উড়িয়াগণের ন্যায় হইলেও তাহারা উড়িয়া অপেক্ষা বলবান, ভীষণদর্শন, নিষ্ঠুর এবং শঠ। তাহাদের পরিধান একখানি সামান্য কৌপিন মাত্র। ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গ মসীলিপ্ত করিয়া ভীষণদর্শন মূর্ত্তিকে ভীষণতর করিয়া তুলিত। সকলেই শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করিত এবং যাহাদিগকে আক্রমণ করিত তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইত না—সকলকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া রাখিয়া যাইত। তাহাদের অত্যাচারে দুগ্ধপোষ্য শিশুও পরিত্রাণ পাইত না।

কটক ত্যাগের ১৩।১৪ দিন পরে আমরা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারাণগড় নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নারাণগড়ে এক রাজার রাজধানী ছিল। রাজার কেল্লা আছে। কেল্লার চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য সকণ্টক বেউড়বাঁশের প্রাচীর। এই বাঁশঝাড়সকল এত ঘন যে তন্মধ্যে গুলি প্রবেশ করে না। কেল্লার মধ্যে প্রবেশের পথ সকলে জানে না। কেল্লার মধ্যে কামান, গোলাগুলি ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশলাভ করা যে অতি দুরূহ ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি আমেরিকার আদিমনিবাসিগণ কেহ কেহ আপনাদের আড্ডা এই প্রকার বেউড়বাঁশের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখে। এই বংশ-বেষ্টিত কেল্লা ভেদ করিতে উনবিংশ শতাব্দীর উন্নত বিজ্ঞানকেও বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়।

নারাণগড় ত্যাগ করিয়া আমরা একটা ক্ষুদ্র নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। কটক হইতে আসিতে আসিতে এই প্রকার ক্ষুদ্র নদী যে কত পার হইতে হয় তাহার শেষ নাই। এই সকল নদীতে নৌকা চলে না। এক হাঁটু জল, অনায়াসেই চলিয়া পার হওয়া যায়। বলা

যে ক্ষুদ্র নদীটির কথা বলিতেছি তাহার ধারে একটা আড্ডা ছিল। পথে আমাদের সহযাত্রী অনেক জুটিয়াছিল। আমাদের তিন খানি এবং অন্যান্য লোকেরও ৪।৫ খানি মোটের উপর ৭।৮ খান গাড়ী একত্র আসিতেছিল। পথে আসিতে আসিতে এই সকল সহযাত্রীদের সহিত বেশ ভাব হইয়াছিল। আমাদের সহযাত্রীরা বলিল যে নদীর ধারে এই আড্ডাতে আজ রাত্রি অতিবাহিত করা যাউক। তখন বেলা বোধ হয় ৪টা হইবে। আমার পিতা বলিলেন আর এক ক্রোশ কি দুই ক্রোশ দূরে মকরমপুরের চটীতে যাওয়া যাউক, এখনও যথেষ্ট বেলা আছে অনায়াসে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা তথায় যাইতে পারিব। সহযাত্রীদের মত হইল না। তাহারা নদীর ধারে আড্ডায় অবস্থান করিল, আমাদের তিন খানি শকট মকরমপুর অভিমুখে চলিল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা মকরমপুরে উপস্থিত হইলাম। এস্থানের ভাষা বোধ হয় ঠিক উড়িয়া নহে। আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া আমার পিতা প্রথমে সন্ধান লইলেন যে আড্ডাধারী চটীতে রাত্রে থাকিবে কি না? থাকিবে শুনিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। মাতাঠাকুরাণী রন্ধনাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আড্ডাঘরের সম্মুখ দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রাজপথ। আড্ডার পশ্চাতে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী, তাহার চারিধারে মৃত্তিকাস্তূপ যেন ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় রহিয়াছে। আর আড্ডার চারিদিকে ধান্যক্ষেত্র, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, কেবলই ধান্যক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে দুই একটা বৃক্ষ—লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই।

আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া অল্পক্ষণ পরেই আমাদের একজন শকট-চালকের জ্বর হইল। তাহার নাম রঘুয়া। রঘুয়া যেমন বলবান তেমনি সাহসী। লাঠি এবং তলোয়ার খেলিতে বিশেষ দক্ষ। কটকে

আমাদের লোকবলের মধ্যে আমার পিতা—নিরীহ ভালমানুষ স্কুল মাষ্টার; আমার একজন মাতুল—ইনি বলবান সাহসী এবং কার্য্যতৎপর হইলেও রাত্র্যন্ধ; আমার মাতার মাতুল—ইঁহার নিবাস কটক জেলার কেন্দ্রাপাড়ার নিকট জগন্নাথপুর, ইনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও উপদেষ্টা কিন্তু প্রাচীন, আমরা তিন সহোদর, সকলেই শিশু এবং তিনজন শকট-চালক। শকটচালকেরাই ভৃত্যের কার্য্য করিত। স্ত্রীলোক দুই তিনজন। সুতরাং পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে মকরমপুরের চটীতে আমাদের কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে দুইজন শকট-চালক এবং আমার পিতা ভিন্ন আর কেহই রক্ষক নাই। তখন জানিতাম না যে মানুষ রক্ষক নহে, রক্ষক আর একজন! আমাদের রন্ধনাদি হইতেছে এমন সময় কালান্তক যমের ন্যায় একজন লোক আড্ডাধারীর নিকট গিয়া চুপে চুপে অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণ-কাল পরে আর একজন লোক, পরে আর একজন লোক, এই প্রকারে ৪।৫ জন লোক একে একে আসিয়া আড্ডাধারীর সহিত কি চুপে চুপে পরামর্শ করিয়া প্রস্থান করিল। রাত্রি প্রায় ৯টার পর আড্ডাধারী আসিয়া আমার পিতাকে বলিল "আপনাদের যে যে দ্রব্য আবশ্যক হইতে পারে এই বেলা লইয়া রাখুন আমাকে ঘরে যাইতে হইবে, আমার আবশ্যক আছে।" এই কথা শুনিয়াই আমার মাতুল সক্রোধে বলিলেন "তুই যখন বলিলি যে রাত্রে চটীতে থাকিবি তখন কখনও রাত্রে যাইতে পারিবি না। তোকে থাকিতেই হইবে।" এই প্রকারে তাহার সহিত মহা বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমরা বুঝিতে পারিলাম গতিক বড় ভাল নহে। ইত্যবসরে একজন উড়িয়া নিরীহ ভালমানুষের মত আসিয়া আমার দাদামহাশয়কে (মাতার মাতুলকে) জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন? কোথায় যাইবেন?" প্রশ্ন শুনিয়াই দাদামহাশয় সক্রোধে বলিলেন "আমরা কোথায় যাইব

তোর কি? আমরা রামপুর হইতে আসিতেছি হরিপুরে যাইব।" সে লোকটা দাদামহাশয়ের নিকট তাড়া খাইয়া চলিয়া গেল। প্রশ্ন-কারাকে এই প্রকার কেন তাড়া দেওয়া হইল তাহা বোধ হয় পাঠক-গণকে বলিয়া দিতে হইবে। ডাকাতের দলের সন্ধানি লোকে প্রথমে নানা প্রকারে সন্ধান লয়। যদি বুঝিতে পারে যে বহুদূর হইতে আসিতেছে এবং বহুদূরে যাইবে তাহা হইলে অনুমান করিয়া লয় যে নিকটে অধিক টাকা আছে। যদি নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে আইসে এবং গন্তব্য স্থানও নিকটবর্ত্তী হয় তাহা হইলে সঙ্গে অধিক অর্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান পথিক হয় প্রশ্নকারীকে তাড়াইয়া দেয় নচেৎ মিথ্যাকথায় ভুলাইয়া দেয়। আর এক প্রকারে ডাকাতেরা পথিকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া থাকে। রাত্রে একজন একটা তৈল-বর্ত্তিকাহীন প্রদীপ আনিয়া পথিকের নিকট হইতে একটু তৈল বা একটা সলিতা চাহিয়া থাকে, পথিক নির্ব্বোধ হইলে নিজের প্রদীপ কক্ষ হইতে বাহির করিয়া আনে। আগন্তুক পথিকের হস্তস্থিত প্রদীপ ফেলিয়া দিয়া অথবা ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে এবং সম্মুখে যাহা পায় তাহাই লইয়া প্রস্থান করে।

আমাদের রন্ধনাদি হইতেছে এমন সময় আর একটা লোক গৃহের দ্বারের নিকট আসিয়া বলিল "ঠাকুরাণি টিকে নিয়া দিয়।" (ঠাকুরাণি একটু আগুন দাও।) তাহার কথা শুনিবামাত্র আমার দাদামহাশয় তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। সে প্রস্থান করিলে আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে আমরাই সে রাত্রে ডাকাতগণের লক্ষ্য হইয়াছি। ইত্যবসরে দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় আমাদের পানীয় জল ফুরাইয়া গেল। একজন শকট-চালক একটা কলস লইয়া পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীর তীরে উচ্চ তট ভূমিতে

উপস্থিত হইয়াই সবেগে আসিয়া বলিল “আর রক্ষা নাই, ডাকাত আসিতেছে।” তাহার কথা শুনিয়া আমার পিতা ও দাদামহাশয় সেই মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দেখিলেন যে রাজপথের উপর আড্ডার দক্ষিণে প্রায় দুই শত হাত দূরে অনেকগুলি মশাল জ্বলিতেছে এবং মশালের আলোকে দেখিতে পাইলেন যে সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ প্রায় উলঙ্গ কতকগুলি লোক, প্রায় ২০।২৫ জন হইবে, উন্মুক্ত অস্ত্র হস্তে অতি ধীরে ধীরে আড্ডার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন সেই প্রকার আর একদল লোক উত্তর দিক হইতে আসিতেছে। দেখিয়াই আসন্ন মৃত্যু স্থির জানিয়া সকলে আড্ডায় ফিরিয়া আসিলেন। আর বড় অধিকক্ষণ নহে, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের লীলাখেলা শেষ হইবে। তখন সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কেহ বলিলেন যে আড্ডার পশ্চাতে ধান্যক্ষেত্র মধ্যে লুকাইয়া থাকাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সঙ্গে ছোট ছোট বালক বালিকা তাহারা ক্রন্দন করিয়া শব্দ করিতে পারে বলিয়া সে যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তখন সকলে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম আমরা আড্ডার দক্ষিণ প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছিলাম। উত্তর প্রান্তে আর একজন পথিক আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের সহিত তিন চার খানা শকট ছিল। সন্ধ্যার পর আমরা আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম সেইজন্য অন্যান্য পথিকের সহিত আমাদের আলাপ করিবার সুবিধা হয় নাই। এই বিপৎপাতে তাহারাও বিপন্ন এবং বোধ হয় এখনও এ বিপদের কথা তাহারা জানিতে পারে নাই এই সকল মনে করিয়া তাহাদিগকে সম্বাদ দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। আমার পিতা সেই পথিকদের নিকট গিয়া দেখিলেন যে তাহাদের কর্ত্তা একজন প্রাচীন মাড়োয়ারী। তাঁহাদের সহিত [illegible]

বা বালক বালিকা নাই। মাড়োয়ারী একজন ব্যবসাদার, তিনি উড়িষ্যার গড়জাত মহলে রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকেন। তিনি কলিকাতা হইতে প্রায় ৫।৬ হাজার টাকার বস্ত্রাদি লইয়া গড়জাত যাইতেছেন, সঙ্গে ৫।৬ জন ভৃত্য, সকলেই সাহসী।

আমার পিতাকে সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিয়া এবং পিতার নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি স্বীয় ভৃত্যগণকে সম্বোধন করিয়া কি একটা আদেশ করিলেন, তাহার মধ্যে আমার পিতা কেবল "বন্দুক" শব্দটি বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি পিতার সহিত আমাদের বাসার নিকট আসিয়া আমার মাতার নিকট গিয়া বলিলেন "বেটি! রোয়ো মৎ, তু মেরা বেটী, ময়্ তেরি বাপ্।" মা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সরোদনে বলিলেন "আপনি আমার পিতা, আজ কন্যাকে রক্ষা করুন।" বৃদ্ধ অভয় দিয়া বলিলেন "আমার নিকট ছয়টা দোনলা বন্দুক আছে, ছয়জন সাহসী ভৃত্য আছে; যতক্ষণ আমরা জীবিত থাকিব ততক্ষণ কেহ তোমার বা বালক বালিকাগণের কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি নির্ভয়ে বালকগণকে আহারাদি করাও, বাবুকে আহারাদি দাও, তোমার কোনও ভয় নাই।" এমন সময় তাঁহার ছয়জন ভৃত্য ছয়টা বন্দুক কাঁধে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই পুষ্করিণীর তীরে মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিলেন। শকট-চালকগণ এবং আমার পিতাকে আড্ডার স্ত্রীলোক-গণের নিকট থাকিতে বলিলেন।

মৃত্তিকাস্তূপে উঠিয়া তিনি একবার দস্যুগণকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া অনুচরগণকে বলিলেন প্রথমে একবার ফাঁকা আওয়াজ কর, যদি উহারা না পালায় তাহা হইলে গুলি চালাও। মশাল দেখিবে আর গুলি চালাইবে।"

সেই গভীর মধ্য-রাত্রে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে সেই বজ্রধ্বনি তুল্য শব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলাম। আমাদের মনে হইল এই বার ডাকাত পড়িয়াছে। মা আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়াই দস্যুরা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আবার ফাঁকা আওয়াজ হইল। এই প্রকারে চার পাঁচ বার ফাঁকা আওয়াজ হইলে পর ডাকাতেরা ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। মাড়োয়ারীর আদেশক্রমে দশ পনের মিনিট অন্তর বজ্র-নির্ঘোষে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র গর্জ্জন করিতে লাগিল। ডাকাতেরা ক্রমে ক্রমে বহুদূরে চলিয়া গেল ও অবশেষে মশাল নির্ব্বাপিত করিয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। তখন সেই প্রাচীন মাড়োয়ারী আমাদের বাসার নিকট সমাগত হইয়া আমাদের শকট-চালকগণকে এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকজনকে সমস্ত রাত্রি গান বাজনা গোলমাল করিয়া রাত্রি যাপন করিতে বলিলেন। মধ্যে মধ্যে ২।১ বার বন্দুকের শব্দও করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশে সকলে সাধ্যমত গোলমাল চীৎকার আরম্ভ করিল। এই প্রকার কোলাহল মধ্যে সেই ভয়ঙ্করী রজনী প্রভাত হইল। আমরা সচরাচর রাত্রি ৩টা বা ৩।০টার সময় আড্ডা ত্যাগ করিতাম, কিন্তু সে দিন সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে মকরমপুর ত্যাগ করিলাম। বিদায়কালে সেই জীবন-দাতা প্রাচীন মাড়োয়ারীকে চক্ষুর জলে অভিষিক্ত করিয়া মা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গলকামনা করিলেন। আমার পিতা, দাদামহাশয় এবং মামা বারম্বার তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সেই উপকারের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের সহানুভূতি লইয়া বৃদ্ধ মাড়োয়ারী দক্ষিণ মুখে কটকের দিকে এবং তাঁহার দত্ত জীবন লইয়া আমরা উত্তর মুখে মেদিনীপুরের দিকে প্রস্থান করিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়।

B... .. AL LIBRARY.
W...TERS' BUILDINGS
Recd. on the 21 JAN 1903

প্রাচীন ভারতের লিচ্ছবিজাতি।

মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থপাঠে দৃষ্ট হয় অতি পুরাকাল হইতে বিদেশীয় জাতিসমূহ ভারতে প্রবেশলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্তর্লীন হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে জাতির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইবে উহাঁরা খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়জাতি মধ্যে 'বলীন হইয়া গিয়াছেন। এই জাতির নাম লিচ্ছবি। পালিভাষার গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দু সংস্কৃতগ্রন্থে তাঁহারা লিচ্ছিবি নামে উক্ত হইয়াছেন। সুবর্ণ-প্রভাস-সূত্র প্রভৃতি মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগ্রন্থে লিৎসবি এই নাম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন তাম্রশাসন, ইষ্টক-লিপি ইত্যাদিতে লিচ্ছিবি এই নামের উল্লেখ আছে। তিব্বতীয় গ্রন্থকারগণ এই জাতিকে লি-চ-ব্যি এই নামে বর্ণন করিয়াছেন।

লিচ্ছবিজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন :—

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥—(মনুসংহিতা ১০।২২)।

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় এই সকল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

উদ্ধৃত বচনদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় মনুর সময়ে লিচ্ছবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ব্রাত্য শব্দের অর্থ সংস্কারবিহীন। অতএব লিচ্ছবিজাতির মধ্যে উপনয়নাদি সংস্কার প্রচলিত ছিল না।

উপবীতাদি ধারণ করিতেন না। তাঁহাদের বিলক্ষণ পরাক্রম ছিল বলিয়া মনু তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় জাতিমধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন।

সানাঙ্‌ সেচেন্‌ প্রাচ্য মঙ্গোলিয়জাতির ইতিহাস নামক প্রাচীন মঙ্গোলিয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন শাক্যজাতি যে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন লিচ্ছবি উহাদের অন্যতম। হঙ্গেরিদেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত সোমা দি কোরোস্‌ বলেন শাক্য ও শক একই জাতি। অতএব তাঁহার মতে লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ শকজাতির একটী শাখা মাত্র।

সামুয়েল্‌ বীল্‌ বলেন ভূপালরাজ্যে সাঞ্চী নামক যে স্তূপ দৃষ্ট হয় উহা বোধ হয় লিচ্ছবিগণের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থ-সমূহে লিখিত আছে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভস্মীভূতদেহের অষ্টমভাগ লিচ্ছবিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ অংশের উপর একটী প্রকাণ্ড স্তূপও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই স্তূপ কোথায় তাহার কোন নিদর্শন নাই। বীল্‌ বলেন লিচ্ছবিগণ যে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাই বোধ হয় বর্ত্তমান সাঞ্চীস্তূপ। ঐ স্তূপে যে সকল নরমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় উক্ত স্তূপ-নির্ম্মাণকারিগণ উত্তরদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেণীবদ্ধ দোলায়মান কেশ-গুচ্ছ ও বাদ্যযন্ত্রাদি দেখিয়া অনুমান হয় চীনসাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তে কু-চে নামক যে দেশ বিদ্যমান ছিল উহাই তাঁহাদের আদিম বাস-ভূমি। বৌদ্ধগ্রন্থে লিচ্ছবি-জাতির নানা অলঙ্কার-বিভূষিত সমুজ্জ্বলবেশের বর্ণনা পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুত্ত-নিপাতের একস্থানে লিখিত আছে স্বর্গের দেবগণ নানা-বর্ণ-রঞ্জিত মহামূল্য পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া কিরূপ শোভা পান তাহা যদি কেহ দেখিতে চান তাহা হইলে লিচ্ছবি-কুমারগণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া বীল্‌ বলেন চীনদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে প্রবল-পরাক্রান্ত য়ুয়ে-চি (Yue-chi)

জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদেরই এক শাখা হইতে লিচ্ছবিজাতির উদ্ভব হইয়াছিল। য়ুয়ে-চিগণ পূর্ব্বোক্ত কু-চে নামক স্থানে বাস করিতেন। হিয়াংনুদিগের নিকট পরাজিত হইয়া য়ুয়ে-চিগণ পশ্চিমাভিমুখে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দিকে আগমন করিয়াছিলেন।

আমার মত অন্যরূপ। আমার বোধ হয় লিচ্ছবিগণ নিসিবি নামক স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রাচীন আরিয় নামক জনপদে বর্ত্তমান হিরাটের সন্নিধানে নিসিবি নামে একটী সুপ্রসিদ্ধ নগর বিদ্যমান ছিল। ঐ স্থানের অধিবাসিগণ নিসিবি নামে অভিহিত ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হিন্দু সংহিতাকার মনু লিচ্ছবিগণকে নিচ্ছিবি এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই নিচ্ছিবি ও পূর্ব্বোক্ত নিসিবি বোধহয় একই জাতি। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমি লিখিয়াছেন আরিয় জনপদের উত্তরাংশেই নিসিবি জাতির বাসভূমি। টলেমির মতে উহাঁদের প্রকৃত নাম (Nisaioi) নিসইওই। Arrian উহাঁদিগকে নাইসইওই (Nysaioi) নামে অভিহিত করিয়াছেন। Arrian আরও লিখিয়াছেন Nysaioi ভারতবর্ষজ লোক নহেন। গ্রীকদেবতা Dionysos অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ভারতের প্রান্তে Nysa নামক স্থানে তিনি একটী গ্রীক উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ উপনিবেশের নাম Nysaia। Dionysos সম্বন্ধীয় বার্ত্তা অলীক হইলেও Nysa নামক স্থানটী নিতান্ত কাল্পনিক নহে। এল্‌বর্জ পর্ব্বতের উত্তরে অস্তরাবাদ ও মেস্‌দ নগরের মধ্যে নিস্‌স (Nissa) নামে যে স্থান বিদ্যমান আছে উহা ও Dionysosএর নাইস (Nysa) বোধ হয় পরস্পর ভিন্ন নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই Nysa নগর যদি গ্রীকদেবতা Dionysos সংস্থাপন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে কে উহার প্রতিষ্ঠা করিল? আমার বোধ হয় উহা প্রাচীন ইরাণীয় (পারসিক) জাতির প্রতিষ্ঠিত। Nysa এই শব্দটী

প্রাচীন ইরাণীয় (পারসিক) ভাষার শব্দ। আর জেন্দ্ আবেস্ত গ্রন্থে ভূ-চক্র বর্ণন অধ্যায়ে পুনঃপুনঃ Nysa বা Nysaya এইরূপ ভাবের নাম দৃষ্ট হয়। অতএব প্রাচীন পারসিক জাতির সংস্থাপিত নগর-বিশেষের নাম Nysa, এবং উহার অধিবাসিগণ Nysaioi বা Nisibi। এই (Nisibi) নিসিবি, নিচ্ছিবি ও লিচ্ছবি একই জাতির নাম। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে যে (Nesei) নিসিই জাতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহারাও বোধ হয় এই নিসিবি জাতি হইতে ভিন্ন নহে।

খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে লিখিত মহাপরিনির্ব্বান স্থত্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ পাঠে লিচ্ছবি জাতির সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। সুবিখ্যাত বজ্জি জাতির যে অষ্টকুল বিদ্যমান ছিল লিচ্ছবি তাহাদের অন্যতম। লিচ্ছবিগণ বৈশালী নগরীতে (বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বসার গ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে) বাস করিতেন। মহাপরিনির্ব্বান সুত্তের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে মগধরাজ অজাত-শত্রু লিচ্ছবি প্রভৃতি অষ্টবজ্জিকুলকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত পাটলীগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু দুইজন ব্রাহ্মণঅমত্যকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্ কি উপায়ে বজ্জিজাতিকে ভারত হইতে বিদূরীত করিব ?" বুদ্ধদেব উত্তরচ্ছলে বলিয়াছিলেন "যতদিন বজ্জিজাতির অষ্টকুল একতা-সূত্রে বদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে কেহই পরাজিত করিতে পারিবে না।" যাহা হউক বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের তিন বৎসর মধ্যে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে পূর্ব্বোক্ত অজাতশত্রু বজ্জিজাতির অষ্টকুলের মধ্যে এরূপ ভেদ সংঘটন করেন যে প্রত্যেকেই অতি সহজে পরাজিত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে বুদ্ধদেবের ভস্মীভূত দেহের এক অংশ

বৈশালীর লিচ্ছবিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে কুশীনগরে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ঐ সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবিগণ কুশীনগরে আগমনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন “ভগবান্ বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, অতএব আমরাও ভগবানের দেহের এক অংশ পাইতে পারি”। লিচ্ছবিগণের এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে তাঁহারা ক্ষত্রিয়জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাও এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে এই সময়ে লিচ্ছবিগণের মধ্যে সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত ছিল। তাঁহারা কোন রাজার অধীন ছিলেন না পরন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞান-জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের উপদেশ অনুসারে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন।

সিংহলের ইতিহাস মহাবংশ পাঠে জানা যায় অজাতশত্রুর বংশধরগণ খৃঃ পূঃ ৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ঐ বৎসর লিচ্ছবিবংশীয় শিশুনাগ মগধরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া পড়েন। অজাতশত্রুর বংশধরগণের মধ্যে নাগদাসক সর্ব্বশেষ রাজা। সিংহল দেশের অনুরাধপুর নগরে উত্তর বিহারে রক্ষিত অংকথা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে লিচ্ছবিবংশীয় শিশুনাগ, নাগদাসকের প্রধান অমাত্য ছিলেন। শিশুনাগ একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। অজাতশত্রুর বংশীয় রাজগণ প্রত্যেকেই স্বীয় পিতার বধ সাধন করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। প্রজাসকল এই পিতৃঘাতী নৃপতি-গণের প্রতি বিরক্ত হইয়াও শিশুনাগের অসাধারণ বিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকেই মগধরাজ্যে বরণ করেন। শিশুনাগ অষ্টাদশ বর্ষ কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র কালাশোক ২৮ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন। কালাশোকের দশ পুত্র ক্রমান্বয়ে ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পরই নন্দবংশীয় রাজগণ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহল দেশীয় পালি

বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে অন্যরূপ। মহাবংশের মতে শিশুনাগবংশীয় রাজগণ সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮ বৎসর রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে তাঁহাদের রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর। যাহা হউক এই দুই গ্রন্থের বর্ণনায় এরূপ পার্থক্য ঘটিল কেন তাহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করা কোন ক্রমেই আমার অভীপ্সিত নহে।

যদিও লিচ্ছবিগণ অতি অল্পকালই মগধরাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহারা ধর্ম্মজগতে এক বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত বচন পাঠ করিয়া আমরা দেখিয়াছি লিচ্ছবিগণ মনুর সময়ে উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন ছিলেন। মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত প্রভৃতি পালিগ্রন্থ পাঠে জানা যায় তাঁহারা বুদ্ধদেব ও তাঁহার ধর্ম্মে নিরতিশয় বিশ্বাস করিতেন। দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে লিচ্ছবিগণ বুদ্ধদেবকে নানা প্রকারে সেবা করিতেন। বিনয় পিটকের চুল্ল বগ্‌গ ও মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বোধ হয় লিচ্ছবিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বুদ্ধদেবের উপদেশসমূহ অক্ষরে অক্ষরে অনুবর্ত্তন করিতেন না। তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সংঘটন করেন। খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে বৈশালীর লিচ্ছবি বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট নিয়মসমূহের কতিপয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দশটী বিষয়ের প্রস্তাব করেন। এই দশটী প্রস্তাব অবগত হইয়া জম্বুদ্বীপের সমস্ত ভিক্ষু সমবেত হন। তাঁহারা অবিলম্বে উক্ত প্রস্তাবকারী লিচ্ছবি বৌদ্ধগণকে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ করিয়া দেন। এই সময়ে লিচ্ছবিবংশীয় দশহাজার বৌদ্ধভিক্ষু বৌদ্ধসমাজ হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহারা এক স্বতন্ত্র বৌদ্ধসমাজের সৃষ্টি করেন, তাহাকে মহাসংগীতি বলে। যদিও লিচ্ছবিগণ এইরূপ যথার্থ বৌদ্ধ

সম্প্রদায় হইতে বিদূরিত হন তথাপি তাঁহারা যে প্রাচীনকালের বৌদ্ধ সমাজের বিজ্ঞতম সভ্য ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অঙ্গুত্তর নিকায় নামক পালিগ্রন্থে দেখা যায় বুদ্ধদেব অভয় ও পণ্ডিত কুমারক নামক দুইজন লিচ্ছবি যুবকের সহ নানা সুগম্ভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ ধর্ম্মপদের ব্যাখ্যায় একটী গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হয় বৈশালীর লিচ্ছবি ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবিষয়ে অসীম উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। মহাবংশের ৯৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে এই পৃথিবীতে যে সকল লোক সুখ ও শান্তিতে বাস করেন লিচ্ছবিকুমারগণ তাঁহাদের আদর্শস্থানীয়।

লিচ্ছবিগণ ভারতে প্রভূত রাজনৈতিক উন্নতিও লাভ করিয়াছিলেন। যতদিন তাঁহারা মগধরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন তত দিনই কেবল তাঁহাদের প্রভাব ভারতে বিদ্যমান ছিল এরূপ নহে। তাঁহাদের রাজ্যকাল পরিসমাপ্ত হইবার পরেও ভারতবাসিগণ তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় সম্মান করিতেন। লিচ্ছবিগণের বংশোপাধি কুমার। ইহার অর্থ রাজপুত্র। লিচ্ছবিগণ বংশাবলীক্রমে রাজপুত্র নামে পরিচিত ছিলেন। গয়া হইতে প্রাপ্ত সমুদ্রগুপ্তের তাম্রশাসনে দেখা যায় খৃঃ পূঃ ৩২০ অব্দে মগধসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশীয় কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। মহাকুল সম্ভূত কুমার দেবীকে বিবাহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নিরতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় লিচ্ছবি বংশ চন্দ্রগুপ্তের বংশ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। জাতক নামক সুপ্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থের সিগাল-জাতকে লিখিত আছে বৈশালী নগরীর এক নাপিত-পুত্র কোন লিচ্ছবিকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য একদা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। নাপিত স্বীয় পুত্রের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিল “বৎস অবস্তুতে

দুহিতা মহাকুলসম্ভূত লিচ্ছবিকুমারীই বা কে, তোমারসহ ইহার মিলন কোন ক্রমেই যোগ্য হইবে না, জাতি ও গোত্রে তোমার সুসদৃশ কোন কন্যাকে আমি অন্বেষণ করিতেছি।” পুত্র পিতার কথায় কর্ণপাত করিল না। অনন্তর তাহার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে বোঝাইতে লাগিল তাহাতেও সে সান্ত্বনালাভ করিল না। দিন দিন সে ক্ষীণশরীর হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই সকল প্রাচীন গল্পেও লিচ্ছবিবংশের মহামর্য্যাদা প্রকাশিত হইয়াছে।

লিচ্ছবিজাতি যে কেবল ভারতেই প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল এরূপ নহে। উহারা নেপালেও বহু শতাব্দী কাল রাজত্ব করিয়াছিল। বংশাবলী নামক সুপ্রসিদ্ধ নেপালী সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় নেপালের প্রথম রাজা সূর্য্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। তদনন্তর অনেক রাজার পর দশরথ নামক এক ব্যক্তি নেপালের অধীশ্বর হন। তদনন্তর আট জন নরপতি ক্রমান্বয়ে তথায় রাজত্ব করেন। ইহার পরই সুবিখ্যাত লিচ্ছবি নেপালের রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। অনন্তর কতিপয় রাজার পর সুপুষ্প নামক এক ব্যক্তি নেপালে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার পর অপর ২৪ জন রাজা নেপাল রাজ্য ভোগ করেন। তাহার পরই জয়দেব নেপালের রাজা হন। জয়দেবের পর ১১ জন রাজা ক্রমান্বয়ে নেপাল শাসন করেন। তাহার পর বৃষদেব, শঙ্করদেব, ধর্ম্মদেব, মানদেব, মহীদেব, বসন্তদেব প্রভৃতি নরপতিগণ নেপালরাজ্য শাসন করেন। বসন্তদেবের পরবর্ত্তী রাজগণের নাম উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহা প্রকাশ থাকা উচিত যে লিচ্ছবি নামক রাজার পরবর্ত্তী সকল নরপতিই লিচ্ছবিবংশসম্ভূত ছিলেন। বিশেষতঃ জয়দেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস বংশাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজি বলেন

প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা আপাততঃ জয়দেবকেই নেপালীয় লিচ্ছবি বংশের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম রাজা বলিয়া স্বীকার করিলাম। জয়দেব ৩৩০-৩৫৫ খৃঃ অব্দে নেপালে রাজত্ব করেন। নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণের সহ মগধ, গৌড় প্রভৃতি প্রদেশের নরপতিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। লিচ্ছবিবংশীয় নেওয়ারিং নামক কোন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে নেপাল জয় করেন। কিন্তু এই নেওয়ারিতের বিশেষ কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বংশাবলীর মতে লিচ্ছবি বংশ সূর্য্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। এই হেতু লিচ্ছবিগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আমার বোধ হয় সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এই দুইটী সম্মানসূচক উপাধিমাত্র। ভারতের প্রত্যেক নরপতিই সূর্য্য চন্দ্র এতদুভয়ের কাহারও বংশে জন্মিয়াছেন। লিচ্ছবি-গণ যেরূপ পরাক্রান্তশালী ছিলেন তাহাতে তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া বর্ণন করা কোনক্রমেই অসঙ্গত নহে।

তিব্বতের রাজগণও লিচ্ছবিবংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম রাজার নাম ঞ্য-ঠি-চন্-পো। ইনি লিচ্ছবিবংশ-সম্ভূত। তাহা হইতে সপ্তবিংশ নৃপের নাম হ্লা-থো-থো-রি এবং দ্বাত্রিংশ নৃপের নাম স্রন্-সন্-গম্-পো। স্রন্-সন্-গম্-পো ৬২৭ খৃঃ অব্দে তিব্বতে রাজত্ব করেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। একটী চীন সম্রাটের কন্যা, অপরটী নেপালের লিচ্ছবি-রাজ অংশুবর্ম্মের কন্যা।

মঙ্গোলিয়, লাডাক্ প্রভৃতি দেশীয় নরপতিগণও আপনাদিগকে লিচ্ছবিবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন।

ভারতীয় লিচ্ছবিবংশের কি পরিণাম ঘটিয়াছিল তাহা আমরা কিছুই জানি না। বৈশালীর লিচ্ছবিগণ প্রথমতঃ বৌদ্ধ ছিলেন। পরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। চাইনীজ

ধর্ম্মের শোচনীয় অবস্থা এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তথায় শনৈঃ শনৈঃ উদয় লাভ করিতেছে। আমার বোধ হয় এই ৭ম শতাব্দীতে লিচ্ছবিগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য হারাইতে থাকেন। লিচ্ছবিরাজগণের বংশধরেরাই বা কোথায় আর লিচ্ছবিবংশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারক ভিক্ষুগণই বা কোথায়? বিগত দ্বাদশ শত বৎসর মধ্যে লিচ্ছবিগণ হিন্দুসমাজে এমনভাবে অন্তর্লীন হইয়া গিয়াছেন যে তাঁহা-দিগকে অন্বেষণ করিবার কোন উপায়ই নাই। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বৈশালীতে (মজঃফরপুর জেলায়) গিয়াছিলেন। অনন্তর কুশীনগর (গোরক্ষপুর জেলা) প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। অতএব মজফর পুর, গোরক্ষপুর, সাহাবাদ, চাম্পারন্ প্রভৃতি জেলা অনুসন্ধান করিলে লিচ্ছবিবংশের কিয়ৎ সন্ধান হইতে পারে। ইদানীং যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা লিচ্ছবিবংশের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট অধুনা নাসিকার দৈর্ঘ্য, ললাটের বিস্তার ইত্যাদি চিহ্নদ্বারা জাতি নিরূপণ করিতেছেন। প্রাচীন ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত লিচ্ছবিজাতি হিন্দুসমাজের কোন্ স্তরে বিলীন হইয়া আছেন তাহা Commissioner of Indian Ethnography অনুসন্ধান করিবেন কি?

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

শ্রীনাথদ্বার।

পাঠক মহাশয়! শ্রীনাথদ্বার কোথায়, তাহা কি বলিতে পারেন? ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই, হিন্দুস্থানের ভূগোলে ইহা স্থান পায় নাই, ইংরেজাধিকৃত ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে ইহার নাম পর্য্যন্ত নাই, অথচ ছয় কোটি হিন্দুর ইহা পবিত্র ও পুরাতন তীর্থক্ষেত্র! এখানে রেল নাই, তার নাই, ছাউনী নাই, অথচ হল্‌দিঘাটের জগদ্বিখ্যাত সমরক্ষেত্রে এখানকার বীরেরাই আকবর, আওরঙ্গজেব ও আলাউদ্দীনকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন: এখানে সম্বাদপত্র নাই, কংগ্রেসের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, স্কুল নাই, কলেজ নাই, সভাসমিতি নাই, অথচ এই পুরাতন ও পবিত্র নগরের সমরকুশল পুরুষদিগের ষড়যন্ত্রে ভারতবর্ষীয় বৃটীশ বীর-কেশরীগণ হিম্‌সিম্ খাইয়া রাজপুতানা হইতে কয়েকবার পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অনেক প্রান্তর, অনেক পাহাড়, অনেক জঙ্গল ও জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া এই দূরবর্ত্তী দুর্গমস্থানে গমন করিতে হয়। প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভয়াবহ হল্‌দিঘাট পার না হইলে শ্রীনাথদ্বারে যাওয়া যায় না। এই অপূর্ব্ব স্থান রাজপুতানার অন্তর্গত মেওয়ার রাজার অধীন। রাজপুতানা-মালওয়া রেলওয়ের ভীলোয়াড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া শ্রীনাথদ্বারে যাওয়া যায়, কিন্তু নানা কারণে এই পথটি নিরতিশয় অসুখকর ও অসুবিধাজনক, এই জন্য অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ পথ দিয়া আমি শ্রীনাথ দ্বারে গমন করিয়াছিলাম। উদয়পুর নামক প্রসিদ্ধ নগর হইতে শ্রীনাথ-দ্বারে যাইবার অধিকতর সুবিধা দেখিয়া আমি এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম। উদয়পুর

দেখিতে পাইলাম। গাড়োয়ান বলিল, এই পর্ব্বতের উপর দিয়া একমাত্র পথ, সেই পথ অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। আমি ঊর্দ্ধে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আকাশের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই কেবল পাহাড় আর পাহাড়! অভ্রভেদী অত্যুচ্চ গিরিশিখরের উপরিস্থিত প্রকাণ্ড মহীরুহসমূহ মেঘকে ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান, ঊর্দ্ধে কেবল ধোঁয়া ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয়না। আমরা প্রাতে বেলা নয়টার সময় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা একা নামক গাড়ীতে বসিয়া যাইতেছিলাম। এক মাইল উঠিবার পরে গাড়োয়ান বলিল, একার উপর আর বসা যায় না, একায় বসিয়া থাকিলে ঘোড়া চলিতে পারিবেনা; সুতরাং আমরা একা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলাম। চারিদিকে গহন বন, সেই বনের মধ্যে সঙ্কীর্ণ রাস্তা। অন্যান্য বনে যেমন নানা প্রকারের শোভা থাকে, এখানে তাহার কিছুই নাই. কেবল শুষ্ক ও নীরস বন আর বন ভিন্ন কিছুই ছিলনা। পর্ব্বতের প্রস্তর এমন কঠিন এবং পথ এত সঙ্কীর্ণ বক্র ও ভাঙ্গা পাথরখণ্ডে পরিপূর্ণ যে পায়ের মজবুদ জুতা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অতি কষ্টে ঘোড়া ও একাকে সেই পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বেলা প্রায় দ্বাদশ ঘটিকার সময় আমরা বন পার হইলাম, কিন্তু তখনও পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারি নাই। বন পার হইয়া দেখিলাম, পথ একটু প্রশস্ত হইয়াছে এবং দুই চারি জন পথিক গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু দূরে "নিগাবান থানা" দেখিলাম। রাজপুতানায় প্রহরীদিগকে নিগাবান বলে। পথিকদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য এই স্থানে উদয়পুরের মহারাজার নিয়োজিত তিনজন বলবান প্রহরী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিবারাত্রি পাহারা দেয়। নিগাবান-থানা হইতে একমাইল দূরে পথটি একেবারে সঙ্কীর্ণ হইতে

ভয়ে ভয়ে পথিককে যাইতে হয়। পাহাড় এত উচ্চ যে, নীচের দিকে চাহিলে ধোঁয়া ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সেখান হইতে পড়িয়া গেলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতীব সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া সেই পথ দিয়া আমরা চলিতে চলিতে, অষ্টাবক্র মুনির মত বেঁকিতে বেঁকিতে, কলুর চোকঢাকা বলদের মত ঘুরিতে ঘুরিতে, পাহাড়ের আর একটি শিখরে উঠিলাম। এইখানে "চড়াই" এর শেষ। তাহার পরে "উতরাই" আরম্ভ। এইবারে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে হইবে। অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকা শেষ হইতে যখন অল্প বাকী, তখন আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। পথে জল নাই, পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছিল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল; ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্তির আর সীমা ছিল না। সেই শীতকালে আমাদের গা দিয়া এত স্বেদ নির্গত হইতেছিল যে, আমরা যেন কোন সরোবর হইতে স্নান করিয়া উঠিয়াছি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, ঘোড়ার মুখ হইতে অবিশ্রান্তভাবে দুগ্ধবৎ ফেন নির্গত হইতেছিল। পাহাড় হইতে নামিয়া আমরা জলান্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও জল পাওয়া গেলনা। অনাহারে পিপাসায়, পরিশ্রমে আমরা একেবারে মৃতবৎ হইয়া পড়িলাম। পর্ব্বতের পাদদেশে এক প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত প্রস্তর ছিল, তাহারই একপার্শ্বে গাড়োয়ান এবং অপর পার্শ্বে আমি শয়ন করিলাম। ঘোড়াটাও একস্থানে শুইয়া ছটফট করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল থাকিয়া আমি তন্দ্রাভিভূত হইলাম; কিন্তু ভাল নিদ্রা হইবে কেন? ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন শরীরে সুনিদ্রা হওয়া কঠিন। কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রাভঙ্গ হওয়ায় যাহা দেখিলাম, এবং তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল, যেরূপে আমরা আহার্য্য পানীয় ও শুশ্রূষা লাভ করিলাম, তাহা বর্ণনা

করিতে নিরস্ত রহিলাম। একটা অনতিবৃহৎ উপত্যকা পার হইয়া আমরা আবার যাইতে আরম্ভ করিলাম, সেই উপত্যকার প্রান্তভাগে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় ছিল, তাহা অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বত পার হইয়া আর একটী উপত্যকা দেখিলাম, সেই উপত্যকায় সুন্দর সরোবর এবং অনেকগুলি মনোহর শস্যক্ষেত্র ছিল। সরোবরে স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলাম, সেই গ্রামের প্রান্তভাগে সুপ্রসিদ্ধ "একলিঙ্গ" দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। একলিঙ্গ, মহাদেবের নাম। এই শিবমন্দির অতি পুরাতন এবং সমগ্র মেওয়ারবাসীদিগের নিকটে অতি পবিত্র। রাজা ও প্রজা উভয়ে ইহাকে মেওয়ারের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন। মুসলমানশাসনের পূর্ব্বকালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুনা যায়, উদয়পুরের এক প্রাচীন মহারাজা এক সময়ে সমগ্র রাজ্যটি এই বিগ্রহের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। বৃটিশ রেসিডেণ্টের নিষেধে তাহা করিতে পারেন নাই। এই সুদৃঢ় মন্দির প্রশস্ত প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, প্রবেশের সময় বোধ হয়, যেন মাটির ভিতরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। মেওয়ারের মধ্যে একলিঙ্গকে না জানে এবং না মানে, এমন লোক নাই। উদয়পুরে এই দেবতার নামে অর্থাৎ "একলিঙ্গ" নামে একখানি সাপ্তাহিক হিন্দী সমাচারপত্রও প্রচারিত হইত, এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা একলিঙ্গ দর্শন করিয়া সেই গ্রামে নিশিযাপন করিলাম। প্রভাতে একাওয়ালা বলিল "মহাশয়! এখান হইতে শ্রীনাথদ্বারে যাইবার দুইটি পথ আছে, যদি সোজা পথে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিরাপদে একবারে সমতলভূমি দিয়া আমরা যাইতে পারিব, আর যদি হলদিঘাট দেখা আপনার বাসনা থাকে, তাহা হইলে চারি ক্রোশ পথ পাহাড়ে পাহাড়ে বক্রভাবে যাইতে হইবে। আপনার

ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গাড়োয়ান বলিল, "তাহা হইলে একজন ভীল সর্দ্দারকে সঙ্গে লওয়া উচিত, নতুবা সে পথে যাওয়া কঠিন হইবে।" আমি সেই গ্রাম হইতে একজন ভীল সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় নয় মাইল পথ পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম, আরাবল্লী পর্ব্বতমালার যে অংশ দিয়া আমরা যাইতেছিলাম, সেই অংশের বিচ্ছেদ হইয়াছে এবং সেই অংশ ঘুরিয়া গিয়া প্রায় দুই মাইল দূরে সম্মুখে প্রসারিত হইয়া অত্যুচ্চ অটল অচলবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা যে পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই পাহাড় এবং সম্মুখের ঐ পাহাড় এতদুভয়ের মধ্যে সুবিশাল প্রান্তরের প্রায় চতুর্দ্দিক নিরবচ্ছিন্ন গিরিমালায় পরিবৃত। এই প্রান্তরে উপস্থিত হইলে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ভীল সর্দ্দার কহিল "ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, ঐ হল্‌দিঘাটের প্রবেশদ্বার।" আমি সুপ্রসিদ্ধ হলদিঘাটের দরওয়াজার দিকে তাকাইয়া বলিলাম "এই স্থানের হল্‌দিঘাট নাম হইবার কারণ কি?" সর্দ্দার কহিল "ইহার প্রকৃত নাম হাওলদার ঘাট, হল্‌দিঘাট নয়। আমাদের দেশে সেনাধিনায়কের প্রধানামাত্যকে হাওলদার বলে, এই ঘাট হাওলদারদিগের দ্বারায় রক্ষিত হইত, এইজন্যই ইহার হাওলদার ঘাট নাম হইয়াছিল, অপভ্রংশে হল্‌দিঘাট হইয়াছে।" দূর হইতে দেখিলে, হলদিঘাটের প্রবেশদ্বারকে ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র বলিয়া বোধ হয়, যতই নিকটে যাওয়া যায়, ততই উহার বিশালত্ব বুঝিতে পারা যায়। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সুবিশাল আরাবল্লী পর্ব্বতের দুইটী অভ্রভেদী অত্যুচ্চ শাখা দুই দিকে দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে ভীষণ পার্ব্বত্য পথ; এই পথ প্রায় দেড় মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে অল্প অন্ধকার এবং অত্যন্ত শীতলতা অনুভূত হয়। স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ ঝরণাও আছে। ভীল সর্দ্দার বলিল "এ দিকে এই হলদিঘাট এবং অন্য

আক্রমণের আর আতঙ্ক থাকে না। কিন্তু দেখুন, মুসলমানদিগের বীরত্ব, বিক্রম ও সৌভাগ্য কেমন প্রবল! তাহারা চিতোর ধ্বংস করিয়া হলদিঘাট পর্য্যন্ত মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অগ্রসর হইয়াছিল।” যবনের হাতে হিন্দুর পরাজয়-ব্যাপার স্মরণ করিয়া ভীলসর্দ্দার ম্রিয়মাণ হইল, আমি ইত্যবসরে হলদিঘাটের দরওয়াজাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘাটের ফটকের দুই ধারের দেওয়ালে দুইটি বর্ম্মপরিহিত মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তি, তাহাদের কটিদেশে, বক্ষঃস্থলে ও বাহুতে সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ খোদিত দেখিয়াছিলাম। ফটকের উপরে লক্ষ্মী, নারায়ণ, মহাদেব ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি, ইহাদের চারি পার্শ্বে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। গেটের ভিতরের দেওয়ালে রাম, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, দশরথ, হনুমান, কংসবধকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। আমি গাড়োয়ানকে নীচে রাখিয়া ভীলসর্দ্দারের সঙ্গে হলদিঘাটের পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকের অরণ্য ও গিরিমালার যে নৈসর্গিক শোভা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অত্যন্ত রমণীয়। ভীলসর্দ্দার আমাকে নানা স্থান দেখাইয়া দিল। যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, যে স্থানে মহাবীর রেওয়াল সিংহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, যে যে স্থানে গোলাগুলি লাগিয়া পাহাড়ের গাত্রে দাগ হইয়াছিল, যে স্থানে মহারাজা উদয় প্রতাপ সিংহ বীরদিগকে শিক্ষা ও উৎসাহ দিতেন, যেখানে সমরের মন্ত্রণা হইত, যেখানে রাজপুত রমণীরা যুদ্ধে জয়লাভ জন্য শিবপূজা করিতেন, যে সকল বনে প্রতাপসিংহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীলদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করিতেন, সে সকল দেখিলাম। ভীলসর্দ্দার, ভীলদিগের সম্বন্ধে যুদ্ধের ব্যাপার লইয়া অনেক কথা শুনাইল। তাহার পরে পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া হলদিঘাট অতিক্রমপূর্ব্বক ভীলসর্দ্দারকে তাহার

করিলাম। সর্দ্দার তাহার গৃহে চলিয়া গেল। এবারের পথ ভাল ছিল, আমরা বিনা কষ্টে যাইতে লাগিলাম। যেখানে সন্ধ্যা হইল, সেই গ্রামের নাম "গোকরণ (অথবা গোকর্ণ) পুর"। পাঠক মহাশয়দিগের বোধ হয় জানা আছে রাজপুতানার—কেবল রাজপুতানা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুরাজাদিগের একটি বা ততোধিক গোশালা থাকে, গোপালন করা হিন্দুরাজারা মহাপুণ্যজনক ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। গোকর্ণপুরে কেবল ২৬ ঘর গোয়ালার বসতি, ইহারা রাজার গো ও বলদসমূহ প্রতিপালন করে এবং তজ্জন্য ভূমি ও বৃত্তি-ভোগ করে। এই গ্রামে উদয়পুরের মহারাজার গোশালায় ৫০টি বলদ এবং ১০০টি গাভী ছিল। এই সকল গাভী হইতে যে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা রাজার বা রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রাপ্য নহে, এই দুগ্ধ বিক্রয় করা হয় না; ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, সন্ন্যাসী, অনাথ, অতিথি, পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে দান করা হইয়া থাকে। এই গ্রামে নিশি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে আমরা শ্রীনাথদ্বারাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় প্রবল শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নগরে প্রবেশ করিলাম। পথ ভাল ছিল; সমতল ভূমির উপর দিয়া শস্যক্ষেত্রসমূহ দেখিতে দেখিতে সহজে আসিতে পারিয়াছিলাম। পথে এক জলাশয় পার হইতে হইয়াছিল, ঐ জলাশয়ের জল লাগিয়া আমার পুস্তকাদি ভিজিয়া গিয়াছিল। নগরে প্রবেশ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, হিন্দুর ধর্ম্মস্পৃহা কি আশ্চর্য্যরূপে বলবতী! এরূপ দূর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও অসংখ্যাসংখ্য হিন্দুনরনারী এই তীর্থে আগমন করিয়া থাকে। যে জাতির হৃদয়মধ্যে ধর্ম্মভাব এরূপ প্রবল, সে জাতি কালপ্রভাবে অধঃপতিত হইলেও তাহার পুনরুত্থানের ভরসা আছে। কিন্তু হায় পরে যাহা জানিলাম, ধর্ম্মের নামে যে সয়তানী

আমি রাত্রিকালে শ্রীনাথদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সুতরাং অন্ধকারে নগরের কিছুই দেখিতে পাই নাই। প্রভাতে জানিতে পারিলাম, এই ক্ষুদ্র নগরটি মৃত্তিকা ও শষ্পাবৃত প্রস্তরস্তূপোপরি অবস্থিত। সমগ্র মেওয়ার বা উদয়পুর রাজ্যের অন্যদিকে যেমন চিতোর প্রথমসীমা এবং প্রথমদ্বার, এইদিকে শ্রীনাথদ্বার ইহার শেষ-সীমা এবং শেষদ্বার, এইস্থানেই সুবিশাল মেওয়ার রাজ্যের এবং আরাবল্লী পর্ব্বতের শেষ প্রান্ত দেখিতে পাইবেন। শ্রীনাথদ্বারে প্রবেশ করিলে বিদেশী পথিকেরা সর্ব্বপ্রথমে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন; কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় সকল তীর্থেই আমরা পুরুষ "পাণ্ডা" দেখিয়া থাকি, কিন্তু শ্রীনাথের পাণ্ডারা পুরুষ নহেন—ব্রাহ্মণকন্যা! বিধবা হইলে পাণ্ডাগিরি করিতে পারে না, কুমারী কিম্বা সধবারাই পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকে; এখানে স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে বিবাহ হয়, সুতরাং কুমারীপাণ্ডাগণ প্রায়ই পরিণতবয়স্কা; আমি দ্বাবিংশবয়স্কা একজন ব্রাহ্মণকুমারীপাণ্ডা দেখিয়াছিলাম। সমগ্র মেওয়ার রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা অতীব রূপবতী,—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকন্যাগণ—এই সকল পাণ্ডার মনোরজ্জুতে বড় বড় যাত্রীজাহাজেরা টানা গিয়া থাকে। আকর্ষিত হইতে হইতে কোন কোন হতভাগ্য পথিক বা যাত্রী এমন আহত হয় যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীনাথদ্বারের দ্বিতীয় আশ্চার্য্যের কথা এই যে, এখানকার বাজারে গোধূম, সর্ষপ, লবণ, ঘৃত, মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতির ন্যায় প্রতিদিন দুইবেলা পান্তাভাত ও গরমভাত বিক্রয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা তাহা বিক্রয় করে। বাঙ্গালাদেশে এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে দেশীয় হোটেল আছে, তথায় পয়সা দিয়া অনেক পথিক হোটেলের ভিতর ভাত খায়, কিন্তু এখানে বসিয়া কেহই ভাত খায় না, ভাত রীতিমত বিক্রয় হয়। বাজারে গিয়া দেখিলাম

কেহ দুই পয়সা, কেহ চারি পয়সা, কেহ দুই আনা, কেহ তিন আনা দিয়া ভাত খরিদ করিতেছে এবং বিক্রেতা তাহা ওজন করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ছয় পয়সা দিলে গরমভাত এবং চারিপ্রকারের তরকারী পাওয়া যায়, তাহা একজন বলবান লোকের আহারের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু শ্রীনাথদ্বারের ছয় পয়সা আমাদের বৃটিশ ভারতের নয় পয়সার সঙ্গে সমতুল্য। তৃতীয় আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এখানে ব্রাহ্মণেরা যখন আহার করেন, তখন স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করেন না। মনে করুন, একজন ব্রাহ্মণের স্ত্রী তাহার অন্ন বা রুটি পাক বা প্রস্তুত করিয়াছে, স্বামীর ভোজনের সময়ে তাহার ভোজনপাত্র স্পর্শ করিয়া অন্ন, রুটি এবং অন্যান্য দ্রব্য পরিবেশন করিতেছে, ব্রাহ্মণ ইহাতে আপত্তি করিবেন না, কিন্তু আহারের সময় স্ত্রীর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৈবাৎ স্পর্শ করিলেই, স্বামী ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া ফেলিবেন এবং ঐ অন্ন "অস্পৃশ্য" বলিয়া বিবেচনা করিবেন। আমি, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণেরা কহিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণকন্যা, ব্রাহ্মণ পিতা মাতার ঔরসে ও গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও, উপবীত ধারণ করিতে অনধিকারিণী হওয়ায়, শূদ্রামধ্যে গণনীয়া, এজন্য ব্রাহ্মণী পূজাকার্য্য সাধনে অনুপযুক্তা।" কি আশ্চর্য্য দেশাচার! ভারতের নানাস্থানে কতই অদ্ভুত সামাজিক প্রথা!

"শ্রীনাথদ্বার" এই নামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তির সঙ্গে শ্রীনাথদ্বারের ইতিহাস সম্পর্কীভূত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম "শ্রীনাথ"। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্য নামে একজন সুচতুর ও সুবিদ্বান গোস্বামীর প্রাদুর্ভাব হয়, সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথে (দ্রাবিড় দেশে) ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। বল্লভাচার্য্য নয়বৎসরকাল নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রজধামে (মথুরা ও বৃন্দাবনে) উপনীত হয়েন।

এবং ইহাঁকে আদেশ করেন যে, "আমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মতত্ত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে; ভক্তেরা বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া কঠোর ভাবে জীবনযাপন করিতেছে; তাহারা সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া সংসারকে অসার ও আনন্দশূন্য করিয়া তুলিতেছে; অতএব তুমি পুনরায় আমার প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কর।" সুচতুর বল্লভাচার্য্যের এই কথা জনসাধারণ মধ্যে প্রচারিত হইলে, সকলে তাঁহাকে অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও মান্য করিতে লাগিল; বল্লভাচার্য্য "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্যভাবের উপাসনা সৃষ্টি করিলেন, এই নূতন ভাবের নাম "পুষ্টিমার্গ"—ইহার ঠিক ইংরাজি অর্থ Eat and Drink Doctrine অর্থাৎ "সংসার কেবল ভোগের স্থান; খাও, পিও আর মজা উড়াও।" পূর্ব্বেকার বৈষ্ণবেরা দীনহীন ভাবে থাকিত, অনিত্য সাংসারিক সুখকূপে লম্ফ দিত না, কঠোর এবং তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তিমার্গেরই পথিক হইত, এক্ষণে একজন অবতারের মুখে "সাংসারিক সুখ ভোগেই মোক্ষের কারণ" এই নূতন রসাল কথা শুনিয়া মরীচিকামুগ্ধ হরিণীদিগের ন্যায় প্রবৃত্তিমার্গেরই অনুসরণ করিতে লাগিল। দলে দলে বল্লভাচার্য্যের শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নেতারা "মহারাজ" নামে খ্যাত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র কচ্ছদেশ, কাটিয়াবাড়, সিন্ধুপ্রদেশ, গুজরাট, বোম্বায়ের অধিকাংশ, সমগ্র মালব, মধ্যভারত, সমগ্র রাজপুতানা এবং দক্ষিণাবর্ত্তের অধিকাংশ বল্লভীমতে দীক্ষিত হইল। অসংখ্যাসংখ্য শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, মঠ, মূর্ত্তি ও "মহারাজা" দিগের বিলাসভোগ জন্য সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হইল। বৃন্দাবন ও মথুরা "প্রধান আড্ডা" বলিয়া প্রখ্যাত হইল। বল্লভাচার্য্য-মতের বৈষ্ণবেরা "বল্লভীকুল" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। [illegible]

যেগুলি প্রধান, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম। ১ জয়পুরের গোবিন্দজী, ২ যোধপুরের গোপীনাথজী, ৩ যশলমীরের রাধাকান্ত, ৪ বিকানীরের ব্রজসুন্দর, ৫ কোটার রাধানাথ, ৬ উদয়পুরের শ্রীনাথজী, ৭ কেরোলীর মদনমোহন, ৮ উজ্জয়িনীর কৃষ্ণচন্দ্র, ৯ কচ্ছের ব্রজপতি, ১০ কাটিয়াবাড়ের রাখালরাজা, ১১ রট্লামের গোবিন্দস্বামী, ১২ ডাকোরের বিষ্ণুরাজ, ১৩ (মাদ্রাজের) মাদুরার শ্রীগোবিন্দ, প্রভৃতি। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ইংরাজি ১৮৮০ অব্দে প্রায় সার্দ্ধনয়শত বল্লভীকুল মন্দির ছিল। বেহার, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের কায়স্থেরা বল্লভীকুলীদের খুব বিরোধী, কায়স্থ জাতি অধিকাংশই তান্ত্রিক, সুতরাং ইহাদের দশ হাজারের মধ্যে একজনও বল্লভকুলী কি না সন্দেহ। পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের অধিকাংশই বল্লভকুলী। রাজপুতানার, গুজরাটের, কচ্ছ ও কাটিবাড়ের, মধ্যভারতের এবং বরোদার দেশীয় রাজগণ বল্লভকুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও অতি ভক্ত শিষ্য। বল্লভাচার্য্যের নূতন মত বঙ্গদেশকে স্পর্শ করিতে বিমুখ হয় নাই, ইহাদেরই দুর্নীতিমূলক মতানুসরণ করিয়া বাঙ্গালায় সেই চিরকলঙ্কের চিহ্নস্বরূপ "গুরুগোঁসাই" প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল; সুখের বিষয়, বঙ্গদেশে এখন এই কুপ্রথা আর প্রচলিত নাই। বল্লভীকুলের "মহারাজা" দিগের বিবরণে এই প্রথার কতকটা আভাস প্রাপ্ত হইবেন। কল্পনা ও কার্য্যে বিলাসসম্ভোগের যতদূর ধারণা হইতে পারে, ইন্দ্রিয়লালসা ও পশুত্বের যতদূর সীমা থাকিতে পারে, নিবৃত্তিমার্গের পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তিমার্গে যতদূর আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে এবং পুণ্যের পবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া পাপের মহা অপবিত্র ও অনিষ্টকর পথে গেলে মানুষের যাহা পরিণাম হয় বল্লভীকুলী মহারাজাদিগের জীবনে তাহা প্রতিদিনে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, ভগবানের

নামে, রোমের পোপও এত পাপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। মথুরা ও বৃন্দাবনের পরেই শ্রীনাথদ্বারের মন্দির ভারতবর্ষীয় বল্লভীকুলী বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ ও আড্ডা। নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে হইলে ইহা দেবতার মন্দির নহে—ইহা সয়তানের দরবার! ভারতবর্ষের ছয় কোটী হিন্দু এই সয়তানের দরবারের সভাসদ ও শিষ্য। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এখনও দ্বাদশ শতাধিক "মহারাজা" বিচরণ করেন; ভারতের অরণ্যে এই নিশাচরদিগের বিচরণে ভারতের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই। শ্রীনাথদ্বারে সচরাচর তিনটি মহাদৈত্যরূপী মহারাজা বিরাজ করেন।

এই সকল "মহারাজা" উপাধিধারী ব্রাহ্মণ গুরুরা বিলাস ও ইন্দ্রিয়লালসার জীবন্তমূর্ত্তি। ইহাদের মাথার চুলগুলি বেশ চিক্কণ, সর্ব্বদাই চিরুণী দ্বারা সুবিন্যস্ত এবং বিবিধ সুগন্ধ তৈলে পরিপূর্ণ। গলায় পদ্ম ও তুলসীকাষ্ঠ মিশ্রিত মালা, তাহার উপরে সুবর্ণের হার; কোমরে সোণার বা রূপার মোটা মোটা "গোট্" ও চন্দ্রহার; হাতে বাজু, অনন্ত ও বালা; কাহারও কাহারও পায়ে সোণার নূপুর বা সোণার মল; পরিধানে সুন্দর সুন্দর "বাহার ওয়ালা" ধুতি ও সাড়ি; গায়ে আতর গোলাপ ছড়ান; কাণে ফুলের ছোট ছোট গুচ্ছ; ভালে চন্দনের তিলক ও ফোঁটা এবং ওষ্ঠে পানের লাল দাগ চব্বিশ ঘণ্টাই বর্ত্তমান। ইহারা মদ্যপান করে না এবং নিরামিষ খায়; জাতি-ভেদ খুব রক্ষা করে; কিন্তু ভাং (সিদ্ধি) গাঁজা অহিফেন প্রভৃতির প্রচলন ইহাদের মধ্যে খুব আছে। ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরী, কৃষি, মহাজনী প্রভৃতি ইহারা করে না, কেবল শিষ্যের মাথায় হাত বুলাইয়া খায়। ইহারা খুব সৌখীন, ইহাদের শয্যা অতি সুন্দর এবং সুকোমল, গৃহের সর্ব্বত্র পুষ্প ও পুষ্পসারে পরিপূর্ণ এবং যাহা কিছু বিলাসের বা ঐন্দ্রিয়িক লালসার দ্রব্য, তাহা ইহাদের ঘরে দেখিতে পাইবেন। ইহা-দের শিষ্যের যাহাতে তাহাদের

তজ্জন্য ইহারা খুব কঠোর আদেশ প্রদান করে। কচ্ছ, কাটিওয়াবাড়, গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থলের বল্লভকুলীরা চাকুরী বা কৃষি কর্ম্ম করে না, ইহারা বাণিজ্য ও ব্যবসা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। কচ্ছদেশের ভাটিয়া নামক হিন্দু জাতি বল্লভকুলের প্রধান গোঁড়া, ইহারা ভুলিয়াও বালকদিগকে ইংরাজী শিখায় না এবং উপবাসী থাকিলেও কাহারও চাকুরী স্বীকার করেনা। গুরুগণ (মহারাজগণ) শিষ্যদিগের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা এই—

প্রত্যেক মণ চাউল (বিক্রীত হইলে) এক আনা বৃত্তি।
ঐ ঐ তৈল ঐ অর্দ্ধ আনা ঐ।
দালালীর প্রত্যেক শতকরায় ঐ ঐ।
তুলার কারখানায় ঐ এক আনা ঐ।
বস্ত্র, তুলা, রেশম, পশম ইত্যাদি অর্দ্ধ আনা (টাকায়)।
চিনি, গুড়, মশাল্য এক টাকায় এক পয়সা।
স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ঐ ঐ।
অহিফেন গাঁজা প্রভৃতি ঐ ½ পয়সা।

মহাজনী কারবারে (প্রতি সহস্র টাকায়) … …	২ টাকা
প্রত্যেক বিবাহে … … … …	৫ ,,
প্রথম পুত্র (সন্তান) জন্মিলে … … …	২ ,,
নূতন গৃহ প্রস্তুত করিলে… … … …	২ ,,
কন্যা বা বধূ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে … … …	৫ ,,
শ্রাদ্ধের বৃত্তি … … … …	৩ ,,
প্রথম দোকান খুলিলে … … … …	৪ ,,
গুরুর প্রথম প্রণামের দক্ষিণা … … …	৫ ,,
গুরুর পদস্পর্শ দ্বারা প্রণাম … … …	২০ ,,
গুরুর পদধৌত দ্বারা প্রণাম … … …	৩৫ ,,
রাসে বা দোলে গুরুকে দোলায় ঝোলান জন্য বৃত্তি … …	৪০ ,,

গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন	...	...	... ৬০ টাকা।
গুরুর গৃহে রাত্রি যাপন			৫০ হইতে ৫০০ „
মহারাজার স্বহস্ত প্রদত্ত পান ভক্ষণে	...	...	... ১৭ „
মহারাজার গাত্রস্নাত জলপান জন্ত	...	...	... ১৯ „
মহারাজার প্রসাদ ভক্ষণ জন্ত	...	...	... ২২ „
মহারাজার মাথায় মুকুট দেওয়া	...	...	... ২৫ „

গরিব হউক আর ধনীই হউক, এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত টাকা দিতে না পারিলে ঐ সকল "পবিত্র কার্য্য" সম্পাদন করিয়া "সদ্য সদ্য মোক্ষ" লাভে কেহই অধিকারী হইবে না! গুরুকে প্রাতে দর্শন না করিলে শিষ্যেরা দোকান খুলিবে না এবং সে দিন আহার করিবে না, সুতরাং গুরুর পয়সার দরকার হইতে মন্দিরের দরজা সে বন্ধ করিয়া রাখে এবং বিগ্রহ দেখায়না অথবা নিজেও দেখা দেয় না। গুরু পান চিবাইতে চিবাইতে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে, শিষ্য কাছে থাকিলে তাহা উঠাইয়া লয় এবং "মহা পবিত্র" ভাবিয়া তাহা নিজের জিহ্বায় মাখাইয়া দেয়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, অতঃপর যাহা বলিব, তাহাতে সকলের রোমাঞ্চ উপস্থিত হইবে। বল্লভকুলের কুলবধূরা প্রথম বয়ঃ প্রাপ্তা হইলে মহারাজা উপাধিধারী গুরুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট করাইয়া তাহাকে স্বামী সকাশে পাঠাইতে হইবে, নতুবা "পতিত" ও সমাজচ্যুত হইবে। গুরু মহারাজা যে কোনও সময়ে যে কোনও সধবা স্ত্রীলোককে ডাকাইয়া পাঠাইবেন, তখনই তাহাকে গুরুর বিলাসগৃহের শয্যায় প্রেরণ করিতে হইবে। গুরু মহারাজা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই তাঁহার গোপিকা, ইহা বিশ্বাস না করিলে মুক্তি নাই। গুরু মহারাজা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারেন, তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীকে সাক্ষাৎ "রাধিকা" বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

রাস, দোল ও ঝুলনার সময়, ভারতের যে যে স্থানে বল্লভকুলী

চূড়ান্ত হইয়া থাকে। কচ্ছদেশের বৃটীশ রেসিডেণ্ট কাপ্তেন ম্যাক্মর্দ্দো লিখিয়াছেন*—

"The most respectable families consider themselves honored by (Gooroo's) cahabiting with their wives and daughters. The principal Maharaj of Srinathdwar is * * * constantly in a state of intoxication from opium and other stimulants which the ingenuity of the sensual has discovered under the name and sanction of religion. This devil practises every kind of licentiousness."

অতি বাল্যকাল হইতে বালিকাদিগকে এই সকল পাপাত্মারা ধর্ম্মের নামে এই সকল পাপকার্য্য শিখাইয়া রাখে।

ইংরাজী ১৮৬২ অব্দে কর্ষণদাস মুলজী নামে একজন বল্লভকুলী বৈষ্ণব ঘটনাচক্রে খুব ভাল ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া এবং ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হইয়া এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করেন। তাহাতে মহা আন্দোলনকারী মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হয় এবং হাইকোর্টে পর্য্যন্ত এই মোকর্দ্দমা উঠিয়াছিল। মুলজী মহাশয় এই মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু কুপ্রথা গুলি তখন যেমন ছিল, এখনও প্রায় ঠিক তেমনি আছে। হায় যে ভারতে ধর্ম্মের নামে পুরুষেরা এরূপ ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয়, এবং স্ত্রীলোকেরা সতীত্বে জলাঞ্জলি দেয়—সে পতিত ভারতের উদ্ধার কতদিনে কিরূপে সম্ভব? যদি স্বদেশের মঙ্গল কামনা কর তবে প্রথমে স্বদেশের ধর্ম্মব্যবসায়ী পুরোহিতদিগকে সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান্ করিয়া তুল।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

* Transactions of the Literary Society of Bombay (now the

অশ্রু।

(ফরাসী হইতে)

পঞ্চাশ বরষ মোর হইল আসন্ন :
ভাল তাই হোক্, পরমেশ তুমি ধন্য!
কিন্তু এই একমাত্র ভাবনা আমার
—বয়োবৃদ্ধি-সহ পাছে কমে অশ্রুধার।

যাহোক্, এখনো ব্যথা পায় মোর প্রাণ ;
এখনো নিজের কাছে হারাইনি মান ;
এখনো ব্যথিত হই অপরের দুখে,
—তীব্র শেল-সম বাজে এখনো গো বুকে।

হায়! সেই উচ্ছ্বসিত উৎস করুণার
—বক্ষ হতে উঠিত যা' নয়নে আমার!
আসিল কি বার্দ্ধক্য এহেন সীমায়
যখন সে উৎস মোর এবে শুষ্ক প্রায়?

বন্ধুদের দুঃখ দেখি' আর কি এখন
আঁখি মোর করিবে না অশ্রুবরিষণ?
—যে অশ্রু সান্ত্বনামৃত—করে প্রশমন
—কি নিজের, কি পরের—সকল বেদন!

এমন কি, গত কল্য—আমি গো যখন
করিনু সে দীনজনে ভিক্ষা বিতরণ
—কাঁপিতেছিল সে যবে শীতে নগ্নপ্রায়—
[illegible]

আবার সে দিন, কোন বিপত্নীক জন
করিল আমায় যবে দুঃখ নিবেদন,
না ঝরিল অশ্রুবিন্দু শুনি' তার কথা
তাহার ব্যথায় আমি না পাইনু ব্যথা।

সত্যই কি অসাড়তা আসে হৃদি-পরে
বার্দ্ধক্যে যতই দেহ নুয়াইয়া পড়ে ?
আপনি আপনাতেই হয়ে তন্ময়
চলিব কি নতশিরে বিশুষ্ক-হৃদয় ?

না, না, ধিক ! সে তো প্রায় আধেক মরণ।
নিষ্ঠুর প্রকৃতি ! তোর কঠোর নিয়ম
কে পারে খণ্ডাতে ? তবু আছে অভিমান
রাখিতে পারিব আর্দ্র মোর এই প্রাণ !

গলিত পলিত কেশ—বলিত রেখা-পাতি
—সে সব অম্লানে আমি ল'ব মাথা পাতি ;
কিন্তু যেন হে বিধাতঃ ! বার্দ্ধক্যে আমার
না শুখায় নয়নের অশ্রু বারিধার।

কেননা, এ ভবে কেহ নহে ঘোর কুৎসিৎ
কিম্বা ঘোর পাপী ;
সেই ভাবে দেখে শুধু আভ্যন্তরীর শুষ্ক
অশ্রুহীন আঁখি।

অশ্রু সে পরশমণি, তারি তো গো বিমল পরশ
বিশ্বেরে করিয়া তোলে রূপান্তর, নবীন, সরস !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিলাতী বুটের আত্মকাহিনী।

বিলাতী মেপে আমরা বার্নিস্, বুরুস, কাল, বাদামী ও রঙবেরঙের অনেক জোড়া বিলাতী বুট প্যাক্ হ'য়ে কলিকাতায় "হোয়াইট অ্যাওয়ে লেডলা কোম্পানী"র দোকানে এসে হাজির হ'লেম। আমাদের ভিতর প্রায় সকলকেই টুপীওয়ালারা কিনে নিয়ে গেল। থাকবার মধ্যে আমরা দু'চার জোড়া রইলাম; কিন্তু আমাকেও আর বড় বেশীদিন থাকতে হ'লো না। একদিন একটি উজ্জ্বল শ্যামকান্তি-বিশিষ্ট দীর্ঘদেহধারী বাঙ্গালী যুবক আমায় পছন্দ করে দোকানদারকে দাম দিলে। আমি ভেতো বাঙ্গালীর কাছে চির-বিক্রীত হলেম দেখে লজ্জায় তলান্তিক ছিঁড়ে যাবার কামনা করলাম। আমার সঙ্গীদের বিদ্রূপবাণও দুর্ভাগা আমার উপর অজস্রধারে বর্ষিত হতে লাগ্‌ল। বাস্তবিক আমি মহাপ্রবল-প্রতাপান্বিত বিলাতীবুট! শেষে নির্জ্জীব বাঙ্গালীর ক্ষীণ পদযুগলে চিরদিনের জন্য বিক্রীত হ'লেম! এ'দেখে আমার সঙ্গীরা যে আমায় ঠাট্টাবিদ্রূপ ক'রবে তা'তে আর বিচিত্র কি? যে বুটের প্রতাপে চা-বাগানের ও চট কলের কুলী, রেলগাড়ী ও ট্রামগাড়ীর গরীব নেটিভ্, এদেশের ঘাটে মাঠে পথের পথিক সদাই সন্ত্রাসিত, ভীত ও চকিত! যে বুটের প্রবল প্রতাপে শ্বেতাঙ্গগণঃ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ও ধর্ম্মজ্ঞানরহিত ঘোর খ্রীষ্টীয় সভ্যতায় এদেশ দিন দিন প্লাবিত করছেন সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত বিলাতীবুট কিনা শেষে নিগার বাঙ্গালীর পায়ে শোভিত হ'লেম! বস্তুতঃ এ দুঃখ আমার ছিঁড়ে গেলেও যাবে না। হায়! এদেশে এসে

নিরপরাধে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ কর্ত্তে না পার্‌লেম, অথবা অর্দ্ধানশন-ব্রতধারী নেটিভ্ কেরাণীকুল নিপাত ক'রে তাদের ভবযন্ত্রণা তিরোহিত কর্ত্তে না পারলেম তবে এভবে এসে করলেম কি? বিলাতীবুটের গৌরবই বা কি আর কদরই বা কি? এইরূপে আমি আপনার অদৃষ্টের প্রতি চেয়ে মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়ে স্বীয় পরিণাম চিন্তা কর্‌ছি, এমন সময় যুবকটী আমায় নিয়ে চলে গেল।

বাড়ীতে এসে যুবক আমায় যেখানে রেখে দিলে, দেখলাম সেখানে আর এক জোড়া পুরান ছাতাধরা কাল বার্ণিসের বিলাতী বুট এক পাশে পড়ে আছে। তার এরূপ অবস্থা দেখে আমার পরিণামের ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেলে। আমাকে মনমরা হ'য়ে থাকতে দেখে পুরাতন বুট জোড়া আমায় বল্লে, "বাপু! নতুন জায়গায় এসোছো বলে ভাব্‌ছো—কোন চিন্তা নেই, এখানে বেশ সুখে থাক্‌বে!" আমি হেসে ব'ল্লাম "নেটীভের কাছে আবার আমাদের সুখ কি—যারা আমাদের কদর বোঝে না তাদের কাছে আমরা কোন্ সুখ আশা কর্ত্তে পারি?" সে ব'ল্লে "নাহে! এ সে ভেতো বাঙ্গালী নয়। এ বাবু সাহেবদের মত হাঁট্‌তে খাট্‌তে পিট্‌তে ঠেঙ্গাতে বিশেষ দক্ষ। তবু এখন পবন বাবুর "জীবন নষ্ট" খেলা নেই। এখন বয়স হ'য়েছে ছেলে পিলে হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে তাই সে খেলা ছেড়ে দিয়েছেন।"

যুবকের নাম শুনলাম "পবন"। আমি ব'ল্লাম "তুমি এই পবন বাবুর এত কথা জানলে কেমন ক'রে?" সে ব'ল্লে "আমি নতুন আসিনি। পবন বাবু যখন ইস্কুলে পড়েন সেই সময়কার আমি। আমার উপর দিয়ে কত হ্যাপা গিয়েছে সে হ্যাপা সহজে কেউ সহ্য ক'র্‌তে পারে না।" আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কিছু কিছু বল না ভাই!"

এ সেই সময়কার কথা যে সময় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কলিকাতা হাইকোর্টের জবরদস্ত জজ নরীস্ সাহেব "আদালতের অবমাননা" (Contempt of Court) অপরাধে অপরাধী করেন এবং সেই বিচারে মহা অসন্তুষ্ট হ'য়ে নেটীভরা ফুল-বেঞ্চে আপীল করে। ফুল-বেঞ্চের শুনানীর দিন সহরের নেটীভ গুলো বিশেষ ইস্কুল কলেজের ছেলেরা দলে দলে হাইকোর্টে হাজির হ'তে লাগ্‌লো। আমাদের পবন বাবুও তখন কালেজের ছেলে, তিনিও সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য হলো। এত লোক আর কোন মামলা উপলক্ষ্যে হয়নি। শুনেছি কোম্পানীর আমলে মহারাজ নন্দকুমারের চূড়ান্ত বিচারের দিন সুপ্রীমকোর্টে নাকি এমনি লোকের ভিড় হ'য়েছিলো। এত লোক উপস্থিত হ'বার কারণ শুনলাম সুরেন্দ্র বাবু এদেশের মাথা, গণ্যমান্য ও সর্ব্বজন-বরেণ্য। তাঁর বিপদ দেখে সহরের ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই মহা চিন্তাকুল হ'য়ে আদালতে হাজির হ'তে লাগলেন। জজেরা লোকের ভিড় দেখে লোক তাড়াবার জন্যে পুলিসকে হুকুম দিলেন। ইংরেজ রাজত্বের পুলিস্ চিরকালই প্রবলের মিত্র—দুর্ব্বলের শত্রু—গরীবের যম—ধনীর গোলাম। তারা জজ সাহেবদের হুকুম পেয়ে নেটীভদের রুলের গুঁতো দিয়ে তাড়াতে আরম্ভ কর্‌লে। তাই দেখে নেটীভ গুলো ভেড়ার পালের মত দলে দলে পালাতে আরম্ভ কর্‌লে, কিন্তু তাদের মধ্যে ইস্কুল কালেজের অর্ব্বাচীন ছেলেরা পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে, এমন কি ইট পাট্‌কেল্ ছুঁড়ে আদালতের খড়্‌খড়ী সার্‌সী ভাঙ্গ্‌তে লাগ্‌ল। এই রূপ অত্যাচার দেখে পুলিস্ উগ্রমূর্ত্তি ধরে দোষী নির্দ্দোষী স্থির কর্‌তে না পেয়ে সকলকেই রুল পিট্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। পবন বাবুর সাম্‌নে এক নির্দ্দোষী ভদ্র সন্তান এইরূপে লাঞ্ছিত

সার্কসওয়ালা প্রফেসর বসুর সঙ্গে জিম্‌নাষ্টীক্ শিক্ষা করেন। 'বারের প্লে'তে তাঁর খুব সুখ্যাতি ছিল। তিনি ভাল খেলোয়াড় ছিলেন বলে লোক তাঁকে বীর পবন বলে ডাক্‌ত। শরীরে এখনকার চেয়ে বেশী জোর না হ'ক তখন সাহসটা খুব ছিল। ছেলে বয়স তখন রক্ত ঝাঁ করে গরম হয়, লোকের ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না। যাহ'ক নির্দ্দোষী ভদ্র সন্তানের নির্যাতন দেখে পবন বাবু মহা ক্রোধে পুলিস্‌কে আক্রমণ কর্‌লেন। নেটীভ পাহারাওয়ালা পবন বাবুর আক্রমণ সহ্য কর্‌তে না পেরে অপর একজন পাহারাওয়ালাকে ডাক্‌লে। লাঞ্ছিত ভদ্রসন্তানটী সেই অবসরে লোকের ভিড়ে ঢুকে পড়্‌ল। পাহারওয়ালারা তাকে আর বৃথা অন্বেষণ না করে পবন বাবুকেই গ্রেপ্তার কর্‌লে। তিনিও দ্বিরুক্তি না করে তাদের সঙ্গে যেতে লাগ্‌লেন। পথে যেতে যেতে গ্রেপ্তারী লোককে দু' এক ঘা রুলের গুঁতো দিয়ে পুলিস্‌গিরী ফলানো অথবা রাস্তার লোকদের পুলিসের প্রতাপ জানানো পুলিসের একটা স্বভাব! তারা পবন বাবুকেও রুলের গুঁতো দেবার উদ্যোগ কর্‌লে তিনি সুযোগ বুঝে দুই হাতের দুই ধাক্কায় তাদের ফেলে দিয়ে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হলেন। তা দেখে একজন সাহেব কনেষ্টবল দৌড়ে এসে চাবুক তুলে তাঁকে মার্‌তে উদ্যত হলে পবন বাবু জিম্‌নাষ্টিকের কৌশল ধরে "সমার্‌সল্ট" খেয়ে সাহেব কনেষ্টবলকে জোড়া পায়ে ক্যাঁৎক'রে সবুট আঘাতে তার গর্ব্বোন্নত বক্ষের ভার-সহত্বের পরীক্ষা কর্‌লেন! বুঝ্‌তেই পারছ আমি তখন তাঁর পায়ে, সুতরাং আমিও অনিচ্ছায় সশরীরে সজোরে সাহেবপুঙ্গবের বুকে গিয়ে পড়্‌লাম। আহা! কি দুর্দ্দৈব ঘটনা! সাহেব পুঙ্গব আমারি পতন প্রভাব সহ্য করতে না পেরে ভিড়ের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্রের ঘটোৎকচের ন্যায় পড়ে গেলেন। সেই অবসরে পবন বাবু বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে সরে' পড়্‌লেন। কিছু-

বাবুর কারাবাসের জন্তে তিনি যেমন বিশেষ দুঃখিত হ'য়েছিলেন, সাহেব সোজা ক'রে তেমনি মহা আনন্দিত হলেন। আমি কিন্তু মহা দুঃখিত। নেটীভের হাতে শ্বেতাঙ্গের নিগ্রহ দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল। বিদেশে আমাদের ন্যায় সাহেবদিগের আত্মীয়-অন্তরঙ্গ-মিত্র আর কে আছে বল? আমি মনে ভাব্‌লেম হায়! "যার শীল, তার নোড়া— তারই ভাঙলেম দাঁতের গোড়া।" "বিলাতী বুট" হ'য়ে শেষে বিলাতী লোককে ঠেঙালেম। বস্তুতঃ আমার সে দিনের সে কষ্ট আর রাখ্‌বার স্থান ছিল না। আমি দুঃখ ও মনোকষ্টে ক্রমে ফেটে চটে গেলেম! তাই দেখে পবন বাবু আমায় বাতিল কর্‌লেন। তিনি মনোভাব বু'ঝ্‌তে পেরে যে আমায় ত্যাগ কর্‌লেন তা' নয়। তিনি কিছু বাবু মেজাজের লোক, কখন তালি দেওয়া জুতা পায়ে দেন না তাই আমায় ত্যাগ কর্‌লেন। আমিও সেই অবধি রেহাই পেলেম, কিন্তু তিনি আমায় ফেলে দিলেন না। তার পর কত বুট এলো আর কত বুট গেলো তার হিসেব নেই, আমি কিন্তু যেখানকার সেখানেই আছি।"

আমি তার এই কৌতূহলোদ্দীপক আত্মকাহিনী শ্রবণ করে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "তোমায় এরূপে পেন্সন দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখ্‌বার কারণ কি?" সে বল্লে "বোধ হয় বাঙ্গালীকর্ত্তৃক সাহেব সোজা করা তাঁদের জাতীয় ইতিহাসে এই প্রথম ব'লে—অথবা বাহু-বলহীন ভীরু বাঙ্গালীর পদাঘাত বঙ্গের প্রথম নিদর্শন-কীর্ত্তির মূল আমি, এই কারণে পবন বাবু আমাকে হতাদরে "হল্‌ওয়েল মনুমেণ্টের" মত সদর রাস্তায় ফেলে না দিয়ে আপন কক্ষেরই একপার্শ্বে রক্ষা কর্‌লেন। আমাকে ঘরে রাখা বোধ হয় বেশী গৌরবের কথা বলে মনে কর্‌তেন। এই কারণে তাঁর বন্ধু বান্ধব সমক্ষে সুরেন্দ্র বাবুর মামলার কথা উত্থাপিত হলে, আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে

তারা সোৎসুক নয়নে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌ত। আমি কিন্তু তাতে মনে মনে মহা লজ্জিত ও মহা দুঃখিত হতেম।"

পুরাতন বুটের মুখে পবনবাবুর পরিচয় পেয়ে তখন যেন আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেম; মনে কর্‌লাম তবু যা' হ'ক নেহাত ভেতো বাঙ্গালীর পায়ে না উঠে একটা মান্‌ষের মত মানুষের পদসেবায় নিযুক্ত হইয়েছি। আমার বিলাতী-বুট-জন্ম একেবারে নিস্ফল নয়!

শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু।

অভিষেকের মহোচ্ছব।

[পল্লীদৃশ্য।]

প্রথম দৃশ্য।

বিনোদনগর,—ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের খাস কামরা

(ম্যাজিষ্ট্রেট্সাহেব ও অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ গ্রামজমিদার শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গদাস মৌলিক আসীন।)

ম্যাজিষ্ট্রেট্। দেখ গৌরাঙ্গদাস বাবু, করোনেশনের তামাসার বাবদ চাঁদা আদায়ের জন্য বিস্তর চেষ্টা করা গেল, কিন্তু প্রজাগুলা এমনই ডিস্‌লয়াল যে, যে দশটাকা অনায়াসে দিতে পারে সে অনেক কষ্টে আট আনার বেশী দিলেনা। টাকাগুলো তোলা যায় কি করে?

গৌরাঙ্গদাস। জমিদারদের মৌজায় মৌজায় নায়েব গোমস্তার উপর সরকারী হতে যে রোকা পাঠান হয়েছে, তাতেই যথেষ্ট কাজ হবে, এ জমীদারের ছেলের অন্নপ্রাসন নয় যে, যে বেটা পাঁচসিকে খাজনা দেয়, সে পাঁচ পয়সা মাঙ্গল দিয়ে খালাস পাবে। প্রজা বেটাদের এবার নাকের জল চোখের জলে এক হবে। একবার দেবে এখানে, একবার দেবে আমাদের জমীদারী কাছারীতে, তার পর ফের মহকুমাতেও এক পত্তন দেবে। বেটারা এবার খুব জব্দ হবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তোমার উপর যে ভার দিয়েছিলাম তার কি কল্লে?

গৌরাঙ্গদাস। তা সাহেব সেটার ক্রুটী করিনি। আমাদের সব-

আয়, তার নামে পর্য্যন্ত আমি তোমার নামসই করা নিমন্ত্রণপত্র স্বহস্তে খামের উপর শিরোনামা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি। পাছে পাইনি বলে, সেজন্যে সই পর্য্যন্ত করিয়ে রেখেছি। এত চেষ্টাতেও বিশেষ ফল পাওয়া না গেলে আর উপায় কি?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। লোকগুলা ভারি ডিস্‌লয়াল হয়ে উঠেছে। স্কুলঘরে সেদিন যে মিটিং করা গেল, চাঁদা দেবার ভয়ে একটা লোকও সে মিটিংয়ে এলোনা। নেটিভ খবরের কাগজগুলোই নিউসান্স হয়ে উঠেছে। আমি চাঁদার পত্র বিলি করেছি, আর চারদিক হতে চীৎকার আরম্ভ করেছে।

গৌরাঙ্গদাস। গ্রামেও লোকগুলো আমাকে প্রায় একঘরে করে তুলেছে, যাক্ তাতে আমি ডরাইনে; আপনিও কোন চিন্তা করবেন না। আপনার মত অনেক ম্যাজিষ্ট্রেটই এবার খুব নাম বাহির করেছেন, সংবাদপত্রের লক্ষ্য আপনি শুধু একা নন। আর এরা বলে কেবল রায় বাহাদুর খেতাব লাভের জন্যেই আমি এতটা সাহেব সেবা করি।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তা হলে তোমার আরও কোন উচ্চ লক্ষ্য আছে নাকি?

গৌরাঙ্গদাস। আমি গৌরাঙ্গদাস মৌলিক, ভজহরি মৌলিকের আমি অদ্বিতীয় বংশধর। আমার পিতা মৃত মহাত্মা অন্নদান ও জলদান ক'রে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা রেখে গেছেন, কিন্তু লালপাগ্‌ড়ী দেখ্‌লে ভয়ে তটস্থ হতেন। আর আমি অন্নদান, জলদান প্রভৃতি সৎকার্য্য বিলকুল উঠিয়ে দিয়ে নিজের দানশক্তির বলে কেবল তোমাদের নয় তোমাদের খান্‌সামামহলে পর্য্যন্ত বাহাবা লাভ করেছি। আমার উচ্চ লক্ষ্য না থাক্‌লে কখন গ্রাম্য মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হতে পারতেম না, প্রথম শ্রেণীর অনরেরী হাকিমী লাভেরও কোন আশা থাক্‌তো না।

আছে বটে। আমি কমিশনরের কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছি তাতে তোমার 'ফেবরে' আমি অনেক কথা লিখেছি। এবার তোমার আশা পূর্ণ হওয়ারই সম্ভাবনা।

গৌরাঙ্গদাস। আর আশা! এবার যদি আশা পূর্ণ না হয় তবে গ্রামে আমার মুখ দেখানই ভার হবে, লোকে গায়ে ধূলো দেবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। রায় বাহাদুর যে হবে, খেতাবের সম্মান রাখ্‌তে পারবে ত? শুনেছি দেনার দায়ে তুমি ভারি বিব্রত।

গৌরাঙ্গদাস। নিন্দুকের কথায় কান দেবেন না। ঋণ করে ঘৃতপান শাস্ত্রের বচন, আমি পরম হিন্দু কি করে শাস্ত্র বচন উল্লঙ্ঘন করি?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। ধর্ম্মজ্ঞানের জন্যে আমি তোমাকে সাধুবাদ প্রদান কচ্ছি, কিন্তু উপস্থিত মহোৎসবে তুমি কত টাকা চাঁদা দিচ্ছ? আর উড়্‌বরণ মেমোরিয়ালের সঙ্গে অবশ্যই তোমার 'সিম্পাথি' আছে?

গৌরাঙ্গদাস। সাহেব, আমাদের মত লোকের 'সিম্পাথি, এপাথির' কোন মূল্য আছে বলে মনে করোনা। যদি তোমরা বল, 'ওয়েল গৌরাঙ্গদাস, আমাদের খুসী রাখবার জন্যে তোমাকে এই করতে হবে', তা হলে অসাধ্য হলেও তা আমরা তৎক্ষণাৎ করবো, ন্যায় অন্যায় দেশের হিত অহিত কিছু বিবেচনা করবোনা। কিন্তু আমার একটা কথা আছে সাহেব, ছোট লাট উড়্‌বরণের আমোলে বিস্তর চেষ্টাকরে ও সেক্রেটারীদের পর্য্যন্ত নানা উপায়ে মনযুগিয়ে আমার রায় বাহাদুরীটা লাভ হলোনা, আর কয়েকটা অপদার্থ নেটীভ ডাক্তার পর্য্যন্ত রায় বাহাদুর হয়ে গেল! এতকাল কি কেবল ভস্মেই ঘি ঢেলেছি?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তুমি যাদের কথা বলচো তারা যোগ্য লোক, যোগ্যতা বলেই তারা রায় বাহাদুরী লাভ করেছে, তুমি অনর্থক ক্ষোভ করচ।

গৌরাঙ্গদাস। আমি অযোগ্য কিসে? উপাধিদান করে তোমরা যোগ্যাযোগ্যের বিচার করে থাক? সে বিচার যদি

থাকতো তা হলে কোন্ দিন তুমি সি, আই, ই, হতে; বিশেষতঃ, আমার যোগ্যতার অভাবটা কোথায় দেখ্‌লে? এ কয় বৎসর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হয়ে আমি কি কম কর্ণমর্দ্দন পরিপাক ক'রেছি—নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছ, যা বলছ, তাই ত করছি। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে সেবার কমিশনরের কাছে কি অপদস্থই না হয়েছি! অনরেরী ম্যাজিষ্ট্রেটী রূপ উচ্চ ক্ষমতালাভ করে আমি একদিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ভ্রূকুটী ও অন্যদিকে সেসনজজের দুর্ব্বাক্য নিঃশব্দে সহ্য করছি—কিন্তু তা আমি গ্রাহ্যও কচ্চিনে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কারণ রায় বাহাদুর, তোমার উচ্চ লক্ষ্য। যাক্, করনেশনে তুমি কি রকম চাঁদা দিচ্ছ? সাধারণের সঙ্গে ত আর তোমার দানের তুলনা চলবে না। তোমার মত জমীদারেরাই প্রকৃত লয়াল, লয়ালটি কাকে বলে সে কথা তোমরা খাঁটি বুঝে নিয়েছ, নতুবা আমাদের এক একটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে তোমরা প্রিন্স অব ওয়েলসের মত মনে কর্‌তে না। আমি তোমার উপর খুব খুসী আছি, এখন তোমার দানের পরিচয় দাও, কি চাঁদা দেবে?

গৌরাঙ্গদাস। পরিচয় আর বেশী কি দেব সাহেব? ফতেপুরের জমীদার নিত্যানন্দ বাঁড়ুয্যে আমাকে তার রাইভেল বলে মনে করে। তার ত পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়, সে যা করতে পারেনি আমি তাই করব, আমি যে কতবড় রাজভক্ত তা হাতে হাতে প্রমাণ করে দেব। রাজভক্তির আদর্শ কি রকম উচ্চ হওয়া দরকার খবরের কাগজওয়ালারা পর্য্যন্ত আমার ব্যবহারে শিখে যাবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (সোৎসুক ভাবে) তুমি কি প্ল্যান করেছ খুলে বল দেখি।

গৌরাঙ্গদাস। আমার প্রত্যেক মহালে যত প্রজা আছে, উৎসবের দিন তাদের সকলকে সেই সেই মহালের কাছারী বাড়ীতে নিমন্ত্রণ

করে এনে মহাসমারোহে ভোজ দেব। রাজার অভিষেকে অন্নদান, এর চেয়ে পুণ্যের কাজ আর কি আছে ?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। ওয়েল মৌলিক, তোমার প্ল্যান আমি এপ্রুভ্ করছি।

গৌরাঙ্গদাস। কিন্তু আমি এজন্যে আপনার একটু সাহায্য চাই—অতি সামান্য সাহায্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কি, বল্‌তে পার।

গৌরাঙ্গদাস। আমার জমীদারীর মধ্যে যে সব পঞ্চায়েৎ আছে—দারোগাদের মারফৎ তাদের উপর এক একটা নোটিস্ দেওয়া হোক্—আমার যত কলাপাতা, থোড়, মোচা, কাঁচকলা এবং কচু আবশ্যক হবে তা যেন তাদের অধীনস্থ চৌকিদারেরা গ্রাম হতে সংগ্রহ করে নেয়। আমার গোমস্তা মুহুরীরা অবশ্যই এজন্য পরিশ্রম কর্‌বে, কিন্তু চৌকিদারের সাহায্যে এ সকল জিনিস সংগ্রহে বিলম্ব হবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। অলরাইট, নাউ গুড্‌বাই।

(ম্যাজিষ্ট্রেটের সংবাপত্রে মনঃসংযোগ ও গৌরাঙ্গদাসের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইলিশমারীর কাছারী।

(বেহারাস্কন্ধে জমীদার গৌরাঙ্গদাসের প্রবেশ, নায়েব ছবিলাল বিশ্বাসের সসম্ভ্রমে অভিবাদন।)

গৌরাঙ্গদাস। দেখ ছবিলাল, করোনেশনের ত আর বিলম্ব নেই, আমার পত্রে যে যে হুকুম ছিল তা তামিল করা হয়েছে ত ?

ছবিলাল। আজ্ঞে আমার মস্তকে কি তিনটি মুণ্ডু আছে যে হুজুরের হুকুম তামিল না করে ফেলে রাখ্‌বো ?—হুকুম বেবাক্ তামিল করা হয়েছে।

গৌরাঙ্গদাস। করোনেশনের দিন রায়তেরা আমার কাছারীর হাতায় এসে খাওয়া দাওয়া করবেত ? চাল ডাল সব বেঁধে আন্‌তে বলেছ ?

ছবিলাল। কেবল চাল ডাল ? নুন, তেল, হাঁড়ি, কাঠ সব নিয়ে আস্‌তে বলেছি, এক এক তেউড়ি খুঁড়বে আর খানা পাকাবে। পৌষমাস, দলবেঁধে কাছারীর মাঠে এসে সকলে বনভোজন করে যাবে, আমোদও হবে রাজভক্তি প্রকাশও হবে। আমি খুব ভাল রকম করেই প্রজাদের বলে দিয়েছি।

গৌরাঙ্গদাস। উত্তম। তরকারী, কলাপাতা প্রভৃতির আয়োজন কি করেছ ?

ছবিলাল। এ অঞ্চলে যে ক'জন পঞ্চায়েৎ আছে তারাই দারোগার হুকুমে তরকারী ও কলাপাতা সংগ্রহের ভার নিয়েছে। এবার বৎসরটি ভাল, ঝড়্‌ঝাপ্‌টা তেমন হয়নি, কলাপাতা সকল বাগানেই প্রচুর আছে। তরকারীরও অভাব নেই, অতি উত্তম সময়ে অভিষেকের মচ্ছব (মহোৎসব) হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে কলা, মুলো, লাউ, কুমড়ো; ক্ষেতে ক্ষেতে বেগুন, পালংশাক, শিম ; শুনেছি এবার ব্যবসায়ের জন্যে এ অঞ্চলে কেউ কেউ ফুলকপিরও আবাদ করেছে, তার সন্ধান নিতে হচ্ছে।

গৌরাঙ্গদাস। উত্তম। ফুলকপি পাড়াগাঁয়ে এখন অপূর্ব্ব তরকারী ; কিছু মাছের যোগাড় করতে পারলে ভাল হয়, জেলেপাড়ায় একটা লোক পাঠিয়ে দিও। ভাল কথা, গোয়ালা বেটাদের দুধ দৈয়ের বরাত দিয়েছ ত ?

ছবিলাল। হাঁ হুজুর, ওপাড়ার পঞ্চুঘোষের অনেক গোরু আছে, বিস্তর দুধ হয়, আমি তাকে ডেকে বল্লেম ঘোষের পো বৃহস্পতিবারে সকালে মন পাঁচেক দই দিতে হবে। পঞ্চু বল্লে 'আমার ঘর হতে ত

হবে, গোটাকত টাকা দেন।' আমি বল্লেম, 'সরকারের সে রকম হুকুম নেই, ওটা রাজভক্তির খরচ বাবদে তুমি দেও গে।' সে ব'ল্লে 'খেতে পাইনে ত রাজভক্তি দেখাব কি, আমি পেরে উঠ্‌বো না।'

গৌরাঙ্গদাস। বটে, পাজী বেটা হারামজাদা, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে চায়? তা সে কত দই দিতে রাজী হয়েছে?

ছবিলাল। বিস্তর ভয় প্রদর্শন করে দু মণে রাজী করেছি, বলেছে, 'ও বারয়ারীর কাণ্ড, হাতে হাতে দাম নেব।'

গৌরাঙ্গদাস। বেটার স্পর্দ্ধা ত কম নয়! হাতে হাতে কেন, ওর পিঠে আচ্ছা করে দাম চাপিয়ে দেওয়া যাবে। বেগার ধরেই ত কাছারীর হাতাটা পরিষ্কার করে নিয়েছ?'

ছবিলাল। হাঁ হুজুর, তাতেই কি বেটারা রাজী হয়! বলে, 'আমরা একবেলা খাটিব তবে কাচ্চাবাচ্চাগুলো একমুঠো ভাত পাবে, বেগার দিলে তাদের খেতে দেব কি?

গৌরাঙ্গদাস। তুমি কি ব'ল্লে?

ছবিলাল। আমি ভারি রাগ করে বল্লেম, তোরা বেটারা শুকিয়েই মর আর দুবেলাই উপোস কর রাজার তাতে কি? তাঁর অভিষেকের মচ্ছব, তোদের বেগার দিতেই হবে। আমাদের জমীদার মহাশয়ের উপর সব ভার পড়েছে—তিনি কি গাঁটের পয়সা খরচ করে এ সব কর্‌বেন?

গৌরাঙ্গদাস। উত্তম বলেছ, তিন দিনের মধ্যেই সকল আয়োজন ঠিক হওয়া দরকার। কাজ কি ভাবে শেষ হয় তা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে রিপোর্ট করতে হবে, দেখো কোন কাজে যেন ত্রুটি না হয়।

ছবিলাল। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সেদিন জেলায় গিয়েছিলাম, কতকগুলো বদলোক রটাচ্ছিল সরকারের কাছে রায়বাহাদুর

প্রকাশ করা কি গলায় ছুরী দেওয়া? লোকগুলা ভারি নিন্দুক, আমার এমন রাগ হতে লাগলো! কি বলবো, আমার ইল্‌সে মারীর কাছারী নয়, নৈলে তাদের এক হাত দেখিয়ে দিতাম।

গৌরাঙ্গদাস। বুঝেছ ছবি, বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে, যে বেটারা আমার নিন্দা করে ক্ষমতা থাক্‌লে তারাও আমার মত রায় বাহাদুরী লাভের চেষ্টা কর্‌তো। পরমেশ্বর সকলকে ত আর সে ক্ষমতা দেননি! তুমি এ কয় দিন খুব সাবধান হয়ে কাজ কর্‌বে।

ছবিলাল। আজ্ঞে তাতে কোন গাফিলি হবে না। আমার একটা আরজ ছিল হুজুর, আমার সহধর্ম্মিনীর সহোদরের বিবাহ, আমার একবার বাড়ী যাওয়া দরকার।

গৌরাঙ্গদাস। সে কথা আমার মনে আছে, উৎসবটা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হোক ত, তোমার ছুটী মঞ্জুর হবে, সে ত মাঘ মাসের কথা। অনেক বেলা হয়েছে। (বেহারাদের প্রতি) তোল্‌রে পালকী, বাড়ী চল্।

(পাল্‌কীতে উঠিয়া গৌরাঙ্গদাসের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

(বিনোদনগর সার্কিট হাউসে উকীল মোক্তারগণ চেয়ারে উপবিষ্ট। অনরারী গৌরাঙ্গদাসকে সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ।)

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (আসন গ্রহণ পূর্ব্বক) আপনারা দেখ্‌ছি ঠিক সময়েই সকলে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারাই জেলার মধ্যে বেশী এন্‌লাইটেণ্ড্ ও কালচারড্, আপনারাই সকল কাজের পথ-প্রদর্শক। করোনেশন ফেষ্টিভিটির জন্য আপনারা কে কত টাকা চাঁদা দেবেন তা জানবার

একজন উকীল। আজ মধ্যাহ্নে বার রুমে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, স্থির হয়েছে আমরা উকীল মোক্তার সকলে আমাদের মধ্যে হতে একশ টাকা চাঁদা তুলে দেব।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (অবজ্ঞাভরে) এ সামান্য টাকার কথা উল্লেখ করতেই আপনাদের সঙ্কোচ হওয়া উচিত ছিল, আমায় অপমান করা অবশ্য আপনাদের মৎলব নয়। আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন, এ উপলক্ষ্যে এ জেলায় পনের হাজার টাকা ব্যয় হবে, আপনাদের উপরই আমার আশা ভরসা অধিক।

উকীল। এর বেশী আর আমরা পেরে উঠিনে, ক্রমাগতই ত সাহেব চাঁদা যোগাচ্ছি। আজ লেডী ডফরিণ ফণ্ড, কাল ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল, পরশু উড্‌বরণ ফণ্ড—চাঁদার তাগাদা ত লেগেই রয়েছে, যদি দু চার বৎসরে একবার হয় ত কিছু বেশী দিতে পারা যায়, কিন্তু প্রতি বৎসরই যে বৃহৎ টাকা চাঁদা যোগাতে হ'চ্ছে। আমাদেরও ত আবার পরিবার প্রতিপালন আছে, সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম আছে, ডাক্তার বৈদ্য আছে, আত্মীয় স্বজনেরও তত্ত্ব তল্লাস নিতে হয়, বেশী টাকা চাঁদা কোথা থেকে দেব সাহেব?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। জানি আপনারা ভারি ডিস্‌কন্‌টেণ্টেড—কেবল তাই নয় দেশের মধ্যেও আপনারা ডিস্‌কন্‌টেণ্ট ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এই যে আপনাদের কংগ্রেস, এ ত আপনাদের কীর্ত্তি। আজ যদি কংগ্রেস থেকে চাঁদার তাগাদা পাঠাত, তাহলে এক দিনেই আপনারা পাঁচশ টাকা সহি কর্ত্তেন।

উকীল। আচ্ছা, পনর হাজার টাকা যদি জেলা হতে না উঠে, তবে তত টাকা ব্যয়ের আবশ্যক কি? আর পনের হাজার টাকা খরচই বা কিসে হবে?

এরকম একটা কাজে যদি এ টাকা না উঠে ত আর কোন্ উপলক্ষ্যে উঠ্‌বে! প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেছে, এখন আর কোন রকম পরিবর্ত্তন হতে পারে না। ব্যয়ের কথা আপনারা বলচেন, ব্যয়ের ফর্দ্দটা দেখেননি বুঝি? কলকাতা হতে যে থিয়েটার আস্‌বে তারাই ত তিন রাত্রির পারফরমেন্সে দু হাজার টাকা নেবে। তাদের এন্‌টারটেন্‌মেণ্টএর ব্যয়ও পাঁচশো হবে।

উকিল। এই ত গেল আড়াই হাজার, আর সাড়ে বার হাজার?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। এ অঞ্চলে যত চা-কর, নীলকর, ল্যাণ্ডহোল্ডার ইউরোপীয়ান ও ইম্‌পিরিয়াল এংলোইণ্ডিয়ান আছেন এই উৎসবে তাঁদের সকলকে আহ্বান করা হবে, সে জন্য কলকাতা হতে অনেক জিনিস পত্র আনাতে হবে। এক কেল্‌নার কোম্পানীর বিলই হবে পাঁচশো! ভাল চুরুট, পেলিটীর বাড়ীর উৎকৃষ্ট জিনিস্—এ সব অল্প টাকায় হয় না। তা ছাড়া বাজী পাঁচশ টাকা, দরবারের ব্যয়ই ত দশ হাজার—অস্‌লারের বাড়ী হতে দরবারের সজ্জা আনান হবে।

উকিল। সদ্ব্যয়ের কোন বন্দোবস্ত আছে?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কেন, এগুলোকে কি অসদ্ব্যয় বলতে চান্? আপনারা ছেলের বিবাহে এ রকম ব্যয় ত সর্ব্বদাই করে থাকেন—তাকি অপব্যয় বলে মনে করেন? এ সকল আয়োজন ত আপনাদেরই জন্য, আপনারা বাহ্যাড়ম্বরের বেশী ভক্ত, জাঁক জমকে বেশী ভোলেন, তাই আমরা এ সকল আয়োজন কচ্চি, ভারতসম্রাটের অভিষেকের উৎসব ঠিক ওরিয়েণ্টল্ টাইপেই হচ্চে।

উকিল। অবশ্য, কেবল সদ্ব্যয়টা বাদ।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (গম্ভীর হইয়া) আপনারা যাকে সদ্ব্যয় বলেন, তারও আয়োজন আছে। গরীবদের ও স্কুলবয়দের এন্‌টার্টেন করার

(গৌরাঙ্গদাসের ফর্দ্দ পাঠ)

দরিদ্র ভোজন—(কাঙ্গালী আন্দাজ দুই শত)।—

চিড়া	... ...	৭৲
মুড়কি	... ...	৫৲
গুড়	... ...	৩৲
দধি	... ...	১০৲
		২৫৲ ———— ২৫৲

স্কুলের ছাত্র ভোজন—(আন্দাজ পঞ্চাশটি)।—

ময়দা	... ...	১।০
ঘৃত	... ...	৪৲
সন্দেস ও মিঠাই	... ...	২।০
দধি (দরিদ্র ভোজনে যে দধি বাঁচিবে তাহাতেই চলিবে)।		
ক্ষীর	... ...	১৷৷০
চিনি	... ...	৸০
পান ও পানের মসলা	...	।০
		১০৲ ———— ১০৲
এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক অন্ধকে দুই পয়সা, খঞ্জকে তিন পয়সা ও বধিরকে এক আনা হিঃ অর্থ সাহায্য সংকল্পে	...	৫৲ ———— ৫৲

সর্ব্বসমেত ... ৪০৲ টাকা।

একজন উকীল।—(দ্বিতীয় উকীলের প্রতি জনান্তিকে) বধিরের

দ্বিতীয় উকীল। ওটা সহানুভূতিসূচক—কর্ত্তৃপক্ষ কোন কোন বিষয়ে ঠিক এই রকম কি না!

ম্যাজিষ্ট্রেট্। দেখুন, পনের হাজার টাকার মধ্যে চল্লিশ টাকা, আপনারা যাকে সদ্ব্যয় বলেন তার জন্যে রাখা হয়েছে; একথা নিয়ে অবশ্যই আপনারা সংবাদপত্রে আন্দোলন করবেন, কিন্তু মনে রাখবেন ব্রিটীশ জেনরসিটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আমরা জেনরস্ না হলে আজ বুয়রেরা নির্ব্বংশ হত, আমরা জেনরস্, তাই সামান্য দুই এক হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করে আমরা আপনাদের দেশের মেষপাল শাসন কর্ত্তে আসি, দীর্ঘ নির্ব্বাসন ভোগ করি। আর আমাদের জেনরসিটীর অনুগ্রহেই আপনারা একালে কিছু করে খাচ্ছেন, বৃটীশ জেনরসিটীর ভাল দিক্‌টা আপনাদের নজরে পড়ে না। ইংরাজ যদি দয়া না করতো তা হলে আজও মুসলমানের জুতা বইতেন, স্ত্রী কন্যা নিয়ে সশঙ্ক-ভাবে ঘরের কোণে বসে থাক্‌তেন, এত স্বাধীনতা কোথায় পেতেন?

উকীল। সাহেব অত্যন্ত রাগ করচেন; মুসলমান যে অপরাধে অপরাধী, খৃষ্টানও যদি সেই অপরাধে অপরাধী হয় তা হলে খৃষ্টানের উচিত হয় না, মুসলমানের দুর্ব্বলতা দেখিয়ে পরিহাস করা।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। যাক্ এ সব কথা। আপনাদের প্রত্যেককে আমি চাঁদা ভাগ করে দিচ্ছি—যাঁরা মাসিক পঁচিশ টাকা বা তার বেশী পান তাঁরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা দেবেন। একশ টাকা যাঁর মাসিক আয় তাঁকে দশ টাকা দিতে হবে—এই নিয়মে। উকীল মোক্তারদের মধ্যে আশা করি এমন কেহই নাই যাঁর মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকার কম।

(জুনিয়ারগণের একত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।)

উকীল। না মশায়, আপনার ফর্দ্দে আর আমাদের ফর্দ্দে অনেক তফাৎ—আমরা যে ফর্দ্দ করেছি তা এই দেখুন, এর উপর আর একটি

ম্যাজিষ্ট্রেট্। দেখি ফর্দ্দ (ফর্দ্দে নেত্রপাত করিয়া) Nonsense! চল্লিশ জন উকীল মোক্তারে একশত টাকা! Damn you!—যান আপনারা, আমি আপনাদের কাছে চাঁদা চাইনে কিন্তু I shall see you all! (ফর্দ্দ ছিঁড়িয়া বেগে প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

বাজারের পথ।

(বটবৃক্ষতলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সদলবলে উপস্থিত।)

ম্যাজিষ্ট্রেট্। পেস্কার!

পেস্কার। (কালো চাপকানে কানে কলম গুঁজিয়া কিঞ্চিৎ নত দেহে অগ্রসর হইয়া) হুজুর!

ম্যাজিষ্ট্রেট্। দোকানদারদের এখানে তলব দেও।

(চাপড়াসী সঙ্গে পেস্কারের প্রস্থান।)

(দোকানদারগণের বৃক্ষতলে ক্রমে সমাবেশ।)

ম্যাজিষ্ট্রেট্। নফর প্রামাণিক কার নাম?

নফর। হুজুর আমিই, অধীন হাজির আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তুমি নফর প্রামাণিক, তুমি খুব বড় দোকানদার, তোমাকে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে হবে।

নফর। (করজোড়ে) হুজুর, আমি পাঁচটি টাকার মানুষ নয়, পঞ্চাশ টাকা কোথা থেকে দেব হুজুর? দুখানা নৌকায় উপরি উপরি মা গঙ্গা কৃপা করায় আমি মবলক টাকার দেনদার হয়ে পড়েছি, মহাজনের দেনাশোধই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। না, তোমাকে এ টাকা আলবৎ দিতে হবে। সরকারে তোমার রাজভক্তি জাহির হবে। নকড়ি সা কার নাম ?

নকড়ি। আমি হুজুর, হাজির আছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তুমি সরাবের দোকান রাখো। খুব টাকা তোমার আছে, এ সহরে বাবু লোক খুব সরাব খায়, তুমি পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দেবে।

নকড়ি। হুজুর, গরীব মারা যাবে। আমি দরবারে এক কেশ হুইস্কি দেব, উত্তম হুইস্কি, সাহেবদের ভোগে লাগবে, তা নিয়েই হুজুর আমাকে মাপ দিতে হবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। আচ্ছা তুমি যেতে পার, খোদাবকস কার নাম ?

খোদাবকস। বান্দা হাজির হুজুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তোমারে গরম কাপড়ের দোকান, তুমি অনেক টাকা উপার্জ্জন কর, তুমিও পঞ্চাশ টাকা দেবে।

খোদাবকস। হুজুর, আমি পাঁচ টাকার অধিক পার্‌বো না।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। আমার হুকুম থাকলো, যাদের খড়ো দোকান তারা প্রত্যেকে দেবে দশ, আর যাদের পাকা দোকান তারা প্রত্যেকে দেবে পঁচিশ—তিন দিনের মধ্যে চাঁদা দাখিল করে দেবে।

দোকানদারগণ। (গলবস্ত্র হইয়া) হুজুর তা হলে আমাদের গলায় পা দেওয়া হবে, দোহাই হুজুর আমরা এত টাকা পেরে উঠ্‌বো না।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (মাটিতে সজোরে পদাঘাত করিয়া সরোষে) পেস্কার, কাল এই সব দোকানদারের ইনকমট্যাক্সের ফর্দ্দটা আমাকে দেবে। আর এদের খাতা পত্র তলপ করবে; এসেসার এবার যে এসেসমেণ্ট করেছে তা আমি নামঞ্জুর করচি, নূতন নোটীস হবে। আমি দেখ্‌ব গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করে কে কে কম ট্যাক্স দিচ্ছে।

দোকানদারগণ। [illegible]

ট্যাক্স আর বাড়াবেন না। যা কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করি তার কতক নেন নীলকমল, কতক নেন মুনিসিপ্যাল (মিউনিসিপালিটী) কতক নেন জমীদার, আমরা এক বেলা উপোস করে সংসার করি। যাহোক, আমরা না খাই সেও স্বীকার—চাঁদাই কিছু কিছু বেশী দেব, নীলকমলের ট্যাক্স আর বাড়াবেন না হুজুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। নফর তোমরা ক'জনে পঞ্চাশ টাকা করে দেবে, আর সকলে আমি যে রেট ধরে দিলাম সেই রেটে দেবে, এক পয়সা কম হলে আমি তোমাদের বুঝতে দেব তোমরা ভাল কাজ করনি।

দোকানদারগণ। (কাতর স্বরে) হুজুর যা বল্লেন তাতেই রাজী, কিন্তু এমন মচ্ছব যেন আর বাপের জন্মেও দেখ্‌তে না হয়। রাজার অভিষেক কোথায় আমরা টেক্স ফেক্স মাপ পাব না মাথার উপর এক পত্তন চাঁদা চাপ্‌লো, অভাগার অদৃষ্টে কখন সুখ নেই।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস কামরা।

(ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও সেরেস্তাদার।)

সেরেস্তাদার। জমীদার নিত্যানন্দ বাবু যা লিখেছেন তার কোন উত্তর দেওয়া যাবে কি?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। না, আবশ্যক নাই, তার ব্যবহার আমার মনে থাকবে। আমি বিনোদনগরে অভিষেকোৎসবের আয়োজন কচ্ছি, তাতে নিত্যানন্দের ও গৌরাঙ্গদাসের ছেলেদের আমার পেজ করতে

দেওয়া হচ্ছে তা আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। কৈ, গৌরাঙ্গদাস বাবু ত কোন আপত্তি কল্লে না, বরং সে এতে নিজেকে সৌভাগ্যবানই মনে করেছে, সেও ত এরিষ্টক্র‍্যাটিকের বংশ।

সেরেস্তাদার। আজ্ঞে সম্প্রতি ওরা বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েছে—নিত্যানন্দের এখনও বিষদাঁত আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌। নিত্যানন্দের জানা উচিত আমি চক্ষুর নিমিষে সেই বিষদাঁত ভাঙ্গতে পারি।

সেরেস্তাদার। আমার পুত্র দিয়ে যদি আপনার কাজ চল্‌তো তা হলে আমার ছেলে হুটিকে আপনার ভৃত্য সাজিয়ে কৃতার্থ হতে পারতেম।

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌। তোমার ছেলে 'পেজ' হলে আর আমার সম্মান রইল কৈ? লর্ড কর্জ্জনের পেজ যদি ক্ষত্রিয় সামন্তরাজের ছেলেরা হতে পারে তা হলে নিত্যানন্দ একজন পঞ্চাশহাজার টাকার জমীদার, তার ছেলে আমার পেজ হতে পারে না! রাজকীয় ক্ষমতায় আবার ছোট বড় কি?

সেরেস্তাদার। নিত্যানন্দের সরিক কানাই বাঁড়ুয্যের এক ছেলে আছে। পনের ষোল বৎসর বয়স, উত্তম দেখতে, তাকে যদি পেজ করেন তবে যোগাড় কর্‌তে পারি। নিত্যানন্দও তাতে খুব শাসিত হবে, তার বংশগৌরবের অভিমান ঘুচে যাবে। কিন্তু কানাইবাবুর উপর হুজুরের যাতে একটু নেক নজর থাকে তা করতে হবে; নিত্যানন্দের সঙ্গে কানাইবাবুর সরিকি বিবাদ আরম্ভ হয়েছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌। উত্তম, কানাইবাবুর রাজভক্তি পুরস্কৃত হবে। তার ছেলেকেই প্রস্তুত হতে বল্‌বে। এজন্য আর চিঠিপত্র লিখে আবশ্যক নাই। আর এক কথা—হাতী কটা আস্‌বে? আর কাঁটাপুকুরের রাজসিংহাসন খানা ঠিক করে রাখ্‌তে হবে। রূপোর সিংহাসন একখানা

সেরেস্তাদার। রূপার সিংহাসন হুজুর আর কার আছে? আচ্ছা সন্ধান জান্‌চি। রূপার সিংহাসন কি মেম সাহেবের জন্য?

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তোমার চুল পেকে গেল, বুদ্ধি পাক্‌লো না। রূপার সিংহাসন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্টের জন্য; জেলার রাজশক্তির দুই কাজ—বাঁধা ও মারা। শেষ শক্তিটি আমার হাতে, প্রথমটি পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্টের—উৎসবে এই উভয় শক্তিরই আসন হবে।

সেরেস্তাদার। পলিটিক্সের ধার ধারিনে হুজুর, কাজেই এতখানি বুঝে উঠতে পারিনি। ভাবলাম ইংলণ্ডে যেমন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর অভিষেক হয়েছে এখানেও মেম সাহেবকে নিয়ে আপনার সেই রকম অভিষেক হবে, স্বর্ণসিংহাসনে আপনি চড়ে বসবেন, আর রৌপ্য-সিংহাসনে মেম সাহেব চড়বেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তোমরা এদেশের লোক একটা কথা বুঝতে পার না; এদেশে রাজশক্তির বিকাশ দেখাবার জন্য রাজা উপস্থিত নেই, কাজেই রাজপুরুষগণকে সে শক্তিটা জাহির কর্ত্তে হয়। রাজপ্রতিনিধি থেকে আমরা পর্য্যন্ত সকলেই সে শক্তি জাহির কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছি।

সেরেস্তাদার। তা করুন, মন্ত্রীত্বটা হতে যেন বঞ্চিত না হই।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। আর এক কথা—টেলিগ্রাম পাওয়া গেল, খেমটা ও থিয়েটারের দল কল্‌কাতা হতে রওনা হয়েছে, তাদের দলে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে, কষ্ট সহ্য করা তাদের অভ্যাস নয়—তাদের রিসেপ্‌সনের ও কম্ফর্টের যেন কোন ক্রটী না হয়। সহিকরবার কাগজ পত্র কি আছে আন।

(ম্যাজিষ্ট্রেটের চুরোটে অগ্নি সংযোগ ও সেরেস্তাদারের সেরেস্তায় গমন।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জনার্দ্দনপুরের হাটের পথ—সময় প্রভাত।

শিবু জেলে ও তিনু পুঁড়োর (তরকারী বিক্রেতা) প্রবেশ।

শিবু। আজ ভাই হাটে গিয়ে লহমার মদ্দি মাছগুলো বেচ্‌তে পাল্লি হয়। জমীদার বাড়ী কি না কি তামাসা তাই কাছারীতে বনভোজন হবে, শুকরুল্লো চৌকিদার বল্‌ছেলো সব মাছ সেতায় দিতে হবে, তা তেনারা নাকি দাম দেবে না!

তিনু। আরে ভাই আমারও ত ঐ কথা। তোদের গাঁয়ের চৌকিদার বুঝি শুকরুল্লো, আমাদের গাঁয়ের চৌকিদার আবার চিন্তে বাগ্‌দী, সুমুন্দি বলে ক্ষ্যাতে যত মুলোবেগুণ আছে সব তুলে জমীদারের কাছারীতে দিয়ে আস্‌তে হবে—দামের বেলা একেবারেই গলায় হাত।

শিবু। অত্যাচারটা কি কম হ'চ্ছে! বল্‌লে না পৃত্যয় যাবা ভাই, আমার বাড়ীর পাশে একটা মাগী আছে বিধ্‌বে সে, সংসারে আপনার বল্‌তে একটি মনিষ্যি নেই; দু ঝাড় কলা গাছ আর কিছু শাক দাঁটা এই তার সম্বলের মধ্যে, তা ঐ তামাশাতে লাগ্‌বে বলে জমীদারের পাক্ আর শুকরুল্লো সুমুন্দি কলা পাড়ছে—এক রকম কলাগাছগুলো কেটে এনেছে—বনভোজনে মোচার ঘণ্ট আর থোড়ের ডাল্না লাগ্‌বে। আফুলো কলা গুলো কচ্ কচ্ করে কেটে ফেলেছে, বলে, পথের দুধারে পাড়তে হবে। গাঁয়ের কলাবাগান একেবারে উজোড় করে ফেলেচে। আর আমার বেয়াই রামচরণের গাছে যে কটা ইচোড় ফলেছিল, সুমুন্দি তার একটা যদি গাছে রেখেচে, বেয়াই হাউ হাউ করে কান্‌তে লাগ্‌লো। মাছেরটক্ সাহেবের হুকুম, এ কি রকম হুকুমরে বাবা—এদেশে কি রাজা নেই?

রাজটীকে হবে, তাতেই ত তরকারীর খোঁজ পড়েছে, ফস্ করে এগুলো বিক্রী হয়ে যায় ত বাঁচি। আজ বুধবার, বনভোজন বুঝি কাল!

(জমীদারের দুইজন পাইক ও একজন চৌকিদারের প্রবেশ।)

১ম পাক্। কি আছে তোর ঝোড়ায়? নামা ঝোড়া।

২য় পাক্। কি আছে তোর মাথায়, দেখি কি মাছ পেয়েছিস্?

চৌকিদার। বড় চুপে চুপে হাটে যাচ্ছিস্! ভেবেছিস্ কোম্পানীকে ফাঁকি দিবি! আমরা আছি কি জন্যে? এ দুবেটার কাছে যা কিছু মাছ তরকারী আছে ওদের ঘাড়ে দিয়ে কাছারীতে নিয়ে চল। সেখানে নামিয়ে নেওয়া যাবে।

তিনু। এ তোমাদের দিয়ে আমি খাব কি?

পাক্। খাবি। রাজার তামাসায়, মাজেষ্টর সাহেবের হুকুম, পেটে খা না খা, পিঠে ঢাক বাজা!

তিনু। তা হলে ছেলে মেয়ে গুলো সারাদিন উপোস পাড়বে, দোহাই বাবা, কিছু নেও, অর্দ্ধেক নেও, সব নিয়ো না।

চৌকিদার! (তিনুর পিঠে ধাক্কা দিয়া) বক্তিমে মাজেষ্টর সাহেবের কাছে গিয়ে করিস্, এখন্ চল। (শিবুকে পদাঘাত করিয়া) চল্‌রে শালা, মাছের ঝোড়া মাথায় করে, কার্ত্তিকের মত দাঁড়িয়ে রইলি যে!

শিবু। (স্বগতঃ) সুমুন্দি ঠ্যাং খান ভেঙ্গে দিলে, আজ কার মুখ দেখেই উঠেলাম! খুব মচ্ছব রে বাবা! পরের মাথায় খুব কাঁঠাল ভাঙ্গচিস্!

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা।

———

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS
Recd. on the 21 JAN 1903

ভ্রম-সংশোধন।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত "কর্ত্তব্য সাধন কর" এই নাটিকার মধ্যেঃ—

৮০৯ পৃষ্ঠা—১৪ পংক্তি—"ছাড়িয়া জাহাজ" ইহার স্থলে "চড়িয়া জাহাজ" হইবে।

৮১০ „ ১১ „ "প্রণয়-ভীষণ" ইহার স্থলে "প্রণয় ভাষণ" হইবে।

৮১৯ „ ২১ „ "নিয়ম সংযম মান" ইহার স্থলে "নিয়ম সংযম মানে" হইবে।

J/4 624
Bh 29
18 - 190
BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS
1905

বন্দনা ।*

বন্দি তোমায় ভারত-জননি
বিদ্যামুকুটধারিণি !
বরপুত্রের তপ-অর্জ্জিত
গৌরব-মণি-মালিনি !
কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণ
হৃদি-আনন্দকারিণি !
মরি বিদ্যামুকুটধারিণি !

যুগযুগান্ত তিমির অন্তে
হাস মা কমল-বরণি !
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে
আবার শোভিছে ধরণী !
নবজীবনের পসরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী !
হাস মা কমল-বরণি !

এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী !
আবার তোমায় দেখিব জননি
সুখে দশদিক্‌পালিনী !
অপমান ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পরকরবালিনি !
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি !

শ্রীসরলা দেবী ।

---

* এই বৎসর সারস্বত-উৎসবকালে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতায় [illegible]

স্বরলিপি।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

॥৬॥ [পঁ প১ মপধ১ ধ২। পধ১ ধনোর্স১ নো১ ধ১ প১ প১।
ব ন্দি তো মায় ভা র ত জ ন নি

প২ ধ১ পধপ১ মগ১ ম১।{মগ২ ম১ পধনোর্স১ নোধ১ পম১।}]
বি দ্যা মু কু ট {ধা রি নি — —}

মগ২ ম১ পধ১ নোর্স১ —১ ॥ র্স১ র্স১ র্রর্গ১ র্ম১ র্গ১ র্র১।
ধা রি নি — — ব র পু — ত্রে র

শেষ॥

র্স১ ন১ র্স১ ন১ র্স১ র্স১। র্সর্র১ র্স১ নো১ ধ১ প১ ম১। মগ২ ম১
ত প অ — র্জি ত গৌ — র ব ম নি মা লি

পধনোর্স১ নোধ১ পম১ ॥ প১ প১ প২ ধর্স১ র্স১। নো১
নি — — কো টি স ন্তা ন আঁ

ধ১ ধর্স১ নোধ১ প১ ম১। ধ১ প১ প১ ধ২ প১। ধ১ প১ ধনো১
খি ত — র্প ণ হৃ দি আ ন ন্দ কা রি ণি

ধপ১ ধ২। —৪ প১ প১। র্স২ র্স১ র্রর্গ১ র্মর্প১ র্মর্গ। র্রর্সন১
— — — ম রি বি দ্যা মু কু ট ধা

—১ র্স১ নর্স র্রর্স১ নোধপম১ ॥ [প১ প১ প১ প২ প১।
— রি ণি — — যু গ যু গা ন্ত

(আ-প্র)

ধ১ র্স১ র্স১ র্র২ র্র১। র্স১ র্স১ র্স১ র্র১ র্র১ র্গর্র১। র্স১ র্র১
তি মি র অ ন্তে হা স মা ক ম ল ব র

র্সর্রর্স১ নো১ ধ১ প১।] প১ ন২ ন১ ন১ ন১। র্স২ ন১

স´১ স´১ স´১। প১ স´১ ন১ স´১ স´১ নর্স১। স´১ নো১

হৃ দ য়ে আ বা র শো ভি ছে ধ র

ধ১ —১ —১ —১। [ধ১ ধ১ ধ১ ধ১ ধপ১ ধ১। নো১ স´১

ণী — — — [ন ব জী ব নে র প স

ধস´১ নোধ১ প১ প১। প১ ধ১ পধপ১ ম১ গ১ ম১। মগ১

রা ব হি য়া আ সি ন্দে কা লে র ত

ম১ পধ১ নোস´১ নোধ১ প১] স´ন১ স´১ স´১ র্গ১ র্মপ১

র ণী — — —] হা স মা ক ম

র্মগ১। র্স ন১ স´১ নস´১ র্স´১ নোধ১ পম১ ॥ প১

ল ব র ণি — — — এ

(আ-প্র)

প১ প১ প২ প১। ধ১ স´১ স´১ র২ র১। স২ স´১ র২

সে ছে বি স্তা আ সি বে ঋ দ্ধি শৌ র্য্য বী

গর১। স´১ র১ র১ স´নো১ ধপ১ —১। প১ ন২ ন১ ন২।

র্য্য শা — লি নী — — আ বার তো মায়

স´১ স´১ ন১ স´১-স´১ স১। প১ স´১ ন১ স´১ স২। নস´১ র১

দে খি ব জ ন নি সু খে দ শ দিক্ পা —

স১ নো১ ধ২। ধ১ ধ১ ধ১ ধ১ ধপ১ ধ১। নো১ স´১ ধস´১

লি নী — অ প মা ন ক্ষ ত জু ড়া ই

নোধ১ প১ প১। প২ ধ১ পধপ১ মগ১ ম১। মগ২ ম১ পধ১

বি মা তঃ খ র্ব্ব র ক র বা লি নি

নোস´১ নোধপ১। স´ন১ স১ স১ র্গ১ র্মপ১ র্মগ১। র্স ন১

— — শৌ — র্য্য বী — র্য্য শা

স´১ স´১ নস´১ রস´১ নোধপম ॥

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS
Recd. on the 17 Mar. 1905

সুন্দরী।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কান্তিচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কমলা দেবী যুবা পুত্রের জননী হইলেও, অধিক বয়স্কা নহেন। তিনি কান্তিচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কমলা দেবী কুমারী অবস্থায় স্লেট্ ও বহি লইয়া বালিকা বিদ্যালয়ে রীতিমত যাতায়াত করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে স্বামীকে তিনি যে সকল প্রেমপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বর্ত্তমান সময়ের প্রথা অনুযায়ী না হউক, তথাপি আশ্চর্য্যরূপ আধুনিক; শিশুবোধকোক্ত শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী কর্ত্তৃক, তদীয়া প্রবাসী ভর্ত্তা শ্রীযুত মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখিত পত্রের সহিত কোনই সৌসাদৃশ্য নাই।

কমলা দেবী অত্যন্ত কোমলহৃদয়া,—তাঁহার পুত্রবাৎসল্য অপরিমিত। সে দিন সন্ধ্যাকালে নবগোপালের কক্ষ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কেবলই এই বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুত্রের মলিন মুখ স্মরণ করিয়া তাঁহার মনটী দুঃখে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। তিনি উপন্যাসাদিতে নিরাশ প্রণয়ের যে সকল কাহিনী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া স্বীয় পুত্রের মঙ্গলের জন্য আকুল হইতে লাগিলেন। সূর্য্যপুরে বিবাহ হইলে যে সাংসারিক হিসাবে খুব উত্তম হয় তাহা তিনি জানিতেন। তথাপি ভাবিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় নবগোপালের ধন সম্পত্তির ত কোনও অভাব নাই, তবে সে যে মেয়েটিকে দেখিয়া স্বয়ং পছন্দ করিয়াছে—যাহাকে লাভ করিবার জন্য একটু আগ্রহান্বিত

বটে, তাহাতে কিবা আসিবে যাইবে? তাহার সহবংশিক্ষা যদি উত্তমরূপ না-ই হইয়া থাকে সমস্ত কাল ত পড়িয়া রহিয়াছে—তিনি তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবেন। তাহার পিতৃগৃহের সঙ্গ যদি ভাল না-ই হয়,—তাহাকে পিতৃগৃহে অধিক দিন থাকিতে না দিলেই হইবে,—কচিৎ কখন কালে ভদ্রে পাঠাইবেন মাত্র। সে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে,—সে জন্য কোনও ভাবনা নাই।

প্রধান ভাবনা, কেমন করিয়া কর্ত্তার মত তিনি সংগ্রহ করিবেন। নিজ স্বামীর চরিত্র তিনি উত্তমরূপই অবগত ছিলেন। সূর্য্যপুরের জমিদারের সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য তিনি কি প্রকার উৎসুক তাহা বিশেষ করিয়া না জানুন,—তাঁহার বিষয়তৃষ্ণার সাধারণ প্রাবল্য তাঁহার কাছে অবিদিত ছিল না। কিন্তু তথাপি মনে মনে একটু আশার স্থান দিলেন। বলিলে কহিলে কি কোনও ফলই হইবে না? কান্তিচন্দ্র বৈষয়িক ব্যাপারে যতই লৌহচেতা হউন,—পুত্রের প্রতি তাঁহার মমতা যথেষ্ট ছিল। আর, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের এ ভার্য্যাটির মন যোগাইতেও তিনি অনেক সময় যত্নবান হইতেন। তাই তিনি আশা বাঁধিলেন। ভাবিলেন,—এ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। সময় বুঝিয়া, স্বামীর মনের অবস্থা বুঝিয়া, অত্যন্ত নিপুণতার সহিত, কথা পাড়িতে হইবে। তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নহে,—অবসর অন্বেষণ আবশ্যক।

এইরূপ চিন্তা ও মানসিক তর্কে সম্পূর্ণ একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হইল—কমলা দেবী একবারও স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িবার অবসর পাইলেন না। সপ্তম দিবসের সন্ধ্যাকালে সে সুযোগটি উপস্থিত হইল।

সূর্য্যাস্তের কিয়ৎক্ষণ পরে, একটি কক্ষে খোলা জানালার নিকট সোফায় বসিয়া কমলা দেবী এক খানি নূতন মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছিলেন। বঙ্গদেশের ...

হাতে পাইলে, সে সংখ্যার গল্প বা উপন্যাসটি অন্বেষণ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। যে সকল মাসিকপত্রিকা পাতা কাটিয়া বাহির হয় না,—তাহাদের গল্পের কয়েকটি পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর অংশ সাধারণতঃ অকর্ত্তিত থাকে, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কমলা দেবীও একটি গল্প পাঠ করিতেছিলেন। সৌভাগ্যবান্ লেখক এই পাঠিকার কৌতূহল অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবেই উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। যখন দিবালোক কমিল, গৃহিণী তখন উঠিয়া, জানালার কাছটিতে দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝি আসিয়া আলো দিয়া গেল,—কমলা দেবী ফিরিয়া সোফায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। গল্পটি শেষ করিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন,—এমন সময় কান্তিচন্দ্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর মুখমণ্ডল আজ হাস্যে উচ্ছ্বসিত। কয়েকদিন হইতে হাইকোর্টে একজন প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে একটা তালুকের চৌহদ্দি লইয়া মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, ইহা তিনি অবগত ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো, আজ যে মুখখানি হাসি হাসি,—কোনও ভাল খবর পেলে না কি ?"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"আমার ব্যারিষ্টার আজ বৈকালে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাফ্ করেছে,, সে মোকর্দ্দমাটা আমরা জিতেছি।"

গৃহিণী শুনিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কান্তিচন্দ্র তখন সেই মোকর্দ্দমাঘটিত আরও কয়েকটি সংবাদ মনের উচ্ছ্বাসে পত্নীকে অবগত করাইলেন—কিন্তু শ্রোত্রী তাহা কতদূর অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন,—সে বিষয়ে আমরা 'সঠিক' সংবাদ পাই নাই।

কমলা দেবী মাসিকপত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া হাতে ধরিয়া ছিলেন,

"এবারকার 'অবসরমোহিনী'—একটা ভারি চমৎকার গল্প বেরিয়েছে।"

কান্তিচন্দ্রের মন আজ এতই লঘু ছিল যে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

গৃহিণী সাগ্রহে বলিলেন—"পড়ে শোনাব?"

কান্তিচন্দ্রের মুখাবয়বে স্পষ্টই ভীতিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না, থাক্। মুখেই সংক্ষেপে বল না কাণ্ডখানা কি।"

গৃহিণী তখন সংক্ষেপে আরম্ভ করিলেন:—

"রাণার রূপবতী কুমারী কন্যার সঙ্গে একজন রাজপুত যুবার প্রণয় হয়েছিল।——"

"যুবা অবিশ্যি খুব গরীব?"

"হ্যাঁ—একজন সিপাহী। দরিদ্র কিন্তু ভারি বীর।" কান্তিচন্দ্র গোপনে ঈষৎ হাস্য করিলেন। গৃহিণী বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"রাজপুত যুবার নাম দুর্জ্জয় সিংহ।——"

"দুর্জ্জন সিংহ?"

"না—দুর্জ্জয় সিংহ। মেয়ের নাম করুণাবতী।" কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"আহা।" প্রকাশ্যে নয়, মনে মনে।

"দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল——"

"দেবীমন্দিরে?"

কমলা দেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ—কি করে জানলে? পড়েছ না কি?"

কান্তিচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"না। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীর পর থেকে ঐ রকম সর্ব্বদাই ঘটে থাকে।"

"দেবীমন্দিরে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, আরও অনেকবার সাক্ষাৎ

হয়। কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ ভারি গরীব বলে রাণার কাছে প্রস্তাব করতে সাহসী হন না। তাই তিনি মনে করলেন, খুব বীরত্ব দেখিয়ে, সৈন্যে উচ্চপদ লাভ করে, তবে প্রস্তাব করবেন। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল পাঠানেরা রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে।”

“বল কি ?”

“হ্যাঁ। ভয়ানক যুদ্ধ বাধল। সেনাপতি নিহত হল। দুর্জ্জয়সিংহ এমন বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যে সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকেই সেনাপতি বরণ করলে। যুদ্ধে পরাভূত হয়ে পাঠানেরা পলায়ন করলে—কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্রমে রটনা হল পাঠানেরা দুর্জ্জয়সিংহকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল—তাঁকে কেটে ফেলেছে। তাই শুনে রাজকন্যা বিষপান করলেন।”

“সর্ব্বনাশ !”

“কিন্তু আসলে তারা দুর্জ্জয়সিংহকে কাটতে পারে নি। মশান থেকে তাদের হাত ছেড়ে, কোতোয়ালের ঘোড়া চড়ে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। ভাবছিলেন রাণা যখন যুদ্ধজয়ের জন্যে তাঁকে পুরস্কার দিতে চাইবেন তখন করুণাবতীর হস্ত প্রার্থনা করবেন। এসে দেখলেন রাজকন্যার চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে।”

কান্তিচন্দ্র মনের কৌতুক গোপন করিয়া বলিলেন—“ভারি দুঃখের বিষয় !”

গৃহিণী বলিলেন—“আহা দুঃখের বিষয় নয়, করুণাবতীকে আর দেখতেও পেলেন না !”

এই সময় পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, ভোজন প্রস্তুত। কমলা দেবী স্বামীকে লইয়া ভোজন কক্ষে গমন করিলেন। স্বামী ভোজন করিতে লাগিলেন—তিনি একখানি আসন লইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া নানাবিধ কথোপকথনে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

নবগোপাল যখন গৃহে থাকিত, তখন সে সান্ধ্যভোজন প্রায়ই পিতার সঙ্গে একত্র সম্পন্ন করিত। তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবু কোথায় ?"

গৃহিণী একটু ক্ষুণ্ণমনা হইয়া বলিলেন—"আজ সে নৌকো নিয়ে বেরিয়েছিল, এখনও ফেরেনি।"

ভোজন শেষ হইলে কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"তুমি খেয়ে এস, আমি ছাদে চল্লাম।" সেদিন সন্ধ্যায় ভারি গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল। কান্তিচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে ভৃত্যগণ ছাদে বিছানা প্রস্তত করিয়াছিল। কান্তিচন্দ্র অর্দ্ধশয়ান হইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

স্বামীর পাতে আহার করিয়া, রূপার ডিবাতে এক ডিবা সুগন্ধি পান লইয়া, গৃহিণী ছাদে উপস্থিত হইলেন। স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী ;—সেই মাত্র চন্দ্রোদয় হইয়াছে। কান্তিচন্দ্রের ধূমনলে একটী জলসিক্ত বেলফুলের মালা—ছাদময় গন্ধবিতরণ করিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পর কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবু ফিরেছে ?"

"কই না, এখনও ত ফেরে নি।"

"কখন গেছে ?"

"বেলা বারোটা একটার সময়।"

"রোজই কি শিকার করতে যায় ?"

"এ কদিন প্রায়ই ত যাচ্চে। বাছার মন ভাল নেই—তাই বোধ করি বাড়ীতে থাকে না,—ঐ রকম করে সময় কাটায়।"

"কেন, কি হয়েছে ?"—কান্তিচন্দ্রের স্বর স্নেহপূর্ণ। গৃহিণী আপাততঃ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সূর্য্যপুরের

"প্রায় পাকা বৈ কি। কেন?"

"ছেলেকে না জিজ্ঞাসা করে একেবারে পাকা করে ফেল না।"

কান্তিচন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন ছেলে কি জানে! এ সকল বিষয়ে একজন বিংশতি বর্ষীয় বালকের মতামতের কোনও মূল্য আছে না কি!

গৃহিণী কহিলেন—"ছেলে যদি বিয়ে করতে না চায়?

"বিয়ে করতে না চায় তবু তাকে বিয়ে করতে হবে। আমরা তার মঙ্গলের জন্য ভাল বুঝে যা বন্দোবস্ত করব তাই তাকে গ্রহণ করতে হবে।"

"কিন্তু জান ত আজকালকার ছেলেরা বিয়ের বিষয়ে একটু স্বাধীন মতামত রাখতে চায়। আজকাল ছেলেদের সঙ্গে প্রথমে কথা কওয়া প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কান্তিচন্দ্র একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। বলিলেন—"যাদের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই দাঁড়িয়েছে। আমাদের বংশাবলীক্রমে চিরদিন যা হয়ে আসছে তাই এখনও হবে।"

গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। কান্তিচন্দ্র ততক্ষণ আকাশের পানে চাহিয়া ধূমপানে রত রহিলেন। ক্রমে গৃহিণী বলিলেন —"তাই যদি করতে চাও, তবে বংশাবলীক্রমে যে রকম শিক্ষা দীক্ষা হয়ে আসছিল তাই বজায় রাখতে হয়। তার ব্যতিক্রম করলে কেন? আগেকার তাঁরা কি ছেলেকে কলকাতায় পাঠিয়ে ইংরেজ মাষ্টারদের তত্ত্বাবধানে রেখে দিতেন? যে রকম ব্যবস্থা করেছ সেই রকম চলতে হবে।"

কান্তিচন্দ্র গুড়গুড়ির নলটি নামাইয়া, তাকিয়াটি একটু সরাইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া বসিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ইংরিজি পড়লেই যে সকলে সায়েব হয়ে যায়—মেম বিয়ে করে—তা নয়।

গৃহিণী এতই সাবধানে, সন্তর্পণে কথা পাড়িয়াছেন যে এখনও কান্তিচন্দ্র সন্দেহও করিতে পারেন নাই যে ভিতরে কোন গোলযোগ আছে। তিনি ভাবিলেন, নবগোপালের মতটা লওয়া হয়, এই মাত্র গৃহিণীর উদ্দেশ্য।

গৃহিণী ভাবিতে লাগিলেন, এইবার আসল বিষয় উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে। কিন্তু সে বিষয় এখনই সম্পূর্ণ বলিবেন অথবা অংশমাত্র বলিবেন, তাহাই মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। স্বামীর মনো-ভাব দেখিয়া অনুমান হয়, একেবারে সমস্ত খুলিয়া বলা বুদ্ধির কায হইবে না। নবগোপাল যে সূর্য্যপুরে বিবাহ করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ, আপাততঃ তাহাই মাত্র প্রকাশ বিধেয়।

সুতরাং তিনি বলিলেন—"তুমি সেদিন সূর্য্যপুর থেকে ফিরে এলে, সেই ছবি নিয়ে গিয়ে আমি নবুকে দেখালাম। সে সব কথা শুনে বল্লে এখন বিয়ে করতে পারবে না।"

কান্তিচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"বিয়ে করতে পারবে না?"

"তাই ত বল্লে।"

"কেন কিছু বল্লে?

মাতা বিপদে পড়িলেন। কি উত্তর দেন! বলিলেন—"ওর চেয়ে সুন্দর মেয়ে বিয়ে করতে চায়।" ভাবিলেন কর্ত্তা যদি জিজ্ঞাসা করেন ওর চেয়ে সুন্দর মেয়ে সে কে এবং কোথা, তাহা হইলেই মুস্কিল হইবে,—হয়ত বা সবই ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু কান্তিচন্দ্রের মনে তাহা উদয় হইল না। তিনি ভাবিলেন, নবগোপালের বুঝি মেয়ে পছন্দ হয় নাই, তাই আপত্তি করিতেছে। প্রকাশ্যে বলিলেন—"সে কি কাযের কথা! বিয়ে তাকে করতেই হবে।"

ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে কায নেই। শুভকার্য্যে জোর জবরদস্তি করা ঠিক নয়। বাছা শুনে অবধি মুখখানি চুণ করে বেড়াচ্চে। আমায় বলেছে তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে। শুনে অবধি তার মনে সুখ নেই—বাড়ীতে থাকে না—নদীতে নদীতে বেড়াচ্চে। বাছার মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।”

আকাশে তখন চন্দ্র অনেকখানি উঠিয়াছে, বেশ আলো হইয়াছে। গুড় গুড়িতে বাঁধা বেলফুলগুলি কান্তিচন্দ্রের অন্তঃকরণে সুগন্ধ প্রেরণ করিয়া তাঁহার মন গলাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

কান্তিচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“না না, সে সব হবে না। তুমিও কি পাগল হলে না কি? তুমি যেন তার কাছে আরও হাওয়া তুলো না,—খবরদার যেন তার ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দিও না। আমি কাল তাকে ডেকে এ বিষয়ে কথা কব।”

গৃহিণী দেখিলেন, স্বামীর মন ফিরাইবার আশা দুরাশা মাত্র।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দশটার সময় নবগোপাল বাটী ফিরিল। গৃহিণী গিয়া পুত্র-সম্ভাষণ করিলেন।

নিকটে বসিয়া তাহাকে আহার করাইয়া,—স্বীয় কক্ষে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অধিক রাত্রি অবধি বাহিরে নদীতে থাকিবার জন্য স্নেহভর্ৎসনা করিয়া শেষে তাহাকে বলিলেন—“আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে।”

মা কি কথা বলিবেন—মনে তাহা নবগোপাল জানিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিল—“কি কথা মা?”

“মহেশপুরের সে মেয়েকে বিয়ে করবার কল্পনা তোমায় ত্যাগ

"কেন ? বাবার সঙ্গে কথা কয়েছ ?"

"কয়েছি। এ ব্যাপার তাঁকে বলিনি, শুধু বলেছি যে সূর্য্যপুরের সে মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে অসম্মত। তাঁকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তুমি ছেলে মানুষ, তোমার এখনও বুদ্ধি হয় নি। ওঁরা যা বলছেন, তাই তুমি কর। তাতেই তোমার ভাল হবে—সব মঙ্গল হবে। লক্ষ্মী বাবা আমার—আর অমত কোরো না।"

মাতার কাতরোক্তি শুনিয়া নবগোপাল মনে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"মা, তুমি যা বলছ, তা করা আমার অসাধ্য। আমি যা করতে একবার প্রতিশ্রুত হয়েছি,—তা আমি কেমন করে ভঙ্গ করব ?"

"না বুঝে সুঝে প্রতিশ্রুত হলে কেন বাবা ?"

নবগোপাল কোনও উত্তর করিল না। মা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ওঁকে এখনও সব কথা বলিনি, সব কথা শুনলে রেগে অনর্থ করবেন। যদিও প্রতিশ্রুত তার বাপের কাছে তুমি হয়েছ বটে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তাদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, এমন বন্দোবস্ত আমি করে দেব। তুমি বলছিলে তারা ভারি গরীব তাই তাদের মেয়ের বিয়ে হয় না—আচ্ছা আমি টাকা দেব তাদের যত টাকা লাগে। তারা মেয়ের বিয়ে দিক্।"

নবগোপাল দেখিল তাহার মাতার চক্ষের কোণে অশ্রুবিন্দু। ব্যথিত চিত্তে বলিল—"আচ্ছা মা, আমি ওকথা ভেবে দেখব।"

শুনিয়া কমলা দেবী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে মেয়ের নাম কি ?"

"রমাসুন্দরী।"

"খুব সুন্দর।"

"বয়স কত?"

"চৌদ্দ বছর।"

"তার মা নেই বলেছিলে না?"

"না, তার মা মরে গেছেন যখন সে খুব ছোট।"

শুনিয়া কমলা দেবীর মন অত্যন্ত স্নেহসিক্ত হইল। আহা বেচারির মা নাই! যদি বিবাহ হইত তবে তিনিই তাহার মা হইতে পারিতেন। গৃহিণী কেবলই ভাবিতে লাগিলেন—আহা সেই মাতৃহীন সুন্দর মেয়েটি যে তাঁহার পুত্রের মনোহরণ করিয়াছে, তাহাকে যদি বধূরূপে বক্ষে গ্রহণ করিতে পারিতেন!

যদিও কমলা দেবী প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না, তথাপি নবগোপাল মাতৃমুখে তাঁহার মনোভাব পাঠ করিতে পারিল।

মাতাপুত্রে তখন পরস্পরের নিকট রজনীর জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মাতার নিকট হইতে স্বীয় কক্ষে আসিয়া নবগোপাল অনেকক্ষণ চেয়ারে বসিয়া রহিল—বিছানায় গেল না।

ইতিমধ্যে আরও তিনবার নবগোপালের নৌকা মহেশপুরের ঘাটে বাঁধা পড়িয়াছিল। আরও দুই দিন সে রমাকে সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। রমা এখন জানে নবগোপাল পক্ষীব্যবসায়ী নহে,—একজন সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান মাত্র; কিন্তু ইহার বেশী আর সে কিছুই জানে না। রমাকে নবগোপাল যত দেখিয়াছে, তাহার কিশোর হৃদয়টীর যত পরিচয় পাইয়াছে, ততই মুগ্ধ হইয়াছে। নবগোপাল যে দিন গদাধরের নিকট রমার হস্ত প্রার্থনান্তর নৌকায় ফিরিতেছিল, সে দিন তাহার মনোভাবের বর্ণনা করিতে গিয়া আমরা

আর জোর করিয়া সে কথা বলিতে পারি না। এ একসপ্তাহে তাহার মনে গভীরতর ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আর তাহা শুধু নবজাগ্রত কৌতূহল ও তজ্জনিত আকর্ষণ নহে। ইহা একটি সুমিষ্ট অথচ বেদনাজড়িত আকাঙ্ক্ষা।

রাত্রি বারোটা বাজিবার পর নবগোপাল শয়ন করিল। কিন্তু অনেকক্ষণ তাহার নিদ্রা আসিল না;—শুধু এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিল। তাহার আশা যদিও বেশী দিনের নহে,—সে আশা যদিও এখন শিশু মাত্র,—কিন্তু শিশু বলিয়াই তাহার আবদার অপরিমেয়। সে মাকে বলিয়াছে ভাবিয়া দেখিবে। তাহা কি হৃদয় হইতে বলিয়াছে? অথবা মাতাকে সাময়িক প্রবোধ দিবার নিমিত্ত বলিয়াছে?—রমাকে পাইবার আশা সে বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না পারিবে না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নবগোপাল যেইমাত্র বেশ পরিধান করিয়াছে,—ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল কর্ত্তাবাবু তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই নবগোপাল পিতৃসন্নিধানে উপনীত হইল।

কান্তিচন্দ্র তখন বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। সে কক্ষে তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল না। পুত্রকে দেখিয়া কান্তিচন্দ্র নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নবগোপাল তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলে তিনি একটু তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন তাহার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, চক্ষুযুগল জ্যোতিহীন।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল কখন ফিরলে?"

"রাত্রি দশটা হয়েছিল।"

"অত রাত্রি অবধি বাইরে নদীতে থাক কেন? একটা বিপদ

নবগোপাল নিরুত্তর রহিল। সে জানিত ইহা ভূমিকা মাত্র,—আসল কথা এখনি আরম্ভ হইবে। সেও আগ্রহের সহিত তাহাই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"নবু, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, তাই তোমায় আজ ডেকে পাঠিয়েছি। সংপ্রতি আমি সূর্য্যপুরে গিয়াছিলাম, তোমার বিবাহের জন্যে একটি মেয়ে দেখতে। সেখানকার জমিদার হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ইচ্ছা করেছি এই আষাঢ় মাসে তোমার বিবাহ দেব।"

নবগোপাল প্রথমে কোনও উত্তর করিল না। কিন্তু পিতা পাছে তাহার মৌনকে সম্মতি লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই জন্য স্বীয় বক্তব্য বলিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

বলিল—"বাবা আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। আমি সূর্যপুরে বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত নই।"

কান্তিচন্দ্র পুত্রের নিকট এপ্রকার উত্তর পাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ধীরতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"কেন? সূর্য্যপুরের সে মেয়ে কি সুন্দরী নয়? তোমার গর্ভধারিণী তোমাকে তার ফোটোগ্রাফ্ দেখিয়েছেন শুন্‌লাম, ছবিতে যেমন দেখতে, আসলে সে মেয়েটি তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। তুমি যদি নিজে দেখে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে থাক, সে উত্তম কথা, তুমি গিয়ে দেখে আসতে পার।"

নবগোপাল শান্তভাবে বলিল—"সে মেয়েকে আমি বিবাহ কর্‌তে চাইনে ভিন্ন কারণে।"

"কি কারণ?"

"আমি অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে চাই।"

তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার মেয়ে? কোথাকার মেয়ে?"

নবগোপাল নির্ভীক চিত্তে বলিল—"মহেশপুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে।"

"গদাধর চট্টোপাধ্যায় কে?"

"তিনি সোণাপুর জমিদারীর একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী।"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"তুমি কি পাগল হয়েছ? একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে আমি তোমায় অনুমতি দেব?"

নবগোপাল কিছু বলিল না। কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"ও সব খেয়াল ছেড়ে দাও। ধনে, মানে, গুণে যারা তোমার সমকক্ষ, তাদেরই গৃহে শুধু বিবাহ কর্‌তে পার তুমি।"

নবগোপাল তখনও নীরব। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, নবগোপাল যদি সুশীলাকে একবার দেখিয়া আসে তবে নিশ্চয়ই তাহাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র হইবে, কারণ মেয়েটি বাস্তবিকই সুন্দরী। সুতরাং বলিলেন—"তুমি বালক। নিজের ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা তোমার এখনও জন্মেনি। আমি তোমার জন্য যা বন্দোবস্ত করেছি তা তোমায় গ্রহণ করতেই হবে। আমার মতের বিপরীত কায কর্‌তে চেষ্টা কোরো না।" তাহার পর একটু নামিয়া বলিলেন—"ইতিমধ্যে তুমি একদিন গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এস। কবে যেতে পারবে বল—আমি আয়োজন করি।"

নবগোপাল স্থিরস্বরে বলিল—"আয়োজন অনাবশ্যক। আমি সে মেয়েকে বিবাহ করব না।"

এ উদ্ধত উত্তর কান্তিচন্দ্রের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত করিল। কিন্তু তখনও তিনি আত্মসম্বৃত। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কর্ম্ম করে গদাধর চট্টোপাধ্যায়?"

"তিনি একজন গোমস্তা।"

কান্তিচন্দ্র ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন— "একজন গোমস্তার মেয়েকে এ বাড়ীতে বড় জোর আমি পাচিকা স্বরূপ প্রবেশ দিতে পারি; বধূ বলে গ্রহণ করতে পারি, এ আশা তুমি কর ?"

নবগোপাল বলিল—"না, করি না।"

"তবে কি আমার বিনা অনুমতিতে তুমি বিবাহ করতে প্রস্তুত ?"

নবগোপাল গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিল—"আপনি ঠিক অনুমান করেছেন।"

কান্তিচন্দ্রের আর সহ্য হইল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অধীর হইয়া কক্ষমধ্যে বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ আসিয়া, নবগোপালের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কঠোরস্বরে কহিলেন— "৫ই আষাঢ় তোমার বিবাহের দিন স্থির করেছি। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে ঐ দিনের মধ্যে বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত কোরো নিজেকে। এখন যেতে পার।"

নবগোপাল কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কান্তিচন্দ্র বিঘূর্ণিত লোচনে কহিলেন—"না। একটি কথাও শুনতে চাইনে। এখন যাও।"

নবগোপাল তখনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য।*

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।" চৌর্য্য অথবা শঠতার দ্বারা পরস্ব অপহরণ করিয়া অনেকে ধনশালী হইয়াছে, কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনও ধনবান হইয়াছে এরূপ আমরা শুনি নাই। ভিক্ষার দ্বারা কোন জাতি বা ব্যক্তি কখনও বড় হইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই।

জগতে এই একটা নিয়ম যে এখানে সমুদয় দ্রব্যই মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। আমরা যে প্রিয়জনের নিকট হইতে স্নেহপূত উপহার পাইয়া থাকি আপাততঃ দেখিতে গেলে তাহা বিনামূল্যেই প্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আপাততঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত জিনিষগুলিই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে কিনিয়া থাকি। নিঃস্বার্থতা, প্রেম, মঙ্গলভাব ইহাই উপহারের মূল্য এবং ইহা অপেক্ষা দুর্মূল্য জগতে আর কি আছে? চৌর অথবা শঠ ব্যক্তিও অনেক স্বার্থত্যাগ, অনেক বুদ্ধিচালনা ও অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া ধন অর্জ্জন করে, কিন্তু ভিক্ষুকের কোন স্বার্থত্যাগ আবশ্যক হয় না—কোন কষ্টসহিষ্ণুতার দরকার হয় না। ভিক্ষা অক্ষমতারই পরিচয় দেয়। তাই ভিক্ষার দ্বারা কোন মূল্যবান বস্তু লাভ করা যায় না। কিন্তু আমাদের জাতির এমনই অধোগতি হইয়াছে যে আমাদের সমুদয় শক্তিই ভিক্ষায় পর্য্যবসিত হইতেছে। সর্ব্ববিষয়েই আমরা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া রাজার দ্বারে দণ্ডায়মান হইতেছি। বিধবা-বিবাহ প্রচলন, সতীদাহ নিবারণ, দেবালয়ের ধনভাণ্ডার রক্ষণ, রাজ-

নীতি ও সমাজধর্ম্ম সকল বিষয়েই আমরা রাজার মুখাপেক্ষী। ইহা আমাদের অতীব শোচনীয় অক্ষমতারই পরিচয় দিতেছে।

আমাদের ন্যায় পরাধীন জাতির পক্ষে ভিক্ষা কতক পরিমাণে অপরিহার্য্য, আমি তাহা স্বীকার করি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কোন স্থায়ী লাভের আশা করা বিড়ম্বনা। আমাদের জাতির মৃতপ্রায় ক্ষীণশক্তির অতি অল্প অংশই ভিক্ষায় ব্যয়িত হওয়া উচিত। কিন্তু ভিক্ষা উহার ন্যায্য গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আমাদের সমুদয় শক্তিকে গ্রাস করিয়াছে। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে ' স্বাবলম্বন "শ্রুতৌ তস্করতাইব" শ্রুতিতেই রহিয়া গিয়াছে।

আমাদের ভিক্ষাপরায়ণতার অনেক কারণ আছে—সেই সমুদয় কারণের উল্লেখ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি এই মাত্র বলিতেছি যে কেবল ভিক্ষার দ্বারা আমরা কোন রূপেই লাভবান হইব না, ইহাতে আমাদের জাতীয় ক্ষীণশক্তির আরও ক্ষয় হইবে অথচ অভীষ্টও সিদ্ধ হইবে না। কংগ্রেসের জীবন ব্যাপারে এ সত্য আমরা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছি। কংগ্রেসের ভিক্ষার দ্বারা উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। কিন্তু ইহা এখনই জাতীয় শক্তিকে অনেক পরিমাণে ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অনেকেই কংগ্রেসের প্রতি হত-শ্রদ্ধ হইতেছেন। সুতরাং ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে কেবল ভিক্ষা অবলম্বন করিয়া থাকিলে আমাদের জাতি হতশক্তি ও ভগ্নমনোরথ হইয়া ক্রমশঃ দুর্গতির অধস্তর হইতে অধস্তম সোপানে অবতরণ করিবে।

আমাদের জাতীয় মহাসমিতি এক বিরাট ভিক্ষা-সভা। ইহা এক মহা ভিক্ষা-যজ্ঞ। ঋষিরা পুরাকালে যজ্ঞ করিয়া দেবতাদের মনস্তুষ্টি করিতেন এবং দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। তাঁহারা

করিতেন এবং উড্ডীয়মান ধূম্রজালে গগন সমাচ্ছন্ন করিয়া পর্জ্জন্য দেবের আরাধনা করিতেন। তাঁহাদের তপোনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া পর্জ্জন্য দেব প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করিয়া ভক্তগণের শস্য প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা করিতেন। আমরাও অধুনাতন বৎসরে বৎসরে এক প্রকাণ্ড ভাষাময় যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করিয়া আবেদন নিবেদনের প্রগাঢ় ধূম্রে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছি। কিন্তু আমাদের যজ্ঞধূম্র কদাচিৎ আমাদের গৌরাঙ্গ দেবতার ধূম্রনেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে। আমাদের দেবতারা প্রায়ই উদাসীন-চিত্ত। তবে মাঝে মাঝে আমরাও যে দেবপ্রসাদে বঞ্চিত হই না সে নেহাৎ আমাদের অদৃষ্টের জোর। মাঝে মাঝে আমাদের দেবতারা প্রসন্ন হইয়া আমাদের যকৃৎপৃষ্ঠে গোশূকরবলিপুষ্ট হস্তপদের বজ্রাঘাতরূপ মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে ভবযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করেন। ইহা ছাড়া দেবপ্রসাদ আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই জোটে না। আমাদের প্রাচীন যজ্ঞের ঋত্বিকগণ পট্টাম্বর পরিধান করিতেন; আর আমাদের আধুনিক যজ্ঞের ঋত্বিক বক্তাগণ আপাদমস্তক বিদেশীয় রমণীয় কমনীয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া বিজাতীয় বিলাসের বরপুত্ররূপে সভাস্থল অলঙ্কৃত করেন। আমাদের গৌরাঙ্গ দেবতা এ জড় দেবতার দেশে আসিয়া জড়ত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বধিরকর্ণ—তাঁহারা আমাদের প্রার্থনায় উদাসীন তাঁহারা "নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং।" সুতরাং আমরা জিজ্ঞাসা করি কংগ্রেসের আশা কোথায়?

কংগ্রেস এখন আমাদের শারদোৎসবের ন্যায় একটা তিনদিন ব্যাপী শীতোৎসবে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে বিভিন্ন দেশীয় ভারত-বাসী বৎসরান্তে মিলিত হইয়া কয়েক দিন উৎসবানন্দে অতিবাহিত করেন। শারদোৎসবে যেমন আমরা অনেকে মিলিত হইয়া কয়েক

কিন্তু আমাদের ভিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফলই রহিয়া যায়, সেইরূপ এই শীতোৎসবেও আনন্দোৎসবের মধ্যে আমরা গৌরাঙ্গ দেবতার নিকট যে ভিক্ষা করি তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফলই রহিয়া যায়। প্রাচীনেরা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।"

সে দিন শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রস্তাব করিলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে যথাসম্ভব স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। অমনি কংগ্রেসের প্রধাননেতা ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটা সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। ফলে এই হইল বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। যাঁহারা দেশের জন্য নিজেদের বিলাসের সামান্য অংশটুকুও ত্যাগ করিতে অসমর্থ তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত ও পুষ্ট কংগ্রেস দেশের কি উপকারে আসিবে? ত্যাগে অক্ষম স্বার্থরত বিলাসী নরশ্রেণীর দ্বারা কোন জাতি কস্মিনকালে উন্নত হয় নাই এবং উন্নত হইতেও পারে না। অন্য সমুদয় প্রস্তাব বিনাপত্তিতে গৃহীত হইল কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। অন্য সমুদয় প্রস্তাবই রাজার স্কন্ধে দোষার্পণ ও রাজার নিকট ভিক্ষা—ইহাতে জাতির কিছুই পরিশ্রম লাগে না—জাতিকে ইহার জন্য কিছু করিতে হইতেছে না বা দিতে হইতেছে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রস্তাবে প্রত্যেকেরই কিছু করিতে হইত। প্রত্যেকেরই কিছু বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিতে হইত। ইহা স্বার্থত্যাগ, ইহা স্বাবলম্বন, তাই ভিক্ষাজীবী কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মত। যাঁহারা নিজে স্বার্থত্যাগে অক্ষম, তাঁহারা রাজাকে স্বার্থত্যাগ নীতিশিক্ষা দিতেছেন—নীতিশাস্ত্রের গুরু হইতেছেন, ইহাপেক্ষা বিচিত্র. জগতে আর কি আছে? কংগ্রেস ভিক্ষাশীলতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বন নীতি গ্রহণ করিয়া নিজেকে পুনর্গঠিত

অনেক আশঙ্কা আছে। ইহা জাতিকে স্বাবলম্বনে অসমর্থ করিয়া ক্রমে গভীরতর দুর্গতিতে পাতিত করিবে।

কংগ্রেস যদি বাস্তবিকই দেশের উপকার করিতে চাহে তবে উহাকে আমেরিকার কংগ্রেসের আদর্শে পুনর্গঠিত হইতে হইবে। উহাকে ভিক্ষা একেবারে বর্জ্জন করিয়া স্বাবলম্বন গ্রহণ করিতে হইবে। কংগ্রেস ভিক্ষা-সভা না হইয়া কার্য্য-সভা হইবে, কি করিয়া রাজ-নিরপেক্ষ হইয়া আমরা আমাদের জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে পারি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। যতদিন না কংগ্রেস স্বাবলম্বনপর কার্য্যসভায় পরিণত হইবে, যতদিন না উহা জাতীয় উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের ভার, সমুদয় কার্য্যের ভার নিজেদের স্কন্ধে লইতে সক্ষম হইবে; ততদিন কংগ্রেস ব্যর্থ ও অনর্থক; ততদিন কংগ্রেস জাতীয় অবনতিরই অনুকূল থাকিবে।

ভিক্ষার প্রধান দোষ এই যে ইহা ভিক্ষুকের মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। ইহা বৃথা আশায় মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া সহজ ও অনায়াস পথ অবলম্বন করিতে নিয়োজিত করে। ইহা মানুষকে অলস ও আরামপ্রিয় করে, বাধা বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখে। বাধা বিঘ্নই মানবের শক্তিসমূহকে বিকশিত ও দৃঢ় করে। বাধা বিঘ্ন হইতে দূরে অবস্থান করিলে মানবের শক্তি বিকশিত হয় না। ভিক্ষা-ব্যবসায়ী তাই অক্ষমতা ও অলসতায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ভিক্ষা মানবকে স্বাবলম্বনে সম্পূর্ণ অপটু করে। এক বিষয়ে যে ভিক্ষা আরম্ভ করে অন্য বিষয়েও তাহার কর্ম্মোদ্যম নষ্ট হয় এবং ক্রমে হীনোদ্যম হইয়া সে অন্য বিষয়েও ভিক্ষা অবলম্বন করে। সুতরাং ভিক্ষা প্রবৃত্তি মানবের এক মহা শত্রু, উহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। আমরা রাজনীতি বিষয়ে ভিক্ষা অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য

আমরা অনেক ভিক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সময় আসিয়াছে, আমরা স্বাবলম্বনমন্ত্রে দীক্ষিত হইব। ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, রাজার মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের কল্যাণের পথ নিজেরা আবিষ্কার করিব, এবং জাতীয় শক্তিকে সেই পথে পরিচালিত করিব। বিদেশীয় রাজা ও বিদেশীয় প্রজার স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। করবৃদ্ধিতে ইংরাজের স্বার্থ, কিন্তু তাহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ; সৈন্যবিভাগে প্রবেশাধিকার ও অস্ত্রধারণের অধিকার প্রদান আমাদের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক কিন্তু উহা ইংরাজের স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। আমরা যতই কেন না তীক্ষ্ণ যুক্তি প্রয়োগ করি ইংরাজ কখন স্বেচ্ছায় তাহার স্বার্থের হানি করিবে না। এ সামান্য কথাটা আমাদের সকলেরই ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখা উচিত।

সম্প্রতি আমরা রাজশক্তির প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া নিজ শক্তির উপর নির্ভরশীল হইব। ভিক্ষায় কবে কোন্ জাতি উন্নত হইয়াছে? ভিক্ষা-লব্ধ বস্তু মহার্ঘ হইলেও অশোভন।

স্বাবলম্বন-ব্রত গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই ভাবিতে হইবে আমরা কোন্ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইব, কোন্ আদর্শের অভিমুখে আমাদের জাতীয় উন্নতি চালিত করিব। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে জাতি একটী সজীব বস্তু, উহা সজীবের নিয়মেই পরিচালিত। ব্যক্তিবিশেষের উত্থানপতন যে নিয়মে পরিচালিত—জাতিবিশেষের উত্থানপতনও সেই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। সমগ্র জাতির (Nation) কাছে তদন্তর্গত প্রত্যেক মানবই যেমন এক একটী ব্যক্তি, সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রত্যেক জাতিই (Nation) সেইরূপ এক একটী ব্যক্তি। সুতরাং একটী জাতিকে একটী ব্যক্তিরূপে আলোচনা করাই বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে জাতি ও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ পৃথক করা

জাতি নাই যাহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তি নাই—আবার এমন কোন ব্যক্তিও নাই যে ব্যক্তি কোন জাতির অন্তর্গত নহে। ব্যক্তিহীন জাতি যেরূপ অসম্ভব, জাতিহীন ব্যক্তিও সেইরূপ অসম্ভব। প্রকৃত কথা এই যে ব্যক্তি লইয়াই জাতির জাতিত্ব এবং জাতির অন্তর্গত বলিয়াই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। জাতি এবং ব্যক্তি এই উভয় লইয়াই একটী বাস্তব সত্তা। সুতরাং উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া আলোচনা করা অসম্ভব। ব্যক্তি ও জাতির চরম গন্তব্য একই।

জর্ম্মাণ ঋষি কাণ্ট (Kant) বলিয়াছেন মানবেচ্ছার স্বাধীনতা (autonomy of the will) অথবা মানবাত্মার স্বাধীনতাই মানব জীবনের লক্ষ্য। মানব যে পরিমাণে বাহ্য পদার্থের প্রলোভনে অবিচলিত থাকিয়া নিজের আত্মশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমুদয় কার্য্য করিবে মানবাত্মা সেই পরিমাণ স্বাধীন। বাহ্য পদার্থের উপর আত্মার আধিপত্য স্থাপন এবং আত্মার শক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়া—ইহাই আত্মার স্বাধীনতা। জর্ম্মাণ ঋষি হেগেল্ (Hegel) ইহাকেই আত্মোপলব্ধি (self-realisation) বলিয়াছেন। মানুষ যে পরিমাণে বাহ্য প্রলোভনের উপর আধিপত্য করিয়া আত্মশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, মানুষ সেই পরিমাণে স্বাধীন ও সেই পরিমাণে জীবনের উদ্দেশ্যের নিকটবর্ত্তী। জর্ম্মাণ ঋষি কাণ্ট ও হেগেলের মতে স্বাধীনতা—মানবাত্মার স্বাধীনতাই মানব জীবনের লক্ষ্যস্থানীয়। আমাদের স্বদেশীয় মনীষিগণও এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের মতে মুক্তি,—অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য। মুক্তি ও স্বাধীনতা একই পদার্থ। বন্ধনের দিক দিয়া দেখিলে যাহা মুক্তি আত্মার দিক দিয়া দেখিলে তাহাই স্বাধীনতা।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীরা মুক্তি অথবা স্বাধীনতাই মানবের চরম লক্ষ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচ্যেরা যাহাকে মুক্তি বলিয়াছেন,

গামী হইয়া স্বাধীনতা শব্দই অধিক ব্যবহার করিব, কারণ স্বাধীনতা ভাবাত্মক, মুক্তি বিয়োগ অথবা অভাবাত্মক। কোন বস্তু বা অবস্থাকে অভাবের দ্বারা না বুঝিয়া ভাবের দ্বারা বোঝাই শ্রেয়ঃ।

আমরা দেখিলাম স্বাধীনতাই মানবের চরম লক্ষ্য। আমাদের জাতিকেও সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। সর্ব্ববিধ বহিঃ-শক্তির অধীনতা হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া জাতীয়শক্তির দ্বারা জাতির পরিচালন ব্যাপার নির্ব্বাহ করা—ইহাই জাতীয় স্বাধীনতা। এস্থানে বলা আবশ্যক যে "জাতি" শব্দ আমি ইংরাজী "নেসন্" শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিতেছি। সমুদয় ভারতবাসীকে লইয়াই এক ভারতীয় জাতি (Indian Nation). আমি জাতি অর্থে এই ভারতীয় জাতিই বুঝিয়াছি।

রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্ম—এই তিন লইয়াই জাতি। এক জাতির মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন হইতে পারে না। রাষ্ট্রীয় একতার উপরই একজাতিত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ধর্ম্ম ও সামাজিক একত্ব বর্ত্তমান থাকিলে জাতির একতাবন্ধন অতীব দৃঢ় হয়।

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম এই তিনের স্বাধীনতা লইয়াই জাতীয় স্বাধীনতা। এই তিনটীর কোনটিকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা জাতীয় স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ পাইতে পারি না। এই তিনটী এক অতি নিগূঢ়যোগে আবদ্ধ (organically connected). একটিকে পরিত্যাগ করিলে অপর দুইটী প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না। জাতির প্রকৃত উন্নতির জন্য এই তিন অঙ্গেরই সমবেত উন্নতি আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গের সম্মিলিত উন্নতি হইলে যেমন শরীরের প্রকৃত পুষ্টি সাধিত হয়, অঙ্গ-বিশেষের অতিমাত্র স্থূলতা যেমন শরীরের অস্বাস্থ্যই সূচনা করে; সেই-

অঙ্গবিশেষের অতিপুষ্টি জাতির অকল্যাণের কারণ হইয়া থাকে। ভারতের ইতিহাসের অক্ষরে অক্ষরে এই সত্যের স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে। সমাজ-নীতি সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রনীতি উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মনীতির আত্যন্তিক অনুশীলনের জন্যই হিন্দুজাতির অধঃপতন হইয়াছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির আত্যন্তিক অনুশীলন দ্বারা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। এইরূপ একদেশদর্শী চেষ্টায় জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয় না। রাষ্ট্র ও সমাজনীতির অপূর্ণতা বশতঃ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্ম্ম হিন্দুজাতিকে উন্নত করিতে পারে নাই, ধর্ম্মও স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীনতার দিকে জাতিকে অগ্রসর করিতে হইবে। জাতির সমবেত শক্তিকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োগ করিতে হয়। জাতির বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলিকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া উদারতা ও আধ্যাত্মিকতার দিকে লইয়া যাইতে হয়। সমাজসমূহকে সর্ব্ববিধ অত্যাচার ও দুর্নীতি হইতে ক্ষালিত করিয়া মানব-স্বাধীনতার উপযোগী করিতে হয়।

কিন্তু অধুনা আমাদিগকে ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি কিঞ্চিৎ উদাসীন হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যই সমধিক পরিশ্রম করিতে হইবে; কারণ বহুকাল হইতেই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। ধর্ম্ম লইয়াই আমাদের জাতীয় শক্তি বহুকাল উন্মত্ত হইয়াছিল, সমাজ-নীতির আলোচনাও আমাদের জাতির মধ্যে হইয়াছিল; কারণ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক আলোচনা আসিয়া পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রালোচনা বহুকাল হইতেই আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ আমাদের জাতি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপেক্ষা করিয়া আমাদের জাতির যে কি মারাত্মক দুর্গতি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এক্ষণে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য

করিয়া পূর্ব্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এ জাতির পরিত্রাণের উপায় নাই।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ক স্বাধীনতার ভিত্তি স্বরূপ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে অবলম্বন না করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ অবস্থিতি করিতে পারে না, ধর্ম্ম ও সমাজ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। শরীর যেমন, মনের ভিত্তিস্বরূপ, শরীর সুস্থ না থাকিলে মনের সুস্থতারও হানি হয়, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ক স্বাধীনতার মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব হইলে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়, ধর্ম্ম বাহ্য ক্রিয়াকলাপের অধীন হইয়া পড়ে; সমাজও স্বাধীনতা ও উদারতার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া নানা দুর্নীতির দ্বারা কলুষিত হইতে থাকে। রোম, গ্রীস ও ভারতবর্ষ জ্বলন্ত অক্ষরে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।*

আমাদের এই বঙ্গদেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ধর্ম্মকে বাহ্যক্রিয়াকলাপ ও দুর্নীতি হইতে মুক্ত করিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু রামমোহন প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এ পরাধীনতা-নিষ্পেষিত দুর্ব্বল জাতির মধ্যে জয়লাভ করিতে পারিতেছে না কেন? ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে কেন? ইহার প্রকৃত কারণ এই যে পরাধীন জাতি ধর্ম্মের স্বাধীনতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উদার ধর্ম্মের বিজয়পতাকার নিম্নে

---

* রাষ্ট্রশক্তি, ধর্ম্মশক্তি ও সমাজশক্তি পরস্পর-সাপেক্ষ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভিত্তিস্থানীয়। "ভিত্তি" শব্দের পরিবর্ত্তে ইংরাজী condition শব্দ ব্যবহার করিলেই আমার অর্থ সহজ বোধ্য হইত। শরীর যে অর্থে মনের ভিত্তি, মনও সেই অর্থে শরীরের ভিত্তি। রাষ্ট্রশক্তিই বিশেষ আলোচ্য বলিয়া এস্থলে উহাকেই বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছি। রাষ্ট্রশক্তির অভাবে ধর্ম্ম ও সমাজ যে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, ইহাই

দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ। আমরা যদি আর তিন শত বৎসর এইরূপ পরাধীন থাকি, আমি নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইবে। ইহা হয় পুনরায় পুরাতন কুসংস্কার ও বাহ্যক্রিয়াকলাপের অধীন হইয়া প্রাচীন সমাজের সহিত মিলিয়া যাইবে, না হয় নবতর কুসংস্কারের অধীন হইয়া উহার উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিধবাবিবাহ আমাদের দেশে প্রচলিত হইল না কেন? রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে—ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে,—আমরা সর্ব্ববিধ স্বাধীন সংস্কারের আদর্শ গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

মহাত্মা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ক সংস্কার-চেষ্টায় নিষ্ফলতা দেখিয়া আমরা এই সত্য অতি স্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে রাষ্ট্রীয় সংস্কার ব্যতিরেকে আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার হইতে পারে না, রাষ্ট্রীয় সংস্কারের দ্বারা জাতীয় ভীরুতা ও কাপুরুষতা বিদূরিত না হইলে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। যাঁহারা বলিয়া থাকেন আমাদের জাতি ধর্ম্মপ্রবণ, ধর্ম্মের উন্নতিই আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারাই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধন করিব, তাঁহারা বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সত্যের অবমাননা করেন। কেবল ধর্ম্ম লইয়া কোন জাতি বড় হইয়াছে ইতিহাস তাহার প্রমাণ দেয় না। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্ম পরস্পরসম্বদ্ধ। একের অবহেলা দ্বারা অন্যের অনুশীলন অসম্ভব। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মালোচনায় উন্মত্ত থাকিয়াই হিন্দু জাতির পতন হইয়াছিল, পুনরায় সেই পন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের

ধর্ম্মের উচ্চাদর্শ খর্ব্ব করিবে এবং ধর্ম্ম আদর্শভ্রষ্ট হইয়া জাতিকে আরও পাতিত করিবে। আমরা বহুকাল রাষ্ট্র ব্যাপারে অনাসক্ত থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছি বলিয়াই অধুনা ধর্ম্মবিষয়ে উদাসীন হইয়া রাষ্ট্র ব্যাপারে আমাদিগকে আত্যন্তিক পরিশ্রম করিতে হইবে—আমাদিগকে এখন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।

সর্ব্বত্র এই এক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রতিক্রিয়া ক্রিয়ার অনুরূপ। (Action and Reaction are equal.) আমরা যে পরিমাণে রাষ্ট্রব্যাপারে অবহেলা করিয়াছি এখন সেই পরিমাণে আমাদিগকে রাষ্ট্রব্যাপারে মনোযোগী হইতে হইবে। এখন প্রতিক্রিয়ার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদিগকে ধর্ম্মসমাজ সমুদয় ভুলিয়া গিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। অত্যন্ত মানস-চিন্তায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে রোগী যেমন মানসশ্রম বর্জ্জন করিয়া শারীরিক উন্নতির প্রতি যত্নশীল হয়, অত্যন্ত ধর্ম্মচিন্তায় হত রাষ্ট্রশক্তি আমাদের জাতিকেও সেইরূপ অধুনা ধর্ম্মালোচনা পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রশক্তির অনুশীলনের জন্য চেষ্টাবান হইতে হইবে। বিধাতার অনুগ্রহে আমরা এক স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছি। ইংরাজ জাতি স্বাধীনতার জন্য জগতে বিখ্যাত। ইহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য বহুকাল হইতে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। ইংরাজ জাতির ইতিহাস স্বাধীনতার বিজয়গর্ব্বে অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্মান; ইহা জাতীয় স্বাধীনতার যশোগৌরবে বিমণ্ডিত। অধুনা ইংরাজ আমাদের গুরু ও শিক্ষাস্থল। আমাদের ইংরাজ সংস্পর্শ ব্যর্থ হইবে যদি ইংরাজের নিকট হইতে আমরা উহাদের জাতীয় বিশেষত্ব—উহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা, স্বাধীনতার জন্য উহাদের অকাতর ত্যাগস্বীকার—এই প্রধান গুণগুলি শিক্ষা করিতে না পারি। ভগবান আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা শিক্ষা দিবার

জগতের শ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতির হস্তে আমাদের ভারার্পণ করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হউক, আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি সজ্ঞান হউক।

বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া। স্বাধীনতা একদিনে লাভ করা যায় না, অজস্র স্বার্থ-ত্যাগ কর—অকাতরে বিদ্যা বুদ্ধি ও শরীর উৎসর্গ কর, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া উপায় উদ্ভাবন কর; শরীরের দৌর্ব্বল্য দূর কর, আবশ্যক হইলে জীবন দান করিতে উন্মুখ হও, কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। জাতীয় সৌভাগ্যলক্ষ্মী অতীব নিষ্ঠুর দেবতা। তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, জাতির উত্তপ্ত রক্ত দিয়া তাঁহার অঞ্জলি রচনা করিতে হইবে, শত নির্যাতনে সহস্র সংগ্রামে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে, নতুবা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

যখন বহু চেষ্টা ও সংগ্রামের পর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্ত হইবে, যখন উপেক্ষিত রাষ্ট্রভাবের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপ আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রশক্তির স্বাধীন অভ্যুদয় হইবে, তখন রাষ্ট্র শক্তির সহিত ধর্ম্ম ও সমাজ শক্তির এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সংসাধিত হইবে। তখন রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইবে। তখন স্বাধীনতা প্রবল বন্যার ন্যায় রাষ্ট্র প্লাবিত করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ পথে প্রবাহিত হইবে। তখন রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প সমুদয় প্লাবিত করিয়া স্বাধীন ভাব ও নবীন উদ্যম প্রবাহিত হইবে। তখন এ মৃত জাতিও সজীব হইয়া উঠিবে এবং জগতের সভ্য জাতির মধ্যে সগর্ব্বে আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। এ সমন্বয়, রাষ্ট্র সমাজ ও ধর্ম্মের সেই সম্মিলিত উন্নতি ...

সম্ভব হইবে, যখন আমরা জাতীয় শক্তির অনুশীলনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইব। তখন আমরা কবির ভাষায় বলিতে পারিব—

"Intrepid sons of Hindustan, not by you
Is life despised ! Ah, no ! the spacious earth,
Never saw a race who held by a right of birth
So many objects to which love is due :
Ye slight not life—to God and nature true ;
But death, becoming death, is dearer far,
When duty bids you bleed in open war,
Heroes ! for instant sacrifice prepared,
Yet filled with ardour and on triumph bent,
Midst direst shocks of mortal accident."

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন।

কলিযুগের প্রারম্ভ নিরূপণ।

ভারতবর্ষের কোন পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্দ্ধারণ করা অতীব দুরূহ। কারণ, আমাদের ক্রমিক এবং ধারাবাহিক ইতিহাস বলিয়া কিছুই নাই; সুতরাং কোন সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে হয় অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, না হয় পাশ্চাত্য কোবিদকুল যাহা নিরূপিত করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইতে হয়। মহাভারতের প্রধান যুদ্ধ, যাহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ, তাহার কথা এ দেশে সকলেই অবগত আছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনাদি

এই যুদ্ধের কাল নির্দ্ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় অতি সরল হইয়া যাইবে; কারণ, আমরা পুরাণাদি হইতে অবগত হই যে, এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এই যুদ্ধ যথার্থ ঘটনা কিম্বা রূপক মাত্র,—এইরূপ সন্দেহের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য বুধগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ যে হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই; গৌতমবুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব্বে পাঞ্চাল এবং কৌরবদের ভিতর এই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এতদিন পরে তর্ক দ্বারা ঐ ঘটনার অস্তিত্বের লোপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। সকলেই অবগত আছেন যে তর্ক শাস্ত্র প্রণেতা বিখ্যাত হোয়েট্‌লী (Archbishop Whately) তর্ক দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে কোন কালে বীরবর নেপোলিয়নের অস্তিত্ব ছিল না। এইরূপ হাস্যকর ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তর্ক দ্বারা সত্যের নাশ করা সহজ কিন্তু উহা বাতুলতা মাত্র।

কেবল যে মহাভারতে ঐ যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, প্রায় সমুদয় পুরাণে উহার উল্লেখ আছে। ঐ সকল পুরাণের মতে এবং জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে অনেকে ঐ যুদ্ধের সময় খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ আস্থা প্রদান করা যায় না। কারণ, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেকের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ মতে ১০১৫ বৎসর, বায়ুপুরাণ মতে ১০৫০ এবং ভাগবতের মতে ১১১৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। পুরাণাদির ভিতরে কাহারও মতের মিল নাই, সুতরাং কেমন করিয়া ইহাদিগের উপর নির্ভর করা যায়? কিন্তু ঐ সকল পুরাণের মতে নন্দবংশীয়েরা যে একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। অনেকে স্থির করেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যখন

সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, সেই সময়ের মধ্যে ১০১৫+১০০ অর্থাৎ ১১১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রতীচ্য বুধমণ্ডলী গ্রীক দেশীয় ইতিহাসাদির সাহায্যে একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা হন। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্‌স মূলার সাহেব ঐ বৎসরকে "the sheet anchor of Indian chronology" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। আবার কেহ কেহ জ্যোতিষের সাহায্যে ঐ বৎসরের পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ১৪১৫ অব্দ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা এমত স্থির করিবার কারণ এরূপ প্রদর্শন করেন যে সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রতি শত বৎসরে এক নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্রে বিচরণ করে, এবং পুরাণে ঐরূপ দৃষ্ট হয় যে পরীক্ষিতের জন্মকালে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, কিন্তু নন্দ যখন সিংহাসনে অধিরূঢ় হন তখন সপ্তর্ষি পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সরিয়া আসিয়াছিল। মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের ভিতর দশটী নক্ষত্র আছে, সুতরাং সহস্রবৎসরে সপ্তর্ষি মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে আগমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নন্দবংশীয়েরা শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্যূন খৃঃ পূঃ ১৪১৫ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। পুরাণে আরও দৃষ্ট হয় যে ঐ যুদ্ধের সময়ে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত কৃত্তিকা নক্ষত্রে হইয়াছিল। কিন্তু ৪৯৯ খৃঃ অব্দে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে অয়নগতি বশতঃ এই ক্রান্তিপাত অশ্বিনী নক্ষত্রে পিছাইয়া আসিয়াছে; সুতরাং তাহাদের মতে ঐ যুদ্ধের সময় খৃঃ পূঃ ১৪২৬ অব্দে নির্দ্ধারিত করা যায়। কিন্তু এই সকল বৎসর যে যুদ্ধের যথার্থ কাল নহে তাহা পরে দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ। আমরা পুরাতন জ্যোতিষশাস্ত্রাদি হইতে এ বিষয়ের

ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ। ইহাতে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, সূর্য্য যখন ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের প্রথমে অবস্থিতি করিত তখন হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, এবং সূর্য্য যখন অশ্লেষা নক্ষত্রের মধ্যভাগে অবস্থিতি করিত তখন গ্রৈষ্ম্য ক্রান্তিপাত হইত। সুতরাং সূর্য্য যখন ভরণীর তৃতীয় পাদে এবং বিশাখার প্রথম পাদে অবস্থান করিত তখন যথাক্রমে শারদীয় ও বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ক্রান্তিবৃত্ত, ডিগ্রী অনুসারে বিভাগের পরিবর্ত্তে, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দ্বারা বিভক্ত দৃষ্ট হয় এবং প্রত্যেক নক্ষত্রকে চারি অংশে ভাগ করা হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে :—

প্রথমে কৃত্তিকে ভাগে যদা ভাস্বাস্তদা শশী।
বিশাখানাং চতুর্থাংশে মুনে তিষ্ঠত্যসংশয়ং॥
বিশাখানাং যদা সূর্য্যশ্চত্যংশং তৃতীয়কং।
তদাচন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকা শিরসি স্থিতং।
তদৈব বিষুবাখ্যো বৈ কালঃ পুণ্যোঽভিধীয়তে॥

(বিষ্ণুপুরাণ, ২-৮)

অর্থাৎ, হে মুনে! যখন সূর্য্য কৃত্তিকার প্রথম পাদে এবং চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ পাদে অবস্থান করে, কিম্বা সূর্য্য বিশাখার তৃতীয় পাদে এবং চন্দ্র কৃত্তিকার মস্তকোপরি থাকে তখনই ক্রান্তিপাতের সময় এবং উহা পুণ্য কাল বলিয়া অভিহিত হয়।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষে সূর্য্যের যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গর্গ এবং বরাহমিহিরও ঐ সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহ মিহির—যিনি ৫০৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—'বৃহৎ সংহিতায়' (৩—১ ও ২) লিখিয়াছেন যে "পুরাতন জ্যোতিষিক পুস্তকাদিতে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, সূর্য্য যখন অশ্লেষার মধ্যভাগে এবং ধনিষ্ঠার প্রথমে

কিন্তু এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের শেষপাদের প্রথমে এবং উত্তরাষাঢ়ার দ্বিতীয় পাদের প্রথমে যথাক্রমে ঐ সকল ক্রান্তিপাত হয়।” সুতরাং বেদাঙ্গের মতে সূর্য্য যখন ধনিষ্ঠার প্রথমে অবস্থিতি করিত তখন হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, কিন্তু ৪৯৯ খৃঃ অব্দে দৃষ্ট হয় যে উহা উত্তরাষাঢ়ার প্রথমপাদের শেষ অংশে সরিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ বৃত্তের ২৩°·২০′ অংশ সরিয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেরিয়ের মতে (M. Le Verrier) ক্রান্তিপাত প্রতি বৎসরে ৫০′·২৪″ সেকেণ্ড সরিয়া যায়; সুতরাং যে ঘটনার সময়ের কথা জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্তরূপ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ৪৯৯ খৃঃ অব্দের ১৬৭২ বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১১৭৩ অব্দে সংঘটিত হয়। প্র্যাট্ (Pratt) ও বেণ্ট্‌লি (Bentley) স্থির করিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ১১৮১ অব্দে উহা সংঘটিত হয়।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, খৃঃ পূঃ ১১৭৩ অব্দে এমন কি বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে যাহার জন্য পুরাতন জ্যোতির্ব্বিদেরা ঐরূপ গ্রহগণের সন্নিবেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন? মান্যবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন যে, “এরূপ প্রবাদ আছে যে, যখন বেদের রচনা হয় তখন সেই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবার জন্য, সেই সময়ের ক্রান্তিপাত উক্ত প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়া রাখা হইয়াছে।” প্রফেসর ওয়েবার (Professor Weber) আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে এইরূপ অনুমান করেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় হইতেই যজুর্ব্বেদ সংহিতা বর্ত্তমান আকৃতি ধারণ করিয়াছে। এবং পুরাণে দৃষ্ট হয় যে বেদসংগ্রহকর্ত্তা ব্যাসদেবও এই সময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং এইরূপ অনুমান অসম্ভব নয় যে গ্রহগণের পূর্ব্বোক্ত সন্নিবেশ, কলিযুগ আরম্ভ হইবার কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ হইয়াছে,

বুঝাইতেছে মাত্র। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে উক্ত আছে যে, যখন হৈমন্তিক ক্রান্তিপাতে সূর্য্য এবং চন্দ্র ধনিষ্ঠার প্রথমে অবস্থিত ছিল, তখন "যুগের" প্রথম বৎসর আরম্ভ হয়। সেই পূর্ব্বকালে যুগ বলিলে দুইটী জিনিষ বুঝাইত—কলিযুগ এবং পঞ্চবর্ষব্যাপী কাল *। সুতরাং বেদাঙ্গ জ্যোতিষে যে গ্রহসন্নিবেশের কথা আছে তাহা যে পঞ্চবর্ষব্যাপী কালকে বুঝাইতেছে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। বরঞ্চ ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে ঐরূপ গ্রহসন্নিবেশ কলিযুগের প্রারম্ভকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

কিন্তু এই অনুমান যে একেবারে আপত্তিশূন্য, তাহা বলিতে পারি না। প্রথমে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ভিন্ন এমন কোন উপকরণ আছে যাহার সাহায্যে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, যখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাতে সূর্য্য ভরণীর ১০° ডিগ্রিতে অবস্থিত ছিল, তখন কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে? বরঞ্চ তৈত্তিরিয় সংহিতা তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সূর্য্য যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। ঐ সকল গ্রন্থের মতে, নক্ষত্রগণের তালিকায় কৃত্তিকা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে (১-১-২-১) কৃত্তিকাকে নক্ষত্রগণের মুখ স্বরূপ বলা হইয়াছে; অথর্ব্ববেদে (১-১৯-৭) এবং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের মতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে (১৬৭-২৬ ও ২৭) উল্লিখিত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইবার কিছুদিন পরে অর্থাৎ মাঘ মাসের অমাবস্যা হইতে পঞ্চম

* বেদাঙ্গ জ্যোতিষ (যজুর্খণ্ড), ৫-৭ শ্লোক এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৭ অধ্যায়

দিন পরে, হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত হইয়াছিল; হিন্দু জ্যোতিষীরা এই সকল তত্ত্ব হইতে স্থির করেন যে ঐ সময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইয়াছিল। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যদ্যপি ক্রান্তিপাত কৃত্তিকা নক্ষত্রে হয়, তাহা হইলে ঐ যুদ্ধের পর অর্থাৎ কলির প্রারম্ভে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ভরণীর ১০° ডিগ্রিতে পিছাইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইহা ৩°২০′ মিনিটের প্রত্যাবর্ত্তন; এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তন হইতে ২৪০ বৎসর অতীত হয়। কিন্তু এই আপত্তি অক্লেশে খণ্ডন করা যায়।

যদিও আধুনিক জ্যোতিষ গ্রন্থ সকল সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন পুস্তকাদিতে—যথা, অথর্ব্বসংহিতা (১৯-৭-১ ৮১) ও তৈত্তিরীয় ব্রহ্মণে (৩-১-২-৫ ও ৩-১-৫-৬) অষ্টবিংশতি নক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে যখন ঐ দুইখানি বৈদিক পুস্তক সংকলিত হইয়াছিল তখন অষ্টবিংশতি নক্ষত্রের পরিচলন ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭-১-৩-২) সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; উহাতে অভিজিৎ নামক নক্ষত্রকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এই তিনখানি প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থের ভিতর তৈত্তিরীয় সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, উহাতে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু উহার পরে রচিত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নক্ষত্রেষ্টি নামক যজ্ঞের জন্য অষ্টবিংশতি নক্ষত্র ধরিয়া নক্ষত্রগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, যজ্ঞাদির নাম যাহাতে সংশ্লিষ্ট আছে তাহা অতি প্রাচীন; সুতরাং পূর্ব্বে যে অষ্টবিংশতি নক্ষত্রের কথা বলা হইয়াছে তাহা পুরাতন মত। কিন্তু বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পরাশর মুনি, যিনি জ্যোতিষিক গণনার সুবিধার জন্য প্রথমে অভিজিৎ

তৈত্তিরীয় সংহিতা সঙ্কলন করেন। আমাদের বোধ হয় যখন কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল তখন উভয় মতেরই প্রচলন ছিল; কিন্তু তাহার পর হইতে জ্যোতিষীরা সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের গণনা করিয়া আসিতেছেন। জ্যোতিষের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পুস্তক জ্যোতিষ বেদাঙ্গ হইতে বর্ত্তমান কালের জ্যোতিষ গ্রন্থ পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে বিখ্যাত জ্যোতিষীরা, যেমন গর্গ, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্ম গুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলে, সপ্তবিংশতি লক্ষণ লইয়া তাহাদের গণনা করিয়াছেন। মহাভারত, মনুস্মৃতি এবং বিষ্ণুপুরাণে যে সংখ্যা দেখিতে পাই তাহা এই সপ্তবিংশতি সংখ্যা। সুতরাং আমরা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যদিও অথর্ব্ববেদ সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের সংস্কলনের সময় অষ্টবিংশতি সংখ্যার প্রচলন ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা পুরাতন প্রথার আরও একটী উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব প্রথানুসারে কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে গণনা আরম্ভ না করিয়া তাঁহারা ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পঞ্চম শ্লোকের বৃত্তিতে সোমকর গর্গের একটী পুরাতন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ—“তেষাং চ সর্ব্বেষাং নক্ষত্রাণাং কর্ম্মসু কৃত্তিকাঃ প্রথম মাচক্ষতে শ্রবিষ্ঠাতু সংখ্যায়াঃ”।—অর্থাৎ, এই সকল নক্ষত্রের ভিতর যজ্ঞাদির জন্য কৃত্তিকা এবং গণনার জন্য শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা প্রথম বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে গর্গ যে কালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই প্রাচীনকালে জ্যোতিষ গ্রন্থে ধনিষ্ঠা হইতে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের গণনা হইত। সুতরাং যদি বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতে ধনিষ্ঠার প্রথমে হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত এবং ভরণীর তৃতীয় পাদে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয়, অষ্ট

বাসন্তিক ক্রান্তিপাত কৃত্তিকায় প্রথমে হয়। সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ধরিয়া খগোলের যে স্থান নির্দ্দেশ করা যায় (অর্থাৎ ভরণীর তৃতীয় পাদের শেষ অংশ), অষ্টবিংশতি নক্ষত্র ধরিয়া কৃত্তিকার প্রথম পাদে সেই স্থানই নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং কেহ কেহ যে পূর্ব্বোক্ত ৩০°-২০′ মিনিটের আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। বৈদিক গ্রন্থের মতানুসারে বিষ্ণুপুরাণে যে গ্রহসন্নিবেশের উল্লেখ আছে তাহা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিতেছে। এই অনুমানের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; যে স্থানে প্রত্যেক নক্ষত্রের অধিষ্ঠিত দেবতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই স্থানে ভরণীর অধিষ্ঠিত যমের পরিবর্ত্তে, অগ্রে কৃত্তিকার অধিষ্ঠিত অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি ভিন্ন আরও একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইহা স্বতঃই মনে উদয় হইতে পারে যে, সেই প্রাচীন কালে, যখন জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতি হয় নাই, তখন কেমন করিয়া ভরণীর তৃতীয় পাদের শেষ অংশ বলিয়া খগোলের কোন একটী কল্পিত স্থানে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? ইহার উত্তর দিতে হইলে খগোলের এই স্থানটী বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা উচিত। অতি পুরাকালে সূর্য্য মৃগশিরা নক্ষত্রে থাকিলে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত বলিয়া, মৃগশিরা নক্ষত্রে নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে মৃগশিরা হইতে রোহিণী ১৩° ৩০′ মিনিট, রোহিণী হইতে কৃত্তিকা ১২° ডিগ্রি এবং কৃত্তিকা হইতে ভরণী ১৭° ৩০′ মিনিট দূরে অবস্থিত। সেই সময়ে ডিগ্রি এবং মিনিটের আবিষ্কার না হওয়ায়, নক্ষত্র এবং নক্ষত্র পাদের দ্বারায় দূরত্ব নির্দ্ধারিত হইত এবং সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে একটী দূরত্ব-নির্দ্দেশকারী নক্ষত্র দ্বারা খগোলের যতটা স্থান নির্দ্দেশ

কৃত্তিকার ভিতর মোটামুটি হিসাবে ততটা প্রভেদ। যখন আমরা দূরত্ব-নির্দ্দেশকারী মৃগশিরা নক্ষত্রের কথা বলি, তখন তাহা বাস্তবিক রোহিণী নক্ষত্র হইতে এবং যখন রোহিণীর কথা বলি তখন কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে গণনা করিতে হয়; সুতরাং দূরত্ব-নির্দ্দেশকারী কৃত্তিকার প্রারম্ভ বলিলে, ভরণী নক্ষত্রের এক পাদ গত হইয়াছে এইরূপ বুঝায়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে বাসন্তিক ক্রান্তি পাতের যে স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভরণীর তৃতীয় পাদ, তাহা কৃত্তিকা হইতে এক নক্ষত্র + ভরণী হইতে এক নক্ষত্র পাদ দূরে অবস্থিত। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর আপত্তি নাই।

এক্ষণে আমরা অক্লেশে বলিতে পারি যে কলিযুগের প্রারম্ভে সূর্য্য যখন ভরণীর তৃতীয় পাদে অবস্থিতি করিতেছিল, তখন বাসন্তিক ক্রান্তি-পাত হইয়াছিল। কিন্তু ৪৯৯ খৃঃ অব্দে দৃষ্ট হয় যে সূর্য্য যখন অশ্বিনীর প্রথমে অবস্থান করিত, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইয়াছিল। সুতরাং কলির প্রারম্ভ হইতে ৪৯৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ক্রান্তিপাত ২৩° ২০′ মিনিটের প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, অর্থাৎ অনূ্যন খৃঃ পূঃ ১১৭৩ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সূর্য্য যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থান করিত; তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, এই মতানুসারে কেহ কেহ যে খৃঃ পূঃ ১৪২৬ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সাব্যস্ত করেন, তাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয়তঃ। ইতিহাস অলোচনা করিলে আমরা এ বিষয়ে কিছু না কিছু সাহায্য পাইতে পারি। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা গর্গাচার্য্য অশোক বংশীয় শালিসুথের বর্ণনা কালে, সিদ্ধান্ত নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে "তৎপরে নিষ্ঠুর গ্রীকজাতি মথুরার অধীনস্থ সাকেত নামক পঞ্চাল দেশকে বশ করিয়া কুসমধ্বজ নগরে (পাটনা) উপস্থিত হইবে; পুষ্পপুর অধিকৃত হইলে সকল প্রদেশ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

সংঘটিত হইবে। গ্রীকদের ধ্বংসের পর এবং যুগের শেষে সাতজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা অযোধ্যায় রাজত্ব করিবে।" তৎপরে উল্লিখিত আছে যে গ্রীকদের পরে শকজাতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। গর্গের ইতিহাস এইখানেই শেষ হইয়াছে। পানিণির মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও এই বিদেশীয় আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির এইরূপ একটী সূত্র আছে যে, যখন অতীত ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে হয়, কিম্বা যে ঘটনা দৃষ্টির বহির্ভূত অথচ সেই ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, এরূপ কোন লোকবিজ্ঞাত ঘটনার যখন বর্ণনা করিতে হয়, তখন লঙ্ ব্যবহৃত হয়*। পতঞ্জলি ঐ সূত্রের উদাহরণ স্বরূপ লিখিয়াছেন যে "অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্," "অরুণস্তবনো মাধ্যমিকান্" অর্থাৎ যবনেরা "সাকেত অবরোধ করিয়াছিল," "যবনেরা মাধ্যমিকা অবরোধ করিয়াছিল"। ইহা হইতে অনেকে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, যবনেরা যখন অযোধ্যা এবং মাধ্যমিকা আক্রমণ করিয়াছিল তখন পতঞ্জলি ঘটনা স্থলে উপস্থিত না থাকিলেও উক্ত সময়ে জীবিত ছিলেন। পতঞ্জলি "মৌর্য্য," "চন্দ্রগুপ্তের সভা," "পুষ্পমিত্রের সভা" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে ডাক্তার গোল্ড্ষ্টাকার (Dr. Goldstucker) স্থির করিয়াছেন যে পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ ১৪৪ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে যবনদের সাকেত এবং মাধ্যমিকা আক্রমণ দ্বারা যথাক্রমে ব্যাকৃট্রীয় রাজা মিনান্ডারের (Menander) হিন্দুস্থান আক্রমণ এবং নাগার্জ্জুনের মতাবলম্বী বৌদ্ধ মাধ্যমিকাদিগের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতও ঐরূপ, তিনি বলেন যে, ভাষ্যের এই অংশটী পতঞ্জলি অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ১৪৪-১৫২ অব্দে লিখিয়াছিলেন এবং এই অংশটী মিনান্ডারকেই বুঝাইতেছে।

* "অনদ্যতনে লঙ্"। ৩।২।১১ পাণিনি পরোক্ষেচ লোক বিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শন

"মাধ্যমিকা" শব্দে পতঞ্জলি মধ্যদেশীয় লোক সকলকে কিম্বা নগর সকলকে বুঝিয়াছেন। মনুস্মৃতিতে (২-২১) মধ্যদেশ মানে—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, পূর্ব্বে এলাহাবাদ এবং পশ্চিমে বিনাশন এইরূপ সীমাবদ্ধ একটী দেশকে বুঝাইয়াছে। গর্গ যে সকল ব্যক্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন তাহারাই "মাধ্যমিকা" অর্থাৎ মধ্যদেশবাসী। সুতরাং পতঞ্জলি এবং গর্গ যে যবনআক্রমণের কথা বলিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ ইতিহাসোক্ত গ্রীকদেশীয় মিলিণ্ডা নামক রাজার সহিত নাগার্জ্জুন এবং মাধ্যমিকা জাতির সংঘর্ষণের সহিত কোন সংস্রব নাই। বঙ্গের কৃতী-পুত্র ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন যে, মিলিণ্ডা কথনই অযোধ্যা পর্য্যন্ত আসেন নাই, যমুনার কূল পর্য্যন্ত আসিয়া থাকেন ত যথেষ্ট; তাঁহাকে অযোধ্যায় আসিতে হইলে পূর্ব্বদিকে অন্ততঃ তিন শত মাইল যাইতে হইত। গর্গ যে খৃঃ পূঃ ১৪৪ অব্দের মিনাণ্ডারের আক্রমণকে লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু বহুপূর্ব্বে ব্যাক্ট্রীয় গ্রীকদের আক্রমণকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা শালিশুকের বর্ণনা হইতেই প্রতীয়মান হয়; বায়ু পুরাণের মতে তিনি চন্দ্রগুপ্তের ১১১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০৪ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ম্যাডাম ডফের Madame Duff "ভারতের ঐতিহাসিক কাল নিরূপণ" নামক পুস্তকে (Chronology of India) নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সময় এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

(১) খৃঃ পূঃ ২০৬। সিরিয়ার তৃতীয় এণ্টিওকস্ (Antiokhs) ব্যাকট্রীয়ার ইউথি ডিমসের (Eutheydemos) সহিত যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সুভগসেনার সহিত সন্ধি করেন।

(২) খৃঃ পূঃ ১৯৫। ব্যাক্‌ট্রিয়ের ডেমিট্রিয়স্ (Demetrias) পঞ্জাব দেশ জয় করেন।

BENGAL LIBRARY.

(৩) খৃঃ পূঃ ১৮১। ইউক্রেটাইডিস্ (Ukratides) ভারতবর্ষে এবং ব্যাক্‌ট্রিয়ায় রাজত্ব করেন।

(৪) খৃঃ পূঃ ১৮০। দ্বিতীয় ইউথিডিমস্ এবং প্রথম এন্‌টিমেকস্, প্যান্টালিয়ন ও এগাথোক্লিশ ভারতে রাজত্ব করেন।

(৫) খৃঃ পূঃ ১৬৫। য়ুহেটি জাতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া শকজাতি ব্যাক্‌ট্রিয়া আক্রমণ করে।

(৬) খৃঃ পূঃ ১২৬। শকজাতিরা ব্যাকট্রীয়া অধিকার করিলে য়ুহেটি জাতিরা তাহা পুনরায় গ্রহণ করে।

উপরোক্ত তালিকার সহিত পূর্ব্বোক্ত গর্গের বর্ণনার বিশেষ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়; খৃঃ পূঃ ২০৬ হইতে খৃঃ পূঃ ১৬৫ অব্দের ভিতর বহু ব্যাক্‌ট্রীয় রাজা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব করেন। এই সকল রাজারা গৃহ-বিবাদ করিয়া অবশেষে খৃঃ পূঃ ১৬৫ অব্দে শকজাতি দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। ঐ ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের পতঞ্জলি এবং গর্গ 'যবন' নামে অভিহিত করিয়াছেন, কারণ হিন্দুরা গ্রীকদের যবনাখ্যা প্রদান করিতেন। খৃঃ পূঃ ১৬৫ অব্দে গ্রীক জাতিরা যে শকজাতির দ্বারা বিতাড়িত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। যবনদের প্রস্থানের পর সাকেত অর্থাৎ কোশল দেশে সাত জন বলবান রাজা রাজত্ব করিয়াছিল।

এই সকল ঘটনা হইতে নির্দ্ধারিত করা যায় যে পতঞ্জলি এবং গর্গ সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহারা খৃঃ পূঃ ১৬৫ অব্দে জীবিত ছিলেন। গর্গ যে খৃঃ পূঃ ১৬৫ অব্দে জীবিত ছিলেন তাহার অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। গর্গের 'বৃহৎ সংহিতা' নামক পুস্তকের বৃত্তিতে ভট্টপল তাহার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহার মানে এই—"গর্গ বলিতেছেন যে, যখন সূর্য্য ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে না

হয় এই বাক্যের দ্বারা যবনদিগের আক্রমণকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ২১৬ অব্দে সূর্য্য ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে না গিয়া উত্তর দিকে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং ঐ সময়ে সূর্য্য যখন শ্রবণা নক্ষত্রে উপস্থিত হইয়াছিল তখন হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত আরম্ভ হয়। সুতরাং এই পরিবর্ত্তন হইবার কিছু পরেই, যে সময় দুর্ঘটনা আরম্ভ হয়, তখন তিনি জীবিত ছিলেন; আমরা 'বহু পরে' এই জন্য বলিতে পারি না যে, তাহা হইলে তিনি এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতেন না, কারণ, যে ঘটনা বহু পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

গর্গ বলিয়াছেন যে "যুগের শেষে" যবনেরা বিতাড়িত হইয়াছিল। এখানে "যুগ" মানে পঞ্চবর্ষব্যাপী যুগ নহে; কিন্তু কলিযুগ। গর্গ নিজে চার যুগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। যখন তৃতীয় যুগ শেষ এবং চতুর্থ যুগ আরম্ভ হইয়াছিল সেই সময়েই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। যুগ সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে দেখাইব যে "যুগ" মানে পূর্ব্বে সহস্র বর্ষব্যাপী কাল বুঝাইত। ঐ যবনেরা যখন ভারত হইতে বিতাড়িত হয়, তখন কলিযুগের শেষ হইয়াছে অর্থাৎ তখন অন্যূন খৃঃ পূঃ ১৬৫ অব্দ। সুতরাং প্রায় খৃঃ পূঃ ১১৬৫ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ। গ্রীক দেশীয় ইতিহাস হইতে আমরা এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। গ্রীকরাজা সেলিউকসের (Seleucus) রাজদূত হইয়া মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় বিখ্যাত ঘটনাসমূহ 'ইণ্ডিকা' (Indica) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আলেকজণ্ডারের পুস্তকাগার ভস্মীভূত হওয়াতে ঐ 'ইণ্ডিকা' ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু

গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে। এরিয়ন (Arrian) ১৪৬ খৃঃ অব্দে লিখিয়াছেন যে "ডাওনিয়স্ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন ; ৪২০ বৎসর ধরিয়া তিনবার কোন রাজা রাজত্ব করেন নাই, তখন সাধারণ পরতন্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল।" তাহা হইলে বোধ হয় সর্ব্বশুদ্ধ ৬০৪২+৪১০ অর্থাৎ ৬৪৬২ বৎসর অতীত হয়। ৪১ খৃঃ অব্দে প্লিনি (Pliny) লিখিয়াছেন যে, "ডাওনিবাস্ হইতে আলেক্জণ্ডার পর্য্যন্ত ১৫৪ রাজা ৬৪৫১ বৎসর ৩ মাস রাজত্ব করিয়াছিল"। ২৩৮ খৃঃ অব্দে সলিসস্ (Solinus) লিখিয়াছেন যে, ডাপনিসাস্ হইতে আলেক্জণ্ডার পর্য্যন্ত ৬৪৫১ বৎসর ৩ মাস অতীত হয়, উহার মধ্যে ১৫৩ জন রাজা রাজত্ব করেন।" এই তিনজন বিখ্যাত গ্রীকইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' হইতে সাহায্য পাইয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন।

গ্রীকদের মতে ডাওনিসস্ হইতেছেন, আমাদের বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। পুরাণেও আমরা দেখিতে পাই যে, ইক্ষ্বাকু হইতে চন্দ্রগুপ্ত বা আলেক্জণ্ডার পর্য্যন্ত ১৫৪ জন রাজা রাজত্ব করেন। সুতরাং খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে এই বিদেশীয় ইতিহাসবেত্তারা রাজাদের সংখ্যা যাহা নিরূপণ করেন, তাহা পুরাণোক্ত তালিকার সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। আমরা পুরাণে দেখিতে পাই যে, ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে ইক্ষ্বাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত ৬২ জন রাজা রাজত্ব করেন। দ্বাপরযুগে সূর্য্যবংশের সমসাময়িক তিন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় ; যথা, কুশ হইতে বৃহদ্বল পর্য্যন্ত ৩৫ জন, দিষ্ট হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত ৩৩ জন, এবং শিরধ্বজের পুত্র হইতে মহাবশি পর্য্যন্ত ৩৪ জন রাজা রাজত্ব করেন। এবং কলিযুগে যদিও সূর্য্যবংশীয় রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু চন্দ্রবংশীয় জরাসন্ধ হইতে নন্দবংশীয় শেষ রাজা পর্য্যন্ত ৫০ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৫ কিম্বা ১৫৬

এরিয়ন যে বৎসরের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় তিনি মোটামুটি হিসাবে ধরিয়াছেন; তাহার এক শতাব্দী পূর্ব্বকার এবং এক শতাব্দী পরের যে দুই জন ইতিবেত্তা বৎসরের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ ৬৪৫১ বৎসর ৩ মাস, তাহা এরিয়ণের নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা ঠিক বলিয়া বোধ হয়। ইক্ষ্বাকু হইতে আলেক্‌জণ্ডার পর্য্যন্ত ৬৪৫১ বৎসর ৩ মাস অতীত হইয়াছে এবং আলেক্‌জণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে পুরুর সহিত যুদ্ধ করিয়া, খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

পুরাণের মত এইরূপ যে বিভিন্ন রাজবংশ ত্রেতাযুগের প্রথমে সৃষ্ট হয় এবং ইক্ষ্বাকু ও বুদ্ধ ঐ যুগের প্রথমেই অবির্ভূত হন*। পুরাণে বর্ণিত আছে যে সত্যযুগে বিষ্ণুর চার অবতার ভিন্ন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুই হয় নাই। ভাগবতে (৯-১৪-৪৯) উক্ত হইয়াছে যে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজার ভাগিনেয় পুরুরবা, চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা হন এবং তিন প্রকার অগ্নির প্রচলন করেন। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ৭৪ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে ক্ষত্রিয়েরা ত্রেতাযুগে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং কলিযুগের দুই যুগ পূর্ব্বে অর্থাৎ ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের সৃষ্টি হয়। আমরা ঋক্‌বেদে দেখিতে পাই যে, সময় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য "সপ্তর্ষি চক্র" বলিয়া একরূপ গণনা প্রচলন ছিল এবং ইক্ষ্বাকু হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত দুইটী সপ্তর্ষি চক্র ঘুর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক মতানুসারে ঐ চক্র একবার ঘুর্ণিত হইতে ২৮০০ শত বৎসর অতীত হয় সুতরাং দুইবারে ৫৬০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি যে ইক্ষ্বাকু হইতে

* Warren's Kala Sankalita, pp. 358 and 366; Fergueson's History of Indian and Eastern Architecture p. 712; Bhagavat.

আলেকৃজণ্ডার পর্য্যন্ত ৬৪৫৯ বৎসর ৩ মাস অতীত হয়, সুতরাং কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে আলেকৃজণ্ডার পর্য্যন্ত ৬৪৫১—৫৬০০ অর্থাৎ ৮৫১ বৎসর অতীত হয়। কিন্তু আলেকৃজণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে ভারত ত্যাগ করেন ; সুতরাং খৃঃ পূঃ ৮৫১+৩২৫ অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১১৭৬ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত তিন বিভিন্ন উপকরণ হইতে আমরা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করিতে সক্ষম হই যে, খৃঃ পূঃ ১১৭৬ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীআশুতোষ দেব।

অপূর্ব্ব বিচার-কৌশল।

'নবম ল্যান্সার্স' নামক গোরাসৈন্য দল দুইটী ভারতবাসী কৃষ্ণাঙ্গের অভিশপ্ত জীর্ণ জীবন দেহ-পিঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত করান অপরাধে লর্ড কর্জ্জন তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে সংবাদ ভারতীর পাঠকগণের অবিদিত নহে। সৈন্যগণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে কোন দেশের শাসনকর্ত্তা দুর্ব্বিনীত সৈন্যগণের শাসনাভিপ্রায়ে এইরূপ বা ইহা অপেক্ষাও কঠোর দণ্ড বিধান করিতে পারিতেন ; তাহাতে সেই সকল দেশের লোক আর্ত্তনাদ করিত কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। অপরাধিগণ অথবা তাহাদের দোষ গোপনকারীর দল দণ্ডিত হইলে যাহারা দলবদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ আরম্ভ করে, গভীর অসন্তোষের ঐক্যতানিক শব্দে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ করিতে থাকে, তাহাদের ভিতর নীতির পবিত্রতা ও ন্যায়ের সম্মান কতটুকু বিদ্যমান আছে তাহা

বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে 'ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পায়।' যে সকল বৃষের গোশালা দগ্ধ হইয়াছে তাহারা সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভীতি-বিহ্বলভাবে পুচ্ছ আস্ফালন করিলে তেমন আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু যে সকল বৃষের গোশালা দগ্ধ হইবার কোন আশঙ্কা নাই, তাহারা যদি সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া শিং নীচু করিয়া পথের লোককে গুঁতাইতে আসে, তাহা হইলে নির্ব্বিরোধী পান্থ 'শৃঙ্গিনাং দশ হস্তেষু' প্রভৃতি চাণক্য-নীতির অনুসরণ করিয়াও কোন ফল পায় না। বস্তুতঃ লর্ড কর্জ্জনের সঙ্গত শাসনবাক্য শুনিয়া এ দেশের ইংরেজ-স্বার্থ-রক্ষক এংগ্লোইণ্ডিয়ান সংবাদ পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবিধ খাস বিলাতী সংবাদ পত্র পর্য্যন্ত যেরূপ হুঙ্কারধ্বনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম হয়ত লর্ড কর্জ্জনকে এই ব্যাপার লইয়া শক্ত একটা কৈফিয়তের নীচে পড়িতে হইবে। পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় এ কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল, কৈফিয়ৎও দিতে হইয়াছিল।

অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিই, ইংলণ্ডে যদি এরূপ হইত, মনে করুন দুই একজন গোরা সৈন্য মেজাজের উষ্ণতায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া সেইদেশী দুজন নেটিভের প্রাণসংহার করিত, আর অবশিষ্ট সৈন্যেরা হত্যাকারীর সন্ধান বলিয়া না দিত, এবং সেই অবস্থায় লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় যদি কেহ তাহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতেন, তাহা হইলে কি ইংলণ্ডে এ ব্যাপার লইয়া এমন তোলপাড় উপস্থিত হইত? বরং সকলেই বলিতেন দণ্ড যথেষ্ট লঘু হইয়াছে, 'মিলিটারী ডিসিপ্লিন' রক্ষার জন্য ইহাদের কঠিন দণ্ড হওয়াই উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেরূপ কথা কোন এংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের মুখ হইতে বাহির হইল না, খাঁটী বিলাতী সম্পাদকগণের অনেকেও তাহা উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না।

যায় যে, গোটা দুই নেটিভই ত মরিয়াছে, তাহার জন্য আফ্রিকাজয়ী মহাপরাক্রান্ত সৈন্যদলকে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা কেন? আদুরে গোপালেরা যখন অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়া দুই হাত বাড়াইয়া আকাশের চাঁদ ধরিতে চায়, তখন তাহাদিগকে সেই দুর্লভ ফলদান করিবার অঙ্গীকার করিলে পিতামাতার ব্যবহারে কেহ দোষারোপ করে না, কিন্তু যখন তাহারা প্রশ্রয়ের ফলে পিতামাতার মস্তকে স্বভাবের আদেশ পালনে উন্মুখ হয়, তখন পুত্রবৎসল পিতামাতার নির্ব্বিকার ভাব প্রকাশ কোন মতে শোভন দেখায় না, পুত্রের বেয়াদবিও তাহাতে দুঃসহভাব ধারণ করে। লর্ড কর্জ্জন অপরাধী সৈন্যগণের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ দিল্লীর দরবারে প্রকাশ্যভাবে তিনি তাঁহার বিলাতী অতিথিগণ কর্তৃক বিদ্রূপভাজন হইলেন! ভারতে যখনই গোরার হাতে কালার মৃত্যু হইয়াছে, তখনই গোরার দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া আসর গরম করিয়াছেন, দেখিয়া শুনিয়া যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশীগণকে ভয়ে মর মর হইতে হইয়াছে। লাথি মারিয়া মারিয়া ফেলিয়া এমন নির্লজ্জের ন্যায় চক্ষু রক্তবর্ণ করিবার শক্তি সকলের নাই; আর এই শক্তিই আধুনিক জগতে এখন 'ক্ষাত্রশক্তি' নামে সমাদৃত।

কিন্তু এই শক্তি যখন বিচারকের হস্ত হইতে আইনের সহায়তায় বিদ্যুদ্বেগে নেটিভের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আইন নামক অচেতন প্রহরণটিকে কোন প্রকারে অপরাধী করা যায় না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এই কথাটিকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতে পারি।

পুরীর রাজা ইতিপূর্ব্বে পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্যারেটের ক্রোধভাজন হইয়া কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন তাহা বোধ করি পাঠকগণ এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। হিন্দুগণ পুরীর রাজাকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া মনে

চিরপ্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহসী হইলেন, তিনি আদেশ করিলেন ৭ই জুলাই রাত্রে 'পহণ্ডি' নামক রথযাত্রার আবশ্যকীয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এদিকে ৭ই রাত্রে 'পহণ্ডি' না হইলে রথযাত্রাই বন্ধ হইয়া যায়। লক্ষ লক্ষ ভক্ত হিন্দুর মনে তাহাতে কি ভাবের সঞ্চার হইতে পারে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা ক্ষণকালের জন্যও বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন না। রাজা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন, অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্যারেটের প্রভুত্বগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার দুরভিসন্ধি তাঁহার ছিল না, তিনি হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস অব্যাহত রাখিবার জন্যই ম্যাজিষ্ট্রেটের অসঙ্গত আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট যখন এই প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি তাঁহার আদেশ পরিবর্ত্তন করিবেন না। তখন রাজার আর কি উপায় বর্ত্তমান ছিল? হয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা—স্বয়ং 'পহণ্ডির' আদেশ দান করা, অথবা উচ্চতর রাজ কর্ম্মচারীর নিকট সকল অবস্থা জানাইয়া অনুমতি প্রার্থনা করা। পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট সকলই করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মনিয়মে হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন না, করিলেও পুরীর রাজা সেই কালাপাহাড়ী আদেশ পালন করিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু তিনি সুবুদ্ধি মনুষ্য, ম্যাজিষ্ট্রেটের সেই অন্যায় আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী না হইয়া তারযোগে বড়লাট ও ছোটলাটের নিকট সকল অবস্থা জানাইলেন। বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বা ছোট লাট স্বর্গীয় সারজন উডবরণ মিঃ গ্যারেটের ন্যায় গণ্ডূষজলে নৃত্য করেন না, লাট-সাহেবের আদেশে যথাকালে 'পহণ্ডি' সম্পন্ন হইল, মধ্যপথেই ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্যারেটের আদেশের উদ্বন্ধন ঘটিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট একটা জেলার কর্ত্তা, তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিশ

মধ্যে বসিয়া অহোরাত্র কম্পিত কলেবরে অবস্থান করেন; সেই জগন্নাথের সেবাইত তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার আকাঙ্ক্ষায় লাটসাহেবের কাছে আপীল করিলেন, হিন্দুর রাজার—নরনারায়ণস্বরূপ পুরীরাজের এতখানি ধৃষ্টতা একটি জেলার সর্ব্বশক্তিমান প্রভু সহ্য করিতে পারেন না। লাট সাহেবের আদেশে যে তাঁহার হুকুম রদ হইল, সেজন্য লাট সাহেবের উপরই তাঁহার ক্রোধ হওয়া উচিত ছিল, হয়ত তাঁহার সেইরূপ ক্রোধই হইয়াছিল, কিন্তু তাহা উপরওয়ালাকে স্পর্শ করিতেও পারিল না, তাঁহার করকবলিত, অনুপায়, দুর্ব্বল পুরীরাজের মস্তকের উপরই তাহা বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইল। মিঃ গ্যারেট রাজাকে আদেশ করিলেন, 'তুমি গবর্ণমেণ্টের কাছে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছ তাহার সাপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করিবে।' আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ করি এমন বুদ্ধিমান কেহই নাই যিনি এই কথা হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারেন, আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বসের পক্ষেও বোধ হয় কাজটি সমান দুরূহ। সুতরাং রাজাও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠাইলেন হুজুর কি রকম প্রমাণ চান জানিতে পারিলে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি। এই কথায় রাজার রাজভক্তিহীনতা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পায় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি অসম্মানও প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিপ্রায় মহৎ, সমস্ত হিন্দুসমাজের নিকট পুরীর রাজার উন্নত মস্তক নত করিতে না পারিলে তাঁহার প্রভুত্বগর্ব্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না, লাট সাহেবের হুকুমের পরও যে হুকুম চালাইবার শক্তি,—একটা প্রকাণ্ড রাজাকে বিপন্ন করিবার শক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের আছে ইহাও প্রতিপন্ন করা যায় না; সুতরাং তিনি তাঁহার পিনালকোড নামক অস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিলেন, রাজার আরজি দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, রাজা

10 A.M. or his attendance will be enforced by severe measure.' হইতে পারে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, কিন্তু একজন দেশপূজ্য রাজাকে যিনি এমন তাচ্ছিল্য করিয়া নোটিস্ দিতে পারেন, তাঁহাকে বিনা অপরাধে অপমানের ভয় দেখাইতে পারেন, তিনি বর্ব্বরের রাজত্বে বর্ব্বরের বিধাতাপুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু হিন্দুস্থানের মত প্রাচীন দেশে, ইংরাজের মত সভ্যজাতির শাসনকর্তৃত্ব তাঁহার শোভা পায় না।

সুপ্রসিদ্ধ রসিক লেখক ম্যাক্স ও'রেল ভারতের প্রসঙ্গে এক স্থানে লিখিয়াছেন—"An Empire of two hundred and eighty-five millions of people, ruled by princes literally covered with gold and precious stones, who black his boots and look happy.—his অর্থ জন-বুষের। যাঁহারা দিল্লীর দরবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন লর্ড কর্জ্জন দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে কি ভাবে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়াছেন, যাঁহারা মফঃস্বলে জেলার দরবার দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কি ভাবে স্থানীয় 'স্বনাম পুরুষধন্ত'গণকে গড্ডলিকার ন্যায় পরিচালন করিয়াছেন। কিন্তু কোন কথা কহিবার সাধ্য নাই, পিনালকোড নামক তীক্ষ্ণ চাবুক তাঁহার হস্তে বর্ত্তমান। পতিতের দেহে জুতার কঠিন ঠকরে পীড়া দিয়া যে বীরত্ব প্রকাশ করে সে অতি কাপুরুষ। কিন্তু এ দেশের অনেক শাসনকর্ত্তাই তাহা বীরত্বের ও রাজকীয় শক্তির লক্ষণ বলিয়া মনে করেন বলিয়াই তাঁহাদের চরিত্রের হীনতা সভ্যতার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছেন; মিঃ গ্যারেটও উড়িষ্যার এক প্রান্তে বসিয়া সেই বীরত্ব প্রকাশ করিলেন।

পুরীর রাজা বাহাদুর যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের করনিক্ষিপ্ত এই অমোঘ পত্রবাণ তাঁহার মস্তকে নিপতিত দেখিলেন তখন তাঁহার সংজ্ঞালোপের

উপক্রম হইল। একেই তিনি আমাশয়ে কষ্ট পাইতেছিলেন তাহার উপর তখন অতি দুর্দ্দান্ত বর্ষা। রাজা অসুস্থ শরীর লইয়া মস্তকের উপর বৃষ্টিধারা ও পদতলে কর্দ্দমরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের অবৈধ আদেশ পালনের জন্য তাঁহার কাছারী বা কুঠিতে ছুটিতে পারিলেন না; সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আইনে কল্পতরু হইয়া তাঁহার প্রতি 'severe measure enforce' না করিয়া আর কিরূপে পদগৌরব বজায় রাখেন? রাজা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের হুকুম শুনিয়া সবিনয়ে লিখিলেন,—দেশীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড কিরূপ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য পত্রখানি অবিকল প্রকাশ করাই বিধেয়—পুরীর রাজা আমাশয় বশতঃ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপস্থ হইতে না পারিয়া লিখিলেন—"I am really very sorry that I cannot obey your honor's order to attend your honor's office to-day and sincerely hope to be excused and pray that your honor will be pleased to appoint for my attendance any other day that will suit your honor." এক পত্রের মধ্যে সাত যায়গায় 'your honor' পাঠ করিয়া দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ ঘটিরাম ডেপুটী 'অনর্ড সারে'র কথা মনে পড়িতেছে। ধনে-মানে-কুলে-শীলে সামাজিক সম্ভ্রমে ও বংশগত আভিজাত্যে বিলাতী ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াও যে দেশের লোক ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোরঞ্জনের জন্য এতখানি আত্মাবমাননা প্রকাশ করে, দেশের শাসনকর্ত্তাগণ তাহাদের রাজভক্তির মৌখিক প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু ইহা ভক্তি নহে ভয়ের নামান্তর মাত্র, কার্য্যোদ্ধারের উপায় স্বরূপ।—কিন্তু ভবি ভুলান এদেশের লোকের পক্ষে অসাধ্য।

ভবি ভুলিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা নিরঙ্কুশভাবে

সরকারী হুকুম অমান্য করিয়াছেন এই অপরাধে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইল, তাহার পর উপলমুক্ত গিরিনদীর ন্যায় পিনালকোডের ধারার স্রোত বহিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আইনের ভাষায় পুলিশের উপর আদেশ দিলেন—"To arrest the said Rajah Mukund Deb, Superintendent of the Temple, and produce him before me. Herein fail not." এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জয়ধ্বজা ঘাড়ে লইয়া পুলিশ ইনেস্পেক্টর বাবু নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় আধ ডজন কনেষ্টবলের সহিত রাজাকে গ্রেপ্তার-করা-রূপ মহৎ কার্য্য সাধনে যাত্রা করিলেন, ১৫ই জুলাই প্রভাতে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ইনেস্পেক্টর বাবুটি রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিরূপ পুলিশোচিত আচরণ করিয়াছিলেন তাহা রাজার কর্ম্মচারী গোপীনাথ পট্টনায়কের দরখাস্তে বিবৃত হইয়াছে। সেই দরখাস্তে লিখিত হইয়াছে, ইনেস্পেক্টর নারায়ণ দাস তহসিলদার সুদর্শন দাসের সঙ্গে যখন রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে যায় তখন রাজা অন্দর মহলে ছিলেন। রাজার কাছে সংবাদ পৌঁছিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল, ইনেস্পেক্টর তাই অন্যান্য সঙ্গিগণের সহিত জুতা পায়ে দিয়াই ভিতরের আঙ্গিনার নিকট উপস্থিত হইল, রাজভৃত্যগণের নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাহারা সাবল দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহার পর আরও তিনটি দরজা ভাঙ্গিল এবং পুলিশ ইনেস্পেক্টর জুতা পায়ে দিয়া সঙ্গিগণের সহিত জেনানা মহলে প্রবেশ করিল, পূর্ব্বে কোন সংবাদ জানাইল না। তাহার পর রাজার হাত ধরিয়া বাহিরের আঙ্গিনায় টানিয়া আনিল, কতকগুলা কটু কাটব্য কথাও তাঁহাকে শুনাইয়া দিল। তাহার পর রাজা হাজার টাকা জামিন দিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এই স্থানে

পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি হাজতের ব্যবস্থা করিলেই তাঁহার বীরত্বের আত্যন্ত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত।

ম্যাজিষ্ট্রেট গ্যারেটের সৌভাগ্য যে বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্রে তিনি পুরীর রাজাকে এই ভাবে অবমানিত করিলেন। আজ মুসলমান ধর্ম্মের কোন শ্রেষ্ঠতীর্থে তীর্থরক্ষক কোন ফকিরকে এ ভাবে অবমানিত করিবার চেষ্টা করিলে তিনি যে দণ্ডলাভ করিতেন, তাহা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর জেলায় বদলী-দণ্ড হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার হইত। এবং কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে এমন জঘন্য, বেআইনি, অসঙ্গত আদেশ প্রদানের পূর্ব্বে দশবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে হইত। রাজা মুকুন্দ দেব আইন নির্দ্দিষ্ট মার্গে সশঙ্কচিত্তে পদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী গোপীনাথ পট্টনায়ক উপরোক্ত মর্ম্মে নালিশ উপস্থিত করিল। ২২এ জুলাই এই নালিশ উপস্থিত হয়, মিঃ গ্যারেট তখনও পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ কোর্টেই এই দরখাস্ত পড়িল। সাপ হইয়া কামড়ানো ও রোজা হইয়া ঝাড়িয়া দেওয়া, এ কেবল উপকথাতেই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এ উপকথা নহে, তেমনই অদ্ভুত হইলেও ঘটনা সত্য, সুতরাং দংশনের নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। সিনিয়র ডেপুটী বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দরখাস্ত পেশ হইলে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ত্রিভুবন ঘূর্ণ্যমান দেখিলেন, তিনি প্রাচীন ও বিচক্ষণ বিচারক, অল্পায়াসেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিলেন, নথিটা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেই নিষ্পত্তির জন্য পাঠাইয়া দিলেন। 'মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে, শান্ত কল্লে বকে'—এই নীতি অবলম্বিত হইল। পুরী রাজ্যে তখন নিয়ম ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ভিন্ন কোন হাকিম মামলার বিচার স্বাধীন ভাবে নিষ্পন্ন করিতে পারিতেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বহস্তে এই মামলার বিচার করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, কিন্তু কার্য্যটি

নিতান্ত অভিনয়ের মত দেখাইবে এই ভয়েই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুকে বলিলেন, 'ওটা তুমিই নিষ্পত্তি করে ফেল।' ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম পাইয়া নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত হইলেন। নিষ্পত্তিটা কি ভাবে হইত তাহা উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিলে আর সন্দেহ থাকে না, কিন্তু ডেপুটী রাধাকান্ত বাবুকে আর সে মামলার বিচার করিতে হইল না, মামলা যাহাতে স্থানান্তরে বিচারার্থ প্রেরিত হয় সেই মর্ম্মে হাইকোর্টে আদেশ প্রার্থনার জন্য ফরিয়াদী পক্ষে তিনি তিন সপ্তাহ সময় মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইলেন।

হাইকোর্ট ফরিয়াদীগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, মামলা কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিসারের নিকট বিচারার্থ সমর্পিত হইল। এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট গ্যারেট দণ্ডভোগের জন্য পরম স্বাস্থ্যকর মজঃফরপুর জেলায় প্রস্থান করিলেন।

মিঃ ফিসার আর একটি মূর্ত্তিমান ধর্ম্মাবতার। তিনি মৌলবী আবদল্ সালেমের হস্তে এই মামলার বিচার ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু মিঃ ফিসারই কটকের দুইজন সরকারী উকীলকে আসামীগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য দণ্ডায়মান হইবার আদেশ করিলেন, যে ম্যাজিষ্ট্রেট অধীনস্থ ডেপুটী মামলার বিচার করিবেন, সেই ম্যাজিষ্ট্রেটই মামলা পরিচালনে আসামী পক্ষের সহায়তায় প্রবৃত্ত।

যথাকালে অর্থাৎ বিচারের দিন আসামীগণ ডেপুটী মৌলবী সাহেবের বিরুদ্ধে এক এফিডেফিটে অকস্মাৎ প্রকাশ পাইল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেছেন, অতএব মামলা হস্তান্তরিত করা প্রার্থনীয়। এই এফিডেফিটে মৌলবী সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর কথা ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিসার বিশেষ প্রমাণ না লইয়া

নিকট প্রকাশ করিলেন তিনি মামলাটা নিজের হাতে আনিয়া ডিস্‌মিস্‌ করিবেন, তিনি মামলার কাগজপত্র দেখিয়া আসামীগণের কোন দোষ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

যে ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার বিচারের পূর্ব্বে এই প্রকার মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত না হন, তিনি অধীনস্থ একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর বিনা কারণে পক্ষপাতের দোষ দিলে তাহা সামঞ্জস্যহীন বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ এই ম্যাজিষ্ট্রেটটির পদে পদে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে দেখা যাইতেছে। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল পূর্ব্বে বাঁকুড়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় অনেক দিন বিশেষ সুখ্যাতির সহিত জজের কাজ করিয়াছেন, এখন তিনি পেন্সন্‌ লইয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বিচারক এদেশে জজের মধ্যে অধিক নাই; শীল মহাশয় রাজা মুকুন্দদেবের উকীল, উকিল হইয়াছেন বলিয়াই যে তিনি আত্মীয় সুহৃদগণের সহিত সকল সম্বন্ধ এমন কি সামাজিক বন্ধনও পরিত্যাগ করিবেন ইহা কেহ আশা করেন না। ব্রজেন্দ্র বাবু উক্ত ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী সাহেবের বাসায় তাঁহার সহিত পূর্ব্ব পরিচয়সূত্রে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন ইহা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন বিশ্বস্তসূত্রে ব্রজেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে এমন কথা শুনিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যে শ্রেণীর হীন অপবাদ ব্রজেন্দ্র বাবুর কোন হীনচেতা শত্রুতেও প্রদান করিতে পারে নাই; আসামী পক্ষের এফিডেফিটে একথার উল্লেখ না থাকিলেও ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদ অবগত হইয়া সুবিচার বিতরণের উদ্দেশ্যে মামলাটি নিজের ফাইলে আনিয়া তাহা ডিস্‌মিস্‌ করিবার জন্য উদ্যত। এরূপ অপক্ষপাত কাজি এ দেশে দিন দিন অত্যন্ত সুলভ হইয়া উঠিতেছে, ইহা আমাদের পক্ষে যৎপরোনাস্তি

শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হাকিম, ব্রজেন্দ্র বাবু এক জন পেন্সন্-প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর জজ—এ কথা মনে রাখিলে ফিসর সাহেব উভয়ের প্রতি কলঙ্কারোপনের অবসর পাইতেন না, কিন্তু তিনি জানেন ইহারা উভয়েই নেটিভ, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং গৌরাঙ্গের খানসামা কুলও যে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহারা অকুণ্ঠিত ভাবে সেই কার্য্য করিতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিসারের জিদ্ এদেশের কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত পুলিশের দারোগার জিদ্ অপেক্ষা এক তিলও কম নহে। ফরিয়াদী পক্ষের ব্যারিষ্টার মকর্দ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে সরাইবার জন্য হাইকোর্টে এফিডেফিট করিবার সংকল্প করিলেন এবং হাইকোর্টের আদেশ বাহির হইবার পূর্ব্বে মকর্দ্দমা স্থগিত রাখিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ফিসার বাহাদুর এতই কর্ত্তব্যপরায়ণ যে পাছে হাইকোর্ট না বুঝিয়া একটা অসুবিধাজনক আদেশদান করিয়া বসেন এই ভয়ে আসামীগণের এফিডেফিটের বিচার উপলক্ষে আসামীগণের অনুপস্থিতিতেই মামলাটি নির্ম্মূল করিলেন, সরকারী উকিলের আসামীর পক্ষ সমর্থনেরও আবশ্যক হইল না। তিনি রায়ে প্রকাশ করিলেন,—"পুলিশ ইনেস্পেক্টরের কোন অপরাধ নাই, তিনি আইন (অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্যারেটের বেদবাক্য) অনুসারে ওয়ারেণ্ট ধরাইতে গিয়াছিলেন, আইন অনুসারেই তিনি চলিয়াছেন, জুতা পায়ে দিয়া অন্তঃপুরে না গিয়া তাঁহার উপায় ছিল না, জুতা পুলিশের একটি পরিচ্ছদ, তাহা পুলিশ কর্ম্মচারী ত্যাগ করিতে পারে না, রাজাকে তিনি গালাগালি দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণাভাব, সুতরাং ইনেস্পেক্টরকে অব্যাহতি দেওয়া গেল।"

অতি পরিপাটী বিচার! পুরীর রাজার মত একজন সম্ভ্রান্ত—

কয়েকজন লোক প্রবেশ করিল, অপমানের চূড়ান্ত করিল, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকাশ্য বিচারালয়ে বসিয়া তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, পুলিশকে প্রজাপীড়নে উৎসাহিত করিতেছেন—ইহাই এখন এদেশে অনেক ম্যাজিষ্ট্রেটের সুবিচার, আমাদের দরিদ্রের দেশের সহস্রাধিক মুদ্রা প্রতি মাসে উদরস্থ করিয়া ইঁহারা এইরূপ বিচার বিতরণ করিতেছেন! এই প্রকৃতির ম্যাজিষ্ট্রেটগণ লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতাপুরুষ। হতভাগ্য দেশ! শাসন ও বিচারক্ষমতা এক হস্তে থাকায় পদে পদে সুবিচারের কিরূপ ব্যাঘাত ঘটিতেছে ইহা তাহার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ম্যাজিষ্ট্রেট অবিচার করিলে কে দারোগার নিকট সুবিচারের আশা করিবে? সুতরাং একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের দুর্ব্বলতা, পক্ষপাত বা ক্ষমতাপ্রিয়তায় শাসনরথের চাকাগুলা পর্য্যন্ত পথিকের ঘাড়ে গড়াইয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে।

যাহা হউক, হাইকোর্টের আদেশে নূতন করিয়া এই মামলায় কিরূপ বিচার হয় তাহা দেখিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে!

বাঙ্গালা দেশের একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার কৌশল প্রদর্শন করিলাম। এবার আসামের একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। উপস্থিত মামলার আসামী একজন গোরা, ফরিয়াদী একটা কুলি—চা-বাগিচার একটা হতভাগ্য কুলি।

ঘটনা সংক্ষেপে বলিতে হইবে। শ্রীহট্টে কেকরাগুল নামক একটা চা-বাগিচা আছে, এই বাগিচার ম্যানেজারের নাম মিঃ লার্ডেন। গোপালবার নামক একটা কুলীর স্ত্রী এক দিন চাউল কিনিবার জন্য স্থানান্তরে যায়, গোপাল তখন ঘরে ছিল না। সাহেব বোধ করি সংবাদ পাইয়াছিলেন গোপালের স্ত্রী বাগিচা ছাড়িয়া পালাইতেছে, কুলী পালায়

দিক দিয়া গোপালের স্ত্রী গৃহে ফিরিয়া আসিল। সাহেবের ক্রোধ হইয়াছিল, ক্রোধের বশে যবনিকান্তরালে তিনি কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অন্যান্য কুলীর সাক্ষীতে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। গোপাল গৃহে ফিরিয়া তাহার স্ত্রীকে জীবিত দেখিতে পাইল না, দেখিল সে উদ্বন্ধনে ঝুলিতেছে! স্বামী স্ত্রীতে এমন কোন বচসা বা মনান্তর হয় নাই যে সে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, অন্যান্য কুলিদের কাছে সে জানিতে পারিল সাহেবই তাহার মৃত্যুর কারণ; গোপাল ফৌজদারীর হাকিম মিঃ সাল্‌কেডের নিকট বিচার প্রার্থী হইল, ম্যাজিষ্ট্রেট সাল্‌কেড্‌ বাহাদুরও এ ক্ষেত্রে পূর্ব্ব মামলার মত অথবা তদপেক্ষাও অধিক সুবিচার করিলেন। মামলার তদন্তেই রায় প্রকাশ করিলেন—মামলা মিথ্যা, কুলি গোপাল নষ্টামী করিয়া সাহেবকে ফৌজদারীতে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু বার জন কুলি গোপালের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী সাহেবকে অব্যাহতি দিয়া গোপাল ও তাহার দ্বাদশ সাক্ষীকে মিথ্যাসাক্ষী দেওয়ার অপরাধে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সাল্‌কেড্‌ অপূর্ব্ব বিচার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার এই বিচারের পর আর কে নেটিভ হইয়া গোরার নামে নালিশ করিতে যাইবে? স্ত্রী হারাইয়াও বেচারার অব্যাহতি নাই। কিঞ্চিৎ সুবিচার লাভের আশায় নালিশ করিলে বিপরীত ফল হইবে, হয় ত তাহাকে জেলেই যাইতে হইবে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা করিয়াছেন তাহা তিনি পিনালকোড নামক কল্পতরুর অনুগ্রহেই করিয়াছেন, সকল পথ পরিষ্কার! ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যদি অপক্ষপাতভাবে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া মামলার বিচার করিতেন ও সুবিচারে তাঁহার আগ্রহ থাকিত তাহা হইলে তিনি এত সহজে ফরিয়াদীগণকে মিথ্যাসাক্ষ্যদানের

হেতুবাদে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারিতেন না। করিমগঞ্জে তিনি অনেক দিন হইতেই একাধারে ফৌজদার ও কাজী। তাঁর এতদিনে বুঝা উচিত ছিল সাহেবের অত্যাচার অসহ্য হইলে কুলিরা দল বাঁধিয়া সাহেবের মাথা ফাটাইয়া জেলে যাইতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্যাসাক্ষী দেওয়া তাহাদের স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু ক্ষুদ্র নগণ্য পশুবৎ কুলিদিগের অভিযোগে তিনি সুসভ্য, ধনবান, স্বদেশীয় স্বসমাজভুক্ত একজন চা-করকে বিড়ম্বিত করিতে পারেন না। সিভিল সার্ব্বিশ পাশ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের অভিনয় করিতে বসিয়া এতখানি আত্মবিসর্জ্জনে, এতখানি কর্ত্তব্যানুরাগ প্রদর্শনে ইংরাজ সমাজে অধিক লোকের আগ্রহ দেখা যায় না, বরং যাঁহাদের সে আগ্রহ আছে তাঁহারা যতই মহত্ত্বের উচ্চশিখরে সমারূঢ় থাকুন সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠালাভ করা দুরূহ। স্বজাতীয়গণ তাঁহাদিগকে শত্রু ভাবিয়া অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, মহামতি কটন এ ঘটনার উৎকৃষ্ট সাক্ষী; আসামের চা-কর ইংরাজ সমাজ তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিল, তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কলঙ্ক আরোপ করিয়া যে অভিযোগ করিয়াছিল তাহাতে এক কলমেই আসামের চা-করপুঞ্জের শিক্ষা, প্রবৃত্তি, রুচি ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, গোপালঘার ও তাহার দ্বাদশ সহচরের প্রতি কিরূপ দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা দেখিলেই আমাদের ক্ষোভ দূর হয়। আমাদের ভরসা আছে ম্যাজিষ্ট্রেট এ মামলার এমন সুবিচার করিবেন যে ভবিষ্যতে কোন সাহেব চা-কর কোন কুলির স্ত্রীকে সহস্র কুলির সম্মুখে উলঙ্গ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেত্রাঘাত করিলেও কুলিরা মিথ্যা মামলা করিবার কি মিথ্যাসাক্ষী দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার ভয়ে মামলা করিবে না, সকল

উঠিবে.—একদিকে চা-কর অন্যদিকে পিনালকোড এই উভয় শাসনের মধ্যে পড়িয়া যখন তাহারা একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে, তখন ভ্রান্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। হাকিমের গৌরব তাঁহার উপার্জ্জনের টাকার উপর নির্ভর করে না, চা-কর বন্ধুগণের সহবাস-সুখে তাহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যপরায়ণ মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য ও মনুষ্যত্বের সহায় স্বরূপ হয়। আসামী লার্ডের সাহেব যদি গোরা না হইয়া এদেশী কোন চা-কর জমীদারের বাগিচার দেশীয় ম্যানেজার হইতেন, তাহা হইলে এই প্রকৃতির মামলার সালকেল্ড কি ভাবে বিচার করিতেন তাহা দেশীয়গণের সহিত তাঁহার ব্যবহারের যাঁহারা পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহারা অত্যন্ত সহজেই অনুভব করিতে পারিবেম। এদেশের এতখানি লবণ প্রতিদিন পরিপাক করিয়া যাঁহারা দেশের লোককে সুবিচারদানে কুণ্ঠিত হন, তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকিলে দেশীয় বিচারপ্রার্থীর অনেক ক্ষোভ দূর হইত; এদেশের ইংরাজ বিচারকগণের অনেকেই গোরা আসামীর দোষ দেখিলে আইনের তীক্ষ্ণ অস্ত্রখানি মুহূর্ত্তমধ্যে ঢালে পরিণত করিয়া তাহা আসামীর মস্তকে ধারণ করেন, ফরিয়াদী বেচারা দূরে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহা দেখে এবং স্ব স্ব বিচারমূঢ়তার জন্য আক্ষেপ করিয়া মরে। এরূপ প্রকৃতির ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া দেশের কোন উপকার নাই, কুপোষ্য পালনের জন্য কতকগুলি টাকা প্রতিমাসে অপব্যয় করিতে হয় মাত্র, পোষ্যেরা সেই টাকায় নবাবী করে ও ভাবে তাহাদের কোন দায়িত্ব নাই।

আসামের কথা শেষ হইল, এখন যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার এক সুবিচার কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। ১লা জানুয়ারী ভারতের প্রতি নগরে, গণ্ডগ্রামে এমন কি ক্ষুদ্র পল্লীতে

অভিনয় কার্য্যে সফলতা সম্পাদনের জন্য স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ চেষ্টার ক্রটী করেন নাই, স্থানে স্থানে নিরীহ নিঃস্ব প্রজার উপরে কিরূপ উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইয়াছে সে সংবাদও সাপ্তাহিক পত্রাদিতে পাঠকরা গিয়াছে। নিঃস্ব অসহায় প্রজার কথা আর তুলিব না, একজন জমীদার এই উৎসব উপলক্ষ্যে যে ভাবে নিগৃহীত হইয়াছেন তাহারই কথা উল্লেখ করিব। এই জমিদার মহাশয়ের নাম বাবু বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ পাঁড়ে, তিনি কেবল জমীদার নহেন, গোরক্ষরপুর মিউনিসিপালিটীর একজন কমিশনর এবং জেলার একজন সম্ভ্রান্ত উকীল; সুতরাং বলা বাহুল্য, সমাজে একজন পদস্থ ভদ্রলোকের যতখানি সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকে—বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ পাঁড়েরও তাহাই আছে।

এই বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ বাবুর প্রতি কিরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহা আমরা নিজের ভাষায় না বলিয়া বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ বাবুর নিজের কথাতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

তিনি বলিতেছেন,—"আমি স্থানীয় করোনেশন দরবার সব-কমিটীর সদস্য মনোনীত হইয়া দরবারে যোগদান করিতে নিমন্ত্রিত হই। দরবারের দিন আনুষ্ঠানিক উৎসবের পর স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা জিমনাষ্টিক, ব্যায়ামকৌশলাদি প্রদর্শিত হইতেছিল। আমি ছাত্রবৃন্দকে মিষ্টান্ন-বিতরণের জন্য ব্যায়ামভূমির নিকটে গমন করি। সেই সময় একজন চৌকীদার আমার এক পৌত্রকে প্রহার করিতেছে দেখিয়া আমি প্রতিবাদ করি, এবং চৌকীদারকে বলি, তুমি আমার নাতিকে মারিয়াছ, আমি তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া তোমায় সাজা দেওয়াইব এবং কার্য্যচ্যুত করাইব। এই সময়ে আর একজন চৌকীদার ও কনষ্টেবল আমার নিকট আসিয়া বলিল, ঐ বালকটী যে আপনার পৌত্র, প্রথমোক্ত চৌকীদার তাহা না জানিয়াই তাহাকে প্রহার করি-

নিবৃত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম; সেই সময়ে সহর কোতোয়াল, নায়েব-কোতোয়াল এবং অনেক চৌকীদার ও কনষ্টেবল আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিল। প্রথমে সহর-কোতোয়াল আমার মস্তকে হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা জোরে আঘাত করিল, আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর কথিত পুলীশ কর্ম্মচারীরা সকলে একযোগে আমাকে লাথি, এবং ছড়ি ও রুলের গুঁতা মারিতে লাগিল। সর্ব্বশুদ্ধ ১০০ জন পুলীশ-প্রহরী তথায় উপস্থিত ছিল।

"আমি একটু ফাঁক পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলার দিকে সবেগে দৌড় দিলাম; কিন্তু বাংলার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র কয়েকজন চৌকীদার ও কনষ্টেবল দৌড়িয়া আসিয়া আমার ঘাড় ধরিয়া বলিল—'ডেপুটী সাহেব তোমাকে ডাকিতেছেন।' আমি বলিলাম, আমি অগ্রে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই কথা জানাইয়া যাইতেছি। কিন্তু পুলীশ কর্ম্মচারীরা আমাকে কিল, ঘুষা মারিয়া ধাক্কা দিতে দিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া গেল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে পুলীশের তত্ত্বাবধানে কয়েদ রাখিতে হুকুম দিলেন। পুলীশের লোকেরা তখন আমাকে গালিগালাজ করিতে লাগিল। আমি ডেপুটী সাহেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম; কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; বরং আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তথায় আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ডেপুটী সাহেবকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন। ডিপুটী সাহেব তাঁহাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—'যদি তোমরা নালিশ করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার কর, তবেই আমি ছাড়িয়া দিতে পারি।' আমার জ্যেষ্ঠ অগত্যা সেইরূপ অঙ্গীকার করায় আমি খালাস পাইলাম। সেই সময়ে আমি লোকের মুখে শুনিলাম, আমি এই অত্যাচারের কথা কালেক্টর সাহেবকে জানাইতে যাইতেছি, পুলীশের মুখে এই কথা শুনিয়াই ডেপুটী সাহেব

তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা ২০০ শত লোক আছ, আর এক জন লোক পালাইয়া যাইতেছে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই! তোমরা পুরুষের বেশ ছাড়িয়া মেয়ে মানুষের পোষাক পর না কেন? যাও—উহাকে ধরিয়া আন।' এই কথায় পুলীশ আমাকে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলার প্রাঙ্গণ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া ডেপুটীর সম্মুখে হাজির করিয়াছিল।

"সে যাহা হউক, আমি অব্যাহতি পাইয়া প্রথমে গৃহে গমন করিলাম, এবং স্থানীয় শিবিল সার্জ্জন ও আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে ডাকাইয়া আমার শরীরের আহত স্থানগুলি দেখাইলাম। তাঁহাদেরই সুচিকিৎসায় আমি এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। ঘটনার পরদিন ২রা জানুয়ারি আমি আমার জ্যেষ্ঠের সহিত কালেক্টর সাহেবের বাংলায় যাইয়া খবর পাঠাইলাম। কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাঁহার আর্দ্দালীর মার্ফৎ বলিয়া পাঠাইলেন, —'আমার সহিত দেখা করিবার আবশ্যক নাই, আদালতে যাইয়া যথা-রীতি নালিশ করগে।' সেই দিবসই অপরাহ্ণে আমার জ্যেষ্ঠ, জনৈক ব্যারিষ্টারের সহিত কালেক্টরের বাসায় নালিশ রুজু করিতে গমন করেন; কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ব্যারিষ্টারকে বলিলেন,—আপনার মক্কেলকে আপোষ-মিট করিবার পরামর্শ দিউন; নতুবা আমি তাহার বিরুদ্ধে, সরকারী কর্ম্মচারীকে মারপিট করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্যপালনে বাধা দিয়াছিল বলিয়া,—নালিশ উপস্থিত করাইব।' তচ্ছ্রবণে ব্যারি-ষ্টার বলিলেন, 'বাদীর ভ্রাতা আপনার বাংলার বাহিরে অপেক্ষা করিতে-ছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে ডাকাইয়া এই কথা বলিলে ভাল হয়।' তখন কালেক্টর সাহেব আমার জ্যেষ্ঠকে ডাকাইয়া বলিলেন,—'অভিযোগ ফিরাইয়া লইয়া বিশেষ বিবেচনার পর নালিশ রুজু করিও; কারণ নালিশ করিলেই তোমার ভ্রাতাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইবে।

হইলে, অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে নালিশ করিও; কিন্তু বেশ জানিও—পরিণামে তাহা আমার এজলাসেই আসিবে।’

“ইহার পর পুলীশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেব আমাকে বিভাগীয় পুলীশ ইন্‌স্পেক্টরের দ্বারায় ডাকাইয়া পাঠান। আমি জ্যেষ্ঠের সহিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাদিগকে আপোষে মিটাইবার পরামর্শ দিয়া বলেন, নালিশ করিলে পুলীশ আপনাদের চির-শত্রু হইয়া থাকিবে। আমি চারি দিবসের মধ্যে জবাব দিবার সময় চাহিয়া চলিয়া আসিলাম। ২।৩ দিন পরে ঐ ইন্‌স্পেক্টর আবার আসিয়া বলিলেন, ‘ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেব আপনাদের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। পরদিন প্রাতে আমার জ্যেষ্ঠ পুনরায় ডিষ্ট্রীক্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ডিষ্ট্রীক্ট সাহেব তাঁহাকে পুনর্ব্বার আপোষ-নিষ্পত্তির উপযোগিতা বুঝাইয়া দেন। আমার জ্যেষ্ঠ বলেন সহর-কোতোয়াল প্রমুখ পুলীশ কর্ম্মচারীরা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সভায় এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি আর নালিশ করিবেন না। ডিষ্ট্রীক্ট সাহেব তাহাতেই রাজি হইলেন। তাহার পর গত ৯ই জানুয়ারি তারিখে সম্ভ্রান্ত সহরবাসীরা স্থানীয় টাউনহলে সমবেত হইলে, সহর-কোতোয়াল, নায়েব-কোতোয়াল এবং চৌকিদার ও কনষ্টেবলগণ আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করায়, আমি তাহাদিগের দোষ মার্জ্জনা করিতে বাধ্য হইলাম।”

অরাজকতার কি শোচনীয় ইতিহাস! জেলার এক জন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক পুলিশ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেন, আর যাহাতে তিনি আইন-সঙ্গত প্রতিকার করিতে না পারেন সে জন্য পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকলে সমান উৎসাহ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর জোর করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা আদায় করা হইল। দেশের সর্ব্বত্রই যদি এই ভাবে ভদ্রলোকের প্রতি অত্যা-

চার করিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার প্রতিকারের পথ রোধ করেন, তাহা হইলে শান্তিরক্ষার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে থাকিবে! কিন্তু এমন ভাবে উৎপীড়িতের নিকট অক্ষম ক্ষমা আদায় করিয়া লাভ কি? ইহার নাম কি মামলা আপষে মিটাইয়া ফেলা? রাজকর্ম্মচারিগণ কি আশা করেন আমরা রঙ্গ মাখিয়া সাজঘরে বসিয়া থাকিব, তাহার পর যখন আমাদের ডাক্ পড়িবে তখন তাঁহাদের পছন্দমত রাজভক্তির অভিনয় করিয়া নেপথ্যে প্রস্থান করিব? এ রকম পেশাদারী রাজভক্তি আমাদের দেশে কোনকালে ছিল না, রাজভক্তির এমন অভিনয়ও আমরা নিষ্ফল মনে করি। রাজার প্রতি আমাদের ভক্তির ত কোন দিনই অভাব নাই, কিন্তু রাজার কর্ম্মচারিগণ যেখানে এমন ব্যবহার করেন সেখানে রাজার প্রতি ভক্তির প্রগাঢ়তা সত্ত্বেও রাজদ্বারের পাহারা-ওয়ালাগুলার সংস্পর্শে যত না আসিতে হয় ততই মঙ্গল বলিয়া ধারণা জন্মে। পুরীর মহাসম্ভ্রান্ত, কোটী কোটী হিন্দুর পরমপূজ্য রাজা হইতে আমাদের নগণ্য কুলি পর্য্যন্ত যখন এক শ্রেণীর বিচারলাভ করিতেছে, তখনও লর্ড কর্জ্জন দিল্লীর দরবারে সগর্ব্বে ঘোষণা করিতেছেন—"রাজার গবর্ণমেণ্ট এই কোটী কোটী লোকের অধিকাংশকেই অরাজকতা ও লুণ্ঠনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে, সর্ব্বসাধারণকে ইহা দুঃখের সময় করুণা বিতরণ করিতেছে, সকলকেই ইহা সমান ন্যায়পরতা, উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ, সভ্যতার সুখ ও শান্তিদানের চেষ্টা করিতেছে।" কিন্তু চেষ্টা কতদূর সফল হইতেছে তাহা জানিলে লর্ড কর্জ্জন সগর্ব্বে এমন তেজোময়ী বাণী বিশ্ববাসিগণের সম্মুখে প্রচার করিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন, অন্ততঃ নিষ্ফল চেষ্টার কাহিনীকে স্থায়িত্ব দানের আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার বাক্য হয়ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভারতে ইংরাজ কর্ম্মচারি-গণের উচ্ছৃঙ্খলতার ইতিহাসও যে তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বড় লাটের

উক্তির অসারতার প্রতিপন্ন করিবে তাহা তিনি কোন দিন চিন্তা করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না।

যদি একবারও তিনি একথা চিন্তা করিতেন, যদি তিনি বুঝিতেন রাজশক্তি হস্তে পাইয়া এ দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ শাসনকর্ত্তৃগণ কি ভাবে তাহার অপব্যবহার করিতেছেন—দেশীয়গণ কি ভাবে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতেছে—নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে—বিজীত বলিয়া তাহাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল সরস বাক্যমাত্রে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছে, তাহা হইলে লর্ড কর্জ্জন রাজকীয় ভোজে স্ফীত-বক্ষে গর্ব্বভরে বলিতেন না যে—

"That a British sovereign should in the fulness of time have been able to do what no predecessor of his ever accomplished, what Alexander never dreamed of, what Akbar never performed, namely, to pacify, unify, and consolidate this great mass into a single homogeneous whole, is, in my judgment, the most impressive phenomenon in history, and the greatest wonder of the modern world." (*Cheers.*)

আর এক দিল্লিপতি।

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান অধিকার সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যাঁহার উৎকট সাধনায় মুসলমান রাজশক্তি এদেশে স্থায়ী হইয়াছিল তাঁহার নাম মহম্মদঘোরি। মহম্মদ দিল্লি জয় করিয়া স্বীয় প্রিয় পাত্র কুতুবউদ্দীনকে শাসনভার অর্পণ করেন। কুতুব প্রথমে একজন ক্রীতদাস ছিলেন, কিন্তু প্রতিভাবলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে দিল্লীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। কুতবউদ্দীনের উত্তরাধিকারিগণ-মধ্যেও প্রথমে দুইজন ক্রীতদাস ছিলেন। এজন্য এই বংশীয় সুলতানগণ দাসরাজা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। দাস-বংশ ধংস প্রাপ্ত হইলে খিলজী ও তোগলকবংশীয়গণ ক্রমান্বয়ে দিল্লিতে আধিপত্য স্থাপন করেন। তোগলকবংশের দ্বিতীয় সম্রাট মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লীর রাজশক্তির প্রবল প্রতাপ ও বিপুল গৌরব খর্ব্ব হইয়া পড়ে। মহম্মদ তোগলক অস্থিরমতি ও কল্পনামত্ত নৃশংস সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মুসলমানের অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার প্রজাপীড়ন ও কুশাসনই দিল্লী-রাজশক্তির অধোগতির মূল কারণ ছিল। মহম্মদকে দিল্লির রাজশক্তির "কালা পাহাড়" রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহম্মদের রাজত্বকালে দুইজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। একের নাম ইবনবতুৎ অপরের নাম সাহাবুদ্দিন। ইঁহারা উভয়েই নিরপেক্ষভাবে মহম্মদের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন।

বহুসংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত ভ্রমণ বৃত্তান্তের নাম মসালিক-উল-আন্‌সার।

মুসলমান ইতিহাসবেত্তৃগণ মহম্মদকে কল্পনামত্ত নৃশংস সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আলোকের পশ্চাতেই ছায়া। ইবনবতুৎ এবং সাহাবুদ্দিন উভয়েই তাঁহার ধর্ম্মশীলতা ও বিদ্যানুরাগেরও প্রশংসা করিয়াছেন। সাহাবুদ্দিন এসম্বন্ধে স্বীয় গ্রন্থের একস্থানে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার সারমর্ম্ম এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। "কোরাণ ও আবুহানিকার শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শী ছিলেন। লিপিকার্য্যে তাঁহার সবিশেষ পটুতা দৃষ্ট হইত। কোরাণানুমোদিত ধর্ম্মের সমুদয় নিয়ম প্রতিপালনে ও ইন্দ্রিয় দমনে তিনি তৎপর ছিলেন। কবিতারচনা, আবৃত্তি ও শ্রবণ তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল। সুলতান কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলোচনা ও প্রতিভাশালা ব্যক্তিগণের সঙ্গে কথোপকথন করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি কবির সঙ্গে পারসীতে বাক্‌যুদ্ধ করিয়া বড় আমোদ পাইতেন। পারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সভা বিদ্বজ্জন পূর্ণ ছিল। ১০০০ কবি, ১২০০ গায়ক ও ১২০০ হাকিম রাজদরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। বিধর্ম্মীর রক্তপাত ইসলাম শাস্ত্রানুমোদিত গৌরবজনক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যুদ্ধক্ষেত্রে বিধর্ম্মীর রক্তপাত করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মহম্মদ অনেক সময় সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতেন।* সুরাপান ইসলাম

---

* এই সকল যুদ্ধে অসংখ্য নরনারী ধৃত হইত। এজন্য প্রত্যহ সহস্র দাসদাসী অল্প মূল্যে বিক্রীত হইত। আট তঙ্কা (এক তঙ্কার মূল্য বর্ত্তমান সময়ের ৪৯৫ গণ্ডা) মূল্যেই গৃহকার্য্যের নিমিত্ত অল্পবয়স্কা ক্রীতদাসী পাওয়া যাইত। গৃহকার্য্যনিপুণা উপপত্নীর মূল্য ১৫ তঙ্কার অধিক ছিল না। আমরা এখানে দিল্লীর কথাই বলিলাম। অন্যান্য সহরে দাসদাসীর মূল্য উহা অপেক্ষাও কম ছিল। কখন কখন ৪ দিরহাম

শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এজন্য ইসলামধর্ম্মানুগত মহম্মদতোগলকের সুরাবিদ্বেষ অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি সুরাপায়ীদিগকে কঠোর দণ্ড বিধান করিতেন। তাঁহার সময়ে কি শৌণ্ডিকালয়ে, কি গৃহে সর্ব্বত্রই সুরা দুর্ল্লভ ছিল। সুলতানের কঠোর শাসনই যে সুরা প্রচলিত না হইবার একমাত্র কারণ ছিল তাহা নহে; ভারতবাসীর মাদক দ্রব্য সেবন বিমুখতা নিবন্ধনও দেশ মধ্যে সুরা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সে কালে ভারতবাসী সংযমাচারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল ছিল; তাহারা একমাত্র তাম্বুল চর্ব্বন করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিত।”

ইবনবতুৎ মহম্মদের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “সুলতান সর্ব্বোপরি উপহার প্রদান ও রক্তপাত করিতে ভাল বাসেন।” সাহাবুদ্দিনও তাঁহাকে দানশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দানশীলতার মূলে ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরপ্রদর্শন করিয়া গৌরব লাভেচ্ছা বিদ্যমান ছিল। মহম্মদের দানশীলতা হৃদয় হইতে স্বাভাবিক শোভায় বাহির হইয়া দুঃখ-ক্লিষ্ট দরিদ্রকে পরিতৃপ্ত করিত না। আমাদের কথার সার্থকতা প্রদর্শন জন্য আমরা সাহাবুদ্দিনের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। “সুলতানের নিজের প্রকাণ্ড শিল্পশালা ছিল। এখানে চারিশত তন্তুবায় রেশমী বস্ত্র বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। রাজদত্ত খেলাতের সর্ব্বপ্রকার উপকরণ এই শিল্পশালায় প্রস্তুত হইত। এখানে নানা প্রকার মূল্যবান পরিচ্ছদের উপকরণ প্রস্তুত হইত। কিন্তু আড়ম্বরপ্রিয় বিলাসপটু সম্রাট তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া চীন, ইরাক ও আলেকজেণ্ড্রিয়া হইতে প্রতিবৎসর বহুমূল্য বস্ত্রাদি আনয়ন করিতেন। তিনি বসন্তকালে একলক্ষ ও শরৎকালে একলক্ষ, প্রতি বৎসর দুইলক্ষ পোষাক বিতরণ করিতেন। বসন্তকালের ব্যবহার-যোগ্য পোষাকগুলি আলেকজেণ্ড্রিয়াজাত বস্ত্র প্রস্তুত হইত। শরৎ-

দেশজাত বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। সুলতান সংসারত্যাগী ধার্ম্মিকদিগের মধ্যেও পোষাক বিতরণ করিতেন।

সুলতান সাচ্চাজরির কাজের জন্য পাঁচশত কারিগর নিযুক্ত রাখিতেন। ইহারা আমীর ও আমীর পত্নীদিগকে উপহার দিবার জন্য সুবর্ণ খচিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত। রাজান্তঃপুরবাসিনীদের ব্যবহার জন্য শাটী প্রস্তুতের ভারও ইহাদের প্রতি অর্পিত ছিল।

সুলতান প্রতি বর্ষে আরবদেশজাত দশ সহস্র অশ্ব এবং অসংখ্য যান বিতরণ করিতেন। এজন্য তিনি সর্ব্বদা উচ্চ মূল্যে বহু সংখ্যক অশ্ব ক্রয় করিতেন। তাঁহার সময়ে অশ্ব দুর্ম্মূল্য ছিল।

সুলতান প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দিনে দুইবার করিয়া দরবার করিতেন। দরবার অন্তে ভোজ হইত। ভোজের সময় ন্যূনাধিক বিশহাজার খান, মালিক, আমীর, সেনাপতি ও কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিতেন। রাজকক্ষে দুইশত ইসলামশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত আহার করিতেন। সুলতান ইহাদের সঙ্গে আহারে বসিয়া নানাবিধ গভীর তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত জন্য প্রত্যহ আড়াই হাজার ষাঁড়, দুই হাজার ভেড়া এবং বহুসংখ্যক পক্ষী নিহত হইত।”

এ পর্য্যন্ত যাহা শুনিয়া আসিলাম তাহাতেই ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে মহম্মদ বিশিষ্ট-সমাজে ধন-গৌরব প্রদর্শন করিয়া “বাহবা” লাভ জন্য অজস্রধারে অর্থ ব্যয় করিতেন; দরিদ্রের অশ্রুজল নিবারণ কল্পে তাঁহার রাজকোষ উন্মুক্ত ছিল না।

মহম্মদ তোগলক যে কেবলমাত্র উপঢৌকন-দান-ব্যাপারেই আড়ম্বর প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে, তাঁহার প্রতি কার্য্যেই এইরূপ আড়ম্বর প্রদর্শিত হইত এবং তাহাতে অজস্রধারে অর্থ নষ্ট হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ

আড়ম্বরের একশেষ করিতেন। শিকারের সময় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ১১০০ লোক সর্ব্বদা রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হইত। সুলতান মৃগয়া উদ্দেশ্যে বিপুল দলবলসহ মহাসমারোহে রাজধানী হইতে বাহির হইতেন, এই সময় তাঁহার সঙ্গে দুইশত হস্তী এবং দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। নানাবিধ পটাবাস ও চন্দ্রাতপ তাঁহার সঙ্গে নীত হইত।

কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন কালেও যথেষ্ট আড়ম্বর করা হইত। এই সময় সুলতানের সঙ্গে দুইশত হস্তী, তিনসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ও একশত ভারবাহী অশ্ব গমন করিত।

সর্ব্ববিষয়েই ঈদৃশ বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রজাশোষণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু অবিশ্রান্ত শোষণে ভারতবাসী অবশেষে রসহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন প্রজাশোষণেও রাজকোষে প্রয়োজনোপযোগী অর্থসঞ্চয় করিতে না পারিয়া মহম্মদ কাগজের মুদ্রা প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হন।* এই সময় রাজসম্ভ্রম নষ্ট হওয়ায় কেহ উহা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং এই রাজব্যবস্থায় দেশের সমগ্র বাণিজ্য বিকল হইয়া পড়ে এবং তাহাতে দেশের ধনসম্পত্তির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া যায়।

আর একটী রাজব্যবস্থায় লোকের উহা অপেক্ষাও অধিক দুর্দ্দশা হইয়াছিল। খেয়ালমত্ত মহম্মদ তোগলক দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহাতে শোভা ও সম্পদের আধার দিল্লীনগরী বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সাহাবুদ্দিনের আগমনকালে দিল্লীর শোভা ও সম্পদ অপ্রতিহত ছিল। সাহাবুদ্দিন দিল্লীর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। "দিল্লী একুশটী

---

* মহম্মদ পারস্য অধিকার জন্য সৈন্যসংগ্রহ ও চীন আক্রমনার্থ সৈন্যপ্রেরণ

নগরীর একত্রীভূত সমষ্টি মাত্র; প্রত্যেক নগরের স্বতন্ত্র নাম আছে, তন্মধ্যে একটীর নাম দিল্লী বলিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নগরগুলিও ঐ নামে পরিচিত। সমগ্র দিল্লীনগরীর পরিধি ২০ ক্রোশ। গৃহসকল প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু ছাদ কাষ্ঠময়। মর্ম্মরপ্রস্তরের ন্যায় এক প্রকার শুভ্রবর্ণ প্রস্তর দ্বারা গৃহচত্বর নির্ম্মিত হয়। দিল্লীতে ত্রিতল গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় না; অধিকাংশ গৃহই দ্বিতল, কোন কোন গৃহ একতল মাত্র। সুলতানের প্রাসাদ ব্যতীত আর কোথায়ও গৃহচত্বর মর্ম্মর প্রস্তর-গ্রথিত নহে। কিন্তু অধুনা যে সকল গৃহ প্রস্তুত হইতেছে তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী স্বতন্ত্র। ইহার তিন দিক উদ্যান শোভিত; পশ্চিম পার্শ্ব পর্ব্বতসংলগ্ন বলিয়া সেদিকে কোন উদ্যান প্রস্তুত হইতে পারে নাই। দিল্লীতে এক সহস্র পাঠশালা ও সত্তরটি সাধারণ চিকিৎসালয় রহিয়াছে। নগর ও উহার উপকণ্ঠের ধর্ম্মমন্দির ও আশ্রমের সংখ্যা দ্বিসহস্র। সুবৃহৎ মঠ, প্রশস্ত বিচরণভূমি এবং অগণিত স্নানাগার সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর অধিবাসিগণ অনতিগভীর কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল কূপ কদাচিৎ সাত হাত অপেক্ষা অধিক গভীর। অধিবাসিগণ বৃহৎ বৃহৎ চৌবাচ্ছায় বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া পান করে। একটী তীর নিক্ষেপ করিলে যতদূরে পতিত হয় ততদূর অন্তর অন্তর এই সকল চৌবাচ্ছা সংস্থাপিত। দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ অভ্রভেদী চূড়ার জন্য বিখ্যাত। তাদৃশ সমুচ্চ চূড়া পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা ছয় শত হস্ত পরিমিত উচ্চ। ভারতবর্ষের নগরসমূহ মধ্যে দিল্লীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

মহম্মদ তোগলকের অমানুষিক অত্যাচারপরম্পরায় প্রজাকুল নিষ্পেশিত হইয়াছিল, দেশের সমগ্র বাণিজ্য বিকল হইয়া পড়িয়াছিল এবং মহানগরী দিল্লী শ্মশানাকার ধারণ করিয়াছিল।

স্বত্ব স্বামিত্ব-বুদ্ধি।

মানবের স্বভাব অতীতের অন্ধকারে বর্ত্তমানের পদচিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করা। ঐতিহাসিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনে অতীত দ্বারায় বর্ত্তমানকে বুঝিবার সেই সহজ মৃদু বাসনা এখন বর্ষাগমে পার্ব্বতীয় ঝরণার মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা যে সমাজ দেখিতেছি, যে আচার, নিয়ম, শিক্ষাপ্রণালী দেখিতেছি তাহারই আদি উৎপত্তি ও তাহারই ক্রমোন্নতির ইতিহাস কি, তাহা অবগত হইবার জন্য অনেকেই উৎসুক। মানবের স্বাভাবিকী অতীত বিষয়ানুসারিণী বৃত্তিই বর্ত্তমান প্রবন্ধেরও কারণ।

এখন সম্পত্তি বলিতে কতকগুলি কথা আমরা বুঝিয়া থাকি। প্রথমতঃ বুঝি সম্পত্তি স্থাবর ও অস্থাবর ভেদে দুই প্রকার। আবার copy right, Patent প্রভৃতির কথা ধরিলে ঐ গুলিকেও এক প্রকার সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। বিধিবদ্ধ রাজনিয়ম দ্বারায় এখন আমাদের সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিরই ভোগ, দান, উত্তরাধিকারী-নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও সংযত। সম্পত্তির উপর আইনের এই সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার সম্প্রসারণ দেখিয়া অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন আইনই সম্পত্তির আদি কারণ। Copy right, পেটেণ্ট প্রভৃতির আদি উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজবিধির কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু সকল সম্পত্তিরই আদি কারণ রাজবিধি নহে। Bentham বলিয়াছেন :—"There is no such thing as natural property, it is entirely the work of Law property and Law are born together and die together. Before Laws were made there was no

বেন্থামের মতে সকল সম্পত্তিরই সৃষ্টির কারণ "ল"। "ল" যখন হয় নাই তখন সম্পত্তি ছিল না। "ল" তুলিয়া লইলেও সম্পত্তি থাকিবে না। এই Law বলিতে বেন্থাম কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহাও একবার দেখা আবশ্যক। বেন্থামের কথায় "If we suppose the least agreement among savages to respect the acquisition of each other, we see the introduction of a principle to which no name can be given but that of law." বেন্থামের মতে পরস্পরের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অতি সামান্য ঐকমত্যও বর্ব্বরদিগের মধ্যে ছিল, যদি এইরূপ মনে করা যায় তবে তাহাকেই "ল" বলিতে হইবে।

সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য বর্ব্বরদিগের মধ্যেও যে সামান্য ঐকমত্য ছিল তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই; কিন্তু এই ঐকমত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা যেন সুসঙ্গত বোধ হয়। আমরা আজ কাল বহু কাজই যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থির করিয়া তৎপর তাহা সম্পাদন করি। সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন নূতন নিয়ম প্রচলন করিতে হইলে এখন আমরা ব্যবস্থাপক সভায় তাহা লইয়া আন্দোলন করিয়া তৎপরে তাহা বিধিবদ্ধ করি। অসভ্য বর্ব্বরেরা পরস্পরের সম্পত্তি রক্ষা করিবার ঐকমত্যে এইরূপ সভা, সমিতি, দরবার করিয়া স্থির করিয়াছিল বোধ হয় না। শিশু যেমন ক্ষুধা পাইলেই স্তন্য পান করে, স্তন্য পান করিলে ক্ষুধা যাইবে কিনা তাহা লইয়া যুক্তিতর্ক করিয়া তারপর স্তন্য পান করে না, তেমনি অসভ্য বর্ব্বরেরাও যুক্তিতর্কদ্বারা নহে, কিন্তু আপনাদের অন্তর্নিহিত অভাব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সম্পত্তির সৃষ্টি ও তৎরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। অবশ্য তখনকার সম্পত্তি ও এখনকার সম্পত্তিতে আকাশ পাতাল তফাৎ। তখন সম্পত্তি বলিতে যাহা বুঝাইত এখন তাহা বুঝায় না, তখন এবং

রাজবিধির প্রচলন হয় নাই, এত বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু তখনও সম্পত্তি ছিল। সম্পত্তি ছিল, কারণ তখনও আদি নিয়ম ছিল। সে নিয়ম, সে বিধি, রাজবিধিরও জন্মদাতা, সে বিধির যদি আজ লোপ হয়, তবে রাজবিধিও লোপ পাইবে, সম্পত্তিও লোপ পাইবে, মানবও লুপ্ত হইবে।

সম্পত্তি বলিতে মানবের সম্পত্তির কথাই হইতেছে। মানবের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার খাদ্যেরও উৎপত্তি হইয়াছিল। খাদ্য কি সম্পত্তি বিশেষ নহে? সর্ব্বপ্রাণীই আহারের স্বত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পশু, পক্ষী, মানব, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে এই স্বত্বের নিয়মবলে চালিত হইয়া আপন আপন সন্তানের আহার যোগায়, সরীসৃপ আপনই খাদ্য অন্বেষণ করে। এই স্বত্ব বিধাতাপ্রদত্ত, এই স্বত্ব হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না। মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার আহার্য্য ছিল না এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয় মানবের উৎপত্তি ও তাহার সম্পত্তির উৎপত্তি, একই সময়ে হইয়াছিল। কেবল: তাহাই নহে মানবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার সম্পত্তির ভাব বিজড়িত, মানব আবার তেমনই সম্পত্তির সহিত বিজড়িত। অসহায় মানব-শিশু নিজেই সম্পত্তি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। মানব-সন্তান সরীসৃপ নহে, জলে রৌদ্রে ডিম্ব হইতে ফুটিয়া বাহির হইবামাত্রই স্বাধীন হইতে পারে না। শিশু, মৎসের মত সাঁতার কাটিতে পারে না, সর্প-শিশুর মত আহার অন্বেষণ করিতে পারে না। তাহাকে মাতৃকোলে, পিতৃ-আশ্রয়ে থাকিয়া বহু দিনে বড় হইতে হয়। নানা পরিশ্রমে বড় করিয়া, শরীরের শোণিত আহারে পুষ্ট করিয়া, আদিযুগে পিতামাতা সন্তানকে সম্পত্তিবিশেষ ভাবিবে আশ্চর্য্য কি? তাহাকে বিক্রয় করিবে, বিনিময় করিবে, কর্ণেলিয়া মাতার মত জহরৎ ভাবিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কোথায়?

এখনও তাহার দৃষ্টান্ত লইয়া বর্ত্তমান আছে। আমাদের দেশের কন্যাদান ও দত্তকপুত্রদান, সেই আদিম যুগের পুত্রকন্যাগণ সম্পত্তি-বিশেষ এই মনোবৃত্তির অস্পষ্ট শেষ নিদর্শন। তাই বলিতেছিলাম মানব জন্মিবামাত্রই তাহার সম্পত্তির উৎপত্তি হয়, এবং মানব আবার সম্পত্তি হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে সম্পত্তি থাকে পরে আবার সেই ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকারী হয়। আদিম যুগের ইহাই বিচিত্রতা।

কেবল পুত্রকন্যাই পুরাকালে সম্পত্তি বিবেচিত হইত না। স্ত্রী, দাস, দাসী সমুদয় পরিবারই পূর্ব্বে পিতা অথবা গৃহকর্ত্তার সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত। ব্যক্তি আগে, কি পরিবার আগে, গাছ আগে কি বীজ আগে জানি না, তবে এইমাত্র বুঝি যে পরিবার না হইলে মানবের উৎপত্তি বিশেষতঃ পরিবর্দ্ধন অসম্ভব। ব্যক্তিবিশেষ পরিবারের মধ্যে জন্মে, পরিবারে বর্দ্ধিত হয় এবং বর্দ্ধিত হইয়াও পরিবারের মধ্যেই থাকে, পরিবার-ত্যাগ করিতে পারে না। জরা-মরণ-ব্যাধি-ভয় ও ভবিষ্যৎচিন্তা, মানবের অন্তরতর হইতে অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত এবং এই কারণেই পরিবার-ত্যাগ তাহার পক্ষে অসম্ভব। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও আপন আপন সত্ত্ব আছে। তবে কচিৎ দুই এক জন যাহাদের এতদুভয়ের কিছুই নাই তাহারা সমাজের পক্ষে মৃত, তাহাদিগকে গণনার মধ্যে না আনিলেও চলিতে পারে।

বলা হইয়াছে যে মানুষ সর্ব্বপ্রথম দুইটি জিনিষকে সম্পত্তি বোধ করে—প্রথমটি খাদ্য, দ্বিতীয়টি পরিবার; তন্মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রীকে। দুইটিই অত্যাবশ্যক। খাদ্য না হইলে আত্মরক্ষা হয় না, স্ত্রী না হইলে বংশরক্ষা হয় না। ক্ষুধা ও সন্তান-উৎপত্তির বাসনা উভয়ই প্রবল, তন্মধ্যে আবার প্রথমটি না হইলে মুহূর্ত্তমাত্রও চলে না, ক্ষুধার শান্তিই পূর্ব্বে চাই। বংশরক্ষার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন হইলেও ক্ষুধার সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। মৃগয়ালব্ধ আমমাংস স্ত্রী আহারেপ

যোগী করিয়া দেয়, সন্তানাদি প্রসব করিয়া স্বামীর সহকারী কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, এইরূপে স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী না হইয়া ক্রমে আজীবন কাল স্থায়ী হইয়া উঠে। বৃদ্ধকালে সন্তানাদি অবলম্বন, সুতরাং আপাততঃ উহাদিগকে বিক্রয় করিলে ভবিষ্যতে অসুবিধা হইতে পারে ইত্যাদি ভাব হইতেই পুত্রগণও সংসারে চিরস্থায়ী হইয়া যায়। মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম যাহা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও বিশেষত্ব তাহাও পারিবারিক এই বন্ধন দৃঢ় করিবার এক প্রধান ও বিশেষ হেতু; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক পণ্ডিতই উহার উল্লেখমাত্র করেন না, অথবা করিলেও উহার উপর যত জোর দেওয়া আবশ্যক তত জোর দেন না; উহা যেন একটা অবান্তর কথা বোধে উপেক্ষা করেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে উহাদিগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। খাদ্যানুসন্ধান ও বংশরক্ষা অতি ইতর প্রাণীও করিয়া থাকে কিন্তু কই তাহাদের মধ্যে মানবের মতন সমাজ বন্ধন কোথায়? মানবের সমাজ বন্ধনের কারণের উল্লেখ করিতে হইলে কেবল আহারেচ্ছা ও বংশরক্ষার বাসনার কথা উল্লেখ করিলেই চলিবে না; মনুষ্যের বিশেষত্ব পূর্ব্বাপর ভাবিবার ক্ষমতায়, স্নেহ, মায়া, দয়া প্রভৃতির অন্তর্নিহিত উৎসে, এবং সর্ব্বোপরি তাহার ভালবাসিয়া আত্মবিসর্জ্জনে। এই উচ্চভাব বিবর্ত্তনবাদীদের কৃপায় আমরা যতই কেন আধুনিক বলিয়া কল্পনা করি না কেন, উহা আজি কালিকার নহে, উহার উৎপত্তি মানবজন্মের সঙ্গে। হইতে পারে, তখন উহা আকরোত্থিত হীরকের মত মলিন ছিল; যাহাই থাকুক তখনও উহা হীরক ভিন্ন অন্য কিছু নহে। নিকৃষ্ট পশুর মধ্যে, পারাবত প্রভৃতি পাখীর মধ্যে, যে আত্মবিসর্জ্জনের স্ফুরণ দেখা যায় তাহাও আদিম মানবের ছিল না উহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?

খাদ্যের জন্যই মানব পশুপক্ষী হনন করে, পশুপক্ষী পোষণ করে,

তাহার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। গো, মেষ, ছাগ পালন করিতে হইলেই তাহাদের আহার আবশ্যক। ভূমিতে যে ঘাস হয় উহাই তাহাদের প্রধান খাদ্য। এইরূপে অস্থাবর হইতে ক্রমে স্থাবর সম্পত্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতে থাকে। লোকসংখ্যা যখন কম ছিল, বিনা দাবীতে যখন ভূমি পড়িয়া থাকিত, তখন লোক পশুর পাল লইয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইত; কোন চিরস্থায়ী গৃহ ছিল না, যখন যেখানে থাকিত সেই স্থানই তখন গৃহ, এবং যেস্থানে পশু চরাইত সেই স্থানই তখন সম্পত্তি। তারপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থান স্থিরীকৃত হইল, ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু তখনও সাধারণের গোচারণের মাঠ বিভক্ত হয় নাই, ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি হইয়া উঠে নাই। মনু-সংহিতায় এইরূপ সর্ব্ব সাধারণের পশুচারণের মাঠের উল্লেখ আছে। যেমন করিয়াই হউক, পূর্ব্বে খাদ্যরূপ অস্থাবর সম্পত্তিমাত্র ছিল, তৎপর বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে, কৃষিকার্য্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, স্থাবর সম্পত্তিরও উদ্ভব হইল।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উৎপত্তির ইতিহাস কতকটা বুঝা গেল। এখন উহার মূল অনুসন্ধান করা যাউক। খাদ্য মানবের আদি সম্পত্তি কেন হইল দেখা যাউক। Black stone বলিয়াছেন :—"সৃষ্টিকর্ত্তার দান বলিয়া পৃথিবী আদিতে মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তৎপর প্রথম ভোগ ব্যবহারের দ্বারায় উক্ত সম্পত্তির উপর কাহারও কাহারও বিশেষ স্বত্ব জন্মিয়াছিল। তখন কেহ কোন দ্রব্য বা স্থান পূর্ব্বে আবিষ্কার করিলে, অন্যের পক্ষে তাহাকে সেই স্থান বা দ্রব্য হইতে চ্যুত করিলে অন্যায় হইত, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে ঐ দ্রব্যের ব্যবহার বা অধিকার পরিত্যাগ করিত অন্য কেহ ইচ্ছা করিলে তখন তাহা ন্যায়তঃ লইতে পারিত।" তবেই কথা হইতেছে যে সকলের পূর্ব্বে অধিকারই সম্পত্তির আদি

স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের দেশের "সম্পত্তি" এই শব্দটির ধাত্বর্থ বুঝিতে গেলেও উহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সম্পদ্ অথবা সম্পত্তি একই অর্থবাচক, সম্+পদ্ ধাতুর অর্থ সম্যকরূপে অবস্থান। অর্থাৎ যাহার উপর সম্যকরূপে অবস্থান করা যায়, যাহার উপর সর্ব্বপ্রকার অধিকার আছে তাহাই সম্পত্তি। পূর্ব্বাধিকার বা সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্বে অবস্থানই উহার মূল। কিন্তু এখানেও কেবল বাহিরটা দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না। একটা প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, মানব পূর্ব্বাধিকারই সম্পত্তির মূল হইতে দিয়াছে কেন? একটা কুকুর যখন রাস্তায় খাদ্য পাইয়া আহার আরম্ভ করে, তখন কি অন্য কুকুর তাহার পূর্ব্বাধিকারের কথা ভাবিয়া উহা কাড়িয়া খাইতে নিবৃত্ত হয়? পূর্ব্বাধিকারের কথা স্মরণ করিয়া হিন্দুরা কি অসভ্যের হাত হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইতে ক্ষান্ত ছিলেন? না ইংরেজেরা বর্ম্মা লইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন? তবেই কেবল প্রথমাধিকারের কথা বলিলেই চলেনা, আরও একটু বাড়াইয়া বলা চাই। সেটুকু কি? না প্রথম অধিকার ও আক্রমণকারীর হাত হইতে কেবল বলের দ্বারা অধিকৃত দ্রব্য বা সম্পত্তির রক্ষার ক্ষমতাই সম্পত্তির উৎপত্তির কারণ। কিন্তু এবারেও কি ঠিক হইল? ইহাতে কি প্রকারান্তরে বলা হইলনা যে যদি কেহ স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে অশক্ত হয় তবে তাহা কাড়িয়া লইতে দোষ নাই? যেন বলা হইল "Might is right", "জোর যার মুল্লুক তার।" কত সম্পত্তি এমনই জোর জবরদস্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে, কত সম্পত্তি নানা মিথ্যা, ছলনা, চাতুরী, চুরি, ডাকাইতিতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু তাইবলিয়া কি বলিতে হইবে চুরি ডাকাইতি সম্পত্তির আদি কারণ? কোন সুস্থচিত্ত ব্যক্তি কি এই প্রবঞ্চনা, মিথ্যাব্যবহারকে নিয়মের ব্যতিক্রম

সম্পত্তির মূল যেমন প্রথমাধিকারে তেমনই তৎকালীন মানসিক অবস্থায়, মানবের সর্ব্ব কার্য্যের মূলীভূত বাসনার অন্তরতম অন্তঃপুরে। কোন দ্রব্য বা স্থান অধিকার করিলেই মানবের ইচ্ছা হয় তাহা নিজে ভোগ করিতে এবং নিজের সন্তানসন্ততি স্বজনবর্গকে উহার ভোগের অধিকারী করিয়া যাইতে। এই উত্তরাধিকারী সন্তান হইতে পারে, বংশ হইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে দেশবাসী সকলে হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে উত্তরাধিকারীতে ধনভোগ করিবে এ ইচ্ছার ব্যতিক্রম হয় না। আদি মানব পরিবারে বাস করিয়া থাকুক, গোষ্ঠিতে বাস করিয়া থাকুক, তাহার সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বিবেচিত হউক, তবুও এ ভাব তাহার হৃদয়ে ছিল বলা যাইতে পারে। সে ভ্রমেও ইচ্ছা করিতনা যে সাধারণ সম্পত্তিতে তাহার যে অংশ আছে তাহা তাহার বংশে বা গোষ্ঠিতে বিতরিত না হইয়া শত্রুমণ্ডলে বিতরিত হউক। ইহার সহিত মানবের স্বাভাবিক ন্যায়পরতা, শান্তিপ্রিয়তা যোগকর, স্বত্ববুদ্ধি সম্পত্তির আদি উৎপত্তির কারণ পাওয়া যাইবে। সম্পত্তি লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ পরবর্ত্তীকালের, আহারের যখন ভাবনা নাই, বাসস্থানের যখন ভাবনা নাই, তখনকার নহে। আদিম বর্ব্বর যতই হিংস্র হউক, হিংসার কারণ উপস্থিত না হইলেও হিংসা করিত এরূপ বলিতে পারি না। মানব যেমনই হউক—চোর হউক, ডাকাইত হউক, সে তাহার সহজ ন্যায়পরতাকে অতিক্রম করিতে পারে না, কাজে করিলেও মনে করিতে পারে না, এবং এই সব কারণেই সে যেমন নিজে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় অধিকারে অধিকারী হইতে চায়, তেমনি অপরকেও উক্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান্ দেখিতে ইচ্ছা করে। পরের স্বত্ব স্বামিত্বে শ্রদ্ধা না থাকিলে, নিজের স্বত্বও টিকিবেনা এই ভয়ও কম নহে। ইতর প্রাণীতেও সম্পত্তির যৎকিঞ্চিৎ ভাব বর্ত্তমান আছে। একটী পাখী যে স্থানে বাসা তৈয়ারী করে সে স্থানে অন্য পাখী বাসা

তৈয়ারী করে না, একের বাসা অপরে জোর জবরদস্তিতে অধিকার করে না, কোকিলের কথা ছাড়িয়া দিলে একে অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে না। পক্ষিজগতে যখন এই অবস্থা তখন আদিম যুগে মানবের অন্ততঃ সম্পত্তি সম্বন্ধে ঐ প্রকার মনোভাব ছিল বলা যাইতে পারে।

সম্পত্তি লইয়া কাটাকাটি, মারামারি, রক্তপাত এই দারুণ জীবন-সংগ্রামের দিনে আরম্ভ হইয়াছে, তাই সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাজ-নিয়মেরও আবশ্যক হইয়াছে, নিয়ম অবহেলা করিলে শাস্তির প্রয়োজনও বাড়িয়াছে। রাজবিধি অধিকৃত সম্পত্তিতে অধিকারীর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ করিয়াছে, পরিশ্রমের ফল পরিশ্রমী পাইবে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছে। এক কথায় বলিতে হয় সম্পত্তির ভোগ, রক্ষণ প্রভৃতি সুরক্ষিত করিয়াছে। এ সকলই মানি, সকলই বুঝি কিন্তু আইনই সম্পত্তির মূল ইহা বুঝিনা বলিয়াই মানি না।

প্রথম আবকারই সম্পত্তির আদি কারণ এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সম্পত্তির উৎপত্তি হয় নাই। সম্পত্তির উৎপত্তি পূর্ব্বেই হইয়াছিল, নিয়ম পরে বাহির হইয়াছে। তবে যদি এই পরের আবিষ্কৃত মূল-সূত্রকে মানবমনের স্বাভাবিক মূলসূত্র, সহজ মূলসূত্র বলা যায় তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। মানব ঐ মূলসূত্র লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়, ঐ বিধির বীজ শৈশবেও মানব-হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে, উহা সর্ব্বপ্রকার নিয়ম, সর্ব্বপ্রকার রাজবিধির মূল। সকল মানব উহার নিকট মস্তক অবনত করে, সকল রাজা উহার নিকট মুকুট ত্যাগ করেন। যেমন বিচারালয়, বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মানব উহার মঙ্গলত্বে বিশ্বাস করে বলিয়া; তেমনি সম্পত্তির সৃষ্টিও হইয়াছে উহার মঙ্গলত্বের বিশ্বাসে, স্বাভাবিক মনোবৃত্তির প্ররোচনায়। আজ সেই স্বাভাবিক মনোবৃত্তির প্রেরণা ভাঙ্গিয়া যাউক, উহার মঙ্গলত্বে অবিশ্বাস হউক,

কেবল নিজের অভ্যন্তরস্থিত অন্তরতম প্রদেশের আপনার বন্ধন। তাই বলিতেছিলাম রাজনিয়ম পূর্ব্বে হয় নাই, মানুষ পূর্ব্বে হইয়াছে, যখনই মানুষ হইয়াছে তখনই তাহার সম্পত্তিরও সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনিয়ম বহু পরের, কিন্তু সেই আদি নিয়মের অভিব্যক্তি, সেই অন্তর্বন্ধনের বহির্বন্ধন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

সিমলাপাহাড়ে নেটিভে-সাহেবে।

রাজপ্রতিনিধির সিমলা গমনের সহিত কেরানীকুল ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারি-পরিবৃত রাজ-কার্য্যালয়সমূহও সিমলা শৈলে দর্শন দিয়া থাকেন। ঐ রাজ কার্য্যালয়ভুক্ত কয়েকটী মাত্র মসীজীবী বঙ্গসন্তানও স্বাস্থ্য-লাভাশায় ভ্রমণেচ্ছুক কতিপয় বাঙ্গালী বাবু ব্যতীত অন্য বাঙ্গালীর মুখদর্শন সেখানে দুর্ল্লভ। কিন্তু পক্ষান্তরে যে কারণ বশতঃই হউক অনেক য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গি দর্শন সুলভ। অবশ্য এ কথা বলিতে হইবে না ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অফিস-ভুক্ত।

সেই স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে ক্রমাগত য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গির পরিভ্রমণ এবং নেটিভের সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাত্র সংঘর্ষণাদি ব্যাপার পরিদর্শন করিলে তথাকার সাহেবের আধিক্য বেশ উপলব্ধি হয়। কলিকাতা ও অন্যস্থানে অনেক য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বাস করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত নেটিভের এত ঘন সাক্ষাৎকার ও সংঘর্ষ ঘটিয়া উঠেনা; কলিকাতায় ট্রামগাড়ি, ইডন্ উদ্যান, গড়ের মাঠ প্রভৃতি

এক প্রকার বিরল দৃশ্য। অনেক স্থলে সাহেব "কোয়াটার" ও নেটিভের বাসস্থান এক অঞ্চলে হয় না, কিন্তু সিমলায় এ পার্থক্যটুকু বিশেষভাবে নাই।

যাঁহারা কলিকাতার একটু আধটু সংবাদ রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা বেশ জানেন যে, এই কলিকাতায় নেটিভের সহিত সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটনা বিরল হইলেও, ঐ বিরল দৃশ্যের মধ্যে কিরূপ নেটিভ পীড়নের অভিনয় হইয়া থাকে। কলিকাতায়ই, যখন নেটিভ অত্যাচারের সংখ্যা অল্প নহে, তখন সিমলার মত স্থানে কিরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। বাস্তবিক সিমলায় বাঙ্গালী নেটিভের প্রতি সাহেবের অত্যাচার অত্যন্তই প্রবল। আমার মতে সিমলা সম্বন্ধে ঐ কথা অপেক্ষা অধিকতর আবশ্যকীয় বক্তব্য বিষয় কিছু থাকিতে পারে না। সেখানকার সাহেবের অত্যাচার-দৃশ্য মনে করিলে এখনও শরীর ক্রোধে ও ক্ষোভে কম্পিত হয়। আমরা যে বিজীত আর তাহারা যে বিজেতৃ এই ভাবটী তথায় প্রতিপদবিক্ষেপের সহিত হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে থাকে।

সিমলার প্রতিপথে সাহেবের মদগর্ব্বপদক্ষেপ যা-ইচ্ছা-তাই-কর্ত্তৃত্ব, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য কর্ম্ম, নেটিভের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অথবা ঘৃণা সূচক দৃষ্টিক্ষেপ এবং কুক্কুর অপেক্ষা হেয়জ্ঞান ও অধম ব্যবহার প্রভৃতি হৃদয়পীড়ক ব্যাপার দর্শন করিলে ভারতবর্ষে ইংরাজের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, ন্যায়শাসনবিমুক্ত রাজ্যলাভজনিত গর্ব্ব কিরূপ তাহা আমাদিগের মজ্জায় মজ্জায়, প্রতি শিরার প্রত্যেক ধমনী-স্রোতে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। বিজীত ও বিজেতৃ ভাব সিমলায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। আর হইবেই না বা কেন? প্রতি পদসঞ্চারণে প্রতি কর্ম্মে, প্রতি ব্যবহারে এমন কি প্রতি দৃষ্টিক্ষেপের সহিত প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ

করিবে; সদাসর্ব্বদা তাহারা এই ভাবটি নেটিভের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবেই, যে তোরা গোলাম আমরা প্রভু; তোরা পশু অপেক্ষা অধম আর আমরা মানব অপেক্ষা উচ্চ; তোদের উপর যে ব্যবহারই করি বিনাপত্তিতে ও নতশিরে তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে! সাহেবের নিকট সামান্য একটা কুকুর যেরূপ স্নেহ ও ভয়ের অধিকারীরূপে নির্ব্বাচিত হয় একজন নেটিভকে সেরূপ ভাবে দেখিতেও তাহারা নিতান্তই নারাজ! কুক্কুরদষ্ট হইবার ভয়ে একজন সাহেব একটা কুক্কুরকে যতটুকু ভয় করে, একজন নেটিভকে ততটুকু ভয়ও করেনা!

এই শতলাঞ্ছনায়, ঘৃণার চিন্তায় ও অবজ্ঞার অভিব্যক্তিতে নেটিভ-প্রাণের গূঢ়স্তরে আঘাত লাগিবে না ত কি। কুক্কুরের ভীত্যুৎপাদিকা বিষাক্ত দন্তনিচয়ের মধ্যে যে ক্ষুদ্র শক্তিটুকু নিহিত আছে, আমাদের নেটিভের মধ্যে কি ততটুকু শক্তিও নাই! সামান্য একটা ক্ষুদ্র সারমেয় যে ভয় ভক্তিটুকু আদায় করিতে পারে আমাদের কি সেটুকু আদায় করিবার ক্ষমতাও নাই! আমরা এত হীন কি নিমিত্ত? আমাদের প্রতি এ ব্যবহার কেন? কে জানে এই লাঞ্ছনায়ই উত্ত্যক্ত হইয়া আমাদের "অন্তরস্থ ব্রহ্ম" একদিন জাগিয়া উঠিবেন না!

সিমলায় সাহেবের অত্যাচারের বিশিষ্ট বিবরণ প্রদান এক প্রকার দুরূহ। তবে যতক্ষণ "ঘরের কোণে" নেটিভ ততক্ষণ একরকম নিশ্চিন্ত, কোন অপমান লাঞ্ছনা বা পীড়নের ভয় নাই, "কোণ" ত্যাগ করিলেই নানা ভয়,—এই কথা বলিলেই বোধ হয় অত্যাচার সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয়। অপরাপর ঘটনা ছাড়িয়া দিয়া মনে করুন আপনিই হয়ত আফিসগমন জন্য বা অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়াছেন; আপনার রাস্তায় পদার্পণের সঙ্গেই হয় অশ্বারোহী সাহেবের সবুট পদরজ আপনাকে অঙ্গে ধারণ করিতে হইবে, কিম্বা সাহেবচালিত

যষ্টির মৃদুমন্দাঘাত ও সৌভাগ্যশালী হইলে "দশ ইঞ্চি প্রস্থ" বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড" শূকরগোমাংসপুষ্ট মুষ্টি আঘাত উপভোগ করিতেই হইবে। কপালগুণে হয়ত সে দিবস আপনার সমস্ত গুলিই জুটিয়া গেল! আপনি প্রাণটুকু হাতে করিয়া গৃহে ফিরিলেন। আমি অনেকবার দেখিয়াছি অশ্বে আরোহণ করিয়া গুটিকতক গৌরাঙ্গ একত্রে আসিতেছেন, আমি এবং পথস্থ অন্য নেটিভ সভয়প্রাণে পথের প্রান্ত-সীমা দিয়া চলিয়াছি, পথ প্রশস্ত হইলেও সেই গৌরাঙ্গ প্রভুরা স্বেচ্ছায় আমাদিগের গাত্রের উপর দিয়া অশ্বচালনা করিয়া গেলেন—কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহাদের পদরজটুকু আমাদের অঙ্গে মাখাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন—কোন নেটিভ হয়ত তাহাতেই আহত হইয়া ধরণীবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই "পপাতধরণীতলে" দৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গ প্রভুগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন—আর পতিত নেটিভ সেই চীৎকারে চমকিত হইয়া বিরসবদনে গাত্রঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অনেকবার দেখিয়াছি, কেবল একজন নেটিভকে বিব্রতকরণ আশয়ে এবং তদ্ভূত আনন্দলাভের জন্য সাহেবেরা কুকুর 'লেলাইয়াছে'; আর কুকুর-তাড়নায় অস্থির হইয়া পলায়নপর নেটিভকে দেখিয়া উচ্চহাস্য করিতেছে। এই তাহাদের ক্রীড়া—একের প্রাণ সঙ্কট অপরের তাহাতে আনন্দ। তাহাদিগের জন্য আমাদের পরিচ্ছদ পরিধানেও স্বাধীনতা নাই। সাহেবের চক্ষে আমাদের পরিচ্ছদ কুশ্রী বলিয়া সিমলার রাস্তায় ধুতিচাদর পরিধান এক প্রকার নিষিদ্ধ।

সিমলার এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া আমার মনোমধ্যে অত্যন্তই ক্ষোভের সঞ্চার হইত এবং সেই অবধি ঐ সাহেবগুলোর উপর কি জানি কেমন একটা বিষম জাতক্রোধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ কেমন স্থির থাকিত

আমার প্রাণের ঐ দুঃখের কথা বলিতাম। তাঁহাদিগের নিকট যেরূপ সহানুভূতি পাইয়াছি তাহা না পাইলে প্রাণের বোঝা লইয়া কি করিতাম জানি না। তাঁহাদেরই সাহায্যে অনেক সময় সিমলার সাহেবদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় সক্ষম হইয়াছিলাম। আমার সুহৃদ্বর্গ ও আমি কখন সাহেবের অত্যাচার নতশিরে গ্রহণ করি নাই—ফল কথায় কিছু গোলযোগ বাধিলেই তাহাদিগের সহিত আমাদিগের হাতা-হাতি না হইয়া মিটিত না। সর্ব্বক্ষণই যে আমরা জয়ী হইতাম এ কথা বলি না, কিন্তু তাহা হইলেও নীরবে যে কখনও অত্যাচার সহ্য করি নাই এবং কখনও যে পশ্চাদ্‌পদ হই নাই এ কথা বেশ স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। এমন কি একটী কথা সসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি যে, অনেক সময় দুই চারিটি সাহেবকে নির্জ্জনে পাইলে বিনাদোষেও বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছি।

সাহেবের সহিত মারামারি করিতে গিয়া অনেক সময় অনেক বিপদেও পড়িয়াছি, কিন্তু সেই একদিনের কথা কখনও ভুলিতে পারিব না। পর্ব্বতবক্ষপথে বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্রোধোন্মত্ত উপরিস্থিত সাহেবমণ্ডলীর উপর্য্যুপরি আমাদিগের উপর প্রস্তরবর্ষণ দেখিয়া সেই দিবস বাস্তবিকই মনে মনে বিপদ গণিয়াছিলাম, প্রতি প্রস্তরক্ষেপণ শব্দের সহিত মনে হইয়াছিল বুঝি ঐ প্রস্তরখণ্ড আসিয়া আমাদের একজনকে সঙ্গের সাথী করিয়া লয়। কিন্তু সুখের বিষয় সেই দিবস সাহেবগণের অর্দ্ধঘণ্টার প্রবল পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইয়াছিল;—আমরা অক্ষতশরীরে গৃহে ফিরিয়াছিলাম। সেই দিবস আমরা কার্য্যকুশলতা, অসীম সহিষ্ণুতা, আত্মরক্ষার উপায়উদ্ভাবন এবং দলপতির আজ্ঞাপালন প্রভৃতি উপায় সাহায্যে অত্যাচারীর বিধিমত প্রতিশোধ লইয়া রণজয়ী ক্ষুদ্র সেনার মত গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের সময় যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় এই সাংসারিক সুখ দুঃখের মধ্যে মিলে না।

সে দিবসের সেই ঘটনা স্মরণ করিলে আজিও হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিয়া যায়।

নানা দিক হইতে বারম্বার সাহেব কর্ত্তৃক নেটিভপীড়নেরই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে কেমন একটি অন্ধ অথচ দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সামান্য অত্যাচারের প্রতিশোধ এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেটিভের মধ্যে একেবারেই নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন না হইলেও সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা যে সাহেবের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, এই ভাবটি আমাদের মন হইতে একেবারে বিলোপ করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা না হইলে এই ভাব যত গভীর বদ্ধমূল হইবে, সেই পরিমাণে সাহেবের অত্যাচার-যাতনা বৃদ্ধি পাইবে, এ কথা স্থির। শ্বেতাঙ্গেরা পুনঃপুনঃ নেটিভ পীড়নে বাধা ও প্রতিফল না পাইয়া তাহাদের এ লালসা-রোগ ক্রমশঃ অগ্নিশিখার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ধর্ম্মাধিকরণে যখন এ বিষয়ের সুমীমাংসা হয় না, এবং হওয়াও সুদূরপরাহত, তখন তাহার নিমিত্ত আমরা বদ্ধপরিকর না হইলে আমাদিগকেই যে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে তাহা কি একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে? আমাদের যে ভ্রান্তধারণা, নেটিভের শক্তি ও বল শ্বেতাঙ্গ-তাড়না সহ্য করিতে যথেষ্ট নহে, আমি তাহার পোষকতা করি না। অবশ্য একজন সাহেব দুই একজন নেটিভের উপর নির্ব্বিঘ্নে বাহুবল পরীক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু নেটিভের মাত্রাধিক্য থাকিলে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না কি? সিমলাস্থ আমার যুবাবন্ধুগণেরই কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার মনে বেশ ধারণা হইয়াছে যে আমাদিগের পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা এবং কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ দিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। আমরা কখন সে ক্ষমতার ব্যবহার করি নাই

একবার বাহু উত্তোলন করিয়া দেখিলেই ত হয়, বল আছে কি না। আমরা সকলেই বলি আমাদের ক্ষমতা নাই, আর ভাবিও তাহাই—আমরা বলবীর্য্যহীন, একবার ত পরীক্ষা করিয়া দেখি না, আমাদের শক্তি সামর্থ্য আছে কি, না! সাহেব কিছু করিলেই, কবে মান্ধাতার আমলে, কে বুঝি সাহেবপ্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল এই কথা আলোচনা করিয়া ক্ষতবিক্ষত শরীরটুকু লইয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠি, কই একবারত ভাবিয়া দেখি না আমাদের ক্ষমতায় সাহেবকে কতদূর শিক্ষা দিতে পারি! আমার জ্ঞানে আমি বেশ জানি সাহেবেরা আমাদেরই মত ভয়প্রবণ; আমরা পরীক্ষা করি নাই তাই বুঝি না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমরা "কিলটী খাইয়া চাপড়টী" মারিতে শিখিলে আমাদের সাহেবাতঙ্ক দূর হইবেই।

সাহেব-পীড়নের জন্য আমরা অন্যোপায় ছাড়িয়া কেবল উচ্চ ক্রন্দনে যে গগণভেদ করিবার সূচনা করিয়াছি, তাহাতে সুফল হইয়াছে কি? না। আমরা স্বয়ংই তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার না দিলে তাহাদিগের চৈতন্য সম্পাদনের সম্ভাবনা নাই, এ কথা স্বতসিদ্ধ। অপর কথা, আমাদের ঐ গগণভেদী চীৎকার আমাদিগেরই যে কত অনিষ্ট সম্পাদন করে, তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখি?—ফিরিঙ্গি বা য়ুরোপীয় কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া আমরা সেই লাঞ্ছনার অভিব্যক্তির জন্য লজ্জা ও সম্ভ্রমের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শতমুখে নিষ্ফল ক্রন্দন করিতে উৎসুক হইয়া উঠি,—সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূরণের চিন্তা হইতে সম্পাদককে বিমুক্ত করি মাত্র! কিন্তু ফলে হয় কি?—অত্যাচারীর অত্যাচার-লালসা নিঃশঙ্কে মিটিবার সুযোগ সম্পন্ন হয়; তাহারা অদূরে থাকিয়া আমাদের ঐ হৃদয়ভেদী ক্রন্দনটাকে একটি মজা ও সখমিটাইবার সামগ্রীরূপে পরিণত করিয়া লয়; পক্ষান্তরে কিন্তু সেইটিই আবার

হৃদয়ের বলটুকু শিথিল ও শক্তিটুকু স্তিমিত প্রায় হইয়া আসে। প্রত্যেক নেটিভ তখন ভয়াকুল হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান বিসর্জ্জন দেয়। বিশ্বাস করিতে যদিনা পারি তথাপি আমাদিগের হাতে এইটুকু ক্ষমতা আছে যে, মিছামিছি সাহেব-ভীতিবর্দ্ধন করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানলোপ করিতে প্রয়াস পাইব না। সিমলা পাহাড়ে আমার প্রত্যক্ষীকৃত কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :—

সিমলার এক দিনের ঘটনায় সাহেবের প্রতি জাতক্রোধ আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ঘটনাটি এই ;—সবেমাত্র সিমলা পাহাড়ে গিয়াছি তখনও সাহেবেরা যে নেটিভের প্রতি সিমলায় কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকে তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতাম না। এক দিন প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে সিমলাস্থ "ম্যাল্" পথ অতিক্রম করিতেছি এমন সময় দেখিলাম আমার গমন-পথের বিপরীত দিকে কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ-সন্তান সারি বাঁধিয়া আসিতেছে। সর্ব্বপ্রথমে আমি তাহাদের লক্ষ্য করি নাই ; পরে হঠাৎ তাহাদিগের উচ্চ কলরব তাহাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দেখিলাম তাহারা সকলেই এক গাছি রজ্জু ধরিয়া মহা উল্লাসে আগমন করিতেছে—কিন্তু সমস্ত পথ প্রস্থ আবদ্ধ রাখিয়াছে—বিপরীত দিক হইতে কাহারো গমনাগমনের সুযোগ নাই। আমি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বিপদে পড়িলাম, কিরূপে তাহাদের অতিক্রম করিব স্থির করিতে পারিলাম না। অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে তাহাদিগকে ইংরাজী ভাষায় "অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যাইতে দিন" এইরূপ বলিলাম। আমার সে কথায় তাহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রজ্জু সমেত তাহারা সকলে আমার গাত্রের উপর আসিয়া পড়িল। সে আঘাতে আমি ধরাশায়ী হইলাম। দেহে রীতিমত আঘাত পাইলাম। আমাকে

শশব্যস্তে ধরাবক্ষ ত্যাগ করিতে না করিতেই, তাহারা আমাকে যেন দেখে নাই, এই ভাবে আমাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। আমি একলা ছিলাম, তাহাদের সংখ্যা অত অধিক দেখিয়া তাহাদিগকে প্রতিফল দিবার সাহস হইল না। কিন্তু মনে ভয়ঙ্কর ক্রোধের উদ্রেক হইল, এই ক্রোধ-প্রণোদিত হইয়াই আমি তাহার পর হইতে সুযোগ পাইলেই নিরপরাধী সাহেব-সন্তানকেও আক্রমণ করিতে পশ্চাদ্পদ্ হইতাম না।

ইহার অল্পদিবস পরেই আমি একদিন সিমলার একটি ক্ষুদ্র রাস্তার প্রবেশ-পথের মুখে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় পশ্চাৎদিক হইতে হঠাৎ দুইজন সাহেব আমাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল। সহসা ধাক্কার আঘাতে আমি পড়িতে পড়িতে রহিয়া যাইলাম। তাহাদের সেই আঘাতে আমি অত্যন্তই কুপিত হইলাম; ধৈর্য্যধারণ করিতে না পরিয়া হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা একজনের স্কন্ধে আঘাত করিলাম। পরক্ষণেই তাহারা দুইজনে আমায় আক্রমণ করিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার যষ্টিটী বেশ স্থূলকায় ছিল—তাহার আঘাত তাহারা বেশিক্ষণ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে "All right" বলিয়া Shakehandএর জন্য হস্ত বাড়াইয়া দিল। আমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া প্রহার স্থগিত রাখিলাম এবং shakehandএর পর আমরা ভিন্নপথে গমন করিলাম। বলিতে কি এই ব্যাপারে সাহেব মারিতে আমার যে একটু আতঙ্ক ছিল তাহা একেবারে বিদূরিত হইল। বরঞ্চ ইহাতে আমার সাহস ও শক্তি যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

নেটিভের প্রতি গৌরাঙ্গের আর একটি ক্ষুদ্র অত্যাচারের কথা এই:—সে বৎসর কলিকাতা বা প্লেগাক্রান্ত অপর স্থান হইতে যাঁহারা সিমলা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই হাঁসপাতালে Health certificate দিবার জন্য প্রত্যহ এক একবার যাইতে হইত। সেস্থানের সাহেব ডাক্তারের অপরাপর দুই একজন সাহেবের মত বোধ হয় "জুতাতঙ্ক" রোগ ছিল। তাঁহার ঘরে জুতা সমেত নেটিভ

প্রত্যেক নেটিভকেই সেই হিমাণীশীতল ঠাণ্ডা প্রদেশে পাদুকা মোচন করিয়া সাহেবের ঘরে দশ পনর মিমিট দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত।

ছোট ছোট বাঙ্গালীর ছেলে কিম্বা অপর নেটিভসন্তান ফুট্‌বল্‌ বা ক্রিকেট ক্রীড়ার জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেই স্থানে খেলা আরম্ভ করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, শ্বেতাঙ্গ-আত্মজেরা, তাহাদের ক্রীড়ার জন্য যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও, সেইস্থলে আসিয়া তাহাদের ক্রীড়াসামগ্রী দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই স্থানকে নিজেদের ক্রীড়াস্থান-রূপে পরিণত করিয়া লয়। নেটিভ-সন্তানের মধ্যে ইহার জন্য যদি কেহ কিছু আপত্তি উত্থাপন করে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই—সমগ্র শ্বেতাঙ্গ-আত্মজদল তাহাদের উপর পড়িয়া বেদম্‌ প্রহার আরম্ভ করিবে, এবং পরিশেষে হয়ত দুই একটি ক্রীড়ার সামগ্রীও জোর করিয়া কাড়িয়া লইবে। এইরূপ স্থানে দুই একজন বাঙ্গালীর ছেলেকে অনেকে মিলিয়া প্রহার করিতেছে দেখিয়া, আমিও আমার কতিপয় বন্ধু তাহাদের রক্ষার জন্য অনেকবার সাহেবাত্মজের সহিত মারামারি করিয়াছি।

বাঙ্গালী বাবুরা অফিসের জন্য যথাসময়ে রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন প্রায়ই দেখিতাম দুই চারিজন সাহেবের ছেলেরা পরামর্শ করিতেছে যে এই গমনশীল কেরানি বাবুর মধ্যে একজনের পৃষ্ঠে পশ্চাদ্‌দিক হইতে একটি মুষ্টি আঘাত করিয়া আসা যাউক। যেমন পরামর্শ তেমনি কাজ—তাহাদের মধ্যে একজন তৎক্ষাৎ দ্রুতপাদক্ষেপে বাঙ্গালী বাবুর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে একটি মুষ্টি আঘাত করিল। বাঙ্গালী বাবু চমকিত হইয়া পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলেন আর অমনি সেই শ্বেতাঙ্গদল সজোরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সিমলায় এইরূপ তাহাদের এক প্রকার আনন্দপ্রদ ক্রীড়া বলিলেও চলে। ইহার উপর সঙ্গে কুকুর থাকিলে নেটিভের দিকে লেলাইয়া দেয়। নেটিভ ভয়াকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ায় তাহা দেখিয়া তাহাদের মহা

সিমলার অধিকাংশ সাহেবই অশ্বারোহণে গমনাগমনাদি কার্য্য চালাইয়া থাকেন। অশ্বারোহী সাহেবের অত্যাচারই অত্যধিক গুরু। নেটিভ পথিক একটু অসাবধান হইয়া চলিলেই অশ্বারোহী সাহেবের শ্যামচাঁদ তাঁহার পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িবেই। এতদ্ভিন্ন সিমলা-পথে সাহেবদের গতিবিধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, সে পথে যে অপর লোকও চলিতে পারে এরূপ জ্ঞান তাহাদের নাই; তাহা না হইলে তাহারা ঐরূপ সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে পথ চলিবে কেন? কাহারো বা গাত্রের উপর দিয়াই ঘোড়া চলিয়াছে, কেহ কেহ বা তদ্দারা আহতও হইতেছে, এইরূপ কেন হয়?

একদিনের এক অশ্বারোহী সাহেবে নৃশংসতার কার্য্য কখনও ভুলিতে পারিব না। পথে আসিতে আসিতে হঠাৎ সেই সাহেবের চাবুক হস্তস্খলিত হইয়া ভূপতিত হয়। ঘটনা ক্রমে ঠিক এই সময় সেই সাহেবের সম্মুখ দিয়া এক জন "পাহাড়ী" গমন করিতেছিল, সাহেবের উচ্চ চীৎকারে সে সেই স্থানে চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সাহেব ক্রোধ কম্পিত স্বরে বারবার তাহাকে চাবুকগাছটি উঠাইয়া দিতে বলিল। সে বেচারা সাহেবের কথা আদৌ বুঝিতে না পারিয়া ভয়কম্পিত-কলেবরে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। সাহেবের ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; সহসা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চাবুকগাছটি গ্রহণ করিয়া সম্মুখস্থিত "পাহাড়ী"কে উপর্য্যুপরি বেশ ঘা কতক কসাইয়া দিয়া অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পাহাড়ীও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গন্তব্যপথে গমন করিল। জানিনা গাত্রবেদনার জন্য কর্ম্মে অবসর লওয়াতে তাহাকে ও তাহার পরিবারস্থ অপর লোককে কতদিন উপবাস করিতে হইয়াছিল।

পদব্রজে সাহেবের সহিত গমনেও সিমলায় নেটিভের নিস্তার নাই। মস্‌মস্‌ শব্দে দ্রুত পদক্ষেপে সাহেব আসিতেছে সম্মুখে কৃষ্ণাঙ্গ পড়িলে আর রক্ষা নাই। সাহেব হইয়া কেমন করিয়াই বা নেটিভের পশ্চাৎ বা পার্শ্ব দিয়া যাইবে? ...

সাহায্যে সরাইতে হইবে! ফলকথা পথ ভ্রমণে সিমলায় নেটিভের এই প্রকার ফলভোগ নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য মাত্র।

সাত আট জনে মিলিয়া আমরা এক দিবস "টানেল" দেখিতে যাই। আমাদের সহিত দুই তিনটি ৭।৮ বৎসরের বালকও ছিল। ঐ বালকেরা সেই থানে যাইলে পর "বল" ছুড়িয়া খেলিতে আরম্ভ করে। হঠাৎ তাহাদের হস্তস্থিত বল একদল শ্বেতাঙ্গ-সন্তানের মধ্যে গিয়া পড়ে। একটি বালক তাহা আনিতে যায়। সেই বালকটি তাহাদের দলমধ্যে যাইবামাত্রই এক জন সাহেব তাহার কর্ণ আকর্ষণ করিতে থাকে। বালকের চিৎকারে আমরা সদলে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওরূপ করিলে কেন?" "বেশ করিয়াছি!" বলিয়া তাহারা হাস্য করিয়া উঠিল। ইহাতে আমাদের সকলকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, আমাদের হস্তস্থিত লগুড় সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়না করি। তাহারা কিয়ৎক্ষণ ঘুঁসি চালাইয়াছিল কিন্তু আমাদিগকে কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারে নাই। অবশেষে কতকগুলি পথিক আমাদের সে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেয়। বলিতে ভুলিয়াছি সাহেবেরা প্রায় দশ জন ছিল। আর একদিন জাকো হিলে কুক্কুর লইয়া একজন সাহেবের সহিত বিবাদ হয়। আমাদের কুক্কুর তাহার কাছে যাইলে সে কুক্কুরকে প্রহার করে। আমরা দুই জন ছিলাম। সেই দিন আমাদের প্রহারে বাস্তবিকই সেই সাহেব তনয় অবশ হইয়া পড়ে। অবশেষে আমরা করুণাবশে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। সাহেবের সহিত মারামারিতে এই টুকু বড়ই বিশেষত্ব দেখিয়াছি যে আমাদের নিকট হারিয়া গেলে কথন পলায়ন না করিয়া শেকহ্যাণ্ড করিয়া প্রহারে বিরত হইতে বলিয়া বিদায় লইয়াছে।

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS

মানী প্রজা।

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

"ইস্তভান বেঙ্কো" নামে "হঙ্গারীয়" মহা এক ধনী,
অঙ্গুষ্ঠে শোভিত তাঁর সুদুর্লভ বৈদূর্য্য মণি ;
দীনজনে করিতেন 'অকাতরে ধনরত্ন দান,
অমন সুদাতা, কেহ দেখে নাই তাঁহার সমান।
এক দিন সে ভূপতি নিজোদ্যানে নৃত্যের উৎসবে
আহ্বান করিলেন অনুগত প্রজাদের সবে।
হীরক মাণিক্য আদি নানা রত্নে হইয়া ভূষিত
অতি জম্‌কাল বেশে হইলেন তথা উপস্থিত।
স্বর্ণমুদ্রা রাশি রাশি রাখিলেন বসনের ভাঁজে,
নৃত্যকালে ঝরে যাতে সেই সব প্রজাদের মাঝে।
আরম্ভ হইল নৃত্য ভূপতিও লাগিলা নাচিতে
খসিতে লাগিল মুদ্রা চারি ধারে বসন হইতে ;
কুড়াতে লাগিল সবে মুদ্রা যাহা হইল স্খলিত,
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব মুদ্রা হল নিঃশেষিত।
যখন হইল শেষ দেখিলেন চাহি' সেই ভূপ
মানী দীন প্রজা এক আছে কোণে দাঁড়াইয়া চুপ্।
আড়া আড়ি বাহু দুটি বক্ষোপরে রাখিয়াছে তুলি',
শুকচঞ্চু বক্র নাসা শুভ্র গুম্ফ পড়িয়াছে ঝুলি' ;
পশ্‌মি আলখাল্লা পরা' আস্তিন্ যাহার সুবিশাল,
—দূর হতে দ্যাখে শুধু, মুদ্রা'পরে নাহিক খেয়াল।
ভূপতি নিকটে গিয়া অভিবাদি' বলিলা তাহায়
তোমারেও দিব কিছু ছিল ইচ্ছা, কিন্তু এবে হায়
আর একটিও মুদ্রা নাহি মোর বসন-অঞ্চলে,
কুড়ালে না কেন তুমি যখন তা' পড়িল ভূতলে ?
উত্তর করিল বৃদ্ধ ঃ "নত হতে হ'ত যে তাহলে" !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

শক্তিসাধন ও তাহার পরিণাম।

শক্তিপূজা প্রস্তাবে শক্তিপূজাসম্বন্ধে সামান্যতঃ যাহা বক্তব্য তাহাই বলা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বর্ত্তমান সভ্যজগতের জাতি সকলের শক্তিপূজা ও তজ্জন্য তৎতৎ জাতির উন্নতি ও অবনতির বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

শক্তি শব্দটী বলের পরিচায়ক, সঙ্ঘর্ষের দ্যোতক, এবং অপরকে দমিত করিয়া প্রবলতার প্রকাশক। সাধারণতঃ আমরা যখন বলি "আমার উঠিবার শক্তি নাই", তখন তদ্দ্বারা ইহাই বুঝায় যে আমি কোন শক্তি দ্বারা পাতিত, আমার শক্তি ও সেই শক্তির পরস্পর সঙ্ঘর্ষ হইতেছে, কিন্তু আমার শক্তি সেই শক্তিকে পরাভূত করিয়া প্রবলা হইতে পারিতেছে না—সুতরাং আমায় বলিতে হইতেছে "আমার উঠিবার শক্তি নাই"। সেইরূপ শক্তিমান পুরুষ বলিলে এই বুঝায় যে সেই পুরুষের শক্তি ও অপর পুরুষের শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তাঁহার শক্তিই প্রবলা থাকে। শক্তি শব্দের এই সাধারণ ভাবার্থ, কিন্তু ইহার আংশিক ভাব দ্যোতক। শক্তি বলিতে কেবল পূর্ব্বোক্ত ভাবই বুঝায় না, আর কিছু বুঝায়।

আর্য্য আচার্য্যগণ সাধারণ লোককে এই শক্তির ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম করিবার জন্য তাহার চিত্র (chart) অঙ্কিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। পাঠক যদি একবার কালীমূর্ত্তির বিষয় ভাবনা করিয়া দেখেন, কি দেখিবেন? মায়ের নয়নদ্বয় রণোন্মাদমদে আঘূর্ণিত, কিন্তু তৃতীয় নয়ন তাহা নয়, তাহাতে অমৃত ধারা ক্ষরিত হইতেছে। মায়ের বামভাগে দুই হস্ত। এক হস্তে করাল রক্তাক্ত কৃপাণ, অপর হস্তে ছিন্ন মুণ্ড। শবশিশুদ্বয় কর্ণভূষণ। কণ্ঠে নরমুণ্ডমালা, কটিদেশে

নরকরবসন। পদতলে পুরুষরূপী মহাদেব শবরূপে পতিত। আবার দক্ষিণদিকে দেখ মায়ের আর এক ভাব। মায়ের দুইহস্ত, একহস্তে বর, এক হস্তে অভয়। ইহা অপেক্ষা বোধ হয় শক্তির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। একাধারে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী শক্তির ত্রিবিধ ভাবের সম্পূর্ণ চিত্র হিন্দুর দেব দেবী মূর্ত্তিতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই ভীষণ ও মধুর ভাবের মিলন, এই প্রশান্ত ও প্রচণ্ড ভাবের সমাবেশ, একাধারে বিপরীত ভাবের এই সম্মিলনই শক্তির প্রকৃত ভাব।

সাধক যদি দুই চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সমগ্রমূর্ত্তি অবলোকন পূর্ব্বক তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার শক্তির সমগ্র ভাব গ্রহণ করা হইল। আর তাহা না করিয়া তিনি যদি দক্ষিণ নেত্র মুদ্রিত করিয়া কেবল উন্মীলিত বাম নেত্রে এই শক্তিচিত্রের দক্ষিণ অংশ এবং তৃতীয় নেত্র মাত্র অবলোকন করেন; অথবা বামনেত্র নিমীলিত করিয়া উন্মুক্ত দক্ষিণ নেত্রে শক্তিমূর্ত্তির কেবল বামভাগ অবলোকন করেন; অথবা বামে বা দক্ষিণে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া কেবল আরক্ত নয়ন, লোল জিহ্বা, নরমুণ্ডমালা এবং নরকরকটিবেষ্টন মাত্র অবলোকন করেন; অথবা ঊর্দ্ধদৃষ্টি না হইয়া যদি কেবল পদতলে পতিত নগ্ন শবপ্রায় শিবকে মাত্র দেখেন; তাহা হইলে আর তাঁহার শক্তির সমগ্রভাব গ্রহণ করা হইল না। তিনি শক্তির এক অংশ মাত্র দেখিলেন, তাঁহার ভগ্না শক্তির আংশিক শক্তির অনুভূতি হইল। তিনি বুঝিলেন না সেই পূর্ণাবয়বা শক্তি কি? সুতরাং তাঁহাতে সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইল না। কেবল বামাংশের অবলম্বনের পরিণাম প্রচণ্ড ভাবের পূর্ণবিকাশ এবং তজ্জন্য স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা অত্যাচারপরায়ণতা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয়। কেবল দক্ষিণাংশের অবলম্বনের ফল সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, ঐহিকে অনাস্থা প্রভৃতি পরমার্থ-

সাধক ও সংসারবিরোধী গুণের প্রাবল্য। কেবল মিলিত ভাবেই সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। পৃথিবীতে যে সকল জাতি কোন মৌলিক ধর্ম্মের অনুসরণ করে তাহার মধ্যে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদীই গণ্য, অপর জাতিরা ইহার কোন এক ধর্ম্মের আংশিক বা বিকৃত ভাব গ্রহণ করিয়া আছে।

খ্রীষ্টানের বাইবেল নামক পুরাণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহুদীরা গডের অতিশয় প্রিয় ছিল। অপর জাতি সকলের মধ্য হইতে ভগবান তাহাদিগকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই আপনার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র করিয়াছিলেন। মিসরে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ ইহুদীগণকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান কি না করিয়াছেন। দাসত্ব-পীড়নে প্রপীড়িত ইহুদীগণের মুশা পর্ব্বতশিখরে মেষ চরাইতে চরাইতে বনমধ্যে অগ্নিরাশি দেখিলেন, বন পুড়িতেছে না অথচ অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সে অগ্নি নহে, ভগবান মুশার নিকট সেইরূপে প্রকটিত হইয়া, তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিলেন, তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। মিসররাজ ইহুদীদাসগণকে ছাড়িতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ভগবদাদেশে মহামারীর উপদ্রবে দেশ ছারখার হইতে লাগিল। পরে মিসররাজ বাধ্য হইয়া ইহুদীদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। মুশা তাহাদের নেতা হইয়া লোহিত সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে মিসররাজ-সৈন্য তাহাদিগকে পুনরায় ধৃত করিবার জন্য পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ভগবদাদেশে লোহিত সমুদ্র ইহুদীদিগকে শুষ্ক পথ দান করিল, ইহুদীরা পার হইয়া গেল, আর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মিসর রাজসৈন্য অতল জলে ডুবিয়া মরিল। ভগবান আলোকস্তম্ভ হইয়া ইহুদীদিগকে রাত্রে পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহাদের আহারের জন্য আকাশ হইতে সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইহুদীগণের পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য পাষাণও

যষ্টিস্পর্শে মধুর বারিধারা উৎসারিত করিয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি ভগবৎশক্তিপ্রকাশক অদ্ভুত গল্প দেখা যায়। কিন্তু সেই ভগবানের প্রিয়, বিশেষ অনুগ্রহভাজন ইহুদী জাতির আজ এত দুরবস্থা কেন? আজ তাহাদের দেশ নাই। গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা তাহাদিগকে শৃগাল কুকুরের মত মনে করে। অপর দেশের রাজগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা বাস করিতেছে। তাহাদের কোন অধিকার নাই, তাহাদের বাক্যের গুরুত্ব নাই, তাহাদের সমাজ ঘোর অর্থলিপ্সাদোষে দূষিত। তাহাদের আপনার কিছুই নাই। তাহারা সর্ব্বদা অপরের কৃপাভিখারী। রাজা মনে করিলেই মহাধনিক ইহুদীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিতে পারেন, তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে দোষ দিবে না, বরঞ্চ অনেকে তাঁহাকে মহাধার্ম্মিক বলিয়া বিশেষ প্রশংসা করিবে। ইহার কারণ কি? আংশিক শক্তিপূজাই এই অধঃপতনের মূল। ইহুদী-নেতা মুশা প্রভৃতির নিকট আত্মাশক্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহার সমগ্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেই আত্মাশক্তির ভীষণাংশ, কঠোরাংশ মাত্র তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা আত্মাশক্তির কোমল বা মধুরাংশ দেখেন নাই। যাঁহারা বাইবেলের ওল্ড টেষ্টমেণ্ট নামক অতিস্থূল পুরাণাংশ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, যে তাহাতে কেবল ভগবৎশক্তির কঠোর ও ভীষণাংশের বিকাশ, মধুরতার নাম গন্ধ মাত্র নাই। তাহাতে যাহা আছে তাহা চিত্তকে আতঙ্কে পূর্ণ করে, ভয়ে অভিভূত করে, ও কুঞ্চিত করিয়া ফেলে। তাহাতে এমন কিছুই নাই যে হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, বা পরমানন্দ রসে মাতাইয়া তুলে। সুতরাং যখন খ্রীষ্ট ইহুদীধর্ম্মের এই খুঁতটুকু বুঝিতে পারিয়া, আত্মাশক্তির দক্ষিণাংশ প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিলেন,

বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন, বাইবেলের ভগবানের দক্ষিণপার্শ্বস্থ ভগবৎপুত্র যখন ভগবানের দক্ষিণভাব বরাভয়, সকলের গোচর করিলেন অন্ধ ইহুদীগণ তাহা বুঝিল না, অথবা বুঝিয়াও বুঝিল না, অথচ এই প্রেমের বার্ত্তা চারিদিকে সাদরে গৃহীত হইতে লাগিল। মূর্খ ইহুদীগণ খ্রীষ্টকে প্রাণে মারিয়া, প্রেমধর্ম্মের বিকাশ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল, আপনারাই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, আপনারাই মহাদুঃখসাগরে মগ্ন হইল, এদিকে মিলিত স্রোত মহাবেগে চারিদিকে ধাবিত হইল। আদ্যাশক্তির এই ভীষণ ও মধুর ভাব মিলিত হইয়া তমসাচ্ছন্ন ইউরোপকে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিল। অসভ্য সভ্য হইয়া উঠিল, বনের পশু মানুষ হইতে লাগিল। চারিদিক আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ঐহিক উন্নতি ঐহিক সুখের উত্তাল তরঙ্গ উঠিল। খ্রীষ্টানগণ, যিশুর মতাবলম্বিগণ ক্রমে ইহুদীধর্ম্মের আদ্যাশক্তির কঠোরতা, নির্ম্মমতা ও ভীষণতা, যিশুর প্রেমের, ক্ষমার, দয়ার ও দাক্ষিণ্যের সহিত মিলাইয়া লইল। যদি তাহারা কেবল যিশুর প্রেমের ধর্ম্মের অনুসরণ করিত, ডান গালে চড় মারিলে বাম গাল ফিরাইয়া দিত, তাহা হইলে জগতে আজ কেহ খ্রীষ্টান জাতির এত অভ্যুদয়, এত উন্নতি, দেখিতে পাইতেন না। তাহা হইলে এই প্রেমের ধর্ম্ম ক্রমে নেড়ানেড়ীর দলে পরিণত হইয়া সমাজের ঘোর অধঃপতনের কারণ হইত। কিন্তু এখনও একটী মহা খুঁত আছে। যদি কোন মহাপুরুষ সেই খুঁতটুকু শুধরাইয়া না দেন, আর খ্রীষ্টানজগৎ তাহা বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য না করেন, তাহা হইলে এই খুঁতটীই ইঁহাদের অধঃপতন সাধন করিবে। সে খুঁত এই। এখনও খ্রীষ্টানদের মধ্যে দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচারের প্রাবল্যই অধিক, এখনও খ্রীষ্টানজগতের দৃষ্টি

অপেক্ষা ভীষণভাবের প্রাবল্যই বিশেষ লক্ষিত হয়। এখনও ঐহিকে থাকিয়াও পারমার্থিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। এখনও স্বার্থপূজার মহা-সমারোহ চলিয়াছে। এখনও গুলি মারিয়া লোককে আহত করিয়া পুনশ্চ প্রলেপ দ্বারা ধীরে ধীরে ক্ষতস্থান আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা, দুর্ব্বল করিয়া অল্প অল্প আহার দানের ব্যবস্থা, সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক কুটীর নির্ম্মাণে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এ ব্যাপার অধিক দিন চলিতে পারে না। স্বার্থ এমনি জিনিস যে ইহাকে পরার্থের সাধক করা অতিশয় কঠিন। পরার্থ বিদলিত করিয়া স্বার্থের পুষ্টিসাধন শক্তিপূজার একটী মহা হেয় প্রথা—বামাচারের আতিশয্য। শাস্ত্রকার অসুরজীবনে তাহাই দেখাইয়াছেন, এবং অসুরনাশন এই হেয় শক্তিপূজার শোচনীয় পরিণাম। তাই বলিতেছিলাম বর্ত্তমান খ্রীষ্টানের শক্তিপূজা আসুরিক। ইহাতে সামঞ্জস্যের অবতারণা না হইলে ইহা অধিক দিন থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা যে হইবে তাহা আশা করা যায় না। কারণ সামঞ্জস্য-বাদী আমেরিকারও পদস্খলন হইতে চলিয়াছে। সুতরাং যাহারা জয়োল্লাসে উন্মত্ত, ঐহিক সমৃদ্ধিতরঙ্গে দোলায়মান তাহাদের যে সামঞ্জস্য আসিবে তাহা এক প্রকার দুরাশার বিষয়। ডাকাতও শক্তিপূজা করে, সে কিন্তু ঘোর আসুরিক ভাবে। সেও ধনীর ধন লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্রের সাহায্য করে। বলবানের পীড়ন করিয়া দুর্ব্বলের সাহায্য করে। তথাপি তাহার পতন হয়, কেন না তাহার পূজা আসুরিক। থ্রেসের প্রসিদ্ধ ডাকাত, আপনার সহিত মহাবীর অলেকজাণ্ডারের তুলনা করিয়া বীরহৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। অপূর্ব্বমানব মহাবীর নেপোলিয়ান আসুরিক ভাবে শক্তির উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়াই উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া একেবারে অধঃপতিত হইলেন।

মুসলমানধর্ম্ম ইহুদীয় ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। আরবের মরুবাসী, কঠোর অথচ কবিতাপ্রবণ নরগণের উপযোগী করিতে গিয়া মহম্মদকে ইহুদীধর্ম্মের কঠোরতাকে কঠোরতর, ভীষণকে ভীষণতর, নির্ম্মমতাকে নির্ম্মমতর করিতে হইয়াছিল। দুই চার পোঁচ অধিক রং লাগাইয়া মরুবাসিগণের হৃদয়গ্রাহী করিতে হইয়াছিল! ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিতে হইয়াছিল। ইহুদীধর্ম্মের যে একটু আধটু সরস ভাব ছিল তাহার স্থানে মরুবাসী, নিরবলম্বনে ভাসমান, উচ্ছৃঙ্খল আরববাসীর মনোগ্রাহী কঠোরমধুর ভাবের অবতারণা করিতে হইয়াছিল, স্বার্থকে এতই প্রবল করিতে হইয়াছিল যে, শক্তিস্বরূপিনী রমণীগণকে বিলাসের উপাদান মাত্রে পরিণত করিতে হইয়াছিল। কাফেরনাশকে কাফেরের প্রতি অত্যাচারকে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত এবং স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত করিতে হইয়াছিল। বামাচারের মহাঘোরভাব উত্তাল আসুরিক স্বার্থতরঙ্গ উত্থিত হইল। চন্দ্রকলালঙ্কৃত মুসলমানপতাকা ধূমকেতুর ন্যায় চারিদিকে ধাবিত হইল। সমৃদ্ধিশালী দেশ নগর ছারখার হইতে লাগিল। এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কোরাণ ধরিয়া মুসলমানগণ সবলে আপনাদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। মেদিনী প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আসুরিক শক্তিসাধন স্থায়ী হয় না। তাই মুসলমান হেঁটমুণ্ডে পতিত হইয়াছে! ভগ্নপদ বিধ্বস্ত ভীষণ শার্দ্দূলের ন্যায় পড়িয়া আছে। উঠিবার শক্তি নাই। উঠিবার আশাও নাই। মধুরতা সন্নিবেশের প্রয়াসে সুফীর মধুর নিনাদ উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন মাত্র। দুই পাঁচ জনে শুনিয়া হাসিল কাঁদিল—এইখানেই তাহার পরিসমাপ্তি হইল।

ভারতবাসী চিরকালই শক্তিপূজক। তবে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের আজ এ দুর্দ্দশা কেন? ভীষ্ম, ভীমার্জ্জুন, লক্ষ্মণ, অভিমন্যুর দেশ আজ শত শত বৎসর বিদেশীয়ের

কেন? স্বদেশের হিতার্থে ধৃতব্রত প্রতাপের সাধের রাজপুতানা আজ বিদেশীয়ের পাদুকা মস্তকে বহন করিতেছে কেন? ভারতের এ দুর্দ্দশা কেন? কোন্ রন্ধ্র অবলম্বন করিয়া মুসলমান ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়া ভারতবাসীর দুর্গতির একশেষ করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিল? কেনই বা মারহাট্টারা মস্তক উত্তোলন করিয়াই পড়িয়া গেল? মহাবীর রঞ্জিতের পাঞ্জাব কেনই বা ব্রীটিস্ পদানত হইল? ভারতের শক্তিপূজার কি শেষ এই শোচনীয় পরিণাম হইল! একদিন যে শক্তিপূজার প্রভাবে সাধকে পূর্ণ শক্তির আবির্ভাব হইত, শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ থাকিত না এবং সেই মহীয়সী শক্তির সম্মুখে ক্ষুদ্রা-শক্তি সমূহ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িত, আজ সেইখানে একেবারেই শক্তির অভাব। ভারতে যেদিন হইতে ক্ষত্রিয়গণ মহাশক্তির বাম অংশের অধিকার করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাংশের অধিকার দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই এই ভাগাভাগিতে সমষ্টিভাবে ব্যষ্টিভাবের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতে দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছে। এই দলাদলি এক সাঙ্ঘাতিক রোগে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ বহুকাল যাবৎ ক্ষত্রিয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই ব্যষ্টিকরণের গতিরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কতদিন চলে? একচেটিয়াভাব আসিয়া জুটিল। উভয়ে উভয়ের অধিকার মহাযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের অধিকারের উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একে যাহাতে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে তাহার ব্যবস্থা হইল। ব্রাহ্মণগণ বিচারমার্গে অগ্রসর হইয়া মহাশক্তির ব্রহ্মভাবে পৌছিলেন। জগৎ তাঁহাদের নিকট মিথ্যা প্রতীয়মান হইল। ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের জ্ঞানোৎসের কণিকা সমাজে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐহিকে অনাস্থা পরমার্থে

আস্থা, সংসারের তুচ্ছতা ও অসারতা, বিষয় সমূহের বিষবত্তা ক্রমে সমাজের স্তরে স্তরে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। লোকের মনে ধারণা হইতে লাগিল, দুইদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়া হাঙ্গামা ফ্যাসাদে প্রয়োজন কি? এরূপ বিভীষিকাপূর্ণ স্থানে যাহাতে আর না আসিতে হয় তাহারই উপায় করা যাউক। তাহার পর অহিংসা পরমো-ধর্ম্মরূপ বৌদ্ধগণের ধর্ম্মের ধুয়া উঠিয়া লোককে নির্বীর্য্য করিল; এবং কর্ম্মফলবাদ উপস্থিত হইয়া লোককে একেবারে প্রারব্ধবাদী ও অদৃষ্টবাদী করিয়া তুলিল। ভগবান বশিষ্ঠ যোগাবাশিষ্ঠে এই অদৃষ্টবাদ খণ্ডন করিয়া পুরুষত্বের মহত্ব স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তি জ্ঞানীর জন্য। সাধারণের মনে অদৃষ্টবাদ ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। আর এক দিকে বুজরুকীর স্রোত ছুটিল। সিদ্ধাইয়ের জন্য ছুটাছুটি হুটোপাটি আরম্ভ হইল। সাধারণ লোকে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এইখানেই দেশের ঐহিক অবনতির মূল ভিত্তি স্থাপিত হইল।

এই ভাগাভাগির এই দলাদলির আর এক বিষময় ফল এই হইল যে যোদ্ধৃকুল আপনাদের অধিকারের উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইয়া কেবল বামাচারী সুতরাং ঘোর স্বার্থপর হইয়া উঠিতে লাগিল। একদেশে দুইজন নেপোলিয়ন, বা দুইজন সিজারের স্থান হইতে পারে না। স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, অত্যাচার ও পরপীড়ন মধুরতা দ্বারা অসংযমিত শক্তি বা ক্ষমতার অবশ্যম্ভাবী ফল। তাহার মাত্রা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে গৃহকলহ উপস্থিত হইল। এই রন্ধ্র অবলম্বন করিয়াই গৃহে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়াও একাধারে সম্পূর্ণ শক্তির সাধন করিয়া অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলের কতবার নিগ্রহ করিলেন। গৃহকলহের বিষময় ফলে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভারত

অনর্থকারী অত্যাচারের প্রশমন করিয়া সামঞ্জস্য করিবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণ।

ভগবান গীতাচ্ছলে নিষ্কাম হইয়া শক্তিসাধনের উপদেশ দিয়াছেন। অবসন্ন "ন যোৎস্যে" ইতিভাষী অর্জ্জুনকে অকাট্য যুক্তি দিয়া রণে প্রবৃত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অধ্যাত্ম জ্ঞানের চরম উপদেশ দিয়া "নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচিন্" বলিয়া পুরুষকারকে দূরে রাখিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই ইংরাজেরা গীতাকে That grand Sublime of Pantheistic fatalism বলে।

এই ভাগাভাগির বিষময় পরিণামে দেশ ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়া পড়িল, দেশের বল নষ্ট হইয়া গেল। কেবল ক্ষত্রিয়ত্বের বিকৃতভাব মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই রন্ধ্র দিয়াই সর্ব্বনাশস্রোত ভারতে প্রবেশ করিল। এ দিকে সাধারণ লোকে মহা গোলযোগ দেখিয়া শক্তিসাধন করা দূরে থাকুক, প্রত্যবায় ভয়ে গুরু পুরোহিতকে ওকালৎনামা দিয়া আপনারা শক্তিসাধন হইতে দূরে থাকিতে লাগিল সুতরাং তাহাদের দায়িত্ব কমিয়া গেল এবং স্বার্থপরতা বাড়িতে লাগিল। তাহার উপর বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবধর্ম্ম দেশের পুরুষকারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে লগিল। বৈষ্ণবগণ ভগবানের ভূভারহরণ, অসুরনিধন ছাড়িয়া দিয়া কেবল তাঁহার মধুর ভাবের লীলা লইয়া ব্যস্ত হইল। অর্থাৎ তাহারা অর্দ্ধ ভগবান লইয়া মত্ত হইল। প্রকৃত ও বাহ্যিক বৈরাগ্যে, সন্ন্যাসে, ও নিষ্কর্ম্মে দেশ ছাইয়া গেল, ঐহিক উন্নতি সাধারণ ভাব ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বুজরুগী ও গোঁড়ামীর স্রোতও ছুটিল। ক্রমে বৈষ্ণবগণ কাটা বলাও পাপ মনে করিয়া বানান বলিতে লাগিল। দেশের যে তেজ যে বিক্রম, যে পুরুষত্ব ছিল তাহারও মূলে কুঠারাঘাত হইল। তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম আচণ্ডালকে শক্তি

তাহাতে পুরুষক্রমানুগত কোন প্রথারই যাহাতে বিপর্য্যয় না ঘটে তাহার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। এখানেও ভাগা-ভাগি হইল। দক্ষিণাচারী ও বামাচারী দুই দল হইয়া পড়িল, সুতরাং মধুরভাবের প্রবল স্রোতের নিকট প্রত্যাহত হইয়া তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল না। সেই শোচনীয় ভাগাভাগির দোষেই এই তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মেরও অধঃপতন হইয়া পড়িল। তবে আর দেশের ঐহিক উন্নতি কিরূপে হইবে? কিরূপে আর পরপদবিদলিত জন্মভূমি মস্তক তুলিবেন। পূর্ণাশক্তির একাধারে সাধন না হইলে এ কার্য্য হইবার নহে। ব্রাহ্মণ-তনয় রাবণ একাধারে পূর্ণাশক্তির সমাবেশ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ত্রিজগতে অজেয় হইয়াছিলেন। যেমনি সামঞ্জস্যের স্খলন হইল অমনি পতন। বংশে বাতি দিতে কেহ রহিল না। এই সামঞ্জস্য ভিন্ন পতিতের পুনরুত্থানের আশা সুদূরপরাহত। বক্তৃতায় কিছু হইবে না; কারণ বিজেতারা শক্তিসাধক, তাঁহারা শক্তির অভাব বেশ অনুভব করিতে পারেন, আর অনুভব করিতে পারেন বলিয়া লম্ফঝম্প দেখিয়া কেবল মুখ বাঁকাইয়া হাস্য করেন। যে দিন শক্তির বিকাশের অনুভূতি হইবে সেই দিন বিজেতাদের আর এক মূর্ত্তি দেখিবেন। ভারতকে জাগ্রত করিতে হইলে শক্তির, পূর্ণাশক্তির সামঞ্জস্য বিশিষ্টা মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। অর্দ্ধ ছাড়িয়া পূর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে। উপাদানের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না, সকলই প্রস্তুত, নাই কেবল পাত্র। তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মই কলির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ উন্নতির ব্যবস্থা আছে। বিবাদ করিয়া সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা আছে। হরপার্ব্বতী জগৎপিতা ও জগন্মাতা সমাসীন। ব্রাহ্মণও যেমন তাঁহাদের পুত্র, শূদ্রও তাহাই, ব্রাহ্মণীও

জননী সর্ব্বদাই চিন্তিতা। তাই মাতা, পিতাকে অনবরত সন্তানের মঙ্গলোপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর পিতা তাহার উত্তর দিতেছেন। বাবার বা মায়ের দোহাই দিলে অনেক সময় কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাই দুষ্টছেলেরা আপনাপন অভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে পিতার কথা বলিয়া "শিব উবাচ" বলিয়া আপনাদের কত কথাই চালাইয়া দিয়াছে। ভাগাভাগি দলাদলি, চালাইয়াছে, যেখানে সন্তানগণের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না, সেখানে প্রভেদ করাইয়াছে।

তন্ত্র বেদসম্মত জাতিভেদের কোন প্রতিবাদ করেন নাই, কিন্তু তাহার দূষনীয় অংশের অপসারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বেদবিহিত আচারপদ্ধতি ও তদুপরি স্থাপিত জাতীয়ত্বকে অটুট রাখিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মে শূদ্র ও স্ত্রীগণের প্রণব উচ্চারণের অধিকার নাই। তন্ত্র তাহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না, সকলের জন্য দেবীপ্রণব দেখাইয়া দিলেন। বৈদিক ধর্ম্মে স্ত্রীশূদ্রের গায়ত্রী বা সন্ধ্যায় অধিকার নাই। তন্ত্র কোন প্রতিবাদ করিলেন না, তান্ত্রিকী গায়ত্রী, তান্ত্রিকী সন্ধ্যা দেখাইয়া দিলেন, সকলেরই তাহাতে অধিকার। বৈদিক ধর্ম্মে স্ত্রীশূদ্রের হবনাদিতে, যজ্ঞকরণাদিতে বা সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তন্ত্র তাহার কোন প্রতিবাদ করেন না, সাধকমাত্রের জন্যই হবন ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ও সন্ন্যাসে অধিকার দিয়াছেন। যাহা বহুকালসাধ্য, বহু-আয়াস সাধ্য, বহুব্যয়সাধ্য ছিল, তাহা অতিশয় সুলভ করিয়া অল্পায়ু লোকের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। একদিন তন্ত্রের বিষয় বলিতে বলিতে শ্রীগুরু বলিয়াছিলেন,—একটী পর্ব্বতপ্রমাণ বৃহৎ দ্বারশূন্য অট্টালিকা, তাহার মধ্যে এক অমূল্য রত্ন নিহিত, সকলেই তাহা জানে, এবং তাহা পাইবার জন্য কতশত লোক পথান্বেষণ করিতেছে, কেহ চারিদিকে ঘুরিতেছে, কেহ উপরে উঠিতেছে, উঠিতে উঠিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, কেহ বা নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু কোন কোন লোক আসিয়াই সেই দ্বারশূন্য প্রাচীর স্পর্শ করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল, এবং সে অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিল। অপরের কাছে যে প্রাচীর সেই প্রাচীর। ইহারই নাম তন্ত্রমার্গ। এই open sesame, এই দ্বারোন্মোচন মন্ত্র তন্ত্রে আছে। বৈদিক ধর্ম্মে ভাগাভাগির জন্য দলাদলির জন্য দ্বিজাতি ভিন্ন অপরে যে সকল অধিকারে বঞ্চিত, তন্ত্র সকলকে সে অধিকার দিয়াছেন। তন্ত্রের ভিত্তি বেদ, তাই ভারতে ইহার প্রচার হইয়াছে। তবে ইহাতে সমস্তই সাঙ্কেতিক। কিন্তু এই মহারত্নও পঙ্কে পতিত। দলাদলি ও ভাগাভাগির হাতে পড়িয়া ইহারও দুর্গতি হইয়াছে। পশ্বাচার নামে ইহার নিস্তেজভাব এখনও দেশে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ইহার সতেজভাব একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যদি কোন সুপাত্র এই মহারত্নকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া, দলাদলি মিটাইয়া স্বরূপভাবে ইহাকে খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে যুগপ্রলয় উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

স্কুলের বাবু।

আমি গভর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগের অবসর প্রাপ্ত পেন্সনভোগী কর্ম্মচারী। অনেক দিন শিক্ষকতা করিয়া অবশেষে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সার রিচার্ড টেম্পেল সাহেবের আমোলে স্কুলের বাবু হই। আমি পূর্ব্বে নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলাম, তারপর যখন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ছোট লাট টেম্পেল সাহেবের আদেশে নর্ম্মাল স্কুল সমূহ উঠিয়া গেল; কেবল ঢাকা, কটক, কলিকাতা, হুগলি, বহরমপুর ইত্যাদি

স্কুলের বাবু হইলাম। শিক্ষা বিভাগের যে সকল কর্ম্মচারী বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে পল্লীগ্রামের লোকে সাধারণতঃ স্কুলের বাবু বলে। স্কুলের বাবুর জীবন বৈচিত্র্যময়; আজ তাই আমার সেই বৈচিত্র্যময় জীবনের ২।১ টা দৃশ্য পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। অনেক দিনের কথা, আমার স্মৃতিও ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, যত টুকু মনে আছে তাহাই উপহার স্বরূপ আমি "ভারতী" পাঠকগণের জন্য পাঠাইলাম।

চিরদিন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া এক স্থানে স্থায়ী হইয়া স্কুল মাষ্টারী করিতে ছিলাম, হঠাৎ সম্বাদ পাইলাম আমাদের স্কুল সমূহ উঠিয়া গেল, আমাদিগকে পরিদর্শক হইতে হইবে। এক স্থানে স্থায়ী না হইয়া প্রত্যহ বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে; সুতরাং স্ত্রী-পুত্রগণকে দেশে পাঠাইতে হইল।

পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া এণ্ট্রেন্স স্কুল পর্য্যন্ত আমাদিগকে দেখিতে হইত। প্রথম প্রথম এই স্কুলের বাবুগিরিতে যে কি কষ্ট হইত তাহা আর বলিবার নহে। সরকার হইতে আমরা এক একটা ফর্দ্দ পাইয়াছিলাম যে আমার অধীনে কয়টা এণ্ট্রান্স স্কুল, কয়টা মধ্য-ইংরাজী ও মধ্যবঙ্গ স্কুল ও কতগুলি উচ্চ প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা আছে। স্কুলগুলির জন্য বড় কষ্ট পাইতে হয় নাই, পাঠশালা-গুলি প্রায় ফর্দ্দের সহিত মিলিত না। পাঠশালাগুলি কবে জন্ম গ্রহণ করে ও কবে লোপ পায় তাহার স্থিরতা নাই। ফর্দ্দ দেখিয়া, আমার হেড কোয়ার্টার বা বাসাতে তালাচাবি বন্ধ করিয়া ভৃত্য ও পাচক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে প্রাতে পাঠশালা পরিদর্শন করিতে বাহির হইলাম। বেলা নয়টা বা দশটার সময় তিন ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া ফর্দ্দ লিখিত গ্রামে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে গ্রামে একটা পাঠশালা ছিল বটে, তা প্রায় ১ মাস হইল সেটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, যদি গ্রামস্থ কোনও ভদ্রলোক অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিলেন ত ভাল, নচেৎ কোনও একটা দোকানে গিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিলাম। এমন অনেক গ্রামে গিয়া পড়িয়াছি যেখানে হিন্দুর বাস নাই, কেবল মুসলমানের বাস, তাহাও আবার অতি দরিদ্র। গ্রামে এক খানিও দোকান নাই, গ্রামবাসীরা হাটবারে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী হাট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনে। বেলা ১০টা ১১টা বা দ্বিপ্রহরের সময় সেই সকল গ্রামে গিয়া তৃষ্ণায় জল পর্য্যন্ত পাই নাই। যে গ্রামে স্কুল পাঠশালা নাই সে গ্রামে আমাদের যাওয়াই বৃথা হইত, কারণ বৎসরের শেষে ইন্সপেক্টরের আফিষ হইতে একটা করিয়া হিসাব বাহির হইত, তাহাতে কোন্ স্কুলের বাবু কতগুলা স্কুল পাঠশালা দেখিয়াছেন তাহার একটা তালিকা বাহির হইত; যিনি যত অধিক দিন হেড কোয়ার্টার ছাড়িয়া মফঃস্বলে থাকিতেন এবং যত অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় দেখিতেন তিনি তত প্রসংশিত হইতেন। গভর্ণমেণ্টের হুকুম ছিল প্রত্যেক স্কুল পাঠশালা অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়াও দেখিতে হইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া অজ্ঞাত গ্রামে পাঠ-শালার সন্ধানে ফিরিতে হইতে। তবে অধিকাংশ গ্রামে গিয়া সন্ধান পাইতাম যে নিকটস্থ কোন্ গ্রামে পাঠশালা আছে। এই প্রকার ২।৩ বৎসরের পর তবে আমার অধীনস্থ গ্রাম সমূহের বিষয় এক প্রকার আয়ত্ত হইল।

পথের কষ্ট অবর্ণনীয়। পল্লীগ্রামের অধিক স্থলেই কোনও পথ নাই, এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে মাঠের উপর আল পথ দিয়া যাইতে হইত। বর্ষাকালে অনেক মাঠ ডুবিয়া যায়, আল পথের চিহ্নমাত্রও থাকেনা—কেবল তাল, তিন্তিড়ি, আম্র ও বংশবেষ্টিত গ্রামগুলি দ্বীপের ন্যায় এই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে ভাসিতে

এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বর্ষাকালে মাঠে ভয়ানক সর্পভয় হয়। "আলের কেউটে" নামক এক প্রকার কৃষ্ণ সর্প এই সময় প্রায় দেখিতে পাইতাম, তাহারা অতি হিংস্রক ও তীক্ষ্ণ বিষধর। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় কখনও সর্পাঘাত হয় নাই। আমাকে একবার একটা সাপে কামড়াইয়াছিল কিন্তু যখন দেখিলাম যে তাহার ফণা নাই, তখন বুঝিলাম যে সেটা বিষধর সর্প নহে। কপালে অনেক কষ্ট ছিল তাই সর্পাঘাতে স্কুলের বাবুগিরি শেষ হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার সঙ্গীর মধ্যে একজন পাচক ও একজন ভৃত্য। শুভগ্রহ বশতঃ ভৃত্যটি পাইয়াছিলাম ভাল। তাহার নাম তিনকড়ি, সে জাতিতে নাপিত, নাপিত বটে কিন্তু কাজে তাঁতি বলিয়া বোধ হইত। নাপিতের ছেলে ততদূর ভাল মানুষ আমি কখনও দেখি নাই। তাহা না হইলে আর আমার নিকট সেই সুখের চাকরিতেও ছিল? সে সকল রকম কাজ জানিত, হাতের লেখা ঠিক পাকা মুহুরীর ন্যায় ছিল, দরজীর ন্যায় জামা শেলাই করিত; তাহার পিতা কবিরাজী করিত তাই সে অনেকটা চিকিৎসাও শিক্ষা করিয়াছিল, আর খানসামার ন্যায় তেল মাখাইতে, কাপড় কোঁচাইতে এবং তাহার জাতিব্যবসা ক্ষৌরকর্ম্ম করিতেও বেশ সুদক্ষ ছিল। এখন মনে মনে ভাবি সে বেচারা এত গুণে গুণবান হইয়াও একজন স্কুলের বাবুর নিকট চাকরি করিত কেন? ভৃত্য ভাগ্যটা আমার ভাল ছিল বটে কিন্তু পাচক ভাগ্য তেমন ছিলনা। যে ব্রাহ্মণের ছেলে একবার আমার সহিত পল্লীগ্রামে ঘুরিয়া আসিয়াছে সে আর যাইতে চাহিত না। সকলে ত আর আমার তিনকড়ির ন্যায় প্রভুভক্ত নহে। কে সাধ করিয়া আমার সহিত ঝড়-জলে রৌদ্রে কাদায় মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইবে? আমি চাকরি ছাড়িয়া দিলে আর জুটাইতে পারিতাম না, কিন্তু তাহাদের ত চাকরির অভাব ছিল না।

কিন্তু এই জল, কাদা, সর্প ইত্যাদির ভয় অপেক্ষা আর এক ভয় বড় প্রবল ছিল। পথে বড় দস্যুভয় ছিল। তখন ডাকঘরে মনি অর্ডার প্রথা হয় নাই। স্কুলের বাবুদিগকে সময় সময় ২।৩ হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া ঘুরিতে হইত। যে সকল গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দেওয়াইয়া ভাল ফল দেখাইতে পারিতেন, তাঁহারা প্রতি মাসে সরকার হইতে বৃত্তি পাইতেন। সেই সকল বৃত্তির টাকা স্কুলের বাবুদিগকে বহন করিয়া গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিতে হইত। এই কাজে নোট লইয়া যাইলে চলিত না, কারণ বৃত্তির পরিমাণ অধিকাংশ স্থলেই পাঁচ টাকার মধ্যে হইত, পল্লীগ্রামে নোট বদলাইয়া টাকা পাওয়া দুষ্কর, সেই জন্য পল্লীগ্রামের লোক সহজে নোট লইতে রাজীও নহে। সুতরাং নগদ টাকার বোঝা মাথায় করিয়া এই সর্প-দস্যু-সঙ্কুল পথে বিচরণ করিতে হইত। আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে পরামর্শ দিতেন—একটা পিস্তল রাখ। তাঁহারা ভাল ভাবিয়াই বলিতেন, কিন্তু পিস্তল ব্যবহার করিবে কে ? একালের পাঠকের নিকট লজ্জাসহকারে স্বীকার করিতেছি চিরকাল স্কুলমাষ্টারি করিয়া আসিয়াছি, কখনও একগাছা লাঠি হাতে করিয়া বেড়াই নাই. অন্য পাড়ায় বন্দুকের শব্দ হইলে চমকিয়া উঠিয়াছি—আর সেই আমি প্রাচীন বয়সে নিজের হাতে বন্দুক ছুড়িব ? দুই একবার দস্যু হস্তে পড়িয়াও ছিলাম, কিন্তু কোনও প্রকার ফৌজদারী ঘটাইতে হয় নাই। দিগন্ত-বিস্তৃত, উন্মুক্ত, সমতল মাঠে দস্যু ভয় বড় হয় না। যেখানে মাঠের মাঝে ছোট ছোট নদী থাকে অথবা গ্রাম হইতে বহুদূরে পথের ধারে নিবিড় বৃক্ষসমাকীর্ণ জলাশয় থাকে সেই সকল স্থলে দস্যুদিগের প্রায় গতিবিধি থাকে। আমাদের সময় অপেক্ষা এখন দস্যুভয় অনেকটা কমিয়া গিয়াছে এমন কি এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমাদের সময়ে এবং তাহার পূর্ব্ব-

দেখিয়াছি। তাহারা তখন প্রাচীন, কেহ কেহ বা মালা তিলক ধারণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল দস্যু গ্রামের লোকের সহায়তায় দস্যুগিরি করিত। একবার একজন ব্রাহ্মণকে পথে দস্যুতে আক্রমণ করে, ব্রাহ্মণ কোনও প্রকারে প্রাণের দায়ে পলায়ন করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করেন। তখন গ্রামের বারয়ারী তলায় যাত্রা হইতেছিল। ব্রাহ্মণ লোক সমাগম দেখিয়া প্রাণরক্ষার আশায় সেই খানে গিয়া প্রাণ ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনেক দূর ছুটিয়া আসিয়া তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত ; অতি কাতর ভাবে ব্রাহ্মণ একটু জল প্রার্থনা করিলেন। ইতি মধ্যে সেই দস্যুও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেই বারোয়ারী তলায় উপস্থিত হইল। গ্রামের মাতব্বর ভদ্র-লোকেরা দেখিলেন যে তাঁহাদের প্রতিবাসী বাগ্দির কবল হইতে এই শিকার পলাইয়া আসিয়াছে, দেখিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া সেই বাগ্দি দস্যুকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে ঠাকুরকে একটু জল খাওয়াইয়া লইয়া আয়।" হুকুম পাইবামাত্র সেই নরঘাতক যাত্রার আসরের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিল! এ ঘটনা কাল্পনিক নহে। যে মহাত্মারা সেই বিপন্ন ব্রাহ্মণকে দস্যুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রেরাই আমার নিকট এই গল্প করিয়া বলিয়াছেন, "মহাশয় আজ কাল আর আমাদের গ্রামে তেমন দস্যুভয় নাই—কর্ত্তাদের আমোলে যা ছিল।" শুনিয়াছি এই সকল দস্যুবৃত্তি কেবল ইতর শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ ছিল না, অনেক ব্রাহ্মণও স্বহস্তে লাঠি ধরিয়া মাঠের মাঝে বিদেশী পথিকদের প্রাণ-সংহার করিতেন!

আমি একবার একটা কাঁদর (কন্দর, অর্থাৎ মাঠের মাঝে ছোট স্রোতস্বতী) পার হইতে ছিলাম। প্রথমে আমার পাচক, মধ্যে পোর্ট-

নদী পার হইতাম। সকল নদীতে জল থাকিত না, এমন কি অনেক নদী পার হইবার সময় পাদুকাও খুলিতে হইত না। নদী পার হইবার সময় আমরা বেশ সতর্কভাবে চারিদিক দেখিতাম কোথাও লোকজন আছে কি না। নদীপার হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পর পারে গিয়া আমি পা ধুইয়া পাদুকা পরিধান করিতেছি এমন সময় নিকটস্থ ধান্যক্ষেত্র হইতে একটা ভীষণদর্শন লোক উঠিয়াই আমাকে কর্কশ স্বরে বলিল "কে যায়—দাঁড়াও"। বলা বাহুল্য যে আমার যথেষ্ট ভয় হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমি স্কুলের বাবুগিরিতে এক প্রকার পরিপক্ক হইয়াছিলাম; সুতরাং তাহার কথায় বাহ্যিক ভয়ের কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া আপন মনে পাদুকা পরিধান করিতে লাগিলাম। সে লোকটা আমাকে দুই তিন বার উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইলে আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "তিনকড়ি আমার বন্দুকটা নিয়ে এস ত ব্যাটাকে আমার পরিচয় দি।" আমার কথা শুনিবামাত্র তিনকড়ি ও পাচক উভয়ে একযোগে চীৎকার করিয়া আমার নিকট ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আর একজন প্রাচীন গোছের লোক সেই ধান্যক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া আমাকে বলিল "বাবু যেতে দিন ও ছোঁড়া তামাসা করিতেছিল, ওর কথা ধরিবেন না, ওর স্বভাবটাই ওই রকম, সকলকে ঠাট্টা তামাসা।" এই বলিয়া সেই সহযোগীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে আমার গন্তব্য গ্রাম তখনও প্রায় এক ক্রোশ দূরে; সুতরাং এই মাঠের মাঝখানে দস্যুদের সহিত বিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না।

আমার স্কুলের বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হওয়ার কিছুদিন পরে আমরা পুলিশ হইতে সাহায্য পাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হই। যখন কাছে টাকা

তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার মেয়ে? কোথাকার মেয়ে?"

নবগোপাল নির্ভীক চিত্তে বলিল—"মহেশপুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে।"

"গদাধর চট্টোপাধ্যায় কে?"

"তিনি সোণাপুর জমিদারীর একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী।"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"তুমি কি পাগল হয়েছ? একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে আমি তোমায় অনুমতি দেব?"

নবগোপাল কিছু বলিল না। কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"ও সব খেয়াল ছেড়ে দাও। ধনে, মানে, গুণে যারা তোমার সমকক্ষ, তাদেরই গৃহে শুধু বিবাহ কর্‌তে পার তুমি।"

নবগোপাল তখনও নীরব। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, নবগোপাল যদি সুশীলাকে একবার দেখিয়া আসে তবে নিশ্চয়ই তাহাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র হইবে, কারণ মেয়েটি বাস্তবিকই সুন্দরী। সুতরাং বলিলেন—"তুমি বালক। নিজের ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা তোমার এখনও জন্মেনি। আমি তোমার জন্য যা বন্দোবস্ত করেছি তা তোমায় গ্রহণ করতেই হবে। আমার মতের বিপরীত কায কর্‌তে চেষ্টা কোরো না।" তাহার পর একটু নামিয়া বলিলেন—"ইতিমধ্যে তুমি একদিন গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এস। কবে যেতে পারবে বল—আমি আয়োজন করি।"

নবগোপাল স্থিরস্বরে বলিল—"আয়োজন অনাবশ্যক। আমি সে মেয়েকে বিবাহ করব না।"

এ উদ্ধত উত্তর কান্তিচন্দ্রের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত করিল। কিন্তু তখনও তিনি আত্মসম্বৃত। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কর্ম্ম করে গদাধর চট্টোপাধ্যায়?"

মাতৃহীন হই, তখন তিনি অতি শিশু, সেই জন্য উত্তরকালেও আমার কোনও সন্ধান লইবার সুযোগ পান নাই।

পল্লীগ্রামে স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া সময়ে সময়ে যেমন আহারের কষ্ট পাইতাম, আবার সময়ে সময়ে তেমনি আহারের সুবিধাও হইত। যে সকল গ্রামে ভদ্রলোকের বাস, যে সকল গ্রামের জমিদার বা বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের মেম্বর, যে সকল গ্রামের বিদ্যালয়ে সরকার হইতে সাহায্য আবশ্যক তথায় উপস্থিত হইলে স্কুলের বাবুদের খাতির দেখে কে ? স্কুলের বাবুর খাতিরে আরও পাঁচ সাত দশ জন নিমন্ত্রিত হইতেন। প্রাতে হয়ত কোনও ইতর লোকের গ্রামে বাগ্দী মহাশয়ের পাঠশালা দেখিয়া কেবল চিঁড়া ভিজাইয়া গুড় দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছি, আর রাত্রে অপর গ্রামে পোলাও কালিয়ার ধূম লাগিয়া যাইত। সরকারী কর্ম্মচারীর এই প্রকার আতিথ্য গ্রহণ ঠিক আইন সঙ্গত নহে, কিন্তু দায়ে পড়িয়া সকল সময় ঠিক আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ সেকালে এ বিষয়ে আমাদের মনেরও একটু শৈথিল্য ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

অনেক স্থলেই একটা বড় গ্রামে দুইটা স্কুল আছে এবং এই দুইটা স্কুল লইয়া গ্রামে বিলক্ষণ দলাদলি আছে। সেই সকল গ্রামে উপস্থিত হইলে আমরা বড় সন্তর্পণে থাকিতাম। প্রায় কাহারও আতিথ্য গ্রহণ করিতাম না, অথবা যাঁহার সহিত কোনও স্কুলের সংশ্রব নাই তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। আমাদের একজন সহযোগী স্কুলের বাবু একবার বলিয়াছিলেন—"আমি গ্রামে স্কুল দেখিতে গিয়া দেখিলাম গ্রামে ভয়ানক দলাদলি। উত্তর পাড়ায় একটা ও দক্ষিণ পাড়ায় একটা —দুইটা স্কুলের জন্য এই বিবাদ। আমার নিকট উভয় দলের লোকেই সরকারী সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। আমি অনেক

স্কুল মাঝের পাড়ায় করিতে পারিলে ভাল হয়। গ্রামে গিয়া উভয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আহ্বান করিয়া যুক্তি সহকারে বুঝাইয়া দিলাম যে এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে দুইটা স্কুলের পরিবর্ত্তে একটা স্কুল হইলে সকল বিষয়েই সুবিধা হইবে। কিন্তু আমার যুক্তি কেহই গ্রহণ করিলেন না। এদিকে গবর্ণমেণ্টও দুইটা স্কুলে সাহায্য করিবেন না। উভয় দলের লোকেই আমাকে বাধ্য করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। আমি যখন দেখিলাম যে আমার কথায় কোনও ফল হইল না তখন কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলাম। বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে দক্ষিণ পাড়া অপেক্ষা উত্তর পাড়ার স্কুলের ছাত্র সংখ্যাও অধিক এবং অধ্যাপনাও ভাল হয়। সুতরাং উত্তর পাড়ার স্কুলেই সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিব স্থির করিয়া গ্রাম ত্যাগ করিলাম। প্রায় দুই ক্রোশ একটা মাঠ পার হইয়া অপর গ্রামে যাইতে হইবে। বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে গ্রামত্যাগ করিবার অল্পকাল পরেই ভয়ানক ঝড় উঠিল। সুতরাং প্রাণের দায়ে অগত্যা সেই গ্রামে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম ও দক্ষিণ পাড়ায় এক ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা আমাকে পাইয়া মহা আপ্যায়িত হইলেন। রাত্রে আমার সেবার জন্য একটা ছাগশিশু প্রাণ-বিসর্জ্জন দিল। আমি কিন্তু আর স্কুল সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিলাম না। রাত্রে পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন প্রাতে গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় গৃহস্বামীকে ডাকিয়া বলিলাম যে "আপনাদের আতিথ্যে আমি যৎপরোনাস্তি বাধিত হইলেও উত্তর পাড়ায় বৃত্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিব। উত্তর পাড়ায় আতিথ্য গ্রহণ করিলে পাছে আপনারা মনে করেন তাঁহাদের যত্নে আমি সন্তুষ্ট হইয়া পক্ষপাত করিতেছি, সেই ভয়েই আমি আপনাদের

প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আপনাদের স্কুলের উন্নতি করিয়া উত্তর পাড়ার স্কুলকে হারাইয়া দিতে চেষ্টা করুন।”

বলা বাহুল্য যে এই প্রকার দলাদলি যে সকল গ্রামে আছে সেখানে কোনও দলেরই স্কুল পাঠশালা স্থায়ী হয় না। কারণ এই দলাদলির ভিত্তি গ্রামের উন্নতি নহে—নিজেদের জেদ বজায় রাখা। কোনও এক পক্ষের জিদ বজায় থাকিলে অপর পক্ষ একেবারে নিবিয়া যায় এবং বিজয়ী পক্ষও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হইয়া অলস ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়ে, ও অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়টী লীলা সম্বরণ করে।

একদিন প্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “গ্রামের লোকেরা স্কুলের সাহায্যের জন্য আমার নিকট আবেদন করিয়াছে, চল উভয়ে গিয়া গোপনে তাহাদের অবস্থাটা দেখিয়া আসি।” গ্রামটি অধিক দূর নহে, সাহেবের সহিত আমি পদব্রজেই চলিলাম। যথা সময়ে গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে গ্রামে বারোয়ারীর ধুম লাগিয়া গিয়াছে, মস্ত আসর হইয়াছে, যাত্রা হইবে—গ্রামে হৈ হৈ ব্যাপার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কেহই চিনিত না। তিনি একজন প্রাচীন কৃষককে নিকটে আহ্বান করিয়া বারোয়ারীর ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে লোকটা বাহাদুরী লইবার জন্য সাহেবের নিকট অতিরঞ্জিত বর্ণনা আরম্ভ করিল। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে স্কুলের সাহায্যপ্রার্থিগণ তথায় সমবেত হইলে সাহেব বেশ দুই একটা বচন দিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে, যে গ্রামের লোকে আমোদের জন্য তিন চারি দিনে তিন চারি শত টাকা ব্যয় করিতে পারে সে গ্রামে স্কুলের সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট এক পয়সাও ব্যয় করিবেন না।

অনেক স্থলেই আমরা গোপনে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইতাম।

"আমার পাঠশালায় আশী জন ছাত্র অথচ আমি গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাই না, যাহাতে সাহায্য পাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" অনেক স্থলেই গুরুমহাশয়েরা দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকার আবেদন করিয়া থাকে। হয় ত পাঠশালায় ১৫টি ১৬টির অধিক ছাত্র নাই কিন্তু গুরুমহাশয় অম্লানবদনে ৭৫ কি ৮০ জন ছাত্রের উল্লেখ করিয়া আবেদন করিল। আমরা যে দিন স্কুল দেখিতে যাইব, সে যদি পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারে, তাহা হইলে গ্রামান্তর হইতে কতকগুলা ছেলে আমদানী করিয়া নিজের পাঠশালা ভর্ত্তি করিয়া রাখে। একখানা মিথ্যা হাজিরা বহি রাখিয়া তাহাতে ৭০।৮০টা ছেলের নাম লিখিয়া রাখে। আমরা অকস্মাৎ পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া একেবারে হাজিরা বহি চাহিয়া লইয়া দেখিতাম যে তাহাতে হয় ত ৭০।৭৫ জন ছেলের মধ্যে ৬০ জন উপস্থিত বলিয়া লেখা আছে কিন্তু পাঠশালায় ১৩টির অধিক ছেলে উপস্থিত নাই। সে স্থলে গুরুমহাশয়দিগের জুয়াচুরি অতি সহজেই ধরা পড়িত।

অনেক স্থলেই আমরা প্রাচীন গুরুমহাশয়দিগকে লইয়া বড় বিপদে পড়িতাম। একদিন এক গ্রামে পাঠশালা দেখিতে গিয়াছি। গুরুমহাশয়টির বয়স বোধ হয় ৭৫ বৎসরের কম হইবে না। আমি যতক্ষণ ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতেছিলাম, তিনি ততক্ষণ অতি নিশ্চিত মনে ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমার সাক্ষাতে গুরুমহাশয়দিগের ধূমপান বেয়াদবী হইলেও পল্লীগ্রামের প্রাচীন গুরুমহাশয়দিগের সে বেয়াদবী আমরা ক্ষমা করিতাম। আমার পরীক্ষা শেষ হইলে আমি গুরুমহাশয়কে অধ্যাপনা সঙ্কেত (Mode of teachings) সম্বন্ধে কিছু বলিতে উদ্যত হইলে তিনি অনুগ্রহ সহকারে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন "তোমরা এখনকার বাবুরা দুই পাতা ইংরাজিই পড়েছ,

তোমরা সে হদিস পাবে কোথায় ?” আমি ত তাহার বক্তৃতা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। লোকটা পাগল না কি ? বলে কি ? অতি কষ্টে মনোভাব দমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—হদিসটা কি রকম ? তিনি তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন “এই ধর ছিরি (শ্রী)। তোমরা কটা ছিরি শিখেছ বাপু ? তোমরা কেবল ছিরি দুগ্‌গার ছিরি শিখেছ বৈত নয়। আমাদের কাছে অনেক রকম ছিরি আছে। ধর ছিরি দুগ্‌গার এক ছিরি। তারপর লোকে ছিরি ছাঁদ বলে সেই এক ছিরি। ছিরি নোক (স্ত্রীলোক) এক ছিরি। কত বলব গো এ আবার নেকবার হদিস্ আছে।” এই বলিয়া একজন বালকের নিকট হইতে একখানা খড়ি লইয়া লিখিয়া দেখাইতে লাগিলেন “এই দেখ কয়ের ছিরি, এই দেখ বয়ের ছিরি, এই দেখ চয়ের ছিরি” এই বলিয়া দশ বার রকম “ছিরিই” লিখিয়া দেখাইলেন। দুঃখের বিষয় পাঠকগণকে সেই নূতন “ছিরি” গুলি লিখিয়া দেখাইতে পারিলাম না। একটা টানা “ক” লিখিয়া তাহাতে “র” ফলা, সেইটাই ঘুরাইয়া দীর্ঘ ঈকার করিয়া দিলে সেটা “কয়ের ছিরি” হইল (ক্রী), এই প্রকার বয়ের ছিরি (ব্রী), চয়ের ছিরি (চ্রী) ইত্যাদি। গুরুমহাশয়-পুঙ্গবের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া আমার মোড অব টিচিঙস্ সম্বন্ধে লেক্‌চারটী বন্ধ করিতে হইল। অনেক স্থলেই গুরুমহাশয়দিগের “ত্রুতীয় ভাগ,” “ত্তিতীয় ভাগ” ও “বৃদোদয়” বলা ঘুচাইতে পারি নাই।

প্রথম স্কুলের বাবু হইয়া একখানা পাল্কি রাখিয়াছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইত বলিয়া বেশীদিন রাখিতে পারি নাই। পাল্কী রাখিয়া আর একটা বড় অসুবিধা হইত। আমার ভৃত্য ও পাচক পাল্কীর সহিত দৌড়াইতে পারিত না। আমি অগত্যা বন্দোবস্ত করিলাম যে আমি মধ্যাহ্নে অমুক গ্রামে যাইব, বলিয়া পাচক ও ভৃত্যকে

ঘুরিয়া যথা সময়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আবার কোনও কোনও সময়ে এমনও হইত যে হয় ত মধ্যের একটা গ্রামে কোনও অপরিহার্য্য কারণে আমার অধিক বিলম্ব হইল, হয় ত সে বেলা আর যাওয়াই হইল না—সে স্থলে আমার ভৃত্য ও পাচক আমার অপেক্ষায় সমস্ত মধ্যাহ্নটা পথ চাহিয়া রহিল। এই প্রকার নানাবিধ অসুবিধায় পড়িয়া অবশেষে পাল্কী ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু পাল্কী ছাড়িলেও চলে না। প্রতি বৎসর জল কাদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বর্ষার শেষে আমার কঠিন পীড়া হইতে লাগিল। প্রত্যহ অসময়ে আহার, নিত্য নূতন জল পান, নূতন জলে স্নান করিয়া আর প্রাচীন শরীর কত দিন ঠিক থাকে? পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে পারিতাম না। তাই অবশেষে একটী ঘোড়া কিনিলাম। নব্য পাঠকগণ হয় ত মনে করিবেন যে যিনি বন্দুকের শব্দে মূর্চ্ছিত হয়েন, তিনি আবার ঘোড়া কেনেন কোন্ সাহসে? কিন্তু সহরের পাঠকেরা বোধ হয় জানেন না যে পল্লীগ্রামে অনেকেই ঘোড়া রাখিয়া থাকেন। আমার বিশেষ জানা আছে সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে ঘোড়ার প্রচলন অধিক, কিন্তু সে ঘোড়া কলিকাতার অশ্বারোহী পুলিশের ঘোড়া বা অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়া নহে। পল্লীগ্রামের ঘোড়ারা স্বতন্ত্র জীব। তাহারা খোল, বিচালি, কলাগাছ সমস্তই খাইয়া থাকে। তাহাদের পায়ের ক্ষুর লৌহ নালে বদ্ধ করিতে হয় না। সকল সময় তাহার জিন ও বল্গারও আবশ্যক হয় না। পল্লীগ্রামের ডাক্তার মাত্রেই ঘোড়ায় রাখিয়া থাকেন। এমন কি অনেক গ্রাম্য পোষ্ট পিয়নেরও ঘোড়া থাকে। এই সকল ঘোড়া পুষিবার খরচ কিছুই নাই। সমস্ত দিন মাঠে ঘাস খাইয়া থাকে, আর রাত্রে গোয়াল ঘরের এক পার্শ্বে দুই আঁটি খড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ঘোড়া তাহাতেই সন্তুষ্ট।

আমি সন্ধান করিয়া খুব ছোট একটা টাট্টু ঘোড়া কিনিলাম।

ছোট কেন না পড়িয়া যাইলেও অধিক আঘাত পাইব না। আমার বাহনটিও তাহার জাতভায়ের মত বিচালি, কলাগাছ ইত্যাদি পাইলে পরম পরিতোষ লাভ করিত, তবে তাহার চেহারাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট মাংসল ছিল, অস্থি চর্ম্মসার ছিল না। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন সহিসও রাখিতে হইল। প্রাচীন বয়সে আমি যখন প্রথম ঘোড়ায় চড়িতে অভ্যাস করি, তখন এক নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি তখন বর্দ্ধমানে—বর্দ্ধমান সহরের মধ্যে ঘোড়ায় চাপিতাম না। আমার সহিস ঘোড়ায় সাজ দিয়া সহরের বাহিরে আমি যেদিকে যাইব সেইদিকে পথের ধারে একটা সাঁকোর নিকট অপেক্ষা করিত। মাঠের রাস্তাগুলি মাঠ হইতে ২।৩ হাত উচ্চ। আমি সেই পথে সাঁকোর নিকট উপস্থিত হইলে আমার সহিস ও ভৃত্য দুই জনে ঘোড়াটাকে লইয়া মাঠে নামিত ও সাঁকোর নীচে গিয়া ঘোড়াটাকে সাঁকোর পার্শ্বে ধরিয়া থাকিত। তাহার পৃষ্ঠ ও সাঁকো প্রায় সমান উচ্চ হইত, আমি অনায়াসে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিতাম। আমার বসা হইলে তাহারা আবার ঘোড়াটাকে টানিয়া রাস্তায় আনিয়া ছাড়িয়া দিত। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি কেহ কখনও আমাকে ঘোড়া ছুটাইতে দেখেন নাই। আমার সহিস লাল পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়া অগ্রে অগ্রে যাইত, আর ঘোড়াটি সেই পাগড়ী লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত; সহিস যদি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কোনও জলাশয়ে গমন করিত আমার বাহনও অমনি সেই পাগড়ীর অনুসরণ করিয়া জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হইত। এই এক নূতন বিপদ—লাল পাগড়ী না হইলে আর তাহাকে চালাইতে পারিতাম না। অবশেষে স্থির করিলাম সহিস যেখানেই যাউক না কেন পাগড়িকে পথ ছাড়া করা হইবে না। সহিস জলাশয় বা অপর কোথাও যাইলে আমার তিনকড়ি সহিসের

অনুসরণ করিত। কোন গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই অশ্ব হইতে অবরোহণ করিতাম। সুতরাং কোনও লোকালয়ে কেহ আমাকে অশ্বারোহণ করিতে দেখেন নাই। এই পাগড়ী অনুসারী ঘোড়াটা বিক্রয় করিয়া আর একটা একটু বড় ঘোড়া কিনিলাম। এখন আর সাঁকোর ধারে গিয়া ঘোড়া চাপিতে হইত না, রেকাবে পা দিয়াই উঠিতে পারিতাম। তবে কখনও ছুট করাইতে পারিতাম না। এই ঘোড়াটার আবার এক অদ্ভুত রোগ ছিল। বর্দ্ধমানে রাস্তায় হাতী দেখিয়া তাহার ভয় হইত না কিন্তু গোরুর গাড়ী দেখিলে ভয়ে পাছু হাঁটিত। পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই গোরুর গাড়ী, আর সে গোরুর গাড়ী দেখিলে পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিত। দিন কতক পরে এ ঘোড়াটাও বদলাইয়া আবার একটা অপেক্ষাকৃত ভাল ঘোড়া কিনিলাম। অশ্বারোহণে আমার যেমন উন্নতি হইতে লাগিল অশ্বেরও সেইরূপ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় বর্দ্ধমানের স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় অশ্ব হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আমরা অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া আবার পদব্রজ আরম্ভ করিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গুরুমহাশয়দিগের পারিতোষিকের টাকা বহিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে পোঁছিয়া দিতে হইত, একজন গুরুমহাশয় এই প্রকারে কিছু পারিতোষিক লইয়াছিলেন। আমি তাঁহার প্রাপ্য টাকা লইয়া তাঁহাকে দিতে উদ্যত হইলে তিনি করযোড়ে আমাকে বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার আমাকে মাফ্ করুন। এ বৃদ্ধ বয়সে আর কেন যন্ত্রণা দিবেন, ও কোম্পানীর টাকা লইয়া আমি জিয়ালে (জেলে) যাইতে পারিব না। ওটাকা আমি লইব না।" অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক ও কথা-বার্ত্তার পর যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর বাটী আমাদের দেশে তখন তিনি বলিলেন, "মহাশয় ভদ্রলোক বিশেষতঃ বলছেন—যায়গায় আপনার বাড়ী তাই নিলেম, নচেৎ কোম্পানির টাকা ও রক্তরক্ত গোরক্ত।"

নিরক্ষর গুরুমহাশয়দিগকে লইয়া যেমন ভুগিতে হইত অনেক সময় আবার নিরক্ষর সেক্রেটারীদিগকে লইয়াও ততোধিক ভুগিতে হইত। পল্লীগ্রামের মধ্যে যিনি একটু ধনবান বা ক্ষমতাবান তিনিই প্রায় স্কুলের সেক্রেটারী হইতেন। অনেক স্থলেই সেক্রেটারীর সহিত মা সরস্বতীর বড় সম্বন্ধ থাকিত না। একবার এক গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। স্কুলে গিয়া শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ স্কুলের সেক্রেটারী কে? আমার কথায় শিক্ষক মহাশয় একজন বালক দ্বারা সেক্রেটারী মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। যথা সময়ে অনাবৃত-দেহে, গাত্র-মার্জ্জনী স্কন্ধে সেক্রেটারী মহাশয় আসিয়া দর্শন দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয় কি এই স্কুলের সেক্রেটারী? তিনি অতি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, আমিই সেক্রেটার।" "সেক্রেটার" মহাশয়ের গতিক দেখিয়া আমি কিছু না বলিয়া প্রথম শ্রেণী পরীক্ষা করিতে গেলাম। "সেক্রেটার" মহাশয়ও আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া একজন শিক্ষককে বলিলেন, "ম্যাষ্টার, আমার ছেলেকে নিয়ে এস দেখি।" তাঁহার আজ্ঞামাত্র একজন শিক্ষক তাঁহার পুত্রকে আনিতে গেলেন। "সেক্রেটার" মহাশয় শিক্ষকগণকে তাঁহার ভৃত্যের ন্যায় হুকুম করিতে লাগিলেন দেখিয়া, অবশেষে আমি বলিলাম, "মহাশয় এই সকল ভদ্রলোকের ছেলে স্কুলে শিক্ষকতা করিতে আসিয়াছেন, আপনার নিকট চাকরি করিতে আসেন নাই।" তিনি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি এই স্কুলের সেক্রেটার।" ক্ষণকাল পরে তাঁহার পুত্রকে লইয়া শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত হইলে সেক্রেটার আমায় বলিলেন, "বাবু আমার এই ছেলেটিকে দুটা কথা জিজ্ঞাসা করুন না।" আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সে ছেলেটি সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে পড়ে। সেক্রেটারকে বলিলাম যখন আমি লাষ্ট ক্লাসে যাইব তখন আপনার ছেলেকে পরীক্ষা করিব, এখন ইঁহাকে উঁহার ক্লাসে পাঠাইয়া দিন। কিন্তু তিনি কিছুতেই

ছাড়িলেন না। প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গেলাম, সেখানে গিয়াও সেক্রেটারি সেই অনুরোধ করেন, "আমার ছেলেকে দুটা কথা জিজ্ঞাসা করুন না।" এই প্রকারে তিনি সব শ্রেণীতে তাঁহার পুত্রকে লইয়া আমার সহিত ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে লাষ্ট ক্লাসে গিয়া দেখি যে সেক্রেটারি মহাশয়ের পুত্র ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, হৃষ্ট-পুষ্ট ও অপকৃষ্ট। সে "বুদোদয়" (বোধোদয়) পড়ে কিন্তু প্রথম ভাগের বানান জানেনা। বালকের স্থূল কলেবরের অনুরূপ স্থূল বুদ্ধি দেখিয়া আমার কালিদাসের 'আকারো সদৃশ প্রাজ্ঞ" মনে পড়িয়া গেল। স্কুলের পরীক্ষা শেষ হইলে সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি অস্বীকার করিলে ভদ্রলোক শেষে আমার পায়ে ধরিয়া অনুরোধ, উপরোধ ও মিনতি করিতে লাগিলেন দেখিয়া বড় বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অগত্যা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। স্কুলের একজন শিক্ষক আমার ছাত্র। সেক্রেটারি যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, "ম্যাষ্টার সন্ধ্যার পর স্কুলের বাবুকে আমার ওখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো, আর তুমিও আমার ওখানে—বুঝেছ?" সেক্রেটারি প্রস্থান করিলে আমার ছাত্র আমায় বলিলেন যে, ঐ বালকটি সেক্রেটারি মহাশয়ের ছোট স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র, সেক্রেটারি তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লইয়াছেন; সেক্রেটারি বেশ ধনবান ও ব্রাহ্মণ, সজ্জনে বড় ভক্তি, তবে অতিরিক্ত তোষামোদ-প্রিয়। যদি সুযোগ পান তাহা হইলে ঐ ছেলেটার একটু সুখ্যাতি করিয়া মজা দেখিবেন ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর আমি, সেই শিক্ষক এবং আরও তিন চার জন ভদ্রলোক অন্তঃপুরের সংলগ্ন একটা গৃহে আহারে বসিয়াছি। আহারের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল—লুচি, পাঁঠা, মাছ, ক্ষীর ইত্যাদি কিছুরই

ক্রুটী ছিল না। সেক্রেটার মহাশয় স্বয়ং গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন—এমন সময় সেই পোষ্য-পুত্র-রত্ন আসিয়া একেবারে পিতার স্কন্ধে আরোহণ করিল। তাহার বয়স ১২।১৩ বৎসরের কম হইবে না। এতবড় অসভ্য ও চোয়াড় ছেলে আমি খুব কমই দেখিয়াছি। পুত্র কোলে করিয়া গৃহস্বামী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে সকলের সাক্ষাতে ও ভাল পড়া বলিতে পারে নাই, এইবার দুটা কথা জিজ্ঞাসা করুন দেখি।" সেক্রেটারের কথা শুনিয়া আমার ছাত্র আমার প্রতি কটাক্ষে ইঙ্গিত করিলে আমি মজা দেখিবার জন্ত বলিলাম—"তুমি কি বই পড় ?" সে বলিল "বুদোদয়।" আমি বলিলাম "আচ্ছা বেশ ছেলে, ভাল ছেলে—বানান কর দেখি হলধর।" সে বানান করিলে আমি তাহার প্রতিভার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া প্রথম ভাগ বর্ণ-পরিচয়ের এমন সব বানান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম যে তাহাতে হ্রস্ব, দীর্ঘ, বর্গীয়, অন্তস্থ, দন্ত্য, মূর্দ্ধণ্য ইত্যাদির কোনও অত্যাচার নাই। সে সকল গুলিই বলিতে পারিল। অন্যান্য ভদ্রলোকগণ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, আর সেক্রেটার মহাশয় আনন্দে উন্মত্তবৎ হইয়া বালকটির গায়ে কেবল হাত বুলাইতে লাগিলেন। ছেলেটি যত বানান বলে, তিনি ততই অন্তঃপুর-দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। বুঝিলাম সেই দ্বারের অন্তরালে তাঁহার পত্নী অবস্থান করিতেছিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "মহাশয় কেমন দেখলেন ?" আমি বলিলাম, "হাজারে এমন একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এ ছেলে যদি বাঁচে ত একজন হবে—হাকিমেরা নাম কল্লেই একে চিন্তে পারবেন—খবরের কাগজে এর নাম উঠবে।" ছেলেটার নাম আমার মনে নাই, তবে এত দিনে যে, সে কোন না কোন ফৌজদারী মকদ্দমার আসামী হইয়া খবরের কাগজে এবং

করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ছেলের প্রশংসা শুনিয়া গৃহস্বামী আমার পাতে মাছের মুড়া, পাঁটা ও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষীর দিবার বন্দোবস্ত করিলেন ও রাত্রে শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি বাতাস করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন।

লিখিতে লিখিতে অনেক কথাই মনে পড়িয়া যায়। একদিন একটা গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র একজন বয়স্থা স্ত্রীলোক আমাকে দেখিয়াই পথের ধারে ক্রীড়াশীল কতকগুলি বালককে বলিল "তোরা পালা।" বালকেরা অবিলম্বে পলায়ন করিলে নিকটবর্ত্তী কামারশাল হইতে একজন কামার অতি মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া, ততোধিক মলিন একখণ্ড বস্ত্র মাথায় বাঁধিয়া, একখণ্ড দীর্ঘ লৌহযষ্টি হস্তে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া আমার নিকট আসিয়া আমাকে এই মারে ত এই মারে, আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে নিজেই হাঁকা হাঁকি করিয়া মহা গোলযোগ আরম্ভ করিল। কেবল বলে—"না তা হবে না, কখনও হবে না, আমার প্রাণ থাক্‌তে তা পারব না। এতে প্রাণ যায় তাও স্বীকার—খুনোখুনী হব—রক্তগঙ্গা হব, ছেলে ছেড়ে দেবনা—হলোই বা কোম্পানীর হুকুম—আমার ছেলে যদি না দিই—কার সাধ্য আমাদের ছেলেদের গায়ে হাত দেয়", ইত্যাদি চীৎকারে গ্রামের লোক জড় করিয়া ফেলিল। আমি ত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় পথের মাঝে দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোকটা পাগল না কি, সত্য সত্যই আমাকে মারিবে না কি? এমন সময় গ্রামের জমীদার মহাশয় আসিয়া তাহাকে অতি কষ্টে নিরস্ত করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে আগন্তুক ভদ্রলোক স্কুলের বাবু, "টিকাদার" নহে। তখন সেই কর্ম্মকার-পুত্র অপ্রস্তুত হইয়া আমায় প্রণাম করিয়া বলিল, "হুজুর মাফ কর্‌বেন, আমি চিন্তে পারিনি আপনাকে টিকেদার বাবু মনে করেছিলাম। আমার অপরাধ লইবেন না।" অপরাধ লওয়া দূরে

থাক আপাততঃ কামারের হাতে অপঘাত মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, কিছু দিন পূর্ব্বে তাহাদের গ্রামে জনরব হয় যে কোম্পানির হুকুম যত ছেলেকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বর্দ্ধমানে বসন্তের টিকা দেওয়া হইবে, সেই জন্য বর্দ্ধমান হইতে একজন বাবু ছেলে ধরিতে আসিবেন। আমাকে সেই বাবু মনে করিয়া স্ত্রীলোকটি বালকগণকে পলাইতে বলিয়াছিল ও কর্ম্মকার মহাশয় বালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সম্বৎসরের মধ্যে আমাদের শীতকালটা কাটিত ভাল। পথের কষ্ট ছিল না, পরিশ্রমে কষ্ট ছিল না, মাঠে কৃষকেরা ধান্যচ্ছেদনাদি করিত বলিয়া দস্যুভয়ও ছিল না, ইদানীং আবার মনি অর্ডার প্রথা হইয়াছে, টাকার বোঝা মাথায় লইয়া ঘুরিতে হইত না। সর্ব্বত্র আহার্য্যও বেশ পাওয়া যাইত। কিন্তু কেন্দ্র পরীক্ষা (Centre Examination) শীতকালের একটা উপদ্রব ছিল। নবেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে ২৩।২৪ জায়গায় এই পরীক্ষা করিতে হইত। পূর্ব্বে পত্রদ্বারা প্রত্যেক গ্রামের গুরুমহাশয়দিগকে সম্বাদ দিয়া রাখিতাম অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে সেণ্টার পরীক্ষা হইবে, যাঁহার যে স্থানে সুবিধা ছাত্রসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইবেন। পরীক্ষার পূর্ব্বে আমরা ছাত্র ছাত্রীদিগের জন্য কতকগুলি পুরস্কারের পুস্তক, খেলনা, রূপার ফুল, কাচের পুতুল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া গ্রাম্য ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে পরীক্ষা আরম্ভ করিতাম। এক একটা সেণ্টারে ত্রিশ চল্লিশটা পাঠশালা ও প্রায় ৫।৬ শত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইত। প্রায় এক দিনেই পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণ শেষ হইত। গ্রাম্য পাঁচ ছয় জন লোকের সাহায্যে ৫।৬ শত বালককে পরীক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার বিতরণ যে কি সুখের

কার্য্য তাহা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আবার বেলা থাকিতে থাকিতে সকলকে ছাড়িয়া দিতে হইত, কারণ অনেক গুরুমহাশয়ই ছাত্রদিগকে লইয়া ২।৩ ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া আসিতেন। অনেক স্থলে দেখিয়াছি গুরুমহাশয়েরা একজন বালকের প্রাপ্ত পুরস্কার পুস্তক ছিন্ন করিয়া চার পাঁচ জন ছোট ছোট ছেলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "এক জন যদি প্রাইজ পায় তাহা হইলে আর পাঁচ জন ছোট ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে যাইবে। এ বৎসর ছেলে কাঁদাইয়া লইয়া যাইলে কে আগামী বৎসরে আবার ছেলে কাঁদাইবার জন্য ২।৩ ক্রোশ পথ পাঠাইয়া দিবে ?" কথাটা মিথ্যা নহে। বালিকা মাত্রেই একটা করিয়া প্রাইজ পাইত, তা পরীক্ষা দিতে পারুক আর নাই পারুক। অনেক গুরুমহাশয় পথে আসিতে আসিতে ৫।৬ বৎসরের ছোট ছোট ছেলেদিগকে খানিক খানিক কোলে করিয়া আনিতেন। সেণ্টার পরীক্ষায় ছেলেদের বড় কষ্ট হইত। অনেক স্থলেই গ্রামস্থভদ্রলোকে ছাত্র ও গুরুমহাশয়দিগের আহারের বন্দোবস্ত করিতেন কিন্তু সে প্রকার বন্দোবস্ত যেখানে হইত না সেখানে আহারের জন্য সকলেই বড় কষ্ট পাইত। প্রায় সকলকেই মুড়ি ও গুড় সম্বল করিয়া সমস্ত দিন কাটাইতে হইত।

যে গ্রামে সেণ্টার পরীক্ষা হইত সেই গ্রামে বড় সমারোহ ব্যাপার বাধিয়া যাইত। প্রায় বারোয়ারীতলার আটচালায় পরীক্ষা হইত। "লোকে লোকারণ্য" ঠিক নহে—বালকে বালকারণ্য হইত। গ্রামের কুলবধূরা পর্য্যন্ত সাকল সকাল গৃহকার্য্য শেষ করিয়া লইতেন, কেন না বারোয়ারীতলা দিয়া আজ আর কলসকক্ষে জল আনিতে যাওয়া হইবে না। যাঁহাদের বাটীতে গুরুমহাশয় ও বালকগণ আহারাদি করিতেন তাঁহাদের বাটিতে প্রকৃতই ভোজের সমারোহ হইত। প্রায় একজনের বাটীতে সকলের আহার হইত না। ৫।৬ জনের বাটীতে

শীতকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা মফঃস্বলে বাহির হইয়া থাকেন। অনেক স্থলেই তাঁহারা এই সেণ্টার পরীক্ষায় উপস্থিত থাকিয়া অধ্যক্ষতা করিতেন। এক একজন হুজুগ-প্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট এই সকল সেণ্টার পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে ভাল বাসিতেন। আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সম্বাদ দিয়া রাখিতাম কোন তারিখে কোথায় সেণ্টার পরীক্ষা হইবে। অনেক স্থলে আবার সাহেবেরা নিজের স্মবিধা মত দিন ও স্থান ধার্য্য করিয়া দিতেন। অনেক সময় সাহেবেরা নিজের স্মবিধা খুঁজিতে গিয়া আমাদিগকে যারপরনাই অস্মবিধায় ফেলিতেন। হয় ত আমরা পূর্ব্বে প্রত্যেক পাঠশালায় সম্বাদ পাঠাইয়াছি যে ১৭ই তারিখে আলিপুরে সেণ্টার পরীক্ষা হইবে। এমন সময় ১৪ই কি ১৫ই তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চাপরাসী দ্বারা একটু শ্লিপ লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, "১৭ তারিখে সেণ্টার দুর্গাপুরে করিলে বাধিত হইব।" আলিপুর হইতে দুর্গাপুর ৩া• ক্রোশ দূর। প্রথমতঃ দুর্গাপুরে সেণ্টার করিলে আলিপুর সেণ্টারের অনেক পাঠশালা বাদ দিতে হইবে ও অনেক নূতন পাঠশালায় সম্বাদ দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দুইটা গ্রামের ব্যবধান নিতান্ত অল্প না হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা এক স্থানে আসিয়া অপর স্থানে যাইতে পারে না ইত্যাদি নানা প্রকার গোলযোগে পড়িতে হয়। সাহেব মনে করিলে অনায়াসে তিন ক্রোশ পথ একাকী অশ্বারোহণে অথবা শিবিকাযোগে যাতায়াত করিতে পারেন। আমরা দুই দিন পূর্ব্বে সম্বাদ পাইয়া পোষ্ট দ্বারা সকল গুরুমহাশয়কে সম্বাদ পাঠাইলেও তাঁহারা ঠিক সময়ে সে সম্বাদ পাইতেন না, কারণ পল্লীগ্রামে সকল স্থানে প্রত্যহ ডাক যায় না। কোথাও সপ্তাহে দুই দিন, কোথাও এক দিন, কোথও বা হাটবারে হাটের লোক ধরিয়া চিঠি বিলি হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় কতক পরীক্ষার্থী দুর্গাপুরে উপস্থিত হয় আর কতক বা আলিপুরে গিয়া সমস্ত

পরীক্ষার যে কিছুমাত্র সার্থকতা আছে তাহা আমি আজ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারিলাম না। আজকাল শুনিতেছি কোন কোন জেলার সেণ্টার পরীক্ষা উঠিয়া গিয়াছে।

আমি পেন্সন লইবার কিছু দিন পূর্ব্বে "চিফ-গুরু" (Chief Guru) প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অনেক জেলায় চিফ-গুরুর পরিবর্ত্তে "ইনস্পেক্টিং পণ্ডিত (Inspecting Pandit) বিদ্যমান আছে। যে সকল গুরুমহাশয় লেখাপড়া জানেন, কর্ম্মদক্ষ ও বুদ্ধিমান তাঁহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ২০।২২ জনকে আমি চিফ-গুরুর পদে উন্নীত করিয়াছিলাম। এক একজন চিফ-গুরুর অধীনে ২০।২৫ খানা গ্রাম ছিল। চিফ-গুরুরা নিজের অবসর মত ঐ সকল গ্রামে পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন এবং পরিদৃষ্ট পাঠশালা প্রতি এক আনা করিয়া মজুরী পাইতেন। ইহাতে তাঁহাদের মাসিক আয় যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলেও সম্মান যথেষ্ট ছিল। চিফ-গুরু প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। প্রত্যেক গুরুমহাশয়কে আর স্বতন্ত্রভাবে পত্র দিয়া সম্বাদ দিতে হইত না, চিফ-গুরুদিগকে সম্বাদ দিলে তাঁহারাই তাঁহাদের অধীনস্থ পাঠশালা সমূহে সেই সম্বাদ দিয়া রাখিতেন। ৩১শে মার্চ্চ সরকারী বৎসরের শেষে আমাদিগকে সম্বৎসরের হিসাব নিকাস করিতে হইত। ঐ সময় চিফ-গুরুরা আমাদের বাসায় আসিয়া ৪।৫ দিন পরিশ্রম করিয়া আমাদের কাজের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং আমরাও সেই অবকাশে তাঁহাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ দিতে পারিতাম। যখন চিফ-গুরু ছিল না তখন সাধারণ গুরুমহাশয়ের দল হইতে বুদ্ধিমান কর্ম্মদক্ষ লোক বাছিয়া লইয়া বাৎসরিক হিসাবের কার্য্য করিতাম।

যখন আত্মশাসনের জয়-পতাকা চারিদিকে উড্ডীয়মান হইল,

জেলায় জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মহকুমায় মহকুমায় লোকাল বোর্ড সৃষ্ট হইল; তখন আমরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনের স্কুলের বাবু হইলাম। পূর্ব্বে আমাদের মনিব ছিলেন ইনেস্‌পেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট, এক্ষণে আবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আমাদের আর এক মনিব হইলেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে আসিয়া আমাদের আবার নূতন একটা কাজ বাড়িয়া গেল—যত খোঁয়াড় দেখিবার হুকুম হইল। এ পর্য্যন্ত কেবল গুরু পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি এক্ষণে আবার গুরুর খাতায় গোরুর নাম লিখিতে হইল দেখিয়া মানে মানে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম।

সৌন্দর্য্যের বাসা।

রমণিরে পায়ে ধরি তোর
চুপি চুপি বল্ মোর কাণে,
স্বরগের সৌন্দর্য্য শিশুরে
রাখিস্ লুকায়ে কোন্ খানে ?

কোথা কোন্ রুদ্ধ অন্তঃপুরে
আগলিয়া ত্রস্ত সযতনে,
লোকের চোখের পথ হ'তে
রেখেছিস্ একান্ত গোপনে ?

চপল চঞ্চল সুকুমার
ধরা নাহি দেয় কারাবাসে,
মাঝে মাঝে তাই পাই দেখা
হাসে, ভাষে, ইঙ্গিতে, আভাষে।

রহি রহি বিজলীর মত
শ্যাম তনু আকাশের গায়,
হেথা হোথা উঁকি ঝুঁকি মারি'
চমকিয়া ছুটিয়া পালায়।

কোথায় সে থাকে নাহি জানি
কোন্ অঙ্গে বল্ তোর নারি !
কখন কোথায় তারে দেখি
কিছুই বুঝিতে নাহি পারি।

ওই তোর অন্ধকার ঘেরা
কুণ্ডলিত কৃষ্ণ কেশ পাশ,—
তারি কোন্ কুঞ্চিত অলকে
সৌন্দর্য্যের সুগোপন বাস !

শ্যাম স্বচ্ছ সরসীর মত
সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ আঁখি দুটি—
উহারি কি অনন্ত অতলে
চঞ্চল সে করে ছুটাছুটি ?

আরক্ত যে অধরের হাসি
না ফুটিয়া অমনি মিলায়,
তা'রি কি নিভৃত কোন্ কোণে
দুরন্ত সে নীরবে ঘুমায় ?

কখন কোথায় সে যে থাকে
কোন্ অঙ্গে বল্ মোরে নারি,
সর্ব্বদেহে পাই দেখিবারে
তাই কিছু বুঝিতে না পারি।

তাই সে মিনতি করি তোরে
চুপি চুপি বল্ কাণে কাণে
অমরার সৌন্দর্য্য কুমারে
বেঁধে রেখেছিস্ কোন্ খানে ?

বৈজ্ঞানিক বলে—"তার বাস
সুসম্বদ্ধ দেহের গঠনে ;"
দার্শনিক বলে—"তাহা নয়
নিশ্চয় সে মানবের মনে ;"

কবি কহে অত নাহি বুঝি
কথা কই খেয়ালের ঝোঁকে
দরিদ্রের ধ্রুব এ বিশ্বাস
সৌন্দর্য্য—সে প্রেমিকের চোখে !

শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী।

পুলিশ কমিশন।

ভারতভূমির উর্ব্বরাশক্তি প্রচুর; কিন্তু উহাতে কমিশনরূপ মহীরুহ রোপিত হইলে যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় সেরূপ উহা ফলশালী হয় না।

ভারতের পক্ষে কমিশন উদ্ভিদ্‌টি সম্পূর্ণ বিজাতীয় বৃক্ষ। ইহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তথ্যনির্দ্ধারণ এবং তথ্যানুসন্ধানে যে সকল ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় সে গুলির নিরাকরণ জন্য ব্যবস্থাবিধান। পূর্ব্বে হিন্দু কিম্বা মুসলমানরাজত্বে রাজাপ্রজার মধ্যে বিলক্ষণ আন্তরিকতা ছিল। সেই জন্য প্রজার অভাব অভিযোগ রাজার অগোচর থাকিত না, এবং রাজাও প্রজার অভাব অভিযোগ সাধ্যমতে দূরীভূত করিতে ত্রুটি করিতেন না। এক্ষণে রাজা ও প্রজার মধ্যে সে আন্তরিকতা নাই। বরং ইহাই পরিলক্ষিত হয় যে, ভারতের প্রজার উপর রাজার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস রহিয়াছে। অস্ত্রআইন, দণ্ডবিধি আইন প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই আন্তরিকতার অভাবে প্রজা এখন আর রাজাকে মন খুলিয়া সমস্ত কথা বলিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ তাহারা বুঝিতে শিখিতেছে যে, রাজা তাহাদের কথা বড় বিশ্বাস করেন না এবং প্রায়শঃ উপেক্ষা করেন। যেখানে অন্যায় অত্যাচার তীব্র সেখানে রাজার উপেক্ষা অবিশ্বাস ঠেলিয়া ফেলিয়া উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদ উত্থিত হয়। তখন একদল মধ্যস্থ মানিয়া রাজা আপনার উপেক্ষা অবিশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু "বহ্বাড়ম্বে লঘুক্রিয়া" ইহা আমরা আজীবন দেখিয়া আসিতেছি। ভারতীর পাঠকের অনেকেরই অবিদিত নাই এযাবৎ যতগুলি কমিশন বসিয়াছে, তাহারা

লর্ড কর্জ্জনপ্রেরিত পুলিশকমিশনই এক্ষণে সাধারণের লক্ষ্যের বিষয়। সেই জন্য আমরা অদ্য এই বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম। পুলিশের ত্রুটি সম্বন্ধে অনেকবার অনেক সংবাদ-পত্রে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক এ বিষয়ে তারস্বরে চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ছোটখাট পুলিশসংশোধনও দুই একবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারকার কমিশনের মত বিরাট ব্যাপার পূর্ব্বে হয় নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিপুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনেকটা যে বাধ্য হইয়াছেন তাহা বলা যাইতে পারে। কারণ ছাপরা ও নোয়াখালির মোকদ্দমায় পেনেল সাহেবের তীব্র কটাক্ষ উপেক্ষা করা সহজ নহে। ঘরের ছেলে পেনেল সাহেব যখন গৃহছিদ্র প্রকাশ করিয়া দিলেন, এবং যখন তাহা ঢাকা দিবার সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ভারতীয় মন্ত্রীসভায় পুলিশের উপর তীব্র মন্তব্য প্রচার করিয়া আত্ম-কলঙ্ক-প্রক্ষালনে যত্নবান্ হইলেন। যে কন্দুক পেনেল-পদাহত হইয়া চালিত হইল, তাহাই ছোটলাট কর্ত্তৃক দ্বিগুণ গতিশীল হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে কলিকাতার গাড়োয়ান-দিগের ধর্ম্মঘটের কমিশনের মীমাংসায় উহার বেগ পরিবর্দ্ধিত হইল। এইরূপে কয়েকটি শক্তিপুঞ্জের সমন্বয়ে এই পুলিশ কমিশনের সৃষ্টি হইল, এইরূপ অনুমান হয়।

এইখানে একটি রাজনীতি সম্বন্ধে অবান্তর কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। অধুনা প্রাদেশিক এবং ভারতীয় মন্ত্রীসভায় বেসরকারী সদস্য লইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, এবং তদনুসারে সভ্য-নিয়োগও হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন বেসরকারী সভ্য কোন ত্রুটিসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে সরকারের পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হয়, "গবর্ণমেণ্ট

শুনিয়া স্তম্ভিত হয়। কারণ, যে ত্রুটির বিষয় দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানে, এবং যে ত্রুটি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কমিশন দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট জানেন না বলিয়া যে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাহাতে লোকে আশ্চর্য্য হয়। কিন্তু এই অজ্ঞতার ভান রাজনীতির একটি অঙ্গ। কারণ, জানি বলিলে ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়, স্বীকার করিলে তাহা সংশোধন করিতে হয়; সংশোধন না করিলে সভ্য গবর্ণমেণ্টের নামে কলঙ্ক লেপিত হয়। ত্রুটি সংশোধন ব্যয় সাপেক্ষ। অর্থের অনটনে গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ “না” বলিতে বাধ্য হইতে হয়। অথচ প্রতি বৎসর ইনকম্ টেক্স, আবকারীর আয়, ষ্ট্যাম্প বিক্রয় প্রতি জেলায় বাড়িয়া যাইতেছে। কোন জেলায় যদি আয় বৃদ্ধি না হইল তবে বোর্ড হইতে গুঁতা (call for explanation) আসিতে লাগিল। গুঁতার চোটে এবং চাকরী বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং আত্মোন্নতি মানসে আমাদের মধ্যে ডেপুটি-কলেক্টর ও আসেসর-গণ উত্তরোত্তর যে কোন প্রকারেই হউক আয়বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইতেছেন। মহম্মদঘোরীর ভারতলুণ্ঠন আইনের বলে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে প্রতিদিন সর্ব্বত্রই সুসম্পন্ন হইতেছে।

এবারের পুলিশ কমিশনে যে সকল সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপীয় এবং উরেসিয় সাক্ষিগণ অম্লানবদনে আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের উপর আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে যে জাতি (class) হইতে লওয়া হয় সে জাতিটাই মন্দ। সুতরাং পুলিশ মন্দ। এইরূপ যুক্তির বলে বোধ হয় মেকলে সাহেব আমাদের জাতির উপর অজস্র গালি দিয়া গিয়াছেন। রাজকার্য্য পরিচালনে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিল সেই সকল ব্যক্তির চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া

পূর্ব্বে ডেলি মেলের সংবাদদাতা ষ্টিভেন সাহেবও (যিনি ভারতে আবির্ভূত হইয়া হোটেল রেলওয়ের বাবুর্চ্চি-খানসামা-কুলি- আরদালি-বেহারা দেখিয়া আমাদিগের জাতীয় চরিত্রে ওয়াকিবহাল হইয়া বুয়ার যুদ্ধে লেডিস্মিথে অবরুদ্ধ অবস্থায় তিরোহিত হন) ঐরূপ গালি দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। আমাদের স্বজাতি স্বদেশীয় জনৈক সবজজ (এক্ষণে পেনসন্ প্রাপ্ত) একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমি আজ ত্রিশ বৎসরকাল বিচারবিভাগে কার্য্য করিয়া আসিতেছি; আমার আদালতে সহস্র সহস্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভদ্রলোক সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য সাক্ষ্য এক জনকেও কখন দিতে দেখিলাম না। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাকে বাঁচাইয়া সাক্ষ্য দেয়।" একজন স্বজাতির ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল যখন এইরূপ, তখন বিদেশীয় ব্যক্তির মন্তব্যে আমাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। আধুনিক আদালত-পুলিশ মিথ্যাপ্রবঞ্চনা বাণিজ্যের পণ্য-বীথিকা। সুতরাং সেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল্যও ঐরূপ।

যে যাহাই বলুক আমরা যে অধিকাংশই মন্দ হইয়াছি সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণই নাই। জাতীয় অধঃপতন সেই জন্যই হইয়াছে। নবীন যুবক—ভবিষ্যতের আশা ভরসা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুলিশে ঢুকিয়া মন্দ হইয়া গিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহারা কেন মন্দ হয় তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রধান কারণ সঙ্গদোষ। সংসারানভিজ্ঞ যুবক পাশ হইয়া দারোগার পদ পাইলেন। কিছুদিন পরে তিনি কোন এক মফস্বল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইয়া গেলেন। দূরস্থ কোন এক গ্রাম হইতে চুরির সংবাদ আসিল। যুবক তদন্তের কোন কাজই জানেন না। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া থানার প্রবীণ হেড্-কনেষ্টবলকে

প্রথমতঃ এলাকার দাগীগণকে ধরিয়া তর্জ্জনগর্জ্জন ও উত্তমমধ্যম আরম্ভ হইল। এবম্বিধ নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দাগী-গণের আত্মীয়স্বজন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থা করিল। যথানিয়মে শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রবীণ হেডকনেষ্টবল প্রভু সেগুলি পকেটস্থ করিতে ভুলিলেন না। ইতিপূর্ব্বে উক্ত কর্ম্মচারী গ্রামের প্রধানকে আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হুকুম দিয়াছেন। তথায় ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন হইতেছে। কারণ পুলিশকে যমদূত স্বরূপ সকলেরই ভয় করিয়া চলিতে হয়। উল্লিখিত প্রকারে সঞ্চিত উৎকোচের অংশ এক্ষণে নবীন দারোগাকে না দিলে ভবিষ্যতে অনিষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া, প্রবীণ নবীনের পকেটে গুটিকতক রজত মুদ্রা ফেলিয়া দিলেন। নবীন তাহাতে প্রথমতঃ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ততক্ষণ পুরাতন বলিতে লাগিলেন :—"বাবু চাকরী করিতে আসিয়াছেন উপার্জ্জনের জন্য; কিন্তু পুলিশে ঢুকিয়া পয়সা না লইয়া সাধু হইয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। দেখুন আমরা এই গ্রামে তদন্ত করিতে আসিয়াছি; সারাদিন তদন্তে ব্যাপৃত হইয়া রহিলাম; গ্রামের লোক যদি আমাদের আহারের বন্দোবস্ত না করিত তাহা হইলে আমাদিগকে উপবাস করিতে হইত। গ্রামের লোকের আতিথ্যগ্রহণ করিতে যদি আপনি ইচ্ছুক না হয়েন, তবে আপনাকে হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য কিনিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে হইবে। আজ এ গ্রামে, কাল সে গ্রামে আপনাকে যাইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে গিয়া আপনার পক্ষে একবার সংসার পাতা ও তোলা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ—আপনার বেতনেও কুলাইবে না এবং আপনি তদন্তেরও সময় পাইবেন না। মানিলাম আপনি সকল কষ্টই স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আপনার

একবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, (এবং থানা সদর এলাকার বহির্ভূত হইলে) একবার সবডিবিজনাল আফিসার আসিবেন। তাঁহাদের এবং তদনুচরগণের রসদ, পাথেয়, বকসিশ্ প্রভৃতি বিধিমতে যোগাইতে হইবে। সে বৃষোৎসর্গের ব্যাপারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আপনাকে প্রতি মাসেই বাটী হইতে টাকা আনিতে হইবে। যদি আপনার বাটীতে অত টাকাই থাকে, তবে বাবু, কেন এ কর্ম্মভোগ করিতে আসিয়াছেন।”

নবীন ক্রমশঃ দেখিলেন যে প্রবীণের কথা এক বর্ণও মিথ্যা নহে। তখন তাঁহার উৎকোচ গ্রহণে যে সঙ্কোচ ছিল তাহা বায়ুবিতাড়িত মেঘের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল। উৎকোচের এমনি একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, যিনি একবার ইহার কবলে পড়িয়াছেন, তাঁহার আর কিছুতেই উদ্ধার নাই। সুতরাং নবীনের উৎকোচ-গ্রহণ-শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তার পর মদ্যপান-শিক্ষা। নবীন যুবক থানায় আসিয়া দেখিলেন থানার প্রত্যেক কর্ম্মচারীই কোন না কোনরূপ নেশার বশীভূত। তাঁহার নেশার প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা ক্রমশঃ সঙ্গগুণে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পুরাতন পাপী ইনেস্পেক্টর বাবু পরিদর্শন উপলক্ষ্যে থানায় শুভাগমন করিলেন। তাঁহার আমোদের জন্য দারোগাকে মদ সংগ্রহ করিতে হইল। ইনেস্পেক্টর বাবু দারোগা বাবুকে এক গ্লাস গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। উচ্চতম কর্ম্মচারীর অনুরোধ গুরুর আজ্ঞা অপেক্ষা গুরুতর—সুতরাং তাহা লঙ্ঘন করিলে দারোগার ইহকাল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ। সুতরাং এক গেলাস সেবন করিতে হইল। ইতিমধ্যে ইনেস্পক্টর বাবুও কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া গেলেন, যথা :—“পুলিশের লোককে নানা স্থানে যাইতে হয়—নানা স্থানের জল খাইতে হয়—এইরূপ প্রত্যহ দূষিত জল-বায়ু সেবনে স্বাস্থ্যহানি হয়। অতএব একটু একটু মদ

খাইলে জল-বায়ু তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। নতুবা স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যাইবে।" থানার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—"দারোগা বাবু, আমরা কি সাধ করিয়া নেশা করি, নেশা করি দায়ে পড়িয়া।" কেহ বলিল—"মেলেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া আজ দুই বৎসর হইতে অহিফেন ধরিয়াছি—অহিফেনের প্রসাদে শরীর ভাল আছে," ইত্যাদি। এতগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ নবীন যুবক ঠেলিয়া ফেলিতে অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাকে মদ ধরিতে হইল। এইরূপে আমরা একমাত্র মাতাল ইনেস্পেক্টর কর্ত্তৃক এক এক মহকুমার যাবতীয় দারোগাকে মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দেখিয়াছি।

মফস্বলের অধিকাংশ থানাগুলিই যেরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহাতে পরিবার লইয়া দারোগার বাস করা সুকঠিন। বিশেষতঃ তথায় থাকিয়া ছেলেদের উপযুক্ত লেখাপড়া শিখাইবার উপায় নাই। উপরন্তু থানার সন্নিকটেই বেশ্যাপল্লী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বেশ্যাগুলি থানারই রক্ষিতা। আমরা যেরূপ সৈন্যাবাস সন্নিহিত বেশ্যাপল্লী দেখিতে পাই, থানার ব্যাপারও সেইরূপ। এইরূপে শত শত যুবক পুলিশে ঢুকিয়া স্ব স্ব জীবন কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু পুলিশ কমিশনের সাক্ষাতে এপর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন সাক্ষ্যই উপস্থিত হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বে পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে পরিদর্শনে যাহা হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিব। প্রতি থানায় একখানি করিয়া পরিদর্শন বহী থাকে। ঐ বহীতে উপরিতন কর্ম্মচারিগণ স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাহা এইরূপ :—

"১লা জানুয়ারি ১৯০৩। অদ্য বেলা ৮টার সময় থানা দেখিলাম। থানার হাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। থানার দারোগার পক্ষে ইহা কম

অতি অল্প দিন হইল ইন্‌স্পেক্টর পরিদর্শন করিয়া গিয়াছে; সুতরাং আর বিশেষরূপে দেখা নিষ্প্রয়োজনীয়।"

স্বাক্ষর এ, বি, জেড্।
ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।
১-১-০৩

দারোগা যে "সন্তোষজনক" যশ পাইল তাহার প্রধান সহায় সাহেবের অনুচর খানসামা, বাবুর্চ্চিগণ। কারণ তাহারা বকসিশ্ ও প্রচুর রসদ পাওয়ায় সাহেবের পূজায় কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই। দুই একজন তেজস্বী দারোগার কথা বলিব তাহা হইলে ভিতরকার ব্যাপার বুঝিতে আর কাহারও কষ্ট পাইতে হইবে না।

কোন সময়ে কোন থানায় একজন ইয়ং বেঙ্গল দারোগা ছিলেন। উক্ত থানা পরিদর্শনার্থে শ্রীল শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের শুভাগমন হইল। খানসামা, বাবুর্চ্চি দারোগার নিকট যাইয়া ১০টি মুরগী, ৩০টি আণ্ডা, ২ সের ঘৃত ইত্যাদি অতিরিক্তরূপ ফর্দ্দ দিল। দারোগা বলিল, "সাহেবের যাহা দরকার তাহাই দিব। এত জিনীস দিব না" বলিয়া দুইটি মুরগী, ৮টি ডিম, সের দুই খাঁটি দুধ এবং যথোপযুক্ত অন্যান্য উপকরণ দিল। তাহারা তাহা লইয়া অসন্তুষ্ট মনে প্রত্যাগমন করিল। অতঃপর প্রাতে চায়ের সহিত দুধে জল মিশাইয়া ধুমাটে গন্ধ করিয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিয়া দিল। সাহেব ঐ দুর্গন্ধযুক্ত চা দেখিয়া একেবারে জলিয়া আগুন—খানসামাকে চাবকাইতে যান। তখন খানসামা জোড়হাত করিয়া অম্লানবদনে বলিল, "খোদাবন্দ হামলোক কিয়া করেঙ্গে—হুজুর মা বাপ—দারোগাকো বোলা হুজুরকা বাস্তে আচ্ছা দুধ দেনে কো—তো এইসি খারাপ চিজ দিয়া।" ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া সাহেবের রাগ তখন গিয়া পড়িল দারোগার উপর।

মুখ হাত ধুইতেছিলেন। সাহেব থানায় আসিতেছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি কুর্ত্তি-উর্দ্দি লাগাইয়া সেলাম দিলেন। সাহেব প্রথমেই ডায়েরী বই দেখিতে চাহিলেন। তারপর যাহা ঘটিল তাহা পরিদর্শন বহী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত মন্তব্যেই প্রকাশ পাইবে :—

৩—৪—০৪। "অদ্য প্রাতঃকালে থানা পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখিলাম কোন কর্ম্মচারীই থানায় উপস্থিত নাই। আমার আসার কয়েক মিনিট পরে দারোগা চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার লাল চক্ষু এবং টলিতে টলিতে আসা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, সে গতরাত্রি মদ্যপানে অতিবাহিত করিয়াছে। ডায়েরী গত কল্য বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। তারপর আর লেখা হয় নাই। দারোগাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। অন্যান্য খাতাপত্রও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। পুলিশ সাহেব এই দারোগার বিরুদ্ধে প্রসিডিং করিয়া এবং উহার লিখিত কৈফিয়ৎ লইয়া হুকুমের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। এই দারোগা সম্পূর্ণ কাজের অযোগ্য। আমি ইহাকে আপাততঃ সসপেণ্ড করিলাম ইত্যাদি।" সাহেব লোকের আহারে বিঘ্ন ঘটিলে কিরূপ রাগ হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং ঐ অপরাধী দারোগা যে শেষে এক গ্রেড্ ডিগ্রেড্ হইয়া চাকরী পাইল তাহা তাহার সৌভাগ্যের কথাই বলিতে হইবে।

অতঃপর আর এক স্থলে আর এক দারোগার লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করিব। থানায় যেদিন সাহেবের শুভাগমন হইবে তাহার পূর্ব্ব রাত্রে সাহেবের তাম্বু লইয়া কয়েকজন চাপরাশী থানায় উপস্থিত। সাহেবের তাম্বু তুলিবার জন্য প্রায় ৫০ জন চৌকিদার উপস্থিত হইয়াছে। এই-খানে আর এক কথা বলিয়া রাখি আজ কাল গবর্ণমেণ্টের বিধান

drawers of water) নিয়োগ নিষেধ। কিন্তু ইহারা পূর্ব্বেও যেরূপ চাকর ছিল এখনও সেইরূপই আছে, অবস্থার পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটে নাই। সাহেবের চাপরাশী সেই চৌকিদারগণকে দিয়া তাম্বু খাড়া করাইতেছে এবং কাহাকেও কাহাকেও দুই এক চপেটাঘাতও দিতেছে। সহসা একজন চৌকিদার তাহার কর্ণমূলে এক চপেটাঘাত পড়ায় মূচ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন সকলে মিলিয়া জলসিঞ্চন করিয়া তাহাকে চেতন করিল। চেতন হইয়াও আহত ব্যক্তি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দারোগা আঘাতকারী চাপরাশীকে বকিতে লাগিল এবং সাহেব আসিলে তাহার অন্যায় প্রহারের কথা সাহেবের গোচরে আনিবে তাহাও বলিল। চাপরাশী তখন সাহেবের কাণে একথা যেন না উঠে তজ্জন্য দারোগাকে অনেক মিনতি করিল। দারোগা পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী—অত্যন্ত কোপন-স্বভাব। চাপরাশীর মিনতি তিনি শুনিলেন না। তখন চাপরাশী আত্মরক্ষার্থ যে কৌশল অবলম্বন করিল তাহাতে দারোগাকে অত্যন্ত অপদস্থ হইতে হইল।

যাঁহাদের পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে পল্লী-গ্রামের শ্রমজীবীরা তামাক সেবনের জন্য অগ্নি রক্ষার্থ বিচালী পাকাইয়া মশাল তৈয়ারি করে। ঐ মসালের এক প্রান্তে আগুন ধরাইয়া লয়। ঐ আগুন ধীরে ধীরে জ্বলে এবং অনেকক্ষণ থাকে। ঐ চৌকিদারগণও ঐরূপ মসাল ধরাইয়া তামাক খাইতেছিল। সেই অর্দ্ধদগ্ধ মশালটি কুড়াইয়া আনিয়া চাপরাশী তাম্বুর কাছে গোপনে রাখিয়া দিল।

সাহেব অশ্বারোহণে তাম্বুতে আসিয়া নামিবামাত্র দারোগা সাহেবকে সমস্ত কথা জানাইল এবং সেই কম্পমান চৌকীদারকে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সাহেব সমস্ত শুনিয়া চাপরাশীকে ডাকিলেন। চাপরাশী নির্ভয়ে বলিল যে সে ঐ চৌকিদারকে মারিয়াছে; মারাটি

কারণ উল্লেখ করিল যে, ঐ আহত চৌকীদারকে তাম্বুর নিকট তামাক খাইতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল; চৌকিদার যখন তাহার কথা শুনিল না তখন তাহাকে মারিয়াছে। চাপরাশী স্বয়ং যদি সতর্ক না থাকিত তাহা হইলে তাম্বুতে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাইত। এবম্প্রকার রচনায় কৈফিয়ৎ দিয়া চাপরাশী সেই তাম্বু সন্নিহিত অর্দ্ধদগ্ধ বিচালীর মশাল সাহেবকে দেখাইয়া দিল। সাহেবের দুর্জ্জয় ক্রোধ তখন দারোগার উপর গিয়া পড়িল। দারোগা যথেষ্ট তিরস্কৃত হইলেন এবং সে যাত্রা ৪০৲ টাকা জরিমানা দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

আমরা ইতিপুর্ব্বে থানা পরিদর্শনের যে আভাষ দিয়াছি তাহাতে বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠকগণকে আর বলিতে হইবে না যে, সাহেব মহোদয়গণের পরিদর্শনে দারোগাগণের কর্ত্তব্যজ্ঞান কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, বরং নানারূপ অন্যায় অত্যাচার প্রশ্রয় পায়। মফস্বলের জমিদারগণ তাহা বিলক্ষণ জানেন। সে সকল বিষয় এখানে বিবৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অভিযোগ এই যে, দেশবাসিগণ (Natives) পুলিশের সাহায্য করে না, সেইজন্য পুলিশ অনুসন্ধান ব্যাপারে কৃতকার্য্য হয় না। ইহার কারণ অনেকগুলি, তার মধ্যে কতকগুলি ইতিমধ্যেই সাক্ষীর মুখে প্রকাশ হইয়াছে। আমরা একটির কথা উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষিগণের খোরাকী ও পাথেয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে নিয়ম আছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে :—

শ্রমজীবী সাক্ষী (Labouring class) প্রত্যহ দুই আনা হিসাবে খোরাকী পাইবে, পাথেয় (নৌকা ভাড়া ব্যতীত) প্রায় পায় না।

(Natives of higher rank) তদুচ্চ শ্রেণীর স্বদেশীগণ খোরাকী

(Natives of superior rank and Europeans) ইউরোপীয়গণ এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় স্বদেশী—খোরাকী এক টাকা হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যহ। তদ্ব্যতীত পাথেয় প্রতি মাইল চারি আনা হিসাবের অনধিক।

তৃতীয় শ্রেণীর সাক্ষিগণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ যথেষ্ট—আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই এবং এই শ্রেণীর সাক্ষিগণ খোরাকী ইত্যাদি বাবতে যদি কিছু না পান তাহা হইলেও তাঁহাদের বড় ক্ষতি নাই। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সাক্ষী শ্রমজীবীর পক্ষে খোরাকী দুই আনা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সাক্ষীর চারি আনা খোরাকী যথেষ্ট নহে। মফস্বল হইতে সহরে আসিয়া আহারাদি ব্যবস্থায় শ্রমজীবীর দুই আনায় কুলায় না। যদি তাহাকে সাক্ষ্য দিতে না আসিতে হইত তাহা হইলে সে অনায়াসে চারি আনা পয়সা ও জলখাবার উপার্জ্জন করিতে পারিত এবং তাহাতেই তাহার ও তাহার পরিবারগণের কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে আসিয়া তাহার নিজের যৎকিঞ্চিৎ আহার এবং পরিবারগণের উপবাস লাভ হয়; সুতরাং এরূপ ব্যবস্থায় কে স্ব ইচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হয়? দ্বিতীয় শ্রেণীর সাক্ষী ও তৃতীয় শ্রেণীর দেশী সাক্ষীর মধ্যে আহারের তারতম্য যৎসামান্য; সুতরাং দ্বিতীয়ের খোরাকীর ব্যবস্থা তৃতীয়ের অন্ততঃ চতুর্থাংশ, ইহাও সমীচীন নহে। এই সকল বিষয়ে পুলিশ কমিশনের দৃষ্টি পতিত হওয়া উচিত।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মিত্র।

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS

সুন্দরী।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাহ্নসময়ে নবগোপালের ক্ষুদ্র নৌকাখানি আবার আসিয়া মহেশপুরের ঘাটে লাগিল। বিগত দিবসদ্বয়ে তাহার উপর দিয়া যে ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তাহার স্পষ্ট চিহ্ন নবগোপালের শুষ্কমুখে ও নিষ্প্রভ চক্ষুযুগলে দেদীপ্যমান।

নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র লম্ফ দিয়া নবগোপাল তীরে অবতরণ করিল। দাঁড়িমাঝিগণকে বলিল যেন তাহারা প্রস্তুত থাকে, ফিরিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইবে না। এই বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনের অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার গতিবেগ অধিকক্ষণ দ্রুত রহিল না—সত্বরই প্রশমতা প্রাপ্ত হইল। এই বনপথে যে নানা স্থানে, নানা সময়ে কোনও বনবালার সাক্ষাৎ পাইয়াছিল,—বোধ করি তাহারই অতর্কিত দর্শনলালসায় নবগোপালের চঞ্চল চক্ষু ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

যদি তাহার মনে সে আশার উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা পূর্ণ হইল না। ক্রমে গদাধরের গৃহ নয়নপথবর্ত্তী হইল। বাটীর বাহিরের বাগান খানিতে যেন একটি মনুষ্যমূর্ত্তি,—নবগোপাল অনুমান করিল গদাধর হইতে পারেন, তাহার অনুমান মিথ্যা হইল না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই সে দেখিল, গদাধর কয়েকটি নবরোপিত ফুলগাছে "কেয়ারি" করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। নবগোপালকে দেখিয়া তিনি সাদর-সম্ভাষণে গৃহে লইয়া গেলেন। একটি নিভৃত কক্ষে, তক্তপোষের উপর দুইজনে উপবেশন করিলেন। তক্তপোষখানির উপর একখানি

ছিটের আবরণ। শতচ্ছিন্নখানির যেটুকু দেখা যাইতেছিল তাহা হইতে মনে হয়, মানুষের নগ্ন আত্মার মত, তাহার নগ্নত্বও সর্ব্বথা দর্শনযোগ্য নহে।—একটু লক্ষ্য করিলে জানা যায়, ছিটের বস্ত্রটি একখানি শীতকালের দোলাই ;—নবগোপালের আগমন সংবাদে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে এই "ডেপ্যুটেশনে" নিয়োগ করিয়াছেন।

বসিয়া নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"আমার চিঠি পেয়েছেন ?"

"পেয়েছি আজ সকালে।"

"কি স্থির করলেন ?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে গঙ্গাধর কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমার পিতাঠাকুর সম্মতি দেন নি শুনে দুঃখিত হলাম। তা সে আশাও আমি করিনি। তুমি যখন স্বয়ং আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, তখন আমি কোনও আপত্তি করব না—এ ত আমার সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি যা বলেছ তাও ঠিক, বিবাহ এখানে হওয়া নিরাপদ নয়। অন্য কোথাও যাওয়া এখন আবশ্যক।

"কোথায় যাবেন কিছু স্থির করেছেন ?"

"করেছি।" বলিয়া গদাধর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"কলকাতা ?"

"না।"—গদাধরের ভ্রূযুগল তখনও কুঞ্চিত। "তবে ?"—জিজ্ঞাসা করিয়া নবগোপাল গদাধরের প্রতি উৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ অধীরতা।

গদাধর বাক্যস্ফূরণ করিলেন। বলিলেন—"তোমাকে বলেছি বোধ হয়, পঞ্জাবে আমার ছেলে কৃষ্ণধন চাকরি করে। রাওলপিণ্ডিতে কমিসারিয়েটের কেরাণী। আমার ইচ্ছা, আমরা সকলে সেইখানে যাই, সেইখানেই শুভকার্য্য সমাধা হয়। কলকাতার চেয়েও সে নিরাপদ

হবে। কলকাতাতে তোমার পিতার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন। মনে করলে তিনি সেখানে অনায়াসেই ব্যাঘাত জন্মাতে পারেন। তুমি কি বল ?”

নবগোপাল উত্তর করিল—“আমার পক্ষে দুই সমান। আপনি যদি পঞ্জাবে সুবিধা মনে করেন তবে তাই হোক্।”

শুনিয়া গদাধরের মুখ প্রফুল্ল হইল। বলিলেন—“তা ভাল, বিবাহের দিন একটা তবে স্থির করা যাক্। কত শীঘ্র তুমি প্রস্তুত হ’তে পার ?”

নবগোপাল বলিল—“কলকাতায় আমাকে একবার যেতে হ’বে। সেখানে সপ্তাহ খানেক আমার থাকা প্রয়োজন। তারপর আমি পঞ্জাব যাত্রা করতে পারব।”

“তা হ’লে ধর, এখন থেকে এক পক্ষ পরে যদি দিনস্থির করা যায় তা হলে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না ?”

“না।”

“উত্তম। তবে পাঁজিটা দেখি। তুমি একটু বোসো,—আমি এখনি আসছি।” এই বলিয়া চট্টোপাধ্যায় কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

নবগোপাল ইতিমধ্যে কক্ষখানির চতুষ্পার্শ্ব ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইল। যদিও ভিত্তিগুলি মৃণ্ময়,—মেঝেটি সানে বাঁধা। সদ্যধৌত বলিয়া বোধ হয়। দেওয়ালে কয়েকটি কুলুঙ্গি, তাহার কোনওটিতে একটি মাটীর গণেশ, কোনটিতে একটি “সিঁদুর চুপড়ী”, কোনটিতে বা বটতলার বাঁধা দুই খানি ধর্ম্মকাব্য রক্ষিত। একটি কোণে একটি বড় বাহারের দ্রব্য ঝুলিতেছিল—তাহা কড়ির আলনা। তাহার অবলম্বনরজ্জু দুইটি শালু দিয়া মোড়া,—শালুর উপর গুচ্ছ গুচ্ছ “চিকি” কড়ি বসানো। আলনাটিতে কয়েকখানি লেপ বোধ হয়

বস্ত্র দিয়া উত্তমরূপে মোড়া। এই লেপের দুইটী “গলি” পিসীমার পরম গোপনীয় স্থান। বালিকাগণের চক্ষু হইতে যাহা কিছু তিনি অন্তরালে করিবার ইচ্ছা করেন,—তাহা এই গলির মধ্যে প্রবেশ করে (এই সংবাদ বালিকাগণ সবিশেষ অবগত ছিল)।

গদাধর ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি বিনামূল্যে বিতরিত, স্বর্ণসিন্দুর-মহামৃতরসায়নাদির বিজ্ঞাপন-কণ্টকিত কবিরাজী পঞ্জিকা এবং একখানি চশমা। উপবেশনান্তর গদাধর চশমাটি বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিলেন। পরে তাহা চক্ষে সংলগ্ন করিয়া পঞ্জিকার শুভদিনের নির্ঘণ্ট পৃষ্ঠাটি বাহির করিলেন। অনুচ্চস্বরে এইরূপ বলিয়া যাইতে লাগিলেন :—

“বিবাহ—বিবাহ—আষাঢ়—অনেকগুলো দিন আছে দেখছি—৪।৫। ১১।১৪।২৬।২৭।৩১—আজ হল গিয়ে তোমার কঁয়ুই?—১৯শে জ্যৈষ্ঠ। এ মাসের বাকা থাকে বার দিন,—ওমাসের চার দিন, তা হলে হল গিয়ে যোল দিন,—ঠিকই হবে।” বলিয়া তিনি “শুভদিনের নির্ঘণ্ট” ছাড়িয়া পঞ্জিকার অভ্যন্তরভাগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাস্থানে আসিয়া আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন :—“৪ঠা আষাঢ় ইংরাজি ১৮ই জুন মুং—যাক্। বুধবার ত্রয়োদশী বিশাখা নক্ষত্র কৌলবকরণ সিদ্ধিযোগ এত গতে নক্ষত্রামৃতযোগ জন্মে তুলারাশি—যাক্। ইংরাজি ঘণ্টা ১০।২৩।৯ সেঃ মধ্যে ধনুমকরলগ্নে শুতহিবুকযোগে বিবাহ।—দক্ষিণে যোগিনী—চুলোয় যাক্। বার্ত্তাকুভক্ষণ নিষেধ।—যাক্—তা হলে ৪ঠা ত দিন বেশ ভালই দেখছি। ৪ঠাই তবে স্থির হোক্—কি বল তুমি?”

নবগোপাল বলিল—“তা বেশ। আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি সময়মত সেখানে উপস্থিত হব। আপনি আমাকে ঠিকানাটা

গদাধর তখন এক টুকরা কাগজে কৃষ্ণধনের ঠিকানাটি লিখিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কবে কলকাতায় যাচ্ছ?"

"দুই তিন দিনের মধ্যেই।"

"তোমার কলকাতার ঠিকানা আমায় দাও, যদি কোনও সংবাদ পাঠাবার আবশ্যক হয়।"

নবগোপাল তাহার কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া দিল।

অতঃপর সে বিদায় প্রার্থনা করিল কিন্তু গদাধর কহিলেন তাহা কোনও মতেই হইবে না, আজ সান্ধ্যভোজন তাহাকে এইখানে সম্পন্ন করিয়া যাইতে হইবে। নবগোপাল বলিল যদি সে তাঁহার নিমন্ত্রণ আজ গ্রহণ করিতে পারিত তবে অত্যন্ত সুখী হইত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা প্রয়োজনে অধিক রাত্রির পূর্ব্বে তাহাকে গৃহে ফিরিতেই হইবে। অবশেষে নবগোপাল কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল।

এতক্ষণ বাড়ীর কোথাও নবগোপাল রমাকে দেখিতে পায় নাই—তাহার কণ্ঠস্বরও শুনিতে পায় নাই। স্বাভাবিক লজ্জায় রমার সংবাদও লইতে পারিতেছিল না। তাহার বিদায় গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই একটি মূর্ত্তিমতী সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল,—সে নৃত্যরতা রাজলক্ষ্মী। এই বালিকার সঙ্গে ইতিমধ্যে নবগোপালের বেশ একটু ঘনিষ্টতার সূত্রপাত হইয়াছে। সে তাহাকে রঙ্গ করিয়া "রাজা মশাই" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর তাহাতে অত্যন্তই আমোদ। "রাজা মশাই" সম্বোধনে কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার হাসির ফোয়ারায় উত্তর করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত। রাজলক্ষ্মী নবগোপালের নাম বাঁকাইয়া একটা কিছু মজা করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মনোমত কিছু না পাইয়া অবশেষে তাহার "মন্ত্রী মশাই" নামকরণ করিয়া ক্ষোভসম্বরণ করিয়াছে।

নবগোপালের বিদায়ের প্রাক্‌কালে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা মন্ত্রী মশাই তোমার বন্দুকটা এনেছ?"

"এনেছি বৈকি—আমার নৌকায় আছে। দেখ্‌বে?"

"আমায় নিয়ে চল আমি দেখ্‌ব।"

রাজলক্ষ্মী নবগোপালের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে চলিল। বাহির হইয়াই বলিল—"ওগো আমরা কোথা যাব জান?"

"না। কোথা বল দিখিন?"

রাজলক্ষ্মী গুরুতর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল—"পঞ্জাব।"

নবগোপাল বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—"অ্যাঁ! বল কি?"

রাজলক্ষ্মী গম্ভীরভাবে শিরশ্চালনা করিতে লাগিল।

"আর কে যাবে পঞ্জাব?"

"বাবা যাবে, দিদি যাবে।"

"তোমার দিদি আজ কোথা গেছে? তাকে ত কৈ দেখতে পেলাম না।

"দিদি কোথা গেছে জাননা বুঝি?"

"না।"

"সে গেছে যদু পুরুতদের বাড়ী চুল বাঁধতে। ফিতে, চিরুণী, পেরজাপতি সব নিয়ে সে চুল বাঁধতে গেছে। সে কিছুতেই যাবে না,—পিসীমা তাকে ধরে বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

নবগোপাল মনে মনে ভাবিল,—আগমন সংবাদটা পূর্ব্ব হইতে পাঠাইয়া ভাল হয় নাই।

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

সে দিন সন্ধ্যাবেলা গদাধর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার পুত্রকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া

যাত্রা করিলেন ;—পত্রখানি স্বহস্তে ডাকঘরে রেজিষ্টারি করিলেন, এবং প্রভুর নিকট এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিলেন।

পঞ্চম দিনে গদাধর এই পোষ্ট আফিসে আসিয়া ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ডাক আসিলে তাঁহার নামে একখানি রেজিষ্টারি পত্র বাহির হইল—পুত্রের উত্তর। বাটী ফিরিয়া সেদিন সন্ধ্যাকালে এই পত্রখানি এবং বাড়ীতে যেখানে যত পুরাতন পত্র ছিল, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আনিয়া, একত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিলেন।

পরদিন গদাধর সপরিবারে পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। যে ষ্টেশনে রেলে উঠিলেন, সে ষ্টেশনে আর একখানি পত্র রেজিষ্টারি করিলেন,—তাহা নবগোপালের নামে,—কলিকাতার ঠিকানায়।

গাড়ীতে রমা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লছমীর নিকট বলিতেছিল,—নবগোপালের নিকট শুনিয়াছে পঞ্জাব যাইবার পথে বিস্তর পাহাড়, বন ও নদী আছে—সে সমস্ত গাড়ী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া দেশে ফিরিয়া সে নবগোপালের নিকট কিরূপ ঘটা করিয়া গল্প যে করিবে,—তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ লছমীকে দিতেছিল। এ পর্য্যন্ত রমা ঘুণাক্ষরেও জানে না কেন তাহারা পঞ্জাব যাইতেছে। পাছে বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় গদাধর এমনই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, এই পরামর্শটি তাঁহার, লছমীর ও পিসীমার মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ ছিল।

নবগোপালের প্রসঙ্গ রমা বারম্বার যখন উত্থাপন করিতে লাগিল, তখন লছমী আর থাকিতে পারিল না,—রমাকে সংবাদটা দিল।

রমা বিস্ময়ে তাহার ডাগর চক্ষু দুইটি ধাত্রীর পানে স্থাপন করিয়া বলিল—"সত্যি ?"

লছমীর চক্ষে একটু পরিহাসের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে বলিল—"সত্যি হলে খুসী হোস ?"

রমাকে কেহ শিখায় নাই যে বিবাহপ্রসঙ্গে লজ্জা করিতে হয়। কিন্তু সে এক সপ্তাহ হইল পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। লছমীর প্রশ্নে এই শিক্ষাবিহীনারও গণ্ডযুগল রক্তিম হইয়া উঠিল; কিন্তু তথাপি সে সরলতাবশতঃ ইঙ্গিতে উত্তর করিল—হয়।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নবগোপালের মাতা যখন শুনিলেন সে কলিকাতা এবং তথা হইতে পঞ্জাব যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন তিনি আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন, এই ভ্রমণে তাহার শরীর ও মন উভয়ই ভাল হইবে। একয়দিন তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় দুঃখে বিগলিত হইতেছিল। এখানে এমন একটি সঙ্গী সাথী নাই যে নবগোপালের সঙ্গে দুই দণ্ড বসিয়া গল্প করে—কোনও আমোদ প্রমোদে রত হয়। কলিকাতায় নবগোপালের অনেক বয়স্য—তাহাদের সংসর্গে তাহার মনের অন্ধকার শীঘ্রই দূর হইবে। কান্তিচন্দ্রও পুত্রের এ কল্পনা শুনিয়া মনে মনে খুশী হইলেন—ভাবিলেন "অশুভস্য কালহরণং"—সময়ে সে গোমস্তার মেয়েকে বিবাহ করিবার আবদার বিস্মৃত হইতে পারে।

মহেশপুর হইতে ফিরিবার দুই দিন পরে নবগোপাল রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করিল।

ইহার এক সপ্তাহ পরে, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, সীতারায় স্বীয় গৃহে বসিয়া ধূমপান ও জননীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত নবগোপালের আশু-বিবাহ-সম্ভাবনা দূরীভূত,—এই কারণে মাতা ও পুত্রের মুখ একটু প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছিল। সময়ের গতিকে কত কি হইতে পারে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা কে জানে?

বাটী হইতে দ্বারবান আসিয়া সহসা সংবাদ দিল, বাবু রায়জিকে স্মরণ করিয়াছেন। বাবু রায়জিকে সময়ে অসময়ে প্রায়ই স্মরণ করিতেন, সুতরাং ইহা কিছুই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা নহে। সীতানাথ বেশ পরিধান করিয়া, হস্তস্থিত লগুড় দোলাইতে দোলাইতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, কাছারি বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সীতানাথ দালানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন আর কেহই নাই—শুধু কান্তিচন্দ্র ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। সীতানাথ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন,—বুঝিলেন বিশেষ কিছু ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভায়া, ব্যাপার কি ?"

কান্তিচন্দ্র কিছুই না বলিয়া সীতানাথের হস্তে একখানি খোলা ডাকের পত্র দিলেন। সীতানাথ তাহা লইয়া পড়িবার জন্য জানালার আলোকের কাছে দাঁড়াইলেন। পত্রখানি এইরূপ।—

কলিকাতা,

২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীচরণেষু—

আমি অদ্য পশ্চিম যাত্রা করিতেছি। আগামী ৪ঠা আষাঢ় শ্রীযুক্ত গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী রমাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিব। নিবেদন ইতি—

শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র পড়িয়া সীতারায় কান্তিচন্দ্রের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—"এখন উপায় ?"

"উপায় পরামর্শ করবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। এ বিয়ে বন্ধ করতে হ'বে। যেমন করে হোক্।"

"নিশ্চয়। বলেছে পশ্চিম—কোথাও তা কিছু অনুমান করতে পার ?"

"কিছু না। সে সব আবিষ্কার করতে হবে। বেশ বোঝা যাচ্চে,—পাছে আমরা বাধা দিই, তাই পশ্চিমে যাচ্চে। আজ ২৯শে,—বিবাহ হতে এখনও ছদিন বাকী। হয় ত গদাধর এখনও মেয়ে নিয়ে পশ্চিম যায়নি। তুমি আজই মহেশপুর যাও—এখনি। যদি মেয়ে এখনও সেখানে থাকে,—মেয়েকে ধরে নিয়ে এস। যদি চলে গিয়ে থাকে, বাড়ীর অন্য লোকের কাছ থেকে সব সন্ধান জেনে এস,—কালই আমরা পশ্চিম রওনা হব।"

সীতানাথ এক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"সন্ধান তারা সহজে দেবে কি ?"

কান্তিচন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"যেমন করে ডাকাত পড়ে, তেমনি করে তাদের উপর গিয়ে পড়। প্রাণের দায়ে তারা সন্ধান বলে দেবে।"

কান্তিচন্দ্রের ক্রোধ ও উত্তেজনা সীতানাথের মনেও বিদ্যুৎপ্রভাব সৃজন করিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"বেশ, আমি প্রস্তুত আছি। আমায় লাঠিয়াল দাও, মশাল দাও, হাতী দাও—আমি যদি কার্য্য উদ্ধার না করে আসতে পারি তা হলে—তা হলে—"

তাহা হইলে আত্মপ্রতি কি অবমাননা স্বেচ্ছায় বরণ করিবেন সীতানাথ স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"সব দিচ্চি। আমার এই কার্য্য যদি তুমি উদ্ধার করতে পার, তবে জানব তোমার মত বন্ধু আমার আর নেই।"

কান্তিচন্দ্র বড়ই উত্তেজিত হইয়াছিলেন নতুবা সচরাচর তিনি ভাবসিক্ত হইয়া উঠেন না।

কান্তিচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে ভৃত্যগণ বিদ্যুৎবেগে গ্রামে গ্রামে ছুটিল। অনতিবিলম্বে বিংশতি জন যমসদৃশ গোয়ালা ও বাগ্দী লাঠিয়াল এবং

মশাল প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেল। দুইটা প্রকাণ্ডকায় হস্তীও সজ্জিত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

অগ্রগামী হস্তীর উপর একটি মাত্র মশাল জ্বালাইয়া, নিঃশব্দে সসৈন্য, সশস্ত্র সীতানাথ যাত্রা করিলেন। রাত্রি তখন এক প্রহর অতীত হইয়াছে। বিশালাক্ষী হইতে মহেশপুর স্থলপথে ছয় ক্রোশ হইবে। যখন অনুমান মধ্যরাত্রি তখন দলবল মহেশপুরে পৌঁছিল।

দলস্থ দুই তিন ব্যক্তি গদাধরের গৃহ জানিত। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইল। সীতারায়ের আজ্ঞায় সমস্ত মশাল প্রজ্জ্বলিত হইল এবং সকলে মিলিয়া সমস্বরে "ডাকাতি চীৎকার" করিল।

সদর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সীতারায় দেখিলেন তালা বন্ধ। ভাবিলেন তবে পাখী উড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর লোককে ভয় দেখাইয়া ঠিকানা লইবেন ভাবিয়াছিলেন, সে পথও ত বন্ধ। এক মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া হুকুম দিলেন—"তালা ভাঙ্গ।"

তালা ভাঙ্গিতে দুই সেকেণ্ড মাত্র লাগিল। দশজন অনুচর লইয়া, হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, সীতারায় অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর বিড়ালটা উঠানে ছাইগাদায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, সে এই আলোক ও লোকসমাগম দেখিয়া "মেও" করিয়া পলাইয়া গেল।

সীতারায় মশালের আলোকে সমস্ত কক্ষগুলির বহির্দ্দেশ পরীক্ষা করিলেন। যে কক্ষটি প্রধান বলিয়া মনে হইল, তাহার তালা ভাঙ্গিতে হুকুম দিলেন।

সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে পুরাতন পত্রাদির জন্য অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বাক্স, পেটারা যাহা কিছু ছিল সমস্ত ভাঙ্গাইয়া উলট

তাহার পর আর একটি কক্ষে এবং আর একটি কক্ষে এবং শেষে রান্নাঘরে অন্বেষণ করিলেন—কোথাও কিছু নাই। শেষে বলিলেন—চালের বাতাগুলা দেখিতে হইবে। মশালের আলোকে চালের বাতা অন্বেষণ করিয়াও কিছুই পাইলেন না;—কিন্তু হঠাৎ একটা স্থানে আগুন ধরিয়া গেল।

অনুচরগণ সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে যাইতেছিল কিন্তু ভগ্নমনোরথ ক্রুদ্ধ সীতানাথ হাঁকিলেন—"নিবুস্‌নে—নিবুস্‌নে—জ্বলুক—জ্বলুক।" তৎক্ষণাৎ অঙ্গন পার হইয়া সদর দরজার বাহিরে আসিয়া হস্তী দুইটার মাহুতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোদের হাতী দেওয়াল ফেলতে পারে?—মাটীর দেওয়াল,—পাকা নয়।"

তাহারা দুইজনে সমস্বরে উত্তর করিল—"কেন পারবে না হুজুর? হুকুম পেলেই পারে।"

সীতানাথ হুকুম দিলেন—"তবে যা,—বাড়ীর পিছন দিকে যা,—সব ঘরের দেওয়াল একে একে ফেলে দে।"

মাহুতগণ তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালন করিতে ধাবমান হইল। অগ্নি-সংলগ্ন কক্ষের সম্মুখদিকের চালই তখন জ্বলিতেছিল,—পশ্চাতের চালে তখনও আগুন পৌঁছে নাই। দুইটা হস্তী ইঙ্গিত অনুসারে দেওয়ালে গাত্রস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। দ্বিতীয় ইঙ্গিতমাত্র, বিকট চীৎকার করিয়া তাহারা যুগপৎ দেওয়াল ঠেলিয়া দিল,—মহাশব্দে তাহা ভিতরদিকে হেলিয়া পড়িল। পশ্চাতের চালটাও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—দেখিতে দেখিতে অগ্নিময় হইয়া উঠিল।

এইরূপ একে একে সব কক্ষগুলি ভগ্ন হইল। সীতারাম স্বহস্তে একটা মশাল লইয়া সব চাল গুলাতে ধরাইয়া দিলেন।

সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে তখন নৈশ অন্ধকার পলায়িত—দিবাবৎ

সম্মুখে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া সীতারাম হর্ষে দন্ত উন্মীলন করিলেন। তীব্র আলোকে অল্পদূরেই আর একখানি গৃহ দেখা গেল, তাহা যদু পুরোহিতের বাটী। সীতারাম অতঃপর সসৈন্যে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, একজন বাগ্‌দী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া খুলিয়া দিল। সদলবলে সীতারাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সমস্ত কক্ষের দরজা খোলা কোথাও জনমনুষ্য নাই।

যদি কাহাকেও পাওয়া যায় এই আশায় তাঁহার অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে গোশালার নিকট একটা ভুষী রাখিবার বৃহৎ জালার মধ্যে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সন্ধান পাওয়া গেল।

বলপূর্ব্বক জালা হইতে বহিষ্কৃত হইবামাত্র স্ত্রীলোকটি সকরুণ ভাবে বিকট চীৎকার করিয়া বলিল—"ওগো ডাকাত বাবা, যা কিছু আছে সর্ব্বস্ব নিয়ে যাও গো, প্রাণে মেরে ফেলো না।" এই বলিয়া সে ভূমিতে পড়িয়া সম্মুখবর্ত্তী মশালধারিগণের পদতলে লুঠাইতে লাগিল।

সীতারাম বলিলেন—"চুপ কর মাগী, যা বলি তা শোন্।"

কিন্তু সে স্ত্রীলোকটি পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিল—"ওগো তোমরা যখন রৈ রৈ করে ওদের বাড়ী এসে পড়লে গো, তখন এ বাড়ীর লোক সবাই পালিয়ে গেল খিড়কী দরজা দিয়ে,—আমি বুড়ো মানুষ রাতকাণা চোখে দেখতে পাইনে বাবা—আমি জালার মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম—"

সীতারাম হাঁকিলেন—"চুপ কর বলছি।" বৃদ্ধা আর্ত্তনাদের স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিল—"ওগো দোহাই বাবা সাত দোহাই তোমাদের—আমি কিছু জানিনে—ছোটলোকের মেয়ে বাবা, গতর খাটিয়ে

সীতারাম একটা সড়কী লইয়া তাহার অগ্রভাগ বৃদ্ধার দেহের অতি সন্নিকটে ধারণ করিয়া বলিলেন—"আর একটি কথা কবি কি এই সড়কী পেটে চালিয়ে দেব।"

ইহার ফল "মন্ত্রবৎ" আশ্চর্য্যজনক হইল। বৃদ্ধা নীরব।

সীতারাম সড়কী সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও বাড়ীর গদাধর চাটুয্যে কোথা গেছে?"

"গদাধর চাটুয্যে আজ দুদিন হল সপরিবারে পশ্চিম গেছে বাবা।"

"পশ্চিমে কোন্ থানে?"

"রাওলপিণ্ডি না কি মুণ্ডু বলে সেই থানে তার ছেলে চাকরী করে বাবা, সেই থানে গেছে। দোহাই বাবা আমি কিছু জানিনে বাবা—গোমস্তা মানুষ অনেক টাকা খাজনা আদায় করে আনে বটে, কোথায় রাখে তা জানিনে বাবা—"

"চুপ কর বুড়ী। ছেলের নাম কি?

"ছেলের নাম? কেষ্টধন বাবা—দোহাই বাবা—আমি গরীব নোক বাবা—"

ইহা শ্রবণানন্তর সীতানাথ সদলবলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে দুই ঘণ্টার মধ্যে বিশালাক্ষীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৎক্ষণাৎ, কান্তিচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কান্তিচন্দ্র তোষাখানার শয্যাতল আশ্রয় করিয়াছিলেন। সীতানাথের নিকট সমস্ত বার্ত্তা শুনিয়া স্থির করিলেন—পরদিন প্রভাত হইবামাত্র পঞ্জাব যাত্রা করিবেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক যৎকিঞ্চিৎ।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের প্যালিয়ামেণ্ট খুলিয়াছে. সেই সভায় সম্রাটের বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল। সম্রাটের বক্তৃতায় তাঁহার সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রসঙ্গে অনেক কথা থাকে, সুতরাং ভারত সম্বন্ধেও দুই চারি কথা থাকে, চির দিনই থাকে, এবারও ছিল। ভারতপ্রসঙ্গে সম্রাট বলিয়াছেন, "দিল্লীনগরে মহাসমারোহে আমার মুকুটধারণের ঘোষণা সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমি ভারতীয় ভূপাল ও প্রজাবৃন্দের আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতির পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সুখের কথা এই যে, এই সুবিরাট উৎসবের আরম্ভকালেই জলকষ্ট দূর হইয়াগিয়াছে, পশ্চিম ভারতের কৃষিবিষয়ক অসুবিধাও দূর হইয়াছে. ভারত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও কৃষির অবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা অপেক্ষা অধিক উন্নত ও আশাপ্রদ।"

আমাদের মনে আছে কলিকাতায় অভিষেকোৎসবে যখন শ্রীযুক্ত ভওন লাল লোহিয়া মহাশয় নিজের অর্থব্যয়ে কাঙ্গালী খাওয়াইতেছিলেন, সেই সময় অনুচরবেষ্টিত লর্ড কর্জ্জন সেই কাঙ্গালীভোজন দেখিতে গিয়াছিলেন, একজন কাঙ্গালী লাট সাহেবকে শুনাইবার জন্য বলিল, "হাম ভুখা হ্যায়"—লাট সাহেবের সঙ্গে একটি তৈলভাণ্ডবাহী মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন, লাট সাহেব ভিখারীর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভিখারীটা কি বলে? উত্তরে সেই মুসলমান খয়েরখাঁটি বলিলেন, ও লাট সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে অনেক গুলি দেশীয় সংবাদ পত্রে সেই মুসলমানটির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত হইয়াছিল। এ দেশের

আশীর্ব্বাদের দুন্দুভিধ্বনি বলিয়া জানিতে পান, সুতরাং বিলাতে বসিয়া ভারতসম্রাট যে, সরকারী কাগজপত্রে ভারতের উন্নতি ও সুখসমৃদ্ধির পরিচয় পাইবেন ইহা অসম্ভব নহে, বিস্ময়জনকও নহে। বস্তুতঃ এই মুসলমান ভদ্রলোকটির অপরাধ যতটুকু—সম্রাটের নিকট যাঁহারা ভারতের সুখসমৃদ্ধির সংবাদ প্রেরণ করেন তাঁহাদের অপরাধ তাহা অপেক্ষা অল্প নহে; কিন্তু ভারতের রাজকার্য্য এখন এই ভাবেই সম্পন্ন হইতেছে। ভারতের প্রজাগণ অনাহারে মরুক, অনাবৃষ্টিতে আর্ত্তনাদ করুক, করভারে নিপীড়িত হউক, তাহারা পরম সুখে আছে এ কথা ঘোষণা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। কিন্তু ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের আত্মপ্রসাদ ভিন্ন প্রজাবৃন্দের কোন উপকার কিছুই লাভ নাই। ভারতসম্রাট যদি ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের প্রকৃত অবস্থার কথা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতপ্রসঙ্গে এ সকল কথা উল্লেখ করিতে আন্তরিক সঙ্কোচ অনুভব করিতেন।

ভারতসম্রাট মন্ত্রিসমাজরূপ রঙ্গিন চশমার ভিতর দিয়া ভারতের অবস্থা পরিদর্শন করেন, চশমার রঙ্গ এমন ঘোরাল যে, যেখানে শস্য-তৃণ-বিহীন ভয়ঙ্কর মরুভূমি, সেই স্থানটা তাঁহার চক্ষে পরম রমণীয় শ্যামল শস্যক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হয়, সুবিস্তীর্ণ ধূলিসমাচ্ছন্ন প্রান্তরকে আতট-পূর্ণ সলিলশালিনী তটিনী বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার পর শুভ বুদ্ধি-বশতঃ ভারতের বিধাতাপুরুষ যদি ভারতের কোন মঙ্গলানুষ্ঠানের সংকল্প করেন, তাহা হইলে বিলাতের মন্ত্রিসমাজ সেই অনুষ্ঠান নিতান্তই বাহুল্য ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করেন; সেদিন সঞ্জীবনী পত্রিকায় ইহার এক দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৪ই ফাল্গুন সঞ্জীবনীতে 'লর্ড কর্জ্জনের একটি মহত্ত্বের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ—

সচিবকে ইহা জানাইয়াছিলেন যে, ভারতের চিরন্তন প্রথা এই যে, যখন কোন রাজা সিংহাসনারোহণ করেন, তখন প্রজাদের করভার লাঘব করিয়া থাকেন। ভারতীয় প্রথা অনুসারেই দিল্লীর দরবার হইবে, অথচ ভারতীয় প্রথা অনুসারে করভার লাঘব না করিলে রাজ-সম্মান রক্ষিত হইবে না। এইজন্য লর্ড কার্জ্জন দিল্লীর দরবারের সময় ইন্‌কম ট্যাক্স ও লবণের কর হ্রাস করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন লর্ড কার্জ্জনের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। লর্ড কার্জ্জন তেজস্বী লোক, সুতরাং তিনি সম্রাট এডওয়ার্ডের নিকট লিখিলেন, প্রাচ্যদেশীয় রীতি অনুসারে মহা সমারোহে দরবার করিব, অথচ প্রাচ্যদেশীয় প্রথানুসারে প্রজার করভার লাঘব করিব না, ইহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য মনে করিতেছি। অতএব আমি রাজপ্রতিনিধির পদ পরিত্যাগ করিলাম। অন্য লোককে রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করুন, তিনি আসিয়া দরবারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। গত অক্টোবর মাসে লর্ড কার্জ্জন সম্রাটের নিকট ইস্তাফাপত্র প্রেরণ করেন। সম্রাট লর্ড কার্জ্জনের পত্র মন্ত্রিসমাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী বেলফোর সাহেব লর্ড কার্জ্জনকে লিখিয়াছিলেন, ব্রিটিশ রাজ্যশাসন প্রণালী অনুসারে রাজা কাহারও করভার লাঘব বা বৃদ্ধি করিতে পারেন না। দিল্লীর দরবারে রাজার সিংহাসনারোহণের সংবাদ ঘোষিত হইবে, ইহা নিরবচ্ছিন্ন রাজকীয় ব্যাপার। এ সময়ে ট্যাক্স লাঘবের সংবাদ ঘোষণা করা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইবে না।

তখন লর্ড কার্জ্জন লিখিয়া পাঠান যে, দরবারের সময় অন্ততঃ এ কথা ঘোষণা করা উচিত যে, কোন প্রকার কর লাঘব করা হইবে। মন্ত্রিসমাজ যদি ইহাতে আপত্তি করেন, তবে তিনি কার্য্য

দান করেন, তাই লর্ড কার্জ্জন তাঁহার দরবারের বক্তৃতাতে কর লাঘবের আশ্বাস দিয়াছিলেন।"

সম্রাটের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে সম্রাটপ্রতিনিধি করপীড়িত দুর্দ্দশাপন্ন, দুর্ভিক্ষকাতর, দারিদ্র্যপেষিত ভারতীয় প্রজার করভার কিঞ্চিৎ লঘু করিতে ইচ্ছা করিয়া সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান মন্ত্রিসমাজ বলিলেন, 'বৃটীশ রাজ্যশাসন প্রণালী অনুসারে রাজা কাহারও করভার লাঘব বা বৃদ্ধি করিতে পারেন না। এ সময়ে ট্যাক্স-লাঘবের সংবাদ ঘোষণা করা বৃটীশ শাসনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইবে না।' অতি চমৎকার সহৃদয়তা। দিল্লীর দরবারে বৃটীশ প্রতিপত্তি ও গৌরব ঘোষণার জন্য কোটী টাকা ব্যয় হউক তাহা রাজনীতিসঙ্গত, আর দুস্থ প্রজার ট্যাক্স লাঘব করা রাজনীতিসঙ্গত নহে! একজন বড়লোকের দ্বারে ভিক্ষুক দুটি ভিক্ষার আশায় উপস্থিত হইলে বড়লোকটি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি ভিক্ষা চাইতে পার বটে কিন্তু আমাদের ভিক্ষা দিতে নাই, পূর্ব্ব পুরুষের নিয়মভঙ্গ করিতে পারিব না, অন্যত্র চেষ্টা কর, দেখ যদি কিছু পাও।"—মন্ত্রিসমাজের কথা ও সেই বড়লোকটির কথা ঠিক একই মর্ম্মের, তবে আমরা বড়লোকের দ্বারসমাগত সেই ভিক্ষুকটি অপেক্ষাও অধম, কারণ যাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দতাবৃদ্ধির অনুরোধে আমাদের স্কন্ধে এই ভিক্ষার ঝুলি, তাঁহারাই আমাদের প্রতি এই প্রকার অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। ইহার পরও কি স্পর্দ্ধিত ইংরাজসমাজ সগর্ব্বে বলিবে, "ভারতবাসীর জন্যই ভারত, ভারতের উন্নতির জন্যই আমরা ভারতশাসন করিতেছি।"

অনেক বিষয়েই ভারতবাসীর সুখ ও উন্নতির জন্য ইংরাজের

সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় জানেন, জাহাজে যে সকল মাঝিমাল্লা চাকরী করে তাহারা সকলেই ইংরাজ নহে, এ দেশী লোকও বিস্তর আছে। কিন্তু জাহাজে চাকরী করিয়া তাহাদের অন্নের সংস্থান যে আর কতদিন হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইতিমধ্যেই বিলাতের একদল মানবহিতৈষী ভারতীয় মাঝিমাল্লার দুঃখে প্রবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন, ভারতীয় লস্করগুলাকে জাহাজে যে স্থান দেওয়া হয় তাহা নিতান্ত অল্প ও অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু গোরা লস্করগুলি জাহাজে পরম সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত বাস করে, জাহাজে তাহারা দিব্য আরামে থাকে, অতএব ভারতীয় লস্করদিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, জাহাজের উপর বর্ণভেদে যে এমন বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকিবে ইহা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। ভারতীয় লস্করপুঞ্জের মোক্তারগণের এইরূপ বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহারা সাম্যনীতির সমর্থক, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদিগের কৌশলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন সহৃদয়তা বা পরদুঃখকাতরতা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা এ ভাবে চীৎকার করিতেছেন না, তাঁহাদের মতলব এই যে, আগে বৃটীশ ও ভারতীয় লস্করগুলির সুবিধা ও অধিকার সমান হউক, তখন অনায়াসে ভারতীয় লস্করগুলির অন্ন মারিয়া গোরা লস্করকে সেই স্থানে ভর্ত্তি করিতে পারা যাইবে। বৃটীশ জাহাজওয়ালারা এ দেশী লস্কর নিযুক্ত করেন, কারণ তাহাদের ব্যয় অল্প, তাহারা জাহাজের উপর যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যদি আইন অনুসারে বা অন্য কোন কারণে বৃটীশ ও দেশীয় লস্করের জন্য সমান বেতন, সমান সুবিধা করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তাঁহারা গোরা লস্কর ছাড়িয়া দেশী লস্কর পুষিবেন কেন? সুতরাং দেশী লস্করদিগের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির

জন্য ভয়ঙ্কর বক্তৃতা ও আন্দোলন চলিতেছে। ভারতের উন্নতির জন্য বা কোন প্রকার মঙ্গলের জন্য ইংলণ্ডের দলবিশেষ যখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন, তখন স্বভাবতঃই আমরা তাঁহাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি। প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হয় তাঁহারা নিস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিতেছেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির হইয়া পড়ে, তখন আমরা আক্ষেপ করিয়া মরি।

সুখের বিষয় দেশীয় লস্করদিগের এই উন্নতি চেষ্টায় বদ্ধপরিকর মহাপুরুষদিগের উদ্দেশ্য, পার্লিয়ামেণ্টের পার্শি মেম্বর সার মুনচেরজি মারোয়ানজি ভবনগরী আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশীয় লস্করদিগের মোক্তার সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়াছেন। ভবনগরী বহুবার স্বদেশের বহু অপকার করিয়াছেন, এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তিনি সেজন্য যথেষ্ট নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু এবার তিনি দেশীয় লস্করদিগের অন্ন বজায় রাখিবার জন্য যে ভাবে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না। এজন্য ভবনগরীকে অনেকের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি সর্ব্বত্রই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বিপক্ষের তর্কজাল খণ্ডন করিয়াছেন। যে, যে অনুগ্রহের প্রার্থনা করে না, তাহাকে সেই অনুগ্রহদানের জন্য জিদ্ করিলে সহজেই মনে হয় লোকটার উদ্দেশ্য ভাল নয়। মিঃ এইচ, জে, উইলসন, মিঃ বর্ট এম্, পি প্রভৃতি গোরা লস্করদিগের মুরুব্বিগণকে উক্ত পারসী ভদ্রলোক যে ভাবে নির্ব্বাক করিয়াছেন তাহা ভবনগরীর পক্ষেই যে কেবল শ্লাঘার কথা তাহাই নহে, তাহা আমাদেরও গৌরবের কথা। এতদিন পরে সার ভবনগরী যে দেশের একটা উপকারের জন্যও সচেষ্ট

দেশীয় মনুষ্য খুন করিয়া গোরা লোকের বিচার পূর্ব্বে যে ভাবে সম্পন্ন হইত, আজ কাল দেখিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—কিন্তু পিনাল কোডের ধারা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, কোন গোরার পদাঘাতে কোন দেশীয় লোক ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে, এখনকার মতই মহাধূমধামে ফৌজদারীর মামলা হইত বটে, কিন্তু অজাযুদ্ধ, ঋষিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি অনুষ্ঠানের মত উপসংহারে লঘু ক্রিয়ারই পরিচয় পাওয়া যাইত, বহুতর প্রমাণাদি গ্রহণের পর দানিয়াল মহাশয়েরা 'প্লীহা ফাটায়' দোহাই দিয়া অপরাধীকে মুক্তিদান করিতেন। এখন গোরার হাতে দেশীয়ের মৃগয়া অথবা মৃত্যুর হার এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, বিচারকগণ পূর্ব্ব বিচারনীতির একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং নরহত্যার অপরাধে গোরা অপরাধীর প্রতি বিনাপরিশ্রমে কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইতেছে। দৃষ্টান্তের অভাব নাই, ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই দুই চারিটি দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। এই সে দিন ওয়েল্‌স্ রেজিমেন্টের প্রাইভেট মরিস নামক একটা গোরা পঞ্জাব পুলিশের সার্জ্জেণ্ট কুরণ সিংহের প্রাণবধ করিল, যথানিয়মে মরিস্ ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইল, বিচারাভিনয়েরও ক্রটী হইল না, বিচারফলে মরিস ছয় সপ্তাহের জন্য বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ডাজ্ঞা লাভ করিল।

তাহার পর আসামের একটা বাগিচার এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মিঃ বেনের মামলা। লালসা নামক একটা কুলি বাগান ছাড়িয়া সপরিবারে পলাইতেছিল, কিন্তু ধরা পড়িয়া সে বেনের কাছে আনীত হইল, পৈশাচিক ক্রোধে বেনের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল, নরচর্ম্মধারীর বিশেষতঃ সুসভ্য জাতীয় মনুষ্যের এমন ক্রোধ ত দেখা যায় না! সংবাদপত্রে পাঠক পাঠ করিয়া থাকিবেন, মিঃ বেন সেই অসহায়, দুর্ব্বল, শোকা-

দিয়া প্রহার করিতে লাগিল, সেই প্রহারেই বেচারার কুলিজীবনের অবসান হইল। এই ভাবে যাহারা মানুষ ঠেঙ্গাইয়া মারিতে পারে, মানুষের চামড়ায় শরীর ঢাকা থাকিলেও তাহারা কি মানুষ ?—এই পাশবিক অত্যাচার, এই হৃদয়বিদারক উৎপীড়নের কথা শুনিয়া ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে বিচলিত না হন এমন মানুষ কেহ আছেন কি না জানি না, নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিক পীড়নের কথা দৈবাৎ পাঠ করা যায়। শুনা গিয়াছে, ঐতিহাসিক যুগের প্রথম আমলে রাজকুলকলঙ্ক নীরো একবার খৃষ্টানগণের জীবিত দেহে আলকাতরা ঢালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া তদ্দ্বারা তাহার উপবন আলোকিত করিতেছিল, মিঃ বেনের নিষ্ঠুরতা তাহা অপেক্ষা এক ডিগ্রী কম হইতে পারে।

কিন্তু এই মনুষ্যবধের জন্য যথানিয়মে মিঃ বেনকে ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইতে হইল। বিচারে স্থির হইল, মিঃ বেন (simple hurt) লঘু আঘাত করিয়াছেন অতএব তাঁহার ছয় মাস বিনাপরিশ্রমে কারাবাসের আজ্ঞা প্রদান করা হইল। কিন্তু কুলি লাল্সা যদি তেজস্বী ও বলবান লোক হইত, যদি সে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে স্তম্ভে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাহার পা হইতে নালবদ্ধ নাগোড়া জুতা খুলিয়া প্রভুকে শিরোপা দান করিত, তাহা হইলে বোধ করি সে বেচারা ছয় মাসের বিনা পরিশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াই পরিত্রাণ পাইত না, দণ্ড অনেক গুরুতর হইয়া দাঁড়াইত এবং ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিলে যে অবস্থা হয়, চতুর্দ্দিকের শ্বেত কৃষ্ণ, হরিৎ কপিশ টুপিওয়ালা হুল বাহির করিয়া সেই অবস্থা প্রকাশমান করিয়া তুলিত।

কিন্তু এই ছয়মাস শ্রমরহিত দণ্ডের কথা শুনিয়াই মিঃ বেনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তিনি নাকি এই দণ্ডের উৎকট আতিশয্যের

হউক, মিঃ বেনের দণ্ডভোগ যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে যে কোন মনুষ্য সখ করিয়া এইরূপ দণ্ডলাভে প্রবৃত্ত হইতে পারে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকার শিলচরের সংবাদদাতা এক টেলিগ্রামে জানাইয়াছেন—

SILCHAR, FEB. 25.

Mr. Bain was taken to the local Jail on Sunday, to enter his name, with full description, on the Jail administration Register. He was escorted by the District Superintendent of Police, Mr. Burt, and the Jail Superintendent, Surgeon-Col. Borah, in the latter's own carriage, from the hotel to the jail and Mr. Bain was always allowed to meet his friends at the hotel and used to offer them drinks. He was allowed liquor and smokes. Mr. Bain left Silchar this morning for the Presidency Jail by railway, as a first class traveller, escorted by the District Superintendent and two constables.

ইহার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা আমাদের নাই। ইংরাজ অপরাধীর বিচারে যদি পিনালকোডের শক্তি এইরূপে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আমরা বুঝিব আইন কেবল তাহার গৌরব নহে, তাহার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

একদিকে এই—একটা সাহেব একটা কুলিকে রেকাবদল দিয়া ঠেঙ্গাইয়া মারিয়া ফেলিল, তাহার ছয়মাস বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ডের

নিজের গাড়ীতে করিয়া বেড়াইবার সুযোগ প্রদান করিলেন, বন্ধুবান্ধবগণকে তাহার খানায় যোগদান করিতে দিলেন, সুরার প্রবাহও চলিতে লাগিল, তাহার পর সরকারী খরচে অপরাধীকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে তুলিয়া কলিকাতায় আনা হইল—দেখিয়া বোধ হয় মিঃ বেন ইংরাজ সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পক্ষান্তরে আসানসোলের ডাক্তার মিত্র ঘটিত মামলাটার কথা অদ্যোপান্ত চিন্তা করুন। মানুষ খুন করিয়া কোন ইংরাজ বা ফিরিঙ্গীর যে দণ্ড না হয়, মামলার বিচারের পূর্ব্বে ডাক্তার মিত্রের তদপেক্ষা সহস্রগুণ গুরুতর দণ্ড হইয়া গেল। মামলাশেষে মিঃ মিত্র নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইয়া সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মামলা আরম্ভের পূর্ব্বেই স্বজাতিগৌরব বাঙ্গালী ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু রাসবিহারী বিশ্বাস, মিঃ মিত্রের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মনুষ্যোচিত নহে, আইনসঙ্গতও নহে। ডাক্তার মিত্র যে অপরাধ করেন নাই বলিয়া মুক্তিলাভ করিলেন, সেই অপরাধ (অর্থাৎ একটা ফিরিঙ্গীকে প্রহার ও তাহার গৃহে অনধিকার প্রবেশ ইত্যাদি) তিনি করিয়াছেন ইহা পূর্ব্ব হইতে সাব্যস্ত করিয়া লইয়া, আসানসোলের পুলিশকর্ম্মচারীর তদন্ত নামঞ্জুর করিয়া, বর্দ্ধমানের বিশ্বাস মহাশয় ডাক্তার মিত্রের হাতে হাতকড়ি দিয়া চালান দিলেন, তাঁহার নিজের ব্যয়ে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে রাণীগঞ্জে পাঠাইলেন। যদি বাবু রাসবিহারী বিশ্বাস, মিঃ বেনের মত কোন গৌরাঙ্গকে কিম্বা যে কোন খ্রীষ্টান টুপিওয়ালাকে নরহত্যা অপরাধেও তাহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া ডাক্তার মিত্রের মত চালান দিতে পারিতেন, বিবিধ প্রকারে তাহাকে অপদস্থ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সাহস ও তেজের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার ক্ষমতার যে অপব্যবহার করিয়াছেন তাহার

মার্জ্জনা নাই—তা সে অপরাধ তিনি নিজের বাহাদুরী প্রকাশের জন্য স্বেচ্ছাক্রমেই করুন, আর কাহারও ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়াই করুন, ন্যায়ের অনুরোধে, রাজধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয় তদন্ত করা উচিত, নতুবা এরূপ ঘটনা দেশের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিবে।

তবে একটা কথা নিশ্চয়। এ দেশের উদ্ধত গোরার দল ক্রমাগতই দেখিয়া আসিতেছে, নেটিভের প্রতি কাপুরুষসুলভ অত্যাচার করিয়া অক্ষম আইনের হস্ত হইতে তাহারা অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, সুতরাং তাহারা কেবল দেশীয় পুরুষ নহে, দেশীয় রমণী সম্প্রদায়ের উপর পর্য্যন্ত অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছে, আর দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা দেশের মধ্যে শিক্ষায়, ধনেমানে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও স্বয়ং তাহার প্রতিকার সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া, আদালতে বিচারপ্রার্থী হইতেছেন। এরূপ বিচারপ্রার্থনায় যে কোন ফল নাই তাহা বহুবার দেখা গিয়াছে। সেদিন বোম্বের এক পুলিশ আদালতে পুনর্ব্বার তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন সন্ধ্যাকালে, একজন সম্ভ্রান্ত পারসী মহিলা ও দুইটি পারসী ভদ্রলোক, বোম্বেবরোদা মধ্যভারতীয় রেলপথের চর্চ্চগেট নামক ষ্টেশনে, একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। এই দুইজন পারসী ভদ্রলোক বোম্বে পারসীসমাজের বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি। একজনের নাম মিঃ এন্, এইচ, মুস—তিনি একজন সলিসিটার, দ্বিতীয়ের নাম মিঃ এ, জে, পাদসা—তিনি ব্যারিষ্টার, পোষ্টাল বিভাগের সুপ্রসিদ্ধ পারসী সিভিলিয়ান পাদসার ভ্রাতা। মহিলাটি পাদসা সাহেবের স্ত্রী। সেই ট্রেনে

কামরায় ছিলেন। এই ভদ্রলোক কয়টির নাম মিঃ ওয়াদলা, মিঃ সোরাবজি ও মিঃ রত্নাগর—সকলেই সম্ভ্রান্ত পারসী।

বোম্বে সহরের ভিতরেই অনেকগুলি ষ্টেসন, ব্যবধান বড় অধিক নহে। চর্চ্চগেট ষ্টেসন হইতে ট্রেন ছাড়িয়া মহালক্ষ্মী ষ্টেসনে আসিয়া থামিলে, একজন সাহেব সেই পারসী-অধিকৃত প্রথম শ্রেণীর কামরাটি খুলিয়া, তাঁহার ভৃত্যকে তাহার মধ্যে তাঁহার 'সামান' তুলিতে বলেন। এই সাহেবটি একটি পরাক্রান্ত জনবুল, ভারতবর্ষের রক্ষাকার্য্য যে সকল বৃটিশপুঙ্গবের হস্তে সমর্পিত আছে তাহাদেরই একজন। তাঁহার নাম ও ভি লি উইণ্টার, হায়দরাবাদ কণ্টিন্‌জেণ্টের ১নং ফীল্ড ব্যাটারীর তিনি একজন কমাণ্ডাণ্ট। সুতরাং তিনি যে, ভারতববর্ষীয় ভদ্রলোকের অপমান করা, তাঁহার একটি 'প্রিভিলেজ' বলিয়া মনে করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই।

যেমন মনিব তেমনই চাকর; প্রভুর আদেশ পাইয়া ভৃত্য পাদসা-পত্নীকে ধাক্কা দিয়া, তাঁহার আসনের নীচে সাহেবের জিনীসপত্র রাখিল, বিছানা ও চামড়ার ভারী ট্রঙ্ক মিঃ মুসের পায়ের কাছে জড় করিল, তাহার পর পাদসার স্ত্রীর কোলের উপর সাহেবের টুপিটা স্থাপন করিল: অদূরে দাঁড়াইয়া মিঃ উইণ্টার বীরগর্ব্বে তাঁহার ভৃত্যের অনিন্দ্যসুন্দর কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার ভৃত্যকে একটা কথাও বলিলেন না, একটি সম্ভ্রান্ত রমণীকে যে তাঁহার ভৃত্য অপমান করিল তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, সটান গাড়ীতে উঠিয়া পাদসাপত্নীর একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাহির করিয়া দিলেন। সাহেবের দেহ পাদসাপত্নীর দেহে সংঘর্ষিত হইল। পাদসা সাহেবের স্ত্রী, মিঃ উইণ্টারকে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, সাহেব তাঁহার ক্রোড়ে বসিবার

পারসীসমাজের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্থাণুর ন্যায় বসিয়া, একটা গোরার এই প্রকার জানোয়ারের মত ব্যবহার দেখিতেছিলেন, কেহ কোন কথা বলাও আবশ্যক বোধ করিলেন না। শেষে মিঃ মুস গরম হইয়া উক্ত বীরপুঙ্গবটিকে বলিলেন, "সাহেব, এই মহিলাটির নিকট তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" কাপ্তেন উইণ্টার এই প্রস্তাবে ক্রোধে একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন, তিনি সকলের সাক্ষাতেই মিঃ মুসকে অতি কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন। যে গালাগালিতে নেটিভবিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত, মিঃ মুস ও তাঁহার সহায় পারসী চতুষ্টয় যদি একটু সাহসী হইতেন, একটু তেজস্বিতা একটু আত্মসম্মান যদি তাঁহাদের অন্তরের এক কোণেও বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই রমণীর অসম্মানকারী, অভদ্র, দাম্ভিক গোরার ব্যবহারের প্রতিশোধ প্রদান করিতে পারিতেন। সাহেবকে কামরা হইতে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া না দিউন, গাড়ীর মধ্যেই এমন শিক্ষা দিতে পারিতেন যে, সাহেব ভবিষ্যতে ভারত মহিলার অপমান করিবার পূর্ব্বে দশবার ইতস্ততঃ করিত, ভারতীয় আত্মসম্মানের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মিত। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের ভদ্রলোকের মেরুদণ্ড ইংরাজের জুতার চাপে এমন দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, পাঁচ জন পারসী তাঁহাদের কুললক্ষ্মীকে এভাবে অবমানিত হইতে দেখিয়াও তাঁহার মানরক্ষায় সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন না! মিঃ মুস ক্ষীণ স্বরে সাহেবকে তাহার অশিষ্টতার জন্য ক্ষমা চাহিতে বলিলে, সাহেব অনায়াসে বলিল, I would sooner apologise to my Sweeper than do the same to you—অর্থাৎ আমার ঝাড়ুদারও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সাহেব যে এই রকম তামাসাতে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছে তাহাও প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইল না।

বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পুলিশ আসিয়া সকল কথা শুনিয়া কাপ্তেন সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সাহেব নিজের নাম বলিলেন না, অনন্তর ষ্টেসন মাষ্টার আসিয়া বহু কষ্টে কাপ্তেনের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর মহাসমারোহে মাজাগান ফৌজদারী আদালতে মামলা আরম্ভ হইল। মিঃ মুস প্রভৃতির সহযাত্রী মিঃ ওয়াদীয়া জেরায় বলিলেন, "মিঃ মুস কাপ্তেন উইণ্টারকে ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছিলেন, তিনি ক্ষমা চাহেন নাই, উপরন্তু একরূপ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিলেন। তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি, ভাবিতেছি মিঃ মুস কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিলেন।"—স্বদেশীয়া স্বজাতীয়া মহিলাকে একটা গোরা কর্ত্তৃক এ ভাবে অবমানিত হইতে দেখিয়া, তিনি স্বয়ং কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিয়াছিলেন; এ সময়ে সে কথাটা তাঁহার মনে উদয় হইলেই ভাল হইত। আদালতে আসিয়া তাঁহার এ আত্মসম্মানের অভিনয় না করাই ভাল ছিল।

যাহা হউক দেশীয় হাকিম ভারত সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা সেই কাপ্তেনটিকে পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া মনে করিয়াছেন, অতঃপর আর রেলের গাড়ীতে গোরার অত্যাচারের প্রসঙ্গ বর্ত্তমান দেখা যাইবে না, কাপ্তেনের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর অভদ্র কাপ্তেনের চৈতন্যোদয়ের জন্য যে কিরূপ শিক্ষাদানের আবশ্যক তাহা কেহই ভাবিয়া দেখিবার একবারও অবসর পান নাই।

কিন্তু এরূপ দণ্ডে গোরার শিক্ষালাভ যে একেবারেই হয় না তাহার দৃষ্টান্ত বহুবার দেখা গিয়াছে। সে দিন দারজিলিংয়ে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইয়াছে। একটা গোরা সে দিন মদ খাইয়া

কেবল সম্ভ্রান্তা নহেন, কোন ভুটিয়া রাজার আত্মীয়া। রমণী, দুইজন সঙ্গিনীর সহিত গৃহে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে চা পান করিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিয়াছে, গোরাটাকে টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, গৃহস্বামিনী ও একটি রমণী কক্ষান্তরে পলায়ন করিলেন। একটি রমণী গোরার কবলে বন্দিনী হইয়া আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু ও কপোলে আঘাত লাগিল, শুনা যায় কাপুরুষ গোরা সেই রমণীকে প্রহার করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যাহা হউক রমণীগণের চীৎকারে কনেষ্টবল ও কয়েকজন পল্লীবাসী সেখানে সমবেত হইয়া গোরাটাকে ধরিয়া ফেলিয়া থানায় লইয়া চলিল। ধর্ম্মাবতার মিঃ ক্যাম্বেলের নিকট গোরার অপরাধের বিচার হইল, বিচারে ধর্ম্মাবতার তাহার পঁচিশটি মুদ্রা অর্থদণ্ড করিয়াই তাহাকে নিষ্কৃতি দান করিলেন। আদালতের আদেশ হইল দশ টাকা উক্ত অবমানিতা রমণীকে প্রদান করা হইবে। দেশীয় পল্টনের কোন সিপাহী যদি ভাঙ্গের নেশায় উন্মত্ত হইয়া, কোন একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে এই ভাবে উৎপীড়ন করিত, তাহা হইলে মিঃ ক্যাম্বেল সেই সিপাহীকে কিরূপ দণ্ডদান করিতেন, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হয়। পল্লীবাসিগণ স্বহস্তে গোরাটার মাতলামী ঘুচাইয়া দিলে তাহার যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের লোক প্রকৃতির দুর্ব্বলতাবশতঃ কেবল ঠকিতেই চায়, এবং ঠকিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেইজন্যই তাহাদিগকে পদে পদে এমন নিগৃহীত হইতে হয়। এইজন্যই গোরার অত্যাচার ও স্পর্দ্ধা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে আইনপরিচালক-দিগের মৃদু ব্যবহারে ইহার কোন প্রতিবিধান হইবে না, ইহার

আরম্ভ হইবে, সেই দিন হইতেই গোরারা আমাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করিতে শিখিবে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্ব্বর গোরার দল যখন এ দেশের নরনারীগণের প্রতি অকারণ পশুবৎ অত্যাচার করে, তখন তাহা দেখিয়া আমরা যেন বিস্মিত হই না, কারণ তাহারা ভদ্রতা, সংযম, শিষ্টাচারে অনভ্যস্ত, শারীরিক বল ও মানসিক দম্ভ প্রকাশকেই তাহারা বীরত্ব বলিয়া জানে, পশুত্ব প্রকাশেই তাহারা অধিক আনন্দ ও আরাম বোধ করে। কিন্তু দেশের বাতাস এমন দূষিত হইয়া উঠিয়াছে, ঐশ্বর্য্যমদে ও ক্ষমতাদর্পে অধীর হইয়া অধিকাংশ ভারতপ্রবাসী ইংরাজ এমন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কে ভাল কে মন্দ তাহা হঠাৎ ঠাহর করা কঠিন। এখন কেবল ছোকরা ইংরাজ সিভিলিয়ানেরা যে কথায় কথায় বে-আইনি করে, সামান্য কারণেই যে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া দেশীয়গণের সহিত অন্যায় ব্যবহার করে তাহাই নহে, বহুকালের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, কার্য্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, বয়োবৃদ্ধ সিভিলিয়ানগণও ধীরে ধীরে এ দেশের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশূন্য, রূঢ়ভাষী, শিষ্টাচারবর্জ্জিত হইয়া উঠিতেছেন, দৃষ্টান্তের জন্য অধিকদূর যাইতে হইবে না। আমাদের পাঠকগণ অনেকেই মিঃ হমুডের নাম শুনিয়াছেন, শাসন বিভাগে বহু দিন দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া তিনি রেজেষ্ট্রী বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদে কয়েক বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার পর গয়ার জজ হইয়া যান, এখন তিনি পাটনার জজ। এই মিঃ হমুড বাহাদুরের এক কীর্ত্তির কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমার বিস্ময় ও ক্ষোভ দমন করিতে পারি নাই। এক জন উকীল বক্তৃতা করিতে করিতে নিয়মিত তাহার মোহরীকে কি একখানি রেফারেন্সের

পুস্তক আনিতে বলিয়াছিলেন, উকীল মহাশয় এমন বে-আইনি বা ভদ্র-নীতি-বিগর্হিত কাজ কিছুই করেন নাই, যেজন্য eye for eye এবং tooth for tooth নীতির ব্যবস্থা হইতে পারে; কিন্তু এই ব্যাপার দর্শনেই মিঃ হমুড ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, "তোমরা জুনিয়ারের দল ভারি বেয়াদব, আমি এভাবে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কথা কহিতে দিব না, যদি ভবিষ্যতে তোমরা সমজাইয়া না চল, আমি আদালতে তোমাদের মুখদর্শন করিব না।—আদালতে মুখদর্শন না করার অর্থ এজ্‌লাসে প্রবেশ করিতে দিব না। ছোকরা সিবিলিয়ান হইলে কথাটা খোলসা করিয়াই বলিয়া ফেলিত, প্রবীণ, বিজ্ঞ সিবিলিয়ান মিঃ হমুড একটু কৌশল করিয়া কথাটা বলিলেন। কিন্তু ভৎর্সনাটি এতই তীব্র যে ইহাকে মুরুব্বি লোকের স্নেহের ভৎর্সনা বলিয়া কাহারও ভ্রম হইতে পারে না। মিঃ হমুড যাঁহাদিগকে বেয়াদব বলিয়া গালি দিলেন তাঁহারা কেহই জুনিয়ার নহেন, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সমাজে তাঁহাদের প্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে; কিন্তু মিঃ হমুড জানেন তিনি জজ ও তাঁহারা তাঁহার কোর্টের উকীল, অতএব তিনি তাঁহাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিলে তাঁহারা অগত্যা তাহা সহ্য করিবেন।

এই সহনশীলতা, মেরুদণ্ডের এই ক্ষীণতা, জাতীয় চরিত্রের এই মৃদুতা, আমাদিগের আত্মসম্মান, আমাদের তেজস্বিতা ও আমাদের মনুষ্যত্বের মূলদেশ জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা ধূলায় পড়িয়া কেবল লাথি খাইতেছি, আর ভাবিতেছি—হায় হায় যখন ডেভিড্‌ হেয়ার, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, ডিরোজিয়ো প্রভৃতি মহোদয়েরা এমন কি সার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতির মত বড়লাট পর্য্যন্ত আমাদিগকে বন্ধু মনে করিতেন, বিপদে আমাদের সাহায্য করিতেন, সম্পদে উৎসবে আমাদের সহিত যোগদান করিতেন, দেশের উন্নতিকল্পে অকপটভাবে সহ-

যোগিতা করিতেন,—সে সময় এখন কোথায়? সেই সকল মহীরুহের পরিবর্ত্তে কি এই সকল উপবৃক্ষ আমাদের ছায়া ও সুফল দানের জন্য লাভ করিয়াছি? কিন্তু আক্ষেপ বৃথা, সে কাল আর নাই; এখন আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। আমাদের জাতীয় জীবনের সেই মধুর শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে, একটি সুমিষ্ট লাড্ডু পাইয়া আহ্লাদে গড়াইয়া পড়িবার সময় আর নাই; সম্মুখে জীবনের সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র, এখন আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। কর্ম্মসমুদ্রে ডুবিয়া রত্নের সন্ধান করিতে হইবে। আমাদের দুর্ব্বলতা, আমাদের লজ্জা, কলঙ্ক, দূরে পরিহার করিয়া একবার মানুষের মত—জগতে জীবিত জাতি সমূহের মত মাথা উঁচু করিয়া তুলিতে হইবে; কেবল বিদ্যায় নহে, কেবল জ্ঞানে নহে, দেহের বলে, মনের তেজে, একতার শক্তিতে স্পর্দ্ধিত অত্যাচারীর স্পর্দ্ধা নিবারণ করিতে হইবে। তাহা যদি না পারি, নব নব উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া, পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা তাহা হইলে চিরদিন পরাজিত হইতেই থাকিব, শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান কিছুই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ —এই বিধাতার রাজ্যে যে আপনাকে রক্ষা না করে—অন্যে তাহাকে কখন রক্ষা করে না, চিরদিন রক্ষা করিতেও পারে না।

৺বাবু স্থচিৎসিং।

কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় হার্মষ্টোন সার্কাসের পটমণ্ডপে, মল্লবীর স্থচিৎসিংএর সহিত গোলামের ভ্রাতা কাল্লু পল্‌বানের কুস্তি দেখিবার জন্য কলিকাতাবাসী সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। বিচারক ও পুরস্কারদাতা ছিলেন কুচবিহারের অধিপতি বঙ্গের বীরাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ভূপ। স্থচিৎসিং ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পল্‌বান্ ছিলেন। কিন্তু সে দিন প্রতিদ্বন্দ্বী মৃত গোলামের ভ্রাতা পল্‌বান্ কাল্লুর নিকট পরাজিত হন। স্থচিৎ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 'চিৎ' হয়েন। তিনি সে সময় অসুস্থ ছিলেন। শুনা যায় এই অসুস্থতা এবং কাল্লুর মল্লজন-অনুচিত কৌশলই সে দিবস স্থচিতের পরাজয়ের কারণ। কাল্লু পল্‌বান্ স্থচিতের নেত্রবিবরে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া গ্রীবা উত্তোলন করান; পরে কণ্ঠের অস্থি উভয় হস্তে নিষ্পেষিত করিয়া, আপন ভারসহ ঝুলিয়া পড়েন, এবং অজ্ঞানাবস্থায় স্থচিৎকে চিৎ করেন। এইরূপ কৌশল ('লুট্টি কসাপ্যাচ') রাজ-দরবারেও প্রধান প্রধান পল্‌বান্ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ।

কুস্তির দিন ও তৎপূর্ব্ব হইতেই স্থচিত জ্বরে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার শরীর তখনও দুর্ব্বল ও গ্লানিযুক্ত ছিল, এবং ঐ ক্রীড়ার পনের দিবস পরেই ১৪ই মাঘ তিনি আপন জন্মভূমিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নিজ ছাপ্‌রা হইতে সার্দ্ধ দুই ক্রোশ উত্তরে আফোর গ্রামে ১২৭৯ সালে মল্লবীর স্থচিৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম ৺সিউবরণ সিং। পিতা শ্রীযুক্ত বাবু ঝুটন্ সিংহ। স্থচিৎ জ্যেষ্ঠ; কনিষ্ঠ বাম আশ্রে। ইঁহারা আফোর গ্রাম মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্মানার্হ। জাতিতে ব্রাহ্মণ। গ্রামের মধ্যে বিলক্ষণ মর্য্যাদা, পদবী ও প্রতিপত্তি

সুচিতের পিতা ঝুটন্ সিংহ প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত যথেষ্ট শারীরিক ব্যায়াম করিতেন। তাঁহার বাটিতে অনেক পল্‌বান্ থাকিত। তিনি নিজে কখনও পরগৃহে চাকুরি লয়েন নাই। তিনি অতি শিষ্ট ও ভদ্র ব্যক্তি। প্রকৃতি, তাঁহার পুত্রে তাঁর সমস্ত গুণগুলিই অর্পণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে সুচিতের ভবিষ্যৎ-বীর্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি সঙ্গীদিগের দুই তিন জনকে পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে লইয়া অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেন। তিনি নামেই যে শুধু 'সু-চিৎ' ছিলেন তাহা নহে; তিনি যথার্থ-নামা। তাঁহার ন্যায় সুশীল ও নম্র, অথচ ধীর ও গম্ভীর, তাঁহার শৈশব-সঙ্গীমধ্যে কেহই ছিল না। পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট পুত্রের কোনরূপ ত্রুটি বা অসদাচরণ, তাঁহার মাতাপিতাকে কোন দিন শুনিতে হয় নাই। কলহ কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না। তবে, সৎসাহসপ্রদর্শনে কদাপি বিমুখ ছিলেন না। শৈশব হইতে সুচিৎ হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গ; কিন্তু মাংসল নহে। পরে মাংস বৃদ্ধি হয়।

যথাকালে তাঁহার উপনয়নসংস্কার হইলে পর, সুচিতের জেষ্ঠ্যতাত-পুত্র শ্রীযুক্ত ধনরাজ সিং তাঁহার গুরুত্বপদ (ওস্তাদ) গ্রহণ করিলেন। তিনি একজন বেশ বিখ্যাত পালোয়ান। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক লোক, শুনিয়াছি, ছাপরায় বিরল। তিনি অত্যন্ত উদারচেতা ও অমায়িক; সদাই প্রফুল্ল ও সন্ন্যাসীর ন্যায়। সুচিৎ তাঁহারি সাক্‌রেদ। শৈশবান্তে তিনি সুচিৎকে যথারীতি মল্লক্রীড়ায় অভ্যস্ত করাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহাকে আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম-শিক্ষাও প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলে, জীবনের অন্তিমমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুচিৎ স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ থাকিয়া, নিত্যবিধি সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়াছিলেন। আমাদের ব্যায়ামশিক্ষার্থিগণের এ বিষয়টা বিশেষ লক্ষ্যনীয়। সুচিত শৈশবে মাতৃভাষা, (হিন্দি), অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করেন।

শ্রীযুক্ত সূরয্ প্রসাদ বাবুর বিলক্ষণ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহারই অনুরোধে, সুচিৎ সূর্য্যবাবুর গৃহে ‘পাট্টা’র মত (পল্‌বান্ অপেক্ষা হীনশক্তি) কুস্তি-চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এতাবৎ সুচিতের নাম অধিক প্রচারিত হয় নাই। একদিন বিখ্যাত পল্‌বান্ শম্ভুসিং সুচিতের সহিত হাত মিলাইতে উকিল বাবুর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শম্ভু চারি টাকা রোজের পলোয়ান্। সৌভাগ্যক্রমে, সেবার সুচিতের জয় হয়। তখন হইতে সুচিতের নাম, বালার্কতপন প্রায়, দিগ্দেশে বহুল প্রচার হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় সুচিতের বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর মাত্র। তখন হইতে সুচিৎকে প্রায় ৫০ কুস্তি লড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র, তাঁহার ওস্তাদ্ ‘পীর পল্‌বান্’ গোলাম্ ভিন্ন, কাহারো সহিত কুস্তিতে তাঁহার পৃষ্ঠে ধূলিস্পর্শ করে নাই। তাঁহার বিখ্যাত জয়গুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি মাত্র এস্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

গয়ার ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত বলদেও সাহাবের দুর্দ্দান্ত পলোয়ান্ হাক্কিকে পরাস্ত করেন। মাঝার বিখ্যাত জমিদার হীরা সাহাবের পলোয়ান্ প্রবল-প্রতাপ গুল্বি চৌবেকে পরাস্ত করেন। রাজা লীলানন্দের শ্রেষ্ঠ পল্‌বান্ চুম্বন মিশিরকে (মিশ্র) রনেলীনামক স্থানে পরাজিত করিলে, চুম্বন সুচিৎকে আপন ওস্তাদ্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। অতঃপর বিখ্যাত ‘জোয়ান’ চন্দর্ (চন্দ্র) সিংহের সহিত অযোধ্যায় এক কুস্তি হয়। বহুক্ষণ পরিশ্রমের পর, উভয়ে ‘বরাব্বর’ (সমান) ছিলেন। ইহার পর ছাপরার সন্নিকটস্থ মাঝায়, কাল্লু পলোয়ানের সহিত সুচিতের মল্লপরীক্ষা হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া উভয়ে যথাসাধ্য কৌশল ও বল প্রয়োগ করিলেও সমান সমান গিয়াছিল।

সুচিৎ মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে গয়াক্ষেত্রে ‘বিশ্বজিৎ’

গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র ভিন্ন রাঘবের উপদেষ্টা কে হইতে পারে! গোলাম সুচিংকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; এবং তাঁহার অপরিসীম বাহু-বল দর্শনে সানন্দে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। একদিন তাঁহার আথড়ায় কাল্লু ও সুচিৎ আপোসে 'জোর করিতেছিল।' কাল্লু কুপন্থা আশ্রয় গ্রহণোদ্যত হইলে, মহানুভব গোলাম ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন; "তুই অত বড় জোয়ানকে খারাব কত্তে চাস্? জানিস্—আর দুবছর বাদে, মেহন্নত করে, ওকে কিঙ্কর সিংহের সহিত লড়াব"! কিঙ্কর সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী, বা সমকক্ষ ভারতে—জগতে নাই! সুতরাং মহাবীর গোলামের মত পল্‌ওয়ানের অভিমত সুচিতের সামর্থ্য ও কৌশলাদির যথেষ্ট পরিচয়।

সুচিতের ক্ষমতার আর একটি উদাহরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। একবার সেই অদ্বিতীয় পলোয়ান-কুলাতঙ্ক কিঙ্কর কার্য্যোপলক্ষ্যে বাঙ্গালায় আসিলে, জমিদার বলদেও সাহেব তাঁহাকে সুচিংকে লড়াইতে উপরোধ করেন। সুচিৎ কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া করিলে, কিঙ্কর সুচিংকে নীচে লইয়া আসেন। এবং 'কাচ' ধরিয়া সুচিংকে উপরে উত্তোলন করিতে চেষ্টা পান; লেঙট ছিঁড়িয়া যায়। অবশ্য, কিঙ্কর ও সুচিতে তখন প্রভেদ অনেক। কিন্তু কিঙ্কর তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি আমার সহিত ইন্দোরে চল; তোমার যেরূপ সাহস ও বিক্রম, তাহাতে এক বৎসরের মধ্যে তোমাকে অদ্বিতীয় পলোয়ান্ করিয়া দিব।" বাস্তবিক কিঙ্করের সহিত লড়িব, কোনও পলোয়ান্ এরূপ কল্পনা করেন না। দৈব-নির্দ্দেশে সেবার যাওয়া হয় নাই।

সুচিং অদীর্ঘ অথচ গৌরবপূর্ণ জীবনের শেষভাগে দাঁতিয়া রাজ-বাটিতে পলোয়ানরূপে কার্য্য প্রাপ্ত হন। বেতন, দৈনিক ছয় টাকা।

গৃহে প্রত্যাগমন করেন। আরোগ্যে তাঁহার শরীর সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই, কুস্তির ঠিকাদার সাবু খলিফা তাঁহার বাটিতে গমন করিয়া একরূপ ধন্না দিয়া পড়িলেন। "আমার অনেক টাকা ক্ষতি হইবে; আপনার অত্যন্ত নাম আছে, একবার রঙ্গভূমে আসিবেন মাত্র; কাল্লু আপনার ভায়ের মত; এ আপোসের কুস্তি।* আপনি দয়া করিয়া চলুন"। এইরূপ নানাবিধ কাতর বচনে প্রবোধ দিয়া, পরদুঃখকাতর সুচিতের সম্মতি লাভ করে। সুচিৎ তদনুসারে কলিকাতায় আগমন করেন। এই জন্যই জ্বরগায়ে কুস্তি হইয়াছিল। আর, প্রতিপক্ষের জয়লাভ হইলেও তাহাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের ন্যায় হীনোচিত নিন্দিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া সুচিৎ ভবানীপুরের বিখ্যাত সহৃদয় জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ চৌধুরীর গৃহে অবস্থান করেন। তখন আমাদের মধ্যে যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি জানেন সুচিৎ কিরূপ লোক ছিলেন। তাঁহার নিকট মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় বসিয়া থাকিতে হইত। তাঁহার অমৃতায়মান বচনাবলী শ্রবণ করিব, না তাঁহার পীবর বাহুযুগ, বিশাল বক্ষঃ, উজ্জ্বল শান্তপ্রভ নয়ন নিরীক্ষণ করিব! ফলতঃ, তিনি অধিক বীর্য্যবান্ কি অধিক গুণবান্ ছিলেন তাহার বিচার করা দুরূহ। তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় উদারচেতা; কুস্তিলব্ধ প্রচুর অর্থ সমস্তই ব্রাহ্মণভোজনে ও দীনদুঃখীকে দান করিয়া ব্যয় করিতেন। ঈদৃশ দানশীলতা লক্ষপতিতেও বিরল দৃষ্ট হয়।

কলিকাতার কুস্তির কয়েকদিন পরে, অসুস্থ শরীরে, সুচিৎ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাত্রাকালে কলিকাতা ভবানীপুরের বিখ্যাত কুস্তিগীর্ সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত কেতকী বাবুকে সঙ্গে লয়েন। কেতকী-বাবু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব। একদিন কথাপ্রসঙ্গে সুচিৎ কেতকী

বাবুকে বলিয়াছিলেন—"বাবু, বাঙ্গালী বাবুরা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, যে আমরা (বাঙ্গালীরা) বলবান্ হইতে পারি কি না। বাবু, ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য প্রশ্ন শুনি নাই। যে দেশে দুধ, ঘী আর আটা, সে দেশে লোকে কি করিতে না পারে! যে দিন বাঙ্গালী বাবুরা বুঝিবেন, যে আমরা কি ছিলাম, সে দিন ভারতের দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।" হায়, আমরা সাহেবলিখিত কেতাবে,—"বাঙ্গালার দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে, অধিবাসিগণ হীনবীর্য্য হয়," একথা কণ্ঠস্থ করিয়া সুচিৎ প্রমুখ বীরগণের কথা উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছি!

আফোরে গমনানন্তর সুচিৎ পূর্ব্বজ্বরে অল্প অল্প ভুগিতে লাগিলেন। কিন্তু চিকিৎসক ('শতমারী চিকিৎসকঃ') তাঁহাকে, উদরের গরম জন্য জ্বর হইয়াছে বলিয়া, যত প্রকার শীতবীর্য্য বস্তু সেবনের ব্যবস্থা করিলেন; যথা মিস্রিপানা, মনেক্কাসরবৎ, আমড়া তক্রাদি। চিকিৎসায় রোগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া সান্নিপাতে পরিণত হইল। পরে গত ১৪ই মাঘ বেলা দ্বিপ্রহরে মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া—স্বদেশকে কাঁদাইয়া সুচিৎ দেহত্যাগ করেন। দ্বিবর্ষ বয়স্ক শিশু দীননাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র। কোন দিন পিতার নামের গৌরব সে রক্ষা করিবে এই আশা করা যাক।

সুচিতের অমিত বাহুবল ভিন্ন অদ্ভুত যষ্টি ও অসিবল ছিল। শৈশব হইতে পলবানদিগের চির-প্রচলিত রীত্যনুসারে, তিনি লাঠি ও তরবারি-সঞ্চালনকৌশল শিক্ষা করেন। লাঠি, কুস্তির অঙ্গ বিশেষ। কুস্তির জয় পরাজয় নির্ণয় কালে উভয়পক্ষে মতভেদ হইলে, অনেক সময় 'লকড়ি' চলিয়া থাকে। তিনি এই বিদ্যা-পারদর্শিতায়, বহুল রাজদরবার ভিন্ন অনেকানেক আখড়ায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

IMPERIAL LIBRARY.